নবজাগরণ ও মানবিকতাবাদের ভূমিকায়

দীনবন্ধুর নাটক

ডঃ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বর্ণালী

৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড,

কলিকাতা-৭০০০০৯।

প্রথম প্রকাশ :
মার্চ, ১৯৬১

প্রকাশক -
শাওনী ঘোষ,
কাঁচড়াপাড়া,
২৪ পরগণা।

প্রচ্ছদ :
গৌতম রায়।

মুদ্রাকর :
শ্রীগোবিন্দলাল চৌধুরী।
ভগবতী প্রেস,
১৪।১ ছিদাম মুদি লেন,
কলিকাতা—৬

উৎসর্গ

পুত্র স্নেহে যিনি ছাত্রদের কাছে টেনে নিতেন,
যিনি দীক্ষিত ছিলেন ত্যাগ-ব্রতে এবং
প্রকৃত অর্থে যিনি ছিলেন
আচার্য,
শেষ মুহূর্তে দুটি ছাত্রকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের প্রাণটি পর্যন্ত যিনি
দিলেন উৎসর্গ করে,
আমার সেই প্রিয় অধ্যক্ষ
গো পা ল চ ন্দ্র ম জু ম দা রে-র
পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে—

লেখকের অন্য বই :

দুই মধুসূদন।

পুরনো কলকাতার নায়িকা।

বাবু গৌরবের কলকাতা।

ডিহি কলকাতা ছাড়িয়ে।

সম্পাদিত গ্রন্থ :

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী।

গ্রন্থকারের নিবেদন

দীনবন্ধু মিত্রকে নিয়ে একটি গ্রন্থ লেখা যেতে পারে, এরকম একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আজ থেকে প্রায় এক যুগ আগে।—পরিকল্পনাও সেইমত তৈরী হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তথ্য সংগ্রহের জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলাম। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ, নোটবই, আর নানারকম খবরে মগজ বোঝাই করে হানা দিতে থাকলুম এক লাইব্রেরী থেকে আরেক লাইব্রেরী। উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরী, কৃষ্ণনগর, শান্তিনিকেতন থেকে কাছে দূরে কোনো লাইব্রেরীকেই বাদ দিইনি। দীনবন্ধুর অধস্তন বংশধরদের বাড়িও গিয়েছি। দেখা করেছি শ্রদ্ধেয় বিপন মিত্র ও তপাই মিত্র মহাশয়ের সঙ্গে। সবাই সহযোগিতা করেছিলেন। তথ্যও পেয়েছিলাম নানা রকমের।

অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। তাঁর কাছ থেকে প্রচুর উৎসাহ পেতাম। দীনবন্ধুকে একটি বিশেষ দৃষ্টি কোণ থেকে দেখার ব্যাপারে তিনি দিতেন প্রভূত উৎসাহ। অনেক সময় এ নিয়ে আলোচনাও করতেন। তবে তাঁর অবকাশ ছিল কম, ব্যস্ত মানুষ, তাই প্রতিটি জিনিষ খুঁটিয়ে দেখে দিতে পারতেন না।—সুতরাং নিজেই নিজের মনের মতন করে ঢাউস একটি পাণ্ডুলিপি তৈরী করে ফেললুম। সে বই যে কখনো ছাপা হতে পারে, তা' ঘুণাক্ষরেও ভাবিনি।

আজ একযুগ পরে আমার প্রকাশক-বন্ধু কান্তিবাবুর তাগাদায় অঘটন ঘটল। তিনি বইটিকে প্রকাশ করবার জন্য হলেন উৎসাহী।—কিন্তু 'স্ক্রিপট্' দিতে গিয়ে ফ্যাসাদে পড়লাম। ছাপার মত করে বই কেমন করে তৈরী করতে হয়, ইতিমধ্যে তার অভিজ্ঞতা ঘটেছে। সুতরাং সমস্যা দেখা দিল ঐ পাহাড় ঘেঁটে সে রকম বই কেমন করে বানিয়ে দেব?—তা' ছাড়া ইতিমধ্যে 'নবজাগরণ' ইত্যাদি সম্পর্কে বেশ কয়েকখানি ভালো ভালো বই বেরিয়ে গেছে বাজারে। অন্নদাশংকরের লেখা রেনেসাঁস সম্পর্কিত বই, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা রামমোহন বিষয়ে গ্রন্থ এবং শিবনারায়ণ রায়ের লেখা রেনেসাঁস সম্পর্কিত আলোচনা আমাকে অনেক ভাবিয়েছে। এ ছাড়া দীনবন্ধুর বিষয়ে কিছু কিছু লেখা আগে আমার চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। যেমন ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের 'দীনবন্ধু মিত্রের স্বদেশ চিন্তা'

শীর্ষক প্রবন্ধটি। এখন বই প্রকাশ করতে হলে এঁদের কথাগুলিকে সেই গ্রন্থে অবশ্যই ঠাঁই করে দিতে হয়।—সোজা কথা, বিপদে পড়লাম। ইতিমধ্যে কালের ব্যবধানে নানা ব্যাপারে আমার নিজের মতেরও বদল হয়েছে। তাই প্রকাশক-বন্ধুর অনুরোধ রাখতে গিয়ে কী বিপদে পড়লাম, তা' ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যাই হোক, অনেক পরিশ্রম করে, কিছুটা সংস্কার করে, এবং তথ্যের ভার বাদ দিয়ে, শিক্ষিতজনের কাছে নিন্দার্হ হবো জেনেই বইটি শেষপর্যন্ত বের করা গেল।—হ্যাঁ, বইটিতে ছাপার ভুল ভালোই আছে, 'সূত্র-নির্দেশে'ও যদি কোনো গোলোযোগ বের হয়, তাতে অনুমাত্র আশ্চর্য হবো না। তবু জানিয়ে দেওয়া দরকার, আমার নিষ্ঠার কোনো ত্রুটি নেই এবং ছিল না। এখন ভুলগুলিকে মার্জনা করে, গুণ যদি কিছু থাকে, সে গুলিকে গ্রহণ করলেই বাধিত হবো।

পরিশেষে একটি তথ্য জানিয়ে নি। বর্তমান গ্রন্থে সাহিত্য-আলোচনার সময় দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের যেখানে পৃষ্ঠা উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলি সাহিত্য পরিষদ সংস্করণের বই থেকে দেওয়া। সাহিত্য পরিষদ সংস্করণের বইগুলির সব সংস্করণের সন তারিখ আবার এক নয়। সর্বত্র না হলেও, মাঝে মাঝে এই সন-তারিখের উল্লেখও করে দেওয়া হয়েছে।

যিনি এই বই প্রকাশিত দেখলে খুব খুশি হতেন, তাঁকে এই বইটি উৎসর্গ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

এক

॥ নবজাগরণ ও মানবিকতাবাদের ভূমিকা ॥

আমাদের বাঙ্‌লা সাহিত্য ও বাঙ্‌লা সংস্কৃতির ইতিহাসে দীনবন্ধু মিত্র একটি পরিচিত নাম। এ নামটিকে আবার পরিচিতি দিয়ে তুলে ধরা নিতান্তই বাহুল্যমাত্র।— আঠারোশ তিরিশের চৈত্রে এঁর জন্ম। মৃত্যু, আঠারোশ তিয়াত্তর খ্রীষ্টাব্দের পয়লা নভেম্বর। প্রায় তেতাল্লিশ বছর ইনি বেঁচে ছিলেন। বৃহৎ জীবনের পক্ষে এ আয়ু খুবই কম। এই স্বল্প আয়ুষ্কালের ভেতর এঁর সাহিত্যজীবন ছিল আরো ছোট। 'নীলদর্পণ' দিয়ে যদি এঁর সাহিত্য-জীবনের স্থচনা ধরা যায়, তবে আঠারোশ ষাট থেকে তিয়াত্তর, এই চৌদ্দ বছর ছিল এর সাহিত্যিক-আয়ু। এই ক'বছরের ভেতর দুটি কবিতাগ্রন্থ বাদে যে ক'টি নাটক তিনি লিখেছিলেন, তা অঙ্গুলিমেয়। কী সাহিত্য, কী সাহিত্যিক, উভয়কে ভুলে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। কী আশ্চর্য, তবু দীনবন্ধু বিস্মিত হলেন না, হারিয়ে গেলেন না। বরং বিপরীত ফলটাই দেখা গেল, কারো কোনো পরিচিতির তোয়াক্কা না রেখে ইনি নিজের কীর্তিতেই রইলেন সমুজ্জ্বল।

দীনবন্ধু কেন, সব চিরায়ত সাহিত্যের ব্যাপারে একথা বলা যায়।— চিরায়ত সাহিত্যের যা গুণ, প্রশ্ন উঠতে পারে, দীনবন্ধুর মধ্যে তা কতখানি বর্তমান? তর্ক বেধে যেতে পারে এ সব শাশ্বত ব্যাপার দীনবন্ধুর মধ্যে আদৌ আছে কী?—এ নিয়ে একদা যে তর্ক বাধেনি, তা' নয়। বরং তর্কাতর্কি একটু বেশিই হয়েছে। সে সব কথা মনে রেখে এবং সব দিক বিবেচনা করে তবু এই উপসংহারেই আসতে হয় যে দীনবন্ধু আজও একটি জীবিত নাম, স্থতরাং পরিচিতি দিয়ে জীবিতকে জীবন দেওয়া নিতান্তই আহাম্মুকি, এবং বাহুল্যত নিশ্চয়ই। তবে আলোচনার মাধ্যমে এই বহু আলোচিত নাট্যকার যদি নতুন করে আবিষ্কৃত হন. সে উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই অভিনন্দিত হবে। আর এ-জাতীয় আলোচনা সব সাহিত্যিকের কাছেই বিশেষভাবে আকাঙ্ক্ষিত, স্থতরাং দীনবন্ধুই বা দূরে থাকবেন কেন?

এখন সমস্যা যা, তা হল আমাদের। আমাদের জিজ্ঞাসা, দীনবন্ধুকে কী সত্যিসত্যিই নতুন করে আবিষ্কার করা যাবে?— যদি যায়, তা কেমন করে ও কী ভাবে? উনিশ শতকে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে ইউরোপীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের যে পরিচয় ঘটেছিল, একথা সুবিদিত এবং এই পরিচয়ের ফলে আমাদের সামাজিক অচলায়তনটি কী রকম ধাক্কা খেয়েছিল, তা' বহু-কথিত ও বহু-আলোচিত। এবং এ কথাও অজ্ঞাত নয়, এই ধাক্কা কেবল বাইরের ছিল না, এর নিঃশব্দ অনুপ্রবেশ ছিল বহুদূর, বহু গভীরে। ধর্মবিশ্বাস, জীবন জিজ্ঞাসা, সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, এমন কী সংস্কৃতিগত খুটিনাটি বিষয় থেকে নতুন নীতিবোধের সূক্ষ্ম বিচার— সর্বত্র এ ধাক্কা এনেছিল এক বিপুল পরিবর্তন। পরিবর্তন মানে 'জাগরণ'। এই নতুন জাগরণের যে বিদেশী নামটি দেওয়া হয়েছিল, সেই 'রেনেসাঁস' শব্দটিও আমাদের পরিচিত। শুধু পরিচিত নয়, বহু ব্যবহারে ঘষা পয়সার মত, এটিও আপন উজ্জ্বলতা হারিয়ে ফেলেছে।— তা হারাক, মূল্য যাচাইয়ের ব্যাপারে এই মুদ্রাটির প্রয়োজন বড়ো বেশি। এবং এক অর্থে অপরিহার্যও বলা যায়।

জীবাণুদের অদৃশ্য অস্তিত্বের খবর চিরকাল অজানা থেকে যেত, যদিনা অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে মানুষ এদের না দেখত, অনুরূপভাবে টেলিস্কোপের আবিষ্কার না হলে বহুকালের রহস্য উন্মোচন আমাদের পক্ষে কী কখনো সম্ভব হত? ঠিক এই রকম না হলেও এই জাতীয় উপমা দিয়ে এবং ঐ সুরে সুর মিলিয়ে জিজ্ঞাসা করা যায় 'রেনেসাঁস'কে বাদ দিয়ে দীনবন্ধুর সাহিত্যের প্রকৃত সত্য উন্মোচন কী সম্ভব? কেবল সম্ভব-অসম্ভবের ব্যাপার নয়, এই শিবহীন যজ্ঞ সঙ্গত কী না, তাও ভেবে দেখা দরকার।

আধুনিক যুগের সাহিত্যিকরা সাধারণত তাঁদের সাহিত্যালোচনার সূত্রটি প্রায়শই ধরিয়ে দেন। রবীন্দ্রনাথ থেকে শরৎচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকরা তা করে গেছেন। কিন্তু যাঁরা এ ইংগিত দেন নি, তাঁদের সংখ্যাও কিছু কম নয়। অন্ততঃ দীনবন্ধু মিত্র তাঁদের একজন। তবে অন্তের ব্যাপারে তিনি যে সংকেত দিয়েছেন, ঐ সংকেতকে যদি সূত্র বলে ধরা যায়, তা হলে দেখা যাচ্ছে এঁর নাটক-আলোচনায় 'রেনেসাঁসে'র ভূমিকা অনিবার্য এবং অপরিহার্য।

'সধবার একাদশী' দীনবন্ধুর একটি বিখ্যাত নাটক। এই নাটকের কোনো এক প্রসঙ্গে উঠেছিল মধুসূদনের কথা। ধনী পরিবারের বখাটে ছেলে অটলবিহারীর মুখে এই নামটি উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই নায়ক

নিমচাঁদ তা লুফে নিয়ে বলে উঠেছিল, 'ওর ভালোমন্দ তুমি বুঝবে কি, তুমি পড়েছ দাতাকর্ণ, তোমার বাপ পড়েছে দাশরথি, তোমার ঠাকুরদা পড়েছে কাশীদাস। তোমার হাতে মেঘনাদ, কাটুরের হাতে মাণিক— মাইকেল দাদা বাঙ্গালার মিলটন।'[১]

এখানে ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দ গভীর ইংগিতবহ, তাৎপর্যপূর্ণ। উনিশ শতকের ইতিহাস প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় রমেশচন্দ্র মজুমদার দেখিয়েছেন, এখানে উদাহৃত 'দাতাকর্ণ' শব্দটি নিতান্ত কথার কথা নয়, অটলবিহারী প্রমুখ ধনী লোকের ছেলেরা যে-সব গতানুগতিক পাঠশালায় পড়াশোনা করত, 'লিটারারি টেকস্ট' হিসাবে 'দাতাকর্ণ'[২] ছিল তাঁদের কাছে একটি ভীষণ প্রয়োজনীয় বই। আর পাঁচালিকার দাশরথির মধ্যযুগীয় চিন্তা-ভাবনার অনুকৃতি কী রকম ছিল, এ যুগের যে-কোনো সচেতন পাঠকেরই বোধহয় তা অজানা নয়।—আঠারোশ ছয় খ্রীষ্টাব্দে দাশরথি রায়ের জন্ম, মারা যান বাহান্ন বছর বয়সে আঠারোশ আটান্ন খ্রীষ্টাব্দে। এঁর চোখের সামনে নবযুগের অভ্যুদয়। হিন্দুকলেজের প্রতিষ্ঠা, ডিরোজিয়ানদের বিদ্রোহ, রামমোহন-দ্বারকানাথ-প্রসন্নকুমার প্রমুখ মনীষীবৃন্দের সমাজসংস্কারে আত্মনিবেশ, ধর্মসংস্কারের ব্যাপারেও এঁদের অবিস্মরণীয় নায়কতা, জর্জ টমসনের কলকাতা আগমন, রামগোপালের বাগ্মীতা প্রভৃতি অনেক ঐতিহাসিক ঘটনা দাশরথি চোখের সামনে দেখেও অণুমাত্র তাদের দ্বারা প্রভাবিত হননি। চারদিক আচ্ছন্ন করে পরিবর্তনের ঝোড়ো হাওয়া যে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছে, তা ইনি টের পান নি। আর দাশরথির যারা শ্রোতা, তাদের কাছে এ কথা আরো নির্মমভাবে সত্য। দাশু রায় চোখ বুজে গান ধরেছেন, শ্রোতারাও চোখ বুজে তা' তারিফ করেছেন। উদ্বেলিত ভক্তিরসামৃতে এঁরা হাবুডুবু খেয়েছেন, অনুপ্রাস-যমকের চটকদারী অলঙ্কারে মোহিত হয়েছেন এবং প্রকৃত নেশাখোরের মতন থেকেছেন বুঁদ হয়ে, বদ্ধ অচলায়তনের দরজা ভেঙ্গে কখনো বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করেন নি।— তাই অমিত্রাক্ষরে প্রচারিত নবযুগের বাণীকে এঁরা গ্রহণ করতে পারবেন কী করে? আর আনুপ্রাণিত হওয়া?—সে আরো এক দুঃসাধ্য ব্যাপার! সুতরাং কাঠুরের হাতে মাণিক যাচাই করতে দেওয়াও যা, আর দাশরথির পাঠককে 'মেঘনাদবধে'র মূল্য বিচার করতে দেওয়া একই ব্যাপার!

না, 'দাতাকর্ণ' বা 'দাশরথি'তে নয়, একবারে শেষে নিমচাঁদ যে-বাক্যটি উচ্চারণ করল, সেটাই সব থেকে মারাত্মক। সব থেকে বিপ্লবাত্মক।

নিমচাঁদ বলেছে, 'মাইকেল দাদা বাঙলার মিলটন'।—আমাদের দেশের সাহিত্য যে সেই চিরাচরিত ধারায় লেখা হবে না, এর থেকে অমোঘ সংকেত আর কী আছে? রাজনৈতিক-সামাজিক-ধর্মগত পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুগে যুগে সাহিত্যেরও ভাব ও প্রকাশরীতির পরিবর্তন ঘটে থাকে। সব দেশের সাহিত্যে এ নজির আছে, আমরাও এ থেকে বঞ্চিত নই। কিন্তু একটি বিদেশী সংস্কৃতি আরেক দেশের সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলতে পারে, এ জাতীয় ঘটনা উনিশ শতকের প্রথম পর্বের আগে পর্যন্ত এ দেশের কারো জানা ছিল না। নিমচাঁদউচ্চারিত 'মাইকেল' শব্দটি পর্যন্ত রীতিমত চমকপ্রদ। বিদেশী সংস্কৃতি কতদূর এগোতে পেরেছে, এ তারই প্রত্যক্ষ উদাহরণ। এর পরে যখন জানা গেল রামায়ণের নতুন ভাষ্য এই 'মাইকেলে'র কাছ থেকে পাওয়া যাবে, তখন যেন বিস্ময়ের আর সীমা-পরিসীমা থাকে না!

'ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ডে' গিয়ে এ্যালিসের যা অবস্থা হয়েছিল, আধুনিক যুগের উষালগ্নে তার থেকেও বিপন্ন অবস্থা হয়েছিল আমাদের দেশের মধ্যযুগীয় এ্যালিসদের। সংখ্যায় এঁরা ছিলেন প্রচুর, এবং প্রচুর ভাবেই মধ্যযুগীয় সংস্কারে আচ্ছন্ন। এই মানুষদের দৃষ্টিতে আধুনিক যুগের প্রতিটি ব্যাপারকে যে ভীষণ বিস্ময়কর বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক, তা'তে কোনো সন্দেহ নেই। অতীতে প্রায় হাজার হাজার বছর ধরে অনুশীলন করে আমাদের দেশের মাটিতে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, সেই অনুশীলিত সংস্কৃতির নিরিখে এই নবযুগের নবজাত সংস্কৃতিকে কোনো রকমেই যাচাই করা যায় না। এবং পরিমাপ করাও সম্ভব নয়। তাই আধুনিক সাহিত্য বোঝবার জন্য ভাব ভাষা ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে নতুন করে করতে হল বর্ণপরিচয়। দরকার হল নতুন করে হাতে-খড়ি করবার। আধুনিক লিপির জটিল সংকেত না বোঝা গেলে আধুনিক সাহিত্যের প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করা অসম্ভব।—দীনবন্ধু মিত্র সেই ইংগিতই দিলেন 'মেঘনাদে'র কবির প্রসঙ্গে। আর যেহেতু 'মেঘনাদে'র কবির পথ এবং দীনবন্ধুর পথ একই, তাই প্রকারান্তরে নিজের পথের সংকেত জানিয়ে দিলেন নাট্যকার। এখন এই সংকেতকে উপেক্ষা করা মানে নাট্যকারকে সচেতন ভাবে এড়িয়ে চলা। একদা দীনবন্ধুকে ঘিরে যে তর্ক ও উত্তেজনার ঝড় বয়ে গিয়েছিল, ঐ বিপরীত পথে চললে সেই বিতর্কের কোনোদিন মীমাংসাই সম্ভব হবে না। সুতরাং সব দিক বিবেচনা করে এই উপসংহারে আসা যেতে পারে যে নাট্যকার দীনবন্ধু যদি সত্যি সত্যিই একটি 'মাণিক' হন, তবে যোগ্য কষ্টিপাথরেই তাঁকে যাচাই করে দেখতে হবে,

কাঠুরের কুঠার অন্ততঃ নিশ্চয়ই 'মাণিক' বিচারের জায়গা নয়। মধ্যযুগের উত্তরাধিকার নয়, আধুনিক যুগের 'নবজাগরণ'ই হল দীনবন্ধুর নাটক বিচারের প্রকৃত কষ্টিপাথর। উপযুক্ত ভূমিকা।

এখানে ব্যবহৃত 'নবজাগরণ' শব্দটিকে যে 'রেনেসাঁসের' সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে, তার পুনরুল্লেখ না করলেও চলে। আমাদের কৌতূহল হতে পারে, এই 'রেনেসাঁস' শব্দটি কবে এবং কোথায় প্রথম প্রযুক্ত হয়েছিল ? যিনি এই শব্দটিকে ব্যবহার করেছিলেন, সেই ব্যবহারের ভেতর দিয়ে ঐ আধুনিক তাৎপর্য নিহিত ছিল কী না !

রেনেসাঁসের তাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার আগে এ ব্যাপারে সামান্য একটু খোঁজ-খবর নেওয়া একবারে নিষ্প্রয়োজনীয় নয়। ঐতিহাসিক টয়েনবি এই শব্দটিকে প্রথম ব্যবহারের গৌরব যাঁকে দিয়েছেন, তিনি একজন ফরাসী, আমাদের কাছে অপরিচিত, এবং তাঁর নাম ই. জে. ডিলেক্লুজে। ইনি বয়সে রামমোহনের থেকেও ছোট, আর বেঁচেছিলেন রামমোহনের মৃত্যুর পরে আরো তিনদশক। প্রাচীন লোক যে ইনি নন, এই সন-তারিখই তার সাক্ষী। বরং ইউরোপীয় রেনেসাঁসের কাল-বিচারে এঁকে একান্ত অর্বাচীনই বলতে যায়। এঁর সম্পর্কে আরনল্ড টয়েনবি লিখেছেন, '· the first to use the term *la renaissance* to describe the impact by a dead Hellenic civilization on western christendom'···[৩]

মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে বিশেষ একটি এলাকায় অর্থাৎ উত্তর ও মধ্য ইটালীতে যে পরিবর্তনের হাওয়া বইল, মৃত হেলেনিক সভ্যতার সঙ্গে পশ্চিমী খ্রীষ্টীয় শক্তির যে সংঘর্ষ ঘটল এবং তার পরিণাম থেকে ভাবের জগতে যে নবজন্ম সূচিত হল, এই ভাবান্তরের প্রতীকী ভাষা হিসাবেই নাকি ডিলেক্লুজের এই শব্দের প্রথম ব্যবহার।

এদিকে কিন্তু 'ভাবের জগতে'র ব্যাপারে না হোক, 'চারুকলার অভিনব পুনর্জন্ম'—অর্থে এই শব্দটি অনেক আগেই যে ব্যবহৃত হয়েছে, তার প্রমাণ হলেন জর্জিও ভাসারি[৪]। জর্জিও ভাসারি ছিলেন ষোড়শ শতকের লোক, ইটালীর একজন চিত্রকর। প্রায় চৈতন্যদেবের সমসাময়িক মানুষ, পনেরোশ এগারোতে এঁর জন্ম, এবং তেষট্টি বছর পরে চুয়াত্তরে এঁর তিরোধান।

মোটকথা, নবজাগরণের সূক্ষ্ম অর্থে ও পরে ব্যাপকতর অর্থে রেনেসাঁস শব্দটিকে ব্যবহৃত হতে দেখা গেল কয়েক শতক ধরে।—না, আমাদের 'নবজাগরণ' শব্দটির ঐ জাতীয় কোনো সুপ্রাচীন অনুষঙ্গ নেই, তবে এই শব্দটি

রেনেসাঁসের প্রতিশব্দ হিসাবে আমাদের ভাষায় প্রযুক্ত হয়ে আসছে গত শতক থেকে। অবশ্য শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ মণীষীরা 'নবজন্ম' শব্দটিকেও ব্যবহার করেছেন। আমাদের উনিশ শতকের যে লগ্ন থেকে এই পরিবর্তনের সূচনা, তারও সময়-সীমা নির্দেশিত হয়েছে এঁদের লেখায়। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, '১৮২৫ হইতে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিংশতি বর্ষকে বঙ্গের নবযুগের জন্মকাল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই কালের মধ্যে কি রাজনীতি, কি সমাজনীতি, কি শিক্ষা বিভাগ, সকল দিকেই নবযুগের প্রবর্তন হইয়াছিল।'[৫]

ইউরোপের ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা করলে, অন্ততঃ এই সময়ের সীমারেখার নিরিখে যাচাই করলে, এই রেনেসাঁসকে নিতান্তই 'মিনি রেনেসাঁস' বলে মনে হতে পারে। ইউরোপের ক্ষেত্রে এর ব্যাপ্তি ছিল প্রায় চারশ বছরের। রেনেসাঁস-রিফরমেসন-এনলাইটমেনট্ ও ফরাসী বিপ্লব—এগুলিকে যদি একই ভাবধারার ক্রমবিকাশ হিসাবে দেখতে হয়, এই চারটি পর্যায়ের জন্য সময় লেগেছিল প্রায় চারশ বছর। চোদ্দশ তিপান্ন খ্রীষ্টাব্দে অটোমান তুর্করা দখল করেছিল কন্‌সটানটিনোপল্। ওখান থেকে গ্রীক ভাষাবিদ্ অধ্যাপকদের ইউরোপের বিভিন্ন শহরে আগমন ঘটতে থাকল আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে। টাকা-কড়ি, সোনা-দানা, হীরা-জহরৎ নয় এঁরা সঙ্গে করে যা বহন করে নিয়ে এলেন তা হল, মুক্ত-চিন্তা, মুক্ত-বুদ্ধি এবং অজস্র পুঁথি। যে-'হেলেনিক' চিন্তা একদা খ্রীষ্টীয় তত্ত্বের দাপটে পলাতক হয়েছিল, আরব দেশে সেই হেলেনিকও রোমান সংস্কৃতির পুনরাগমন ঘটল। ভাবলে হয়ত রোমাঞ্চিত হতে হবে, এক গ্রীক অধ্যাপক কনস্‌টান্‌টিনোপল থেকে আসবার সময় সঙ্গে করে এনেছিলেন আটশ'রও বেশী পুঁথি। যাইহোক এখান থেকে যদি রেনেসাঁসের কাল গণনা করতে হয়, তা'হলে ধাপে ধাপে এটি যখন গিয়ে সতেরোশ নিরানব্বই-এ ফরাসী বিপ্লবে পৌঁছুল, তখন সময়ের ব্যাপ্তি পৌঁছুল গিয়ে প্রায় সাড়ে তিনশ বছরে। সুতরাং এর পাশাপাশি আমাদের নব জাগরণের কাল খুবই নগণ্য। সিপাই-যুদ্ধের পর আমাদের দেশে যে নীল বিদ্রোহ ঘটে, এ বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত কাল গণনা করলেও আমাদের এই পরিবর্তিত সংস্কৃতিকে খুব বয়স্ক করে দেখানো যায় না। আর বিশ শতকের প্রথম দিকে আমাদের দেশে যে ব্যাপকতর স্বদেশী আন্দোলন দেখা দেয়, একেও যদি নবজাগরণের প্রসারিত পর্যায় হিসাবে ধরা হয়, তা'হলেও আমাদের রেনেসাঁসের বয়স একশ বছরের বেশী হয় না। অনুরূপভাবে ওদেশে যে রেনেসাঁসের সময়-সীমা দেখা যায়, তাকে একটু লঘুভাবে দেখলে, চারশ

বছর ব্যাপ্ত করা কিছু কঠিন নয়। মোটকথা, ব্যাপারটা যেমন বিচার সাপেক্ষ, তেমনি তর্কেরও অবকাশ সুপ্রচুর। তবে বর্তমান প্রসঙ্গে তা অবান্তর।

এখন নবজাগরণের স্বরূপ কী, তার বিশ্লেষণে এগোন যেতে পারে। এ ব্যাপারে এদেশীয় এক সমালোচক ভারি সুন্দর ভাষায় যা লিখেছেন, তা হল এই রকম: 'রেনেসাঁসের সংজ্ঞা সম্বন্ধে একমত হওয়া শক্ত। অধিকাংশের মতে রেনেসাঁসের প্রধান লক্ষণ হলো দিব্য-চেতনার পরিবর্তে মানবিক চেতনা, ব্রহ্মজ্ঞানের পরিবর্তে বস্তুজ্ঞান, পারলৌকিক বা অলৌকিক কার্যকারণ পরম্পরার পরিবর্তে ঐহিক বা প্রাকৃতিক কার্যকারণ পরম্পরা, ভক্তির পরিবর্তে যুক্তি, আপ্তবাক্যের পরিবর্তে প্রমাণসিদ্ধ বাক্য, অথরিটির পরিবর্তে লিবার্টি।'[৬]

নবজাগরণের লক্ষণ বিচারে সমালোচক এখানে যে শব্দগুলি ব্যবহার করেছেন, প্রতিটি শব্দ ভীষণ ভাবে মূল্যবান। প্রতিটি শব্দ জীবন্ত এবং অনুরূপ ভাবেই তাৎপর্যপূর্ণ। ইটালী থেকে যা শুরু হয়েছিল, সমগ্র ইউরোপ ধীরে ধীরে তা একদিন সত্য হিসাবে অন্তরে অন্তরে অনুভব করল। এবং সুদীর্ঘ এক রাত্রির শেষে সেখানে যে এই নতুন সূর্যের উদয় হয়েছিল, তা কে না জানে?

তবে ইউরোপের সঙ্গে আমাদের এই বিকাশ ধারার একটু তফাৎ আছে। যে সত্যের কথা বলা হয়েছে, এই সত্যের উৎস ওদেশে ছিল প্রাচীন এথেন্স। রোমানরা কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখলেও, শেষ পর্যন্ত প্রাচীন গ্রীসের মানবিক-সত্যকে তাঁরাও ধরে রাখতে পারেন নি। পঞ্চম শতকের সূচনায় বর্বর ভিসিগথরা যেদিন রোম লুণ্ঠন করল, সেদিন থেকে রোমান সাম্রাজ্যের শেষ মুহূর্ত কেবল যে ঘনিয়ে এলো তাই নয়, যে মানবিক সত্য এঁদের দ্বারা অনুশীলিত হচ্ছিল, সেই অনুশীলনের অবকাশও এঁরা হারালেন। হুন-জার্মান-হাঙ্গেরিয়ান-ভাইকিং প্রমুখ দস্যুকুলের পুনঃপুনঃ আক্রমণে সমগ্র ইউরোপ হয়ে উঠল বিপর্যস্ত; আর যেহেতু নগর পুড়তে থাকলে, দেবালয়ও সে আগুন থেকে রক্ষা পায় না, ঠিক এই কারণেই ইউরোপ হারিয়ে ফেলল তার গ্রীক-চিন্তার মূল্যবান সম্পদকে। এদিকে খ্রীষ্টধর্মের 'তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়' ধীরে ধীরে গ্রাস করল ইউরোপকে। সেইনট্ অগাষ্টিনের মতন পবিত্রচেতা খ্রীষ্টীয় সাধু-সন্তরা এই খ্রীষ্টীয়-করণে তাঁদের চরিত্র-মাধুর্যের দ্বারা সবিশেষ সাহায্য অবশ্যই করলেন।—কিন্তু ভুললে চলবে না, হেলেনিক জীবনাদর্শ ছিল যুক্তি-নির্ভর, আর নতুন ধর্মে ইউরোপ যে দীক্ষা নিল, এর প্রথম কাজই হল যুক্তিকে বিসর্জন দেওয়া। মোটকথা, বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এদের পার্থক্য

একটু-আধটু নয়, দুস্তর। তাই ইউরোপ খ্রীষ্টীয়ধর্মের যত গভীরে প্রবেশ করতে থাকল, হেলেনিক জীবনাদর্শ থেকে সে সরে যেতে থাকল ঠিক ততদূরে।— সুতরাং হেলেনিক চিন্তার পুঁথি-পত্তর ও পণ্ডিতকুল যে পলাতক হবেন, তাতে আর বিস্ময়ের কী? ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকেই দেখা গেল, সম্রাটের আদেশে বন্ধ করে দেওয়া হল। এথেন্সের বিদ্যালয়গুলি। বিদ্যালয় যখন বন্ধ হল, তখন যে সব গ্রীক মনীষী এখানে বিদ্যাদানের ব্যাপারে নিযুক্ত ছিলেন, তাঁরা নিরুপায় হয়ে সিরিয়া-মেসোপটেমিয়া-পারস্য ইত্যাদি দেশে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

বিদেশে এসে এই পণ্ডিতেরা কিন্তু তাঁদের অর্জিত শিক্ষাদান থেকে বিরত থাকেন নি। ইউরোপ যখন ধর্মান্ধতার গভীরে নিমজ্জমান, আরব দেশের অনেক জায়গাতেই তখন কিন্তু জ্বলতে থাকল হেলেনিক চিন্তার দীপশিখা। গণিত-জ্যোতির্বিজ্ঞান-শারীরবৃত্ত চিকিৎসাশাস্ত্র প্রমুখ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চলল পরীক্ষা-নিরীক্ষা। তুলনামূলক ধর্মবিচারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলল ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা।—এই ভাবে হেলেনিক চিন্তার দীপশিখাটি দীর্ঘরাত্রি ধরে জ্বলা রইল আরবদেশে। বলাবাহুল্য, আরব যদি এই আদর্শকে ধরে না রাখত, তা'হলে পরবর্তীকালের ইউরোপের অবস্থা কী হতে পারত, তা' না ভাবাই ভালো।

যাইহোক, ওদিকে শেষ পর্যন্ত দীর্ঘনিশার অবসান ঘটল। দিব্যচেতনাই যে যথেষ্ট নয়, অন্ততঃ মানবিক চেতনার কাছে, ওঁরা তা অনুভব করলেন। অনুভব করলেন যে বস্তুজ্ঞান না হলে, ব্রহ্মজ্ঞান নিতান্তই ব্যর্থ। আপ্তবাক্যে এঁদের পেট ভরল না, এঁরা চেয়ে বসলেন প্রমাণ। আর পরিপূর্ণ সমর্পণের বদলে চাইলেন যুক্তি দিয়ে সব কিছুকে যাচাই করতে। মোটকথা, এঁরা চাইলেন মুক্তি, লিবার্টি। অথরিটিকে কোনো ক্রমেই মানতে রাজি হলেন না। আর সব থেকে বড়ো কথা হল, সমষ্টির চাপে এঁরা নিজেদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে কিছুতেই বিসর্জন দিতে চাইলেন না। বা ঘুরিয়ে বলতে গেলে যে কথা বলতে হয়, তা হল মধ্যযুগে 'সমষ্টি' নামক যে পদার নিচে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য ছিল চাপা দেওয়া, বিশ্বাস-বিভ্রান্তি-শিশুতোষ মোহ-কল্পনা ইত্যাদিতে যে চাদরটি ছিল অদ্ভুত বর্ণের, সেই মোহময় মধ্যযুগীয় শ্রেণীচেতনার পর্দা বা চাদর ঠেলে বেরিয়ে এলো, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত আধুনিক মানুষ। একজন সমালোচকের ভাষা উদ্ধৃত করে বলা যায়, 'In the same way the Greek had once distinguished himself from the barbarian, and the

Arab had left himself an individual at a time when other Asiatics knew themselves only as members of a race.'৬ক

অটোমান তুর্করা চোদ্দশ তিপ্পান্ন খ্রীষ্টাব্দে যখন কন্‌সটান্টিনোপল দখল করল, ঠিক তখন থেকেই যে ইউরোপের 'রেনেসাঁসে'র সূচনা, তা আগেই বলা হয়েছে। উত্তর ও মধ্য ইটালীর সামান্য একটু জায়গায় নতুন করে হেলেনিক চিন্তার বীজ উপ্ত হল। তারপর সংগ্রাম শুরু হল আলোর সঙ্গে অন্ধকারের। নিজের পায়ে ভর দিয়ে মানুষ সেদিন বেরিয়ে পড়ল নিজের রাজ্য-পাট দখলে আনার জন্য। দার্শনিক-লেখক-শিল্পী সকলের মনেই এই নবজাগ্রত মানবিক-বোধ সমানভাবে চলল কাজ করে। বিজ্ঞানী ও চিকিৎসকেরা এলেন এগিয়ে। ওদিকে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করলেন ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে। ভাস্কো-দা-গামা সমুদ্রপথে ভারত পৌঁছে গেলেন এর ঠিক পাঁচ বছর পরেই। এই অ্যাড্‌ভেনঞ্চারিসট্‌দের সঙ্গে সঙ্গে বা পিছনে পিছনে পৌঁছল বণিককুল। এঁরা দেশ-বিদেশের সম্পদ এনে জড়ো করতে থাকলেন। মোটকথা, নতুন আদর্শে দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে ইউরোপ নতুন করে নিজেকে আবিষ্কারে সমর্থ হল।

বাহ্যিক সম্পদের কথা উপস্থিত আলোচ্য নয়। অন্তরের সম্পদে সে দিনে দিনে কীভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছিল, এবং তার সঙ্গে আমাদের মনের মিল যতটুকু সেটুকুই আমাদের বর্তমান অন্বেষণের বিষয়।

সুতরাং আমাদের দেশীয় পরিবেশের মধ্যে এখনই ফিরে যাওয়া দরকার। —কিন্তু তার আগে আরেকটি বিষয়ে একটু খবর নেওয়া দরকার, এবং সে খবরটি হল ছাপাখানার। হেলেনিক চিন্তাধারাকে অতিক্রান্ত যে ইউরোপের ভেতর ছড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছিল, তার মূলে ছিল এই ছাপাখানা। যাঁরা এ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, তাঁরা 'গ্রীক হিউম্যানিসট্‌'-দের সঙ্গে এটিকেও যুক্ত করে দিয়ে লিখেছেন. 'Another important factoor in the advancement of learning was the invention, about the middle of the fifteenth century, of printing with movable type, which brought books into many more hands.'৬খ

বলাবাহুল্য, ছাপাখানার এই ভূমিকার কথা বহু-কথিত এবং আলোচিত তার থেকেও বেশি। তবু তথ্যের জন্য জেনে রাখা দরকার, অটোমান তুর্ক-দের কন্‌স্টানটিনোপল বিজয় এবং ইউরোপে ছাপাখানার আবির্ভাবের তারিখের ব্যবধান বেশি দিনের নয়, মাত্র কয়েক বছরের। ইটালিতে মুদ্রণের

কাজ আরম্ভ হল ১৪৬৫, খ্রীষ্টাব্দে, প্যারীতে ১৪৭০ খ্রীষ্টাব্দে, লণ্ডনে ১৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দে, স্টক্‌হলম্‌-এ ১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে। মোটকথা, আমাদের দেশে চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগেই, ইউরোপের দেশে দেশে আবির্ভাব ঘটল ছাপাখানার। ফলে ইটালী নবীন ভাবাবেগে হল ডুবুডুবু, এবং ভেসে গেল ফ্রান্স-ইংল্যাণ্ড ইত্যাদি। সংখ্যাতত্ত্বের হিসাবে দেখা গেল, পনেরো শতকের সূচনায় ইউরোপে যেখানে পুঁথির সংখ্যা ছিল মাত্র কয়েক হাজার, এই নবাবিষ্কৃত শিল্পের কল্যাণে, এই শতকের শেষ তা' দাঁড়িয়ে গেল নব্বই লক্ষে।—হাতে লেখা পুঁথির যুগ থাকলে এইভাবে যে সংখ্যাটি বাড়ত না, তা ব্যাখ্যা করে না বললেও চলে।

যাইহোক, এইভাবেই ইউরোপ দিনে দিনে হ'তে থাকল সমৃদ্ধ। আর আমরা চৈতন্যদেব, বৈষ্ণব-কবিতা, মঙ্গলকাব্য এবং কথকতা ইত্যাদির মাধ্যমে ও অনূদিত রামায়ণ-ভাগবত ইত্যাদির স্বাদ নিতে নিতে প্রায় শ' তিনেক বছর নির্বিঘ্নে পার করে দিলাম। সাগরের ওপারে যখন হেলেনিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানবিক অধিকারের সম্প্রসারণে মানুষ চলেছে লড়াই করে, আমরা তখন আমাদের অধিকারের সঙ্কোচনেই ব্যস্ত। দিব্য-চেতনাই সেদিন আমাদের কাছে অমোঘ সত্য। অলৌকিক কার্যকারণে ঝোঁক তখন আমাদের দুর্বার, ভক্তিরসে আমরা মাতোয়ারা, আপ্তবাক্যে বিশ্বাসী, আর 'হাঁচি-টিক্‌টিকি ইত্যাদি সংস্কার আমাদের রক্তের ভেতর খাচ্ছে কুরে কুরে। অমাবস্যার রাত্রে কালীমন্দিরের হাড়কাঠ সেযুগে আপ্লুত হচ্ছে মানুষের রক্তে, শিশু বিসর্জিত হচ্ছে সাগরে, সদ্যবিধবা রমণীকে ধর্মের মহিমা প্রচারের জন্য তুলে দেওয়া হচ্ছে সদ্যমৃত স্বামীর চিতায়। আর কৌলিন্য প্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদির কল্যাণে আমাদের সমাজ-দেহ তখন ক্ষত-বিক্ষত।—অটোমান তুর্করা যেদিন কন্‌স্টান্টিনোপল দখল করেছিল, ঠিক তিনশ চার বছর পরে আমাদের দেশে প্রায় অনুরূপ একটি অঘটন ঘটে গেল। এই অঘটনের নাম, 'পলাশীর যুদ্ধ'।

যে-ইউরোপ নিজেকে নিত্য প্রসারিত করবার কাজে ব্যস্ত ছিল, সেই ইউরোপেরই কিছু লোক এসে এই যুদ্ধ বাধিয়ে বসল। সেই যে ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-দা-গামা ভারত-পথ আবিষ্কার করেছিলেন, সেই পথ ধরে ইউরোপের বণিককুল ও মিসনারীরা সেইদিন থেকেই এদেশে যাওয়া-আসা আরম্ভ করে দেন। এঁরা ব্যস্ত ছিলেন ইউরোপের জন্য সম্পদ আহরণে। যদিও রক্তের সূত্রে ও চেহারায় এঁরা পুরোপুরি ইউরোপীয়ই ছিলেন, কিন্তু

চরিত্রে ছিলেন সুলতান মামুদের মতনই ঐশ্বর্যলোলুপ। যে-ভাবেই হোক এবং যে-উপায়েই হোক এঁরা সঞ্চয় করতে চেয়েছিলেন ধন-দৌলত, টাকা-পয়সা। তাই নীতিবোধের দিক থেকে ও চারিত্রগৌরবে এরা আধুনিক ইউরোপের নন, এঁরা বংশধর ছিলেন সুলতান মামুদের।

আধুনিক ইউরোপীয় মনকে অপরের মনে সঞ্চারিত করা দূরে থাক, এঁরা বরং অপরের মনোরঞ্জনের জন্য তাঁদের হাব-ভাব চলা-ফেরা অনুসরণ করতেন বেশি করে। পলাশির যুদ্ধের আগে ও অব্যবহিত পরে ইংরেজদের পোশাক-আসাক ও প্রতিদিনের জীবন যাত্রা অন্ততঃ সেই কথাই ব্যক্ত করে। বাঙালীদের মতনই এঁরা কুর্তি-পায়জামা পরতেন, পেটভরে ডাল-ভাত খেতেন, দুপুরে প্রচুর নিদ্রা দিতেন, আল-বোলায় তামাক খেতেন, পেলা দিতেন বাইজীদের নাচের আসরে, আর আরবি-ফারসী ইত্যাদি শিখে ব্যবসা-পত্তর গোছানোর চেষ্টা করতেন।—তাই আর যাদের দ্বারা হোক-না-কেন, অন্ততঃ এই মানুষদের দ্বারা আধুনিক ইউরোপীয় মন বাহিত হওয়া ছিল শক্ত।

তবে ব্যবসার প্রয়োজনে এবং প্রায় মরিয়া হয়ে এঁরা শেষ পর্যন্ত একটি অঘটন ঘটিয়ে ফেললেন। আর এই অঘটনটি হল, 'পলাশীর যুদ্ধ'।

এই পলাশীর যুদ্ধ যখন ঘটে, তখন কী এদেশীয় মানুষ, কী ওদেশের বণিককুল কেউই এর সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। সেদিনের কোনো মানুষই ভাবতে পারেন নি যে আধুনিক 'ইউরোপীয় মনে'র প্রবেশের জন্য কয়েকজন দস্যু এদেশের সদর দরজার খিল ভেঙ্গে দিয়েছেন। না, দস্যুরা এ সম্পর্কে মোটেই সচেতন ছিলেন না। এঁরা ঐ খোলা দরজা দিয়ে বারবার প্রবেশ করে ও এর পরে বছরের পর বছর ধরে এদেশের সম্পদ লুণ্ঠন করেই চললেন। এদিকে যাঁরা নবাবী তখ্‌তের দিকে তাকিয়েছিলেন, তাঁরা ষড়যন্ত্রের পর ষড়যন্ত্র করেও সেই তখ্‌ত নিজেদের জন্য ধরে রাখতে পারলেন না।

দেখতে দেখতে এই ভাবে গড়িয়ে গেল অর্ধশতাব্দী। সকলের অলক্ষ্যে চুপি চুপি কখন যে ঐ 'হেলেনিক' চিন্তাপুষ্ট ইউরোপীয় মন আমাদের প্রতিটি মানুষের ঘরে ঘরে ঢুকে পড়ল, তা জানতেই পারা গেল না। ইতিমধ্যে সতেরোশ বিরানব্বই খ্রীষ্টাব্দে 'ফরাসী বিপ্লব' ঘটে গেল, এদেশে রামমোহন রায়ের বয়স তখন মাত্র কুড়ি বৎসর।

অটোমান তুর্কদের তাড়া খেয়ে গ্রীক ভাষাবিদ পণ্ডিতেরা একদা যেমন ইউরোপের শহরগুলিতে পালিয়ে এসেছিলেন, আমাদের দেশে সেরকম ঘটনা অবশ্য ঘটে নি। কার্ডিনাল বেসারিয়ন প্রমুখ পণ্ডিতের মত কোনো পণ্ডিতই

এদেশে শ' আষ্টেক পুঁথি আনেন নি 'হেলেনিক' ভাবধারা প্রচারের জন্ত ; তবু ঐ ভাবধারা এলো। যে-'রেনেসাঁস' ইউরোপে দেখা দিয়েছিল সাড়ে-তিনশ বছর আগে, ঠিক সেই ছাঁদেই দেখা দিল এদেশের 'নবজাগরণ'। না, কোনো গ্রীক পণ্ডিত নন, একবারে মূলে যিনি ছিলেন তিনি একজন স্কচ্। এঁর নাম হল, 'ডেবিড ড্রামনড্'।—এঁর সম্পর্কে কোনো বিস্তৃত পরিচিতি উদ্ধার করা শক্ত, যা পাওয়া যায় তা এই রকম: 'সে সময় ডেবিড ড্রমণ্ড নামে একজন স্কট্লণ্ড দেশীয় লোক কলিকাতার ধর্ম্মতলাতে একটি স্কুল খুলিয়াছিলেন। এই ড্রমণ্ড সেই সময়ে একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার রচিত কবিতাসকল সে সময়ে অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তদ্ভিন্ন তিনি ইংরাজী সাহিত্য এবং দর্শন শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন। এরূপ শুনা যায় যে ধর্ম্মবিষয়ে আত্মীয়-স্বজনের সহিত মতভেদ উপস্থিত হওয়াতে তিনি চিরদিনের মত জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। যে স্বাধীন চিন্তার প্রভাবে ফরাসী বিপ্লবের অভ্যুদয়, সেই স্বাধীন চিন্তা পূর্ণমাত্রায় তাঁহার অন্তরে কার্য্য করিতেছিল। ড্রমণ্ড বিদ্যালয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিলে কলিকাতাবাসী ইংরাজগণ বলিতে লাগিলেন, সেখানে পড়িলে বালকগণ নাস্তিকত'তে বর্ধিত হইবে। এই ভয়ে অনেকে স্বীয় স্বীয় বালককে তাঁগার বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেন না।'৬গ

এখানে 'ডেভিড ড্রমণ্ড' সম্পর্কে যে তথ্য নিবেদিত হয়েছে, তার বাইরে আর কোনো বিশেষ তথ্য জানা যায় না। জন কোম্পানির গৌরবময় পুরনো দিনের কথা লিখতে গিয়ে কেরি সাহেব এঁর সম্পর্কে বাড়তি যে দুটি তথ্য দিয়েছেন, তাদের একটি হল, ড্রামণ্ড সাহেবের স্কুলের নাম ছিল, 'ধর্মতলা একাডেমি' এবং স্কুলে বাৎসরিক পরীক্ষা নেওয়া তিনিই এদেশে প্রথম চালু করেন। কেরি সাহেবের ভাষায়, 'অ্যানুএল এক্জামিনেশন্স অয়ার ফার্স্ট হেল্ড বাই মি. ড্রামনড্'।৬ঘ—আরেকজন ইংরেজ ঐতিহাসিক কলকাতার বিবরণ লিখতে গিয়ে এঁর কথা উল্লেখ করেছেন যদিও, কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এই যে এ উল্লেখও যথেষ্ট সুপরিচিতি বাহক নয়। তবু উদ্ধৃত করা দরকার, কেননা ইনি যে ইংরেজদের চোখে খুব শ্রদ্ধাস্পদ ছিলেন না, তার প্রমাণ এখানে মিলবে। এই ইংরেজ ঐতিহাসিক ডিরোজিওর শিক্ষক হিসাবে এর নাম লিখে, তারপর লিখেছেন, ড্রামণ্ড হলেন '...an eccentric Scotch dominie, who kept a school in Dhurrumtollah, near where Hart's livery stables now stand. Drummond was a poet

himself, but his book of verses never saw the light. It was his dying wish that these poems—written in his Doric—should be published in Scotland, but the ship that carried them was lost and thus perished 'some of the first Scottish lyrics since the days of Burns and Tanna-hill.'[৬৩]

যে-কবিতা পৃথিবীর আলো দেখতে পেল না, সেই ছাপা-না-হওয়া কবিতার কবি হলেন ড্রামণ্ড। তাঁর অন্তিম ইচ্ছা চিরকাল অপূর্ণই রয়ে গেল। এদিকে এই পাগল মাস্টারমশাইও আজ বিস্মৃত। তবু তিনি ব্যক্তি-পরিচয়ের খুঁটি নাটি বিবরণ হারিয়েও, নবজাগরণের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম হয়েই রয়ে গেছেন। এর কারণ তিনিই প্রথম যিনি, এদেশে হেলেনিক চিন্তার বীজ প্রথম ছড়িয়েছিলেন। 'ধর্মতলা একাডেমী'র হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও হলেন তাঁর ঐ উপ্ত বীজের প্রধান ও শ্রেষ্ঠ ফসল।—মানববাদী গ্রীক পণ্ডিতরা ইটালীতে যা করেছিলেন, গুরু ড্রামণ্ড এবং তাঁর শিষ্য ডিরোজিও ঠিক তাই করলেন।

ডিরোজিও একটি অতি বিখ্যাত নাম। তাই এঁর সম্পর্কে খুব বিস্তৃত পরিচয় না দিলেও চলবে। তবে খুব সংক্ষেপও করা যায় না, কারণ ইনিই প্রথম বাঙালী বিদ্যার্থীদের চিত্তে নবজাগরণের স্বপ্ন জাগালেন এবং দীক্ষা দিলেন 'যুক্তিবাদ' ও 'মানবিকতাবাদে'র মন্ত্রে।

হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার আট বছর আগে অর্থাৎ ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন এণ্টালীর 'পদ্মপুকুর সন্নিহিত মামলালীর দরগা নামক এক ভবনে।' জাতিতে পর্তুগীজ বংশোদ্ভব। ফিরিঙ্গী। এর বাবা কাজ করতেন একটি সওদাগরী অফিসে। ছেলেকে শিক্ষিত করবার জন্য যথাসময়ে ইনি ভর্তি করে দিলেন 'ধর্মতলা একাডেমি'-তে। এখানে পাঠ নিতে এসে ডিরোজিও যা পেলেন, শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষায় তা হল এই রকম: 'ড্রমণ্ডের প্রতিভার এক প্রকার জ্যোতি ছিল, যাহাতে বালকদিগের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিতেন এবং স্বীয় হৃদয়ের ভাব তাহাদের হৃদয়ে ঢালিয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার সংস্রবে আসিয়া বালক ডিবোজিওর প্রতিভা ফুটিয়া উঠিল। চতুর্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি পাঠ সাঙ্গ করিয়া বাহির হইলেন।'[৬৮]

এই 'চতুর্দশ বর্ষ বয়ক্রমে' যখন তিনি পাঠ সাঙ্গ করলেন, সন তারিখের হিসাবে সেটা হল, ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ। স্কুল ছেড়ে এই চৌদ্দবছরের ছেলে সেদিন চললেন ভাগলপুর, এবং সেখানে গিয়ে সওদগরী আপিসে এক কেরানীর পদে

নিযুক্ত হলেন।—ছাত্র হিসাবে যিনি ছিলেন 'ধর্মতলা একাডেমী'র সেরা ছাত্র, আবৃত্তি-পাঠ-ভূগোলবিদ্যা এবং এই সঙ্গে 'জেনারেল একস্ট্রা অর্ডিনারি অ্যাকয়ারমেন্টসে' যিনি আট বছর বয়স থেকেই কৃতিত্ব দেখিয়ে আসছিলেন এবং যাঁর খবর তদানীন্তন 'ক্যালকাটা গেজেট' ও 'গভমেণ্ট গেজেটে' প্রকাশিত হত, যাঁর অভিনয়-দক্ষতা দেখে ডাঃ গ্রানৃট[৭] পর্যন্ত বিস্ময়ে হয়েছিলেন অভিভূত, সেই অপরিসীম সম্ভাবনাময় একটি প্রতিভা কেরানীগিরি করে নিঃশেষিত হয়ে যাবে, একথা যেন ভাবাই যায় না।

ভাবতে হল না। অঘটন ঘটল। কেরানীগিরি করতে গিয়ে তিনি যে কলম ধরেছিলেন, সে কলম হিসাব-নিকাশের খাতা থেকে মাঝে মাঝে বেরিয়ে এসে সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখত। সেই কবিতা ছাপাবার সূত্রে এঁকে আসতে হল কলকাতায়। আর কলকাতায় আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটে গেল অঘটন। শিবনাথ শাস্ত্রী মশায়ের ভাষায়, '১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিও তাঁহার কবিতা-পুস্তক মুদ্রিত করিবার জন্য কলিকাতাতে আসেন। সেই সময় হিন্দু কলেজে একটি শিক্ষকের পদ খালি হয়; স্কুল কমিটি সেই পদে ডিরোজিওকে নিযুক্ত করেন। ১৮২৮ (?) সালের মার্চ মাসে তিনি ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হন।'[৮]

কেবল শিক্ষকতা নয়, আরেকটি দায়িত্বও তাঁর ঘাড়ে চাপল। সে দায়িত্বটি হল পত্রিকা সম্পাদনায় সহায়তা করা। একজন জীবনীকারের ভাষায়, 'ইণ্ডিয়া গেজেটে'র সম্পাদক পূর্ব হইতেই তাঁহার সাহিত্যিক গুণপনায় মুগ্ধ ছিলেন। তাঁহার বহু কবিতা তিনি পত্রস্থ করিয়াছেন। কলিকাতায় আসিবামাত্র ডিরোজিওকে তিনি তাঁহার একজন সহকারী রূপে গ্রহণ করিলেন। হিন্দু কলেজে ও 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' দুই চাকরিই ডিরোজিও করিতে লাগিলেন।'[৯]

বয়সের হিসাবে বিচার করলে দেখা যায়, ডিরোজিওর বয়স তখন সবে আঠারো। একজন আঠারো বছরের তরুণ যুবকের পক্ষে এ গৌরব অভাবনীয়। শুধু এটুকুতেই নয়, গৌরব আরো প্রসারিত হতে থাকল, ছড়িয়ে পড়ল আরো খ্যাতি। তরুণ ডিরোজিও প্রাণ-প্রাচুর্যে ছিলেন ভরপুর, এবং পড়াশোনা ও দার্শনিক আলোচনায় কখনো ক্লান্তি বোধ করতেন না। এর ফলে, তরুণ বাঙলাকে মাতিয়ে তোলা তাঁর পক্ষে কঠিন হল না। জীবনী কারের ভাষায়, '...চুম্বকে যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে তেমনি তিনিও অপরাপর শ্রেণীর বালকদিগকে আকৃষ্ট করিলেন। তিনি স্কুলে পদার্পণ করিবামাত্র বালকগণ তাঁহার চারিদিকে ঘিরিত। তিনি তাহাদিগের সহিত

কথা কহিতে ভালবাসিতেন। স্কুলের ছুটি হইয়া গেলেও অনেকক্ষণ বসিয়া তাহাদিগের পাঠে সাহায্য করিতেন; এবং নানা বিষয়ে তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতেন। তাঁহার কথোপকথনের এই রীতি ছিল যে, তিনি এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া বালকদিগকে অপরপক্ষ অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিতেন; এবং স্বাধীন ভাবে তর্ক বিতর্ক করিতে দিতেন। এইরূপে বালকগণের স্বাধীন চিন্তা-শক্তি বিকাশ হইতে লাগিল।'[১০]

'হিউম্যানিস্ট' পণ্ডিতরা ইউরোপের রেনেসাঁসকে যে-ভাবে ত্বরান্বিত করেছিলেন, ঠিক সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন এই তরুণ অধ্যাপক ডিরোজিও। স্বাধীন চিন্তার বিকাশে কী ভাবে তিনি তরুণ বাঙ্‌লাকে উদ্বোধিত করেছিলেন ওপরের ঐ উদ্ধৃতিই তার প্রমাণ। তদানীন্তন ইউরোপের বিখ্যাত দার্শনিককুলকে তিনি তাঁর ছাত্রদের কাছে আলোচনার বিষয় করে তুললেন। এই দার্শনিকদের মধ্যে যাঁরা বিশেষ ভাবে আলোচিত হতেন, তাঁরা হলেন অ্যাডাম স্মিথ, বেন্থাম, বার্কলে, লক, হিউম, মিল, রীড, ষ্টুয়ার্ট, পেইন এবং ব্রাউন।

মুক্ত-চিন্তার যে মুক্ত বাতাস প্রবাহিত হতে থাকল, ডিরোজিও তাকে শুধু কলেজ ঘরের চার দেওয়ালের ভেতর আবদ্ধ রাখলেন না, তিনি অনুপ্রাণিত যুবকদের নিয়ে গঠন করলেন 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েসন।' এখানেও প্রবাহিত হতে থাকল মুক্ত-বুদ্ধির তর্কযুদ্ধ। মোটকথা, কলকাতার ছাত্র সমাজের মধ্যমণি ডিরোজিও, আর ছাত্ররা সেদিন কেবল আলোচনা, প্রবন্ধপাঠ বা তর্কাতর্কি করেই সন্তুষ্ট নয়, তারা লেখবার জন্যও কলম ধরল। ইণ্ডিয়া গেজেট, বেঙ্গল হরকরা, লিটারারি গেজেট প্রমুখ নানা পত্রিকায় তাদের মুক্তচিন্তার প্রবন্ধও থাকল প্রকাশিত হতে। আর ঐ বাঙালী তরুণদের উদ্যোগে 'পার্থিনন' নামে একটি সমাচার পত্রও প্রকাশিত হতে আরম্ভ হল।

এই ভাবে চারিদিকে যখন সংস্কারের বন্ধনকে ছিঁড়ে ফেলে মুক্ত-চিন্তার অবারিত চর্চা শুরু হয়ে গেল, তখন রক্ষণশীল সমাজ প্রমাদগণনা করলেন। এঁরা নানারকম অভিযোগ এনে[১১] রাতারাতি হিন্দুকলেজ থেকে ডিরোজিওকে চাইলেন অপসারিত করতে। এবং সমর্থও হলেন এঁরা। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে এপ্রিল এঁকে অপসারিত করা হল। মিথ্যা দেনায় খাতে জমিদাররা এককালে যেমন সম্পত্তি ডিক্রি করে নিতেন অসহায় প্রজার, তেমনি সেকালের রক্ষণশীল সমাজ ডিরোজিওর অধ্যাপনার বৃত্তিটি কেড়ে নিলেন

নানারকম অভিযোগ খাড়া করে। অন্ততঃ একটি অভিযোগও খুবই স্পষ্ট ছিল, সে অভিযোগ হল, 'হিন্দু সমাজ মধ্যে মহাগোলযোগ উপস্থিত করিয়া হিন্দুধর্মস্বরূপ বৃক্ষের মূলে'[১২] অস্ত্রাঘাত করা।

এ অভিযোগের জবাবে ডিরোজিও যা বলেছিলেন, তা 'হিউম্যানিস্ট' পণ্ডিতদের কথারই যেন প্রতিধ্বনি। এমন সহজ অথচ জোরালো উত্তর তিনিই দিতে পারেন, যিনি চিন্তা ও বুদ্ধির জগতে পরিপূর্ণ মুক্ত। ডিরোজিও খুব পরিষ্কার ভাবেই জানালেন, 'আমি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছি, তাহাতে ছেলেদের ধর্মে বিশ্বাস যদি টলিয়া থাকে, তাহার জন্ম অপরাধ আমার নহে। তাহাদের মনে প্রত্যয় জন্মানো আমার সাধ্যাতীত এবং যদি কয়েকজনের আস্তিক্যহীনতার জন্ম আমাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তবে অপর সকলের আস্তিক্য বোধের জন্ম আমার কৃতিত্বও স্বীকার করা উচিত। মহাশয়, আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি মানুষের অজ্ঞতা ও মতের অহোরহ পরিবর্তন সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন, নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় সম্বন্ধেও আমি কোনো নির্দিষ্ট অভিমত ব্যক্ত করি না। সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা আমাদের মনে এরূপ ওতপ্রোত ভাবে অবস্থিতি করিতেছে যে, কোনোরূপ গোঁড়ামি করিবার সাহস আমার নাই। কাজেই আমি কথনই এমন কথা বলিতে পারি না- 'এটা ঠিক' আর 'এটা ঠিক নয়।'[১৩]

নিজের নিজের ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলাই শুধু নয়, ডিরোজিওর প্রতি আরেকটি বিরাট অভিযোগ ছিল, আর সেই অভিযোগটি হল, যথার্থ শিক্ষার পরিবর্তে 'কুশিক্ষা' প্রচারের। এ সম্পর্কে ডিরোজিও যে উত্তর দিলেন, সেটিও মনে রাখবার মতন; ডিরোজিও জানালেন, 'আমি ছেলেদের শিক্ষার ভার লইয়া তাহাদের মন হইতে সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামি দূর করিতে তৎপর হইলাম। এক একটি বিষয় লইয়া তাহার সপক্ষে ও বিপক্ষে কি যুক্তি থাকা সম্ভব, তাহা বুঝাইয়া দিতাম। এ বিষয়ে মনীষী বেকনই আমার আদর্শ। তিনি বলিতেন, 'কেহ যদি কোন বিষয়ে নিশ্চিত ধরিয়া লইয়া আলোচনা শুরু করে, তাহা হইলে শেষ পর্যন্ত তাহার সন্দেহ থাকিয়াই যায়, সন্দেহ নিরাকৃত হইবার উপায় থাকে না।' মনে একটি সন্দেহের পর আর একটি সন্দেহ উদয় হইবে, ফলে সকল বিষয়েই অবিশ্বাস জন্মিবে। কাজে কাজেই আমি কলেজের ছেলেদের যেমন হিউমের ফ্লিছিস্ ও ফিলোর কথোপকথন পড়াইয়া আস্তিক্যের বিরুদ্ধে সূক্ষ্ম মতবাদ গুলির সঙ্গে পরিচিত করাইয়াছি, তেমনি হিউমের বিরুদ্ধ-পন্থী ডক্টর রীড

ও ডুগাল্ড ষ্টুয়ার্টের আস্তিক্যের সপক্ষে সূক্ষ্মতর জবাবগুলির সঙ্গেও পরিচয় করাইয়া দিয়াছি।'[১৪]

এই হলেন ডিরোজিও। তাঁর এই লেখাগুলিই প্রমাণ করে যে তিনি কী ধরণের মানুষ ছিলেন, ইউরোপের যে হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতসমাজ 'হেলেনিক-চিন্তা'কে তুলে ধরেছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও যদি এই অভিযোগ খাড়া করা হত, তাঁরাও সম্ভবতঃ এইরকম উত্তরই দিতেন। হিন্দুকলেজ থেকে অপসারিত হবার পর খুব সামান্য দিনই বেঁচে ছিলেন তিনি। আঠারোশ একত্রিশের পঁচিশে এপ্রিল হিন্দু কলেজ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলেন, আর পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন সে বছরেরই শীতকালে। ছাব্বিশে ডিসেম্বর। তেইশ বছরও পূর্ণ হল না, আকস্মিক মৃত্যু তাঁর জীবনের ছেদ টেনে দিয়ে গেল।

হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও খুবই অল্প বয়সে পৃথিবী থেকে চলে গেলেন বটে, কিন্তু তিনি যে আলোকবর্তিকা জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন, সেই আলো থেকে আগুন নিয়ে জ্বলে উঠল আরো আলো। আরো ডিরোজিও দেখা দিল ঘরে ঘরে। এই 'তরুণবাঙলার' নতুন নামকরণই হয়ে গেল, 'ডিরোজিয়ান' বা 'ডিরোজিয়-পন্থী'। আমাদের কুসংস্কারের দেওয়াল এঁরা ভেঙ্গে চুরমার করতে থাকলেন। জ্ঞানের জগতের প্রবেশ-পথ এঁরা করলেন অবারিত। আর মুক্ত-চিন্তাকে এঁরা ছড়িয়ে দিতে থাকলেন দিকে দিকে। সত্যভাষণ ও স্পষ্টবাদিতায় এঁরা হয়ে উঠলেন আদর্শস্থানীয়। হরচন্দ্র ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব প্রমুখ 'ডিরোজিয়ান'-রা পরবর্তীকলে দেশগঠনের বিভিন্ন কাজে যে-ভাবে আত্মনিয়োগ করলেন, তা চোখের ওপরেই দেখা গেল। ওদিকে রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র ও তারিণীচরণ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ তরুণ-বাঙলা তাঁদের বিদ্রোহের ক্ষেত্র করলেন আরো প্রসারিত। হিসাব-নিকাশ করলে দেখা যায়, এঁরা নিজেরাই ছিলেন একেকটি প্রতিষ্ঠান। বিদ্রোহী ডেভিড ড্রামণ্ড তাঁর ক্ষুদ্র 'ধর্মতলা একাডেমি'তে যে-শিক্ষা দিয়ে হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও-কে দীক্ষিত করেছিলেন, ডিরোজিও তা' ছড়িয়ে দিলেন তখনকার বাঙলার ভেতর। তারপর এই তরুণ-বাঙলা আনলেন নবজাগরণ বা রেনেসাঁস। আমাদের তথাকথিত জীবন ধারার প্রায় সবটাই গেল বদলে। এলো আধুনিক জীবন। কিন্তু আমরা যেন না ভুলি, এ সবের মূলে রয়েছেন ডিরোজিও। একজন সুযোগ্য ডিরোজিয়ান অকপটে

যে স্বীকারোক্তি করে গেছেন, তা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। ইনি লিখেছেন, 'ডিরোজিও দয়ালু এবং স্নেহপরায়ণ শিক্ষক ছিলেন। বিদ্যাবত্তার অভিমান করিলেও তিনি সুবিদ্বান ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমাদিগকে উপদেশ দিতেন। এ শিক্ষা অমূল্য। তাঁহার শিক্ষাগুণে সাহিত্যিক যশের আকাঙ্ক্ষা আমার মনে এমন ভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, আজও তাহা আমার সকল কর্ম নিয়ন্ত্রিত এবং আমাকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে আমি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ণ করিতে আরম্ভ করি। তাঁহার নিকট হইতে এরূপ কতকগুলি উদার ও নীতিমূলক ধারণা লাভ করিয়াছি, যাহা চিরকাল আমার কার্যকে প্রভাবিত করিবে।'[১৫]

এই স্বীকারোক্তির লেখক হলেন রাধানাথ শিকদার। সেদিন ডিরোজিওর মুক্ত-বুদ্ধি ও মুক্ত-চিন্তার অনুশীলন যে তাঁকে 'সাহিত্যিক' হবার প্রেরণা জুগিয়েছিল, এ তত্ত্ব অন্ততঃ আমাদের জানা হল।

ড্রামণ্ড ও ডিরোজিওর সঙ্গে আর একটি নাম এই প্রসঙ্গে যোগ করা যেতে পারে, তিনি হলেন, 'টমাস পেইন'। আমাদের উনিশ শতকের ইতিহাসে ইনি 'টম পেইন' নামে পরিচিত। জর্জ টমসনের মতন যদিও ইনি সশরীরে এদেশে আসেন নি, কিন্তু এঁর অনুপস্থিতি তা' বলে কিন্তু তরুণ-বাঙ্‌লার মনে তাঁর প্রভাব সঞ্চারিত করতে ব্যর্থ হয় নি। এঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থ হল Rights of Man, এই গ্রন্থের প্রকাশকাল সতেরোশ একানব্বই-বিরানব্বই। মানবাধিকারের ওপর এই বই যখন লিখিত হয়, বাস্তবেও তখন এই অধিকার বিস্তৃত হচ্ছে। এই একই সনে ঘটে গেল ফরাসী বিপ্লব। কেবল সংস্কারের অদৃশ্য দুর্গ নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষের অধিকারের ধাক্কায় ব্যাস্টিল-দুর্গের অবরোধের প্রাচীরও পড়ল ধ্বসে। লেখক টমাস পেইন ছিলেন 'ফ্রেন্‌চ ন্যাশানাল কন্‌ভেনশানের' সদস্য, এবং ঐ Rights of Man প্রকাশের অপরাধে তাঁর বিচারও হয়েছিল লর্ড কেনিয়নের এজলাশে।[১৬]—এই পেইনের পরবর্তী লেখা হল, 'এজ অব রিজন্‌'। এ লেখা ও প্রকাশের তারিখ ১৭৯৪-৯৬ খ্রীষ্টাব্দ। এই সময় রামমোহন রায়ের বয়স বাইশ-চব্বিশ, এবং ডিরোজিওর জন্ম হ'তে তখন মাত্র বছর চোদ্দ-পনেরো দেরি।

টমাস পেইনের আয়ুষ্কাল ছিল বাহাত্তর বছর। সতেরোশ সাঁইত্রিশে—যে বছর ভীষণ ঝড়-ভুমিকম্প ও ভয়ঙ্কর জলোচ্ছ্বাসের তলায় শহর কলকাতা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছিল, সেই সনে এঁর জন্ম। যদিও ইনি আমেরিকান

হিসাবেই পরিচিত, কিন্তু জন্ম হয়েছিল এঁর ইংলণ্ডের মাটিতে।—আর এঁর তিরোভাব ও ডিরোজিওর আবির্ভাব একই সনে ঘটে, অর্থাৎ এ ঘটনার তারিখ হল, ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ।

ডিরোজিওর শিক্ষাগুণে মুক্ত-বুদ্ধি ও মুক্ত-চিন্তার কল্যাণে ঐ পেইন হঠাৎ জীবিত হয়ে উঠলেন আমাদের দেশের তরুণ সমাজের মধ্যে। পেইনের এই যুক্তিবাদের ভেতর 'ইয়ং বেঙ্গল' পেলেন তাঁদের মুক্তির স্বাদ। তাই 'এজ অব রিজ্‌নে'র চাহিদা হু-হু করে বেড়েই চলল। ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ ছাত্র যাঁরা ছিলেন, তাঁদের সংখ্যা অঙ্গুলিমেয়। কিন্তু কী আশ্চর্য, টমাস পেইনের এই বইটির জন্ম পাঠক দেখা গেল অনেক। শ' পেরিয়ে হাজার হাজারত বটেই। শোনা যায়, আমেরিকার পুস্তক প্রকাশকদের কাছে এ চাহিদার খবর গিয়ে পৌঁচেছিল, এবং এক প্রকাশক কলকাতার বাজারে জাহাজে করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন না কী একহাজার কপি বই। জর্জ স্মিথের লেখা আলেকজাণ্ডার ডাফের জীবনীতে[১৭] এই সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য রয়েছে। এখানকার তথ্য থেকে জানা যায়, কলকাতায় এ বই আসা মাত্র কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। প্রতি কপির দাম ছিল দুই শিলিং অর্থাৎ এক টাকা। কিন্তু চাহিদার গুণে হু হু করে দাম বেড়ে গেল। শোনা যায় ষোল শিলিং অর্থাৎ আট টাকা খরচ করেও অনেকে এই গ্রন্থখানি না কী জোগাড় করতে সমর্থ হন নি।

না, আলোচনা বাড়িয়ে লাভ নেই। খুব সংক্ষেপে বলা যায়, উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে 'নবজাগরণ' দেখা দিল। নতুন যুগের হাওয়া বইল। কার্ডিনাল বেসারিয়ন প্রমুখ পণ্ডিতরা আটশ'র বেশী গ্রীক পুঁথি এনে যা করেছিলেন, এখানে টমাস পেইনের একখানি বই-ই তাই করল। প্রাচীনে-নবীনে লেগে গেল সংঘর্ষ এবং শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষায় বলা যায় 'ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সূচনা' সমাগত হল।

কী রাজনীতি, কী সমাজনীতি, কী শিক্ষাবিভাগ—সবদিকেই যে এই বিপ্লব দেখা দিল এবং তার পরিণতি হিসাবে পরিবর্তনের হাওয়া বইতে আরম্ভ করল, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ মনীষীরা তা খুব স্পষ্ট ভাষাতেই লিখেছেন এবং এই বিবর্তনের স্থায়িত্ব ও কাল গণনায় ধরেছেন মোট কুড়ি বছর—আঠারোশ পঁচিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ।[১৮] —বলা বাহুল্য, একথা আগেই বলা হয়েছে।

এই কাল গণনা মোটামুটিভাবে ঠিক। নব্যবঙ্গের প্রথম যুগের যাঁরা

নেতৃবৃন্দ, দ্বিতীয় পর্যায়ে তাঁরা সকলেই এসে গেছেন কর্মক্ষেত্রে। এবং আঠারোশ পয়তাল্লিশের পর থেকেই এই সময়কে চিহ্নিত করা যায়। আঠারোশ সতেরোতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে 'হিন্দু কলেজ', নয় বছর পরে আঠারোশ ছাব্বিশে ডিরোজিও এখানে ঢুকেছেন অধ্যাপক হিসাবে। এবং মাসের হিসাবে সেটা 'মে' মাস। পাঁচবছর ভর্তি হতে যখন মাত্র কয়েকদিন বাকী, সেই আঠারোশ একত্রিশের ২৫শে এপ্রিল তারিখে ইনি অধ্যাপক হিসাবে হলেন অপসারিত।

এখন আঠারোশ পঁচিশ খ্রীষ্টাব্দকে যদি একটি বিস্তৃত পথের 'মাইলস্টোন' হিসাবে দেখা যায়, তা'হলে কে কতখানি দূরে আছেন, এই ভাবে হিসাব করা যেতে পারে।—বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং অক্ষয়কুমারের বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর, মধুসূদনের বয়স এক, কৃষ্ণমোহনের বয়স বছর বারো, রামগোপাল ঘোষের বয়স দশ, রসিককৃষ্ণ মল্লিকের বয়স পনেরো, প্যারীচাঁদ মিত্রের বয়স ও রাধানাথ সিকদারের বয়স যথাক্রমে এগারো ও বারো বছর। দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র তখনো জন্মগ্রহণ করেননি।—এদিকে রামমোহনের পাকাপাকি ভাবে কলকাতা অবস্থিতি তখন সবে দশ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে ; এই দশ বছর ধরে রামমোহন নতুন যুগকে নানাভাবে ও নানাদিকে যে বিস্তৃত করবার চেষ্টা করছেন, তা' পুনরুক্ত করা বাহুল্যমাত্র।

'নবজাগরণে'র প্রসঙ্গে ইউরোপীয়-মন কী ভাবে আমাদের ভেতর সঞ্চারিত হয়েছিল, তার একটি ধারা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হল। অবশ্য খুঁটিয়ে খুটিয়ে আরো অনেক আলোচনা করা যায়, কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে তা' অনাবশ্যক। তবে একথাও জেনে রাখা দরকার যে রামমোহনকে বাদ দিলে 'নবজাগরণে'র আলোচনা কিন্তু থেকে যায় অসমাপ্ত। অসম্পূর্ণ। কারণ, রামমোহন নিজেই হলেন আরেকটি ধারা। অর্থাৎ দ্বিতীয় ধারা। ড্রামণ্ড-ডিরোজিও ও তাঁদের ছাত্রদের প্রভাবে যে বিপুল পরিবর্তন এলো, এই পরিবর্তিত ধারায় আর সবই ছিল, কিন্তু যা ছিল না, তা হল, 'ভারতীয় চরিত্র'। রামমোহন ছিলেন বলেই আমাদের 'তরুণ-বাঙলা' একবারে ইউরোপের 'কপি-বুকে' পরিণত হল না। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইউরোপীয় সংস্কৃতির মিলনের ফলে 'নবজাগরণে'র ভেতর দিয়ে আমরা যে স্বতন্ত্র সংস্কৃতির স্বাদ পেলাম, তাতে 'ভারতীয়ভাবের' অন্ততঃ অভাব হল না। তাই আমাদের রেনেসাঁসের ইতিহাসে দুটি ধারাই আলোচিত হওয়া দরকার। নবজাগরণের লক্ষ্যে ডিরোজিও ও রামমোহন একই দিকে চলেছেন এগিয়ে। এবং এ

ব্যাপারে অনেক সমালোচক বলেন, রামমোহন আগে, পিছনে ডিরোজিও। জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে দ্বিতীয় প্রথমকে চলেছেন অনুসরণ করে। এঁদের ভাষায়, 'Consciusly or unconsciusly, Derozio became a continuer of the mission of Rammohan Roy. In their emphasis on rationalism and human freedom, in their condemnation of idolatry and in the close affinity that existed between the larger purposes of their *Atmiya Sabha* and *Academic Association*, Rammohan Roy and Derozio seemed to have been impelled by the same dynamic spirit to attempt the regeneration of their country.'[১৯]

ডিরোজিও যে-সব দার্শনিকদের নিয়ে সর্বদা আলোচনায় মত্ত থাকতেন, রামমোহনও তাঁদের দ্বারা হয়েছিলেন উদ্দীপিত। সেই বেন্থাম, হিউম, রিকারডো, জেমস্ মিল, জন স্টুয়ার্ট মিল আমাদের রামমোহন-কে বিশেষ ভাবে ভাবিয়েছিল, এবং প্রভাবিত যে করেছিল, তা আগেই বলা হয়েছে। তবে রামমোহন এইসঙ্গে 'বেদান্ত'কেও মেলালেন।—১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাই রামমোহন যখন স্থায়ীভাবে কলকাতাতে এসে বসতি স্থাপিত করলেন, এই আগমনকে কখনও উপেক্ষা করা যায় না। অন্ততঃ নবযুগের আলোচনাতেত নয়ই।

শিবনাথ শাস্ত্রী এই বিশেষ সময়টির কথায় লিখেছেন, 'রামমোহন কলিকাতাতে পদার্পণ করিবামাত্রই অগ্রসর, উদার, চিন্তাশীল ও সংস্কার-প্রয়াসী কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন।···তিনি এই সকলকে লইয়া ১৮১৫ সালে 'আত্মীয়-সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করিলেন, তাহাতে বেদান্ত ধর্ম্মের ব্যাখ্যা ও বিচার হইত। এই শাস্ত্রীয় বিচারে সহরের অনেক বড় বড় লোক মধ্যে মধ্যে উপস্থিত থাকিতেন।'[২০]

রেনেসাঁসের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে আমরা ইউরোপের ইতিহাসে দেখেছি সেখানে প্রায় চারশ বছরের একটি ধারাবাহিকতা রয়ে গিয়েছে। এই ধারাবাহিকতা আবার চারটি পর্যায়ে বিভক্ত। সেই চারটি পর্যায় হল, রেনেসাঁস-রিফরমেশন-এনলাইটেন্‌মেন্ট-ফরাসীবিপ্লব। যখন এগুলি সব অবসিত ঠিক তখনই আমরা ইউরোপের আলোকে হতে চেয়েছি আলোকিত। তাই আমাদের ধন্দ লেগে যায়, অন্ততঃ যখন এই ছাঁদে আমরা নিজেদের বিচার করতে বসি। ধন্দ লাগে রেনেসাঁস-রিফরমেশনে, প্রশ্ন দেখা দেয় 'নিউলার্নিং' কী কেবলই ভাঙ্‌বার জন্য? সংস্কারের সুদুর্গম দুর্গ ভেঙ্গে সে কী আমাদের

জন্ত নব্য আদর্শের কোনো ভিত্তি স্থাপন করবে না?—বলাবাহুল্য, রামমোহনকে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েও এসব প্রশ্ন দেখা দেয়। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় রামমোহনকে সংস্কারকের ভূমিকায় দেখেছেন এবং 'আত্মীয়-সভা' স্থাপন করিয়া রামমোহন রায় কিরূপ উৎসাহের সহিত প্রচলিত ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন', [২১] তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এঁকে দেখেছেন 'ভারত-পথিকে'র ভূমিকায়, অর্থাৎ নব্যভারতের পথপ্রদর্শক হিসাবেই তাঁর চরিত্র ব্যাখ্যা করেছেন।—এখন আমাদের প্রশ্ন, কোন্‌টি ঠিক?

বলাবাহুল্য, এ জিজ্ঞাসারও সার্থক জবাব আছে। তবে হিসাব করলে দেখা যায় এঁরা রামমোহনের বিশ্লেষণে কেউই ভুল করেন নি। রামমোহন একাধারে ঐ চারটি পর্যায়েরই কাজ করে গেছেন। এ ব্যাপারে একজন আধুনিক সমালোচকের ব্যাখ্যা উদ্ধার করা যেতে পারে। এঁর ব্যাখ্যা হল, 'আমাদের রেনেসাঁস ইউরোপীয় রেনেসাঁসেরই মতো মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে আধুনিক যুগের আলোকে উত্তরণ। আমাদের রিফরমেশন অর্থাৎ ধর্ম-সংস্কার তথা সমাজসংস্কার আমাদের রেনেসাঁসের সমকালীন, যদিও স্বতন্ত্র। আমাদের এনলাইটেনমেন্‌ট স্বতন্ত্র নয়, যদিও সমকালীন। রামমোহনের মধ্যে তিনটেই একসূত্রে গ্রথিত। ফরাসী বিপ্লবের সঞ্চালিকা ভাবধারাও তাঁর মধ্যে কাজ করছিল, তিনিও ভালবাসতেন সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা। তবে বিপ্লবটার অনুরূপ স্বকালে ও তাঁর নেতৃত্বে সংঘটিত হয় নি।' [২২]

রামমোহন বিলেত রওনা দিয়েছিলেন ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯-এ নভেম্বর। শহর লিভারপুলে গিয়ে পৌঁছুলেন পরের বছর ৮ই এপ্রিল। আর দেহরক্ষা করেন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭-এ সেপ্টেম্বর।—আমরা যে ইতিপূর্বে একটি পথের 'মাইলস্টোনে'র কথা বলেছি, এখন এই তারিখগুলিকে ঐ বিস্তৃতপথের ঐ মাইলস্টোন থেকে কতখানি কাছে-দূরে তার একটি হিসাব-নিকাশ অতি সহজেই সেরে দিতে পারি। এবং এই সিদ্ধান্তে আসা বোধহয় কঠিন হবে না যে রামমোহন নবযুগের শুধু প্রস্তুতি পর্বই সমাধা করে যান নি, তিনি পথের নকশা ও দিশা দুই-ই গেছেন দেখিয়ে দিয়ে। এদেশে নবজাগরণ আরম্ভ হবার আট বছরের মাথায় তাঁর দেহান্তর, আর যে বছর তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন, তখন নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারও হয়েছেন ভূমিষ্ঠ।—অর্থাৎ যে নাট্যকারকে নিয়ে আমাদের এত বিস্তৃত ভূমিকা ও আলোচনা, সেই দীনবন্ধু মিত্র তখন গন্ধর্বনারায়ণ মিত্র নামে এই ধরাধামে এসে গেছেন। তবে শহর কলকাতা থেকে একটু দূরে, এই যা!

'গন্ধর্বনারায়ণ' নামটি ছিল বাবার দেওয়া। এমন জমকালো নাম রাখা সেকালে ছিল রেওয়াজ। সেকালের পিতৃকুল ভীষণভাবে পছন্দ করতেন এ জাতীয় ভারি নাম। আর ছেলেরাও এই ধরণের একটি বিরাট নাম নিয়ে থিতিয়ে জিরিয়ে আলসে-বিলাসে কাটিয়ে দিতেন তাঁদের জীবন।—এ ব্যাপারে যে বিদ্রোহ করা যায়, তা কেউই ভাবতে পারতেন না। আমাদের আলোচ্য ব্যক্তিটি কিন্তু এই অভাবিত তুচ্ছ ব্যাপারেই করে বসলেন বিদ্রোহ। কলকাতায় আসবার পর এই 'গন্ধর্বনারায়ণ' নিজের ভেতর পুরনো দিনের এক গন্ধ পেলেন, এবং অচিরেই 'গন্ধর্বনারায়ণে'র খোলশ থেকে বেরিয়ে এলেন 'দীনবন্ধু'।

ঘটনাটি অতিতুচ্ছ। আর ব্যাপারটি যা, তা' হল রুচির। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়, এই নাম-প্রত্যাখ্যানের রুচি তিনি কোথায় পেলেন ?—অবশ্য এ জিজ্ঞাসার একটিই উত্তর। সে উত্তর হল, আধুনিক যুগের নতুন পরিবেশ তাঁকে দিয়েছিল এই সূক্ষ্ম রুচিবোধ। যাঁরা প্রাচীনপন্থী তাঁরা অবশ্য এ ব্যাপারে দ্বি-মত হতে পারেন।—শুধু এ ব্যাপারে কেন দীনবন্ধুর লেখায় যে ভাবে নতুনযুগ আত্মপ্রকাশ করেছে, তাতেও দ্বি-মত হবার অবকাশ যেমন প্রাচীন-পন্থীদের আছে, তেমনি বিষয়বস্তু নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অবকাশও সুপ্রচুর।

সুতরাং প্রকৃত বিচার করতে হলে, দীনবন্ধুর ক্ষেত্রে নবযুগের ভূমিকা কেবল অনিবার্য নয়, অপরিহার্য। এবং এ ব্যাপারে যে যে সমালোচকই তাঁর আলোচনা করেছেন, সকলেই এই দিকে তাঁদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই লিখেছেন ; ডঃ সুশীলকুমার দে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দীনবন্ধু মিত্রে'র প্রায় সূচনাতেই হিন্দুকলেজ এবং দুই বিপরীতধর্মী সভ্যতার সংঘর্ষ ও বিরোধের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, 'উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে, অর্থাৎ দীনবন্ধুর আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বেই, বাঙালীর সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যে ধর্ম প্রথা ও চরিত্রে যে বিপ্লব দেখা দিয়াছিল, তার মূলকারণ ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই দুই বিপরীতধর্মী সভ্যতার সংঘর্ষ ও মর্মগত বিরোধ। ইংরেজ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল, কিন্তু বিপ্লবের গতিবেগ বর্ধিত করিয়াছিল ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপক প্রচার।'[২৩]

এহ বাহ্য। নবজাগরণের তাত্ত্বিক ভূমিকা আমাদের ইতিপূর্বে করা হয়ে গেছে। এখন 'কলেজ' ইত্যাদি বিষয়ের দিকে একটু নজর দেওয়া যেতে পারে।

জন্ম নব্য আদর্শের কোনো ভিত্তি স্থাপন করবে না?—বলাবাহুল্য, রামমোহনকে নিয়ে আলোচনা করতে গিয়েও এসব প্রশ্ন দেখা দেয়। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় রামমোহনকে সংস্কারকের ভূমিকায় দেখেছেন এবং 'আত্মীয়-সভা' স্থাপন করিয়া রামমোহন রায় কিরূপ উৎসাহের সহিত প্রচলিত ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন', [২১] তার বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এঁকে দেখেছেন 'ভারত-পথিকে'র ভূমিকায়, অর্থাৎ নব্যভারতের পথপ্রদর্শক হিসাবেই তাঁর চরিত্র ব্যাখ্যা করেছেন।—এখন আমাদের প্রশ্ন, কোন্‌টি ঠিক?

বলাবাহুল্য, এ জিজ্ঞাসারও সার্থক জবাব আছে। তবে হিসাব করলে দেখা যায় এঁরা রামমোহনের বিশ্লেষণে কেউই ভুল করেন নি। রামমোহন একাধারে ঐ চারটি পর্যাযেরই কাজ করে গেছেন। এ ব্যাপারে একজন আধুনিক সমালোচকের ব্যাখ্যা উদ্ধার করা যেতে পারে। এঁর ব্যাখ্যা হল, 'আমাদের রেনেসাঁস ইউরোপীয় রেনেসাঁসেরই মতো মধ্যযুগের অন্ধকার থেকে আধুনিক যুগের আলোকে উত্তরণ। আমাদের রিফরমেশন অর্থাৎ ধর্ম-সংস্কার তথা সমাজসংস্কার আমাদের রেনেসাঁসের সমকালীন, যদিও স্বতন্ত্র। আমাদের এনলাইটেনমেন্‌ট স্বতন্ত্র নয়, যদিও সমকালীন। রামমোহনের মধ্যে তিনটেই একসূত্রে গ্রথিত। ফরাসী বিপ্লবের সঞ্চালিকা ভাবধারাও তাঁর মধ্যে কাজ করছিল, তিনিও ভালবাসতেন সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা। তবে বিপ্লবটার অনুরূপ স্বকালে ও তাঁর নেতৃত্বে সংঘটিত হয় নি।'[২২]

রামমোহন বিলেত রওনা দিয়েছিলেন ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯-এ নভেম্বর। শহর লিভারপুলে গিয়ে পৌছুলেন পরের বছর ৮ই এপ্রিল। আর দেহরক্ষা করেন ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭-এ সেপ্টেম্বর।—আমরা যে ইতিপূর্বে একটি পথের 'মাইলস্টোনে'র কথা বলেছি, এখন এই তারিখগুলিকে ঐ বিস্তৃতপথের ঐ মাইলস্টোন থেকে কতখানি কাছে-দূরে তার একটি হিসাব-নিকাশ অতি সহজেই সেরে দিতে পারি। এবং এই সিদ্ধান্তে আসা বোধহয় কঠিন হবে না যে রামমোহন নবযুগের শুধু প্রস্তুতি পর্বই সমাধা করে যান নি, তিনি পথের নকশা ও দিশা দুই-ই গেছেন দেখিয়ে দিয়ে। এদেশে নবজাগরণ আরম্ভ হবার আট বছরের মাথায় তাঁর দেহান্তর, আর যে বছর তিনি কলকাতা ত্যাগ করেন, তখন নবজাগরণের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারও হয়েছেন ভূমিষ্ঠ।—অর্থাৎ যে নাট্যকারকে নিয়ে আমাদের এত বিস্তৃত ভূমিকা ও আলোচনা, সেই দীনবন্ধু মিত্র তখন গন্ধর্বনারায়ণ মিত্র নামে এই ধরাধামে এসে গেছেন। তবে শহর কলকাতা থেকে একটু দূরে, এই যা!

'গন্ধর্বনারায়ণ' নামটি ছিল বাবার দেওয়া। এমন জমকালো নাম রাখা সেকালে ছিল রেওয়াজ। সেকালের পিতৃকুল ভীষণভাবে পছন্দ করতেন এ জাতীয় ভারি নাম। আর ছেলেরাও এই ধরণের একটি বিরাট নাম নিয়ে থিতিয়ে জিরিয়ে আলসে-বিলাসে কাটিয়ে দিতেন তাঁদের জীবন।—এ ব্যাপারে যে বিদ্রোহ করা যায়, তা কেউই ভাবতে পারতেন না। আমাদের আলোচ্য ব্যক্তিটি কিন্তু এই অভাবিত তুচ্ছ ব্যাপারেই করে বসলেন বিদ্রোহ। কলকাতায় আসবার পর এই 'গন্ধর্বনারায়ণ' নিজের ভেতর পুরনো দিনের এক গন্ধ পেলেন, এবং অচিরেই 'গন্ধর্বনারায়ণে'র খোলশ থেকে বেরিয়ে এলেন 'দীনবন্ধু'।

ঘটনাটি অতিতুচ্ছ। আর ব্যাপারটি যা, তা' হল রুচির। জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়, এই নাম-প্রত্যাখ্যানের রুচি তিনি কোথায় পেলেন?—অবশ্য এ জিজ্ঞাসার একটিই উত্তর। সে উত্তর হল, আধুনিক যুগের নতুন পরিবেশ তাঁকে দিয়েছিল এই সূক্ষ্ম রুচিবোধ। যাঁরা প্রাচীনপন্থী তাঁরা অবশ্য এ ব্যাপারে দ্বি-মত হতে পারেন।—শুধু এ ব্যাপারে কেন দীনবন্ধুর লেখায় যে ভাবে নতুনযুগ আত্মপ্রকাশ করেছে, তাতেও দ্বি-মত হবার অবকাশ যেমন প্রাচীন-পন্থীদের আছে, তেমনি বিষয়বস্তু নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অবকাশও সুপ্রচুর।

সুতরাং প্রকৃত বিচার করতে হলে, দীনবন্ধুর ক্ষেত্রে নবযুগের ভূমিকা কেবল অনিবার্য নয়, অপরিহার্য। এবং এ ব্যাপারে যে যে সমালোচকই তাঁর আলোচনা করেছেন, সকলেই এই দিকে তাঁদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেই লিখেছেন; ডঃ সুশীলকুমার দে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দীনবন্ধু মিত্রে'র প্রায় সূচনাতেই হিন্দুকলেজ এবং দুই বিপরীতধর্মী সভ্যতার সংঘর্ষ ও বিরোধের কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, 'উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে, অর্থাৎ দীনবন্ধুর আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বেই, বাঙালীর সমাজ সংস্কৃতি ও সাহিত্যে ধর্ম প্রথা ও চরিত্রে যে বিপ্লব দেখা দিয়াছিল, তার মূলকারণ ছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য এই দুই বিপরীতধর্মী সভ্যতার সংঘর্ষ ও মর্মগত বিরোধ। ইংরেজ অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল, কিন্তু বিপ্লবের গতিবেগ বর্ধিত করিয়াছিল ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা ও ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপক প্রচার।'[২৩]

এহ বাহ্য। নবজাগরণের তাত্ত্বিক ভূমিকা আমাদের ইতিপূর্বে করা হয়ে গেছে। এখন 'কলেজ' ইত্যাদি বিষয়ের দিকে একটু নজর দেওয়া যেতে পারে।

বলতে দ্বিধা নেই, দীনবন্ধুর যা কিছু খ্যাতি-অখ্যাতি তা' কিন্তু এই বিষয়ের মূলেই। এই বিষয়গুলির ভেতর 'নিউলার্নিং ও কলেজ' যতখানি জায়গা জুড়ে আছে, তার থেকেও বেশি স্থান নিয়েছে 'পানাসক্তি ও গণিকা চর্চা'।—আগেই বলা হয়েছে যে এই যুগটি ছিল মুক্ত-চিন্তা ও মুক্ত-বুদ্ধির যুগ। আর রেনেসাঁসের মানুষ এক অর্থে মুক্ত-মানুষ। তাই সব ব্যাপারেই তার কৌতূহল যেমন তীব্র, তেমনি সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষাও প্রবল। সুতরাং এই মানুষগুলি একটু বেপরোয়া। তাই এদের কথা উঠলেই প্রাসঙ্গিকভাবে 'সমাজও ধর্মের' কথাও ওঠে, আসে 'স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদে'র কথা। এবং সবশেষে ও সবার ওপরে আসে 'মানবিকতাবাদে'র প্রসঙ্গ। কেননা, নবজাগরণ কোনো ধর্মের কথা প্রচার করেনি, প্রচার করেনি কোনো দার্শনিক-তত্ত্ব বা আদর্শের কথা। মানুষের অধিকার যাতে কোনোরকমেই সঙ্কুচিত না হয়, এই কথাই বলতে চেয়েছে 'রেনেসাঁস' এবং এই অভিব্যক্তির অপর নাম হল, 'মানবিকতাবাদ'।—এদিক থেকে দীনবন্ধু যে একজন 'মানবিকতাবাদী' লেখক, এঁর নাটকগুলিই তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। খোলা মন ও মুক্ত-বুদ্ধি নিয়েই তাঁর এই নাটকগুলি লেখা। বিশেষ কোনো দার্শনিক মতবাদের প্রচারক তিনি নন। কোনো তাত্ত্বিক আদর্শের জন্যও তিনি কলম ধরেন নি; তা যদি ধরতেন, তা' হলে 'সধবার একাদশীর' নিমচাঁদ তাঁর হাত দিয়ে বের হত না। অন্ততঃ ঐ ভাবেত নয়ই। আসলে দীনবন্ধুর প্রেরণার উৎস ছিল মানুষ। আর তাঁর লক্ষ্যও ঐ মানুষ। এই মানুষের কথা বলতে গিয়ে তিনি কতকগুলি বিষয়কে অবলম্বন করেছেন। সুতরাং এই বিষয়গুলি সম্পর্কে কিছু না বললে তাঁর আলোচনা যেমন সমাপ্ত করা যায় না, তেমনি আরম্ভ করাও যায় না; সুতরাং এবার সেদিকে একটু নজর দেওয়া যাক।

কলেজ ও নিউলার্নিং

'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদ দীনবন্ধু মিত্রের আঁকা একটি সর্বাধিক বিতর্কিত চরিত্র। সেই বিতর্কিত নিমচাঁদ এক মদের আড্ডায় বসে কেনারাম নামে এক ডেপুটি-কে সদম্ভে বলেছিল, '···তোমার কলেজের একটাকে দেখাও দেখি আমার মত ইংরেজি জানে—I read Euglish, write English, talk Euglish, speechify in English, think English, dream in English··· ।'[২৪]—এখানে নিমচাঁদ যে-কথা বলেছে, এ শুধু তার

নিজের কথা নয়, এই দম্ভোক্তি তথনকার সব ইংরেজি-শিক্ষিত মানুষদেরই। এঁরা ইংরেজির মধ্য দিয়ে পেয়েছিলেন নতুন যুগের বাণী, এবং এঁদের কাছে নিজের নিজের কলেজ ছিল সর্বাধিক প্রিয়; এঁরা কলেজ বলতেন না, বলতেন, 'কালেজ'। আর এই 'কালেজে'র সেরা হল 'হিন্দু কলেজ'। স্বয়ং দীনবন্ধু ছিলেন এখানকার ছাত্র, সুতরাং তাঁর নাটকের চরিত্রদের এ নিয়ে গৌরব করবার হক আছে।

কিন্তু ঐ কলেজ ও কলেজীয় শিক্ষা কী অবিমিশ্র গৌরবের? সেকালে অনেকেরই ধারণা ছিল, সব কিছু সর্বনাশের মূলে রয়ে গেছে ঐ কলেজ। হিউম্যানিস্ট পণ্ডিতরা যে দিন কন্‌সটান্‌টিনোপল থেকে শরণার্থী হয়ে এসে নতুন নতুন পাঠশালা খুলে বসলেন, সেদিন ঐ কৃতবিদ্য নতুন শিক্ষিতদের সম্পর্কে তাঁদের ছাত্রদের অভিভাবকরা ঠিক কী মনোভাব পোষণ করতেন জানি না, কিন্তু আমাদের দেশের ছেলেদের বাবারা এ শিক্ষায় কী অসহায় বোধ করছিলেন তার একটি দলিল আছে। এই দলিলটি হল চিঠি। 'হিন্দু কলেজ ছাত্রস্থ পিতুঃ' লিখিত এই চিঠি প্রকাশিত হয় 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর সংখ্যায়। তথনকার দিনে বাঙ্‌লা-গদ্যে তথাকথিত বিরাম-চিহ্নের ব্যবহার ছিল না। বিরাম-চিহ্ন ব্যবহার করার পর চিঠির ভাষা যা দাঁড়ায়, তা এইরকম, 'আমি বিদেশী মনুষ্য। এই শহরে বিষয় কর্ম করি। শুনিলাম হিন্দু কলেজ নামক পাঠশালায় বড় বিদ্যাচর্চা। ছেলে পড়াইলেই বড় বিদ্বান হয়। আর বড় বড় সাহেবরা আসিয়া তাহার পরীক্ষা লয়েন। কৃতবিদ্য হইলে পরে রাজসরকারে বড় কর্ম হইতে পারে। ইহাতে লোভাকৃষ্ট হইয়া অতিক্লেশে মাসিক বেতন দিতে স্বীকার করিয়া আপন বালককে দেশ হইতে আনিয়া ঐ কলেজে নিযুক্ত করিলাম। তাহাতে যে উৎপাত গ্রস্ত হইয়াছি তাহা কিঞ্চিৎ লিখি।'

'হিন্দু কলেজে'র প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ সুশীল কুমার দে লিখেছেন, 'হিন্দু কলেজ নামে হিন্দু হইলেও ভাবে, গৌরবে ও শিক্ষা পদ্ধতিতে অহিন্দু মনোবৃত্তির প্রশ্রয়ের জন্য সৃষ্টি হইয়াছিল। অনেকদিন পর্যন্ত ইহার পাঠ্য তালিকায় প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য চর্চার নামগন্ধও ছিল না।'[২৫] এই কথাগুলি তথনকার দিনের অভিভাবকদের কাছে কী মর্মান্তিক ভাবে সত্য, তা ঐ 'হিন্দুকলেজছাত্রস্থ পিতুঃ' লিখিত চিঠির আরো কিছু অংশ উদ্ধার করলেই দেখা যাবে। ঐ অসহায় পিতা কতথানি 'উৎপাতগ্রস্ত' হয়েছিলেন, তা' একটির পর একটি ঘটনা সাজিয়ে উল্লেখ করছেন। এবং সে বিবরণ

এই রকম : 'আমি নির্ধন মনুষ্য। পুত্রটি কখন কখন ঘরের কর্ম দেখিত ও ডাকিলেই নিকটে আসিত। কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর দিত। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে বিপরীত রীতি হইতে লাগিল।...প্রাপ্তমাত্রেই ভোজন করে, শুচি অশুচি দুই সমান জ্ঞান, জাতির বিষয় অভিমান ত্যাগী, উপদেশ কথা হইলেই Non sense কহে'—

অর্জিত বিদ্যার ব্যাপারে ইনি লিখেছেন, 'ছেলে ইংরেজী, অঙ্ক, গণিতশাস্ত্র, ক্ষেত্রপরিমাণ বিদ্যা, বিলাতের রাজারদিগের উপাখ্যান, ভূগোল, খগোল, ইতিহাস ইত্যাদি পড়ে।.. চড় চড় করিয়া টানা কলমে ইঙ্গরেজী লেখে, মধ্যে মধ্যে তরজমাও করে।... লেখার তজবীজ করিলাম। অতি কদাক্ষর লেখে এবং অধিক লিখিতে পারে না। যে তরজমা করে তাহার বাঙ্গালা বুঝা যায় না। পাঁচটা অঙ্ক ঠিক লিখতে পারে না। কসা মাজা জানে না। নিমন্ত্রণ পত্র কিম্বা বাজারের চিঠীখানা লিখিতে অক্ষম।'

ছেলেটির গুণাগুণ সম্পর্কে উক্ত অভিভাবক যা লিখেছেন, তা' আরো চমকপ্রদ। এই পত্র পাঠে জানা যায় এরা '.. যথার্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে 'চোর' 'ডাকাইত' ও 'গরু' বলে। পিতা-পিতৃব্যদিগকে নির্বোধ কহে। মিথ্যার সেবা যথেষ্ট করে। কিন্তু বাহ্যে সত্যবাদির ন্যায়, ইহার কেহ নাস্তিক, কেহবা, চার্বাক, কেহ এক আত্মবাদী, কেহ বা দ্বৈত্যবাদী (?), নিশ্চিত আচার ব্যবহার দ্বেষী।... ইংরেজী ব্যবহার ও চলনে অসীমক ভক্তি।... স্বদেশীয় তাবৎ বিষয়কে দ্বেষ করে।... রুস দেশে কোন্ স্থানে কোন নদী পর্বতাদি আছে তাহা জানে ও বলিতে পারে। কিন্তু স্বদেশীয় বৃত্তান্ত কিছুই জানে না। বর্দ্ধমান কলিকাতার কোন্‌দিকে, শোননদী ও রাজমহলের পর্বত কোথা তাহা জানে না।'

এই চিঠির লেখক কে, তা' জানা যায় যায় না। 'হিন্দুকলেজ ছাত্রের পিতা' —এই ছদ্মপরিচয়ের অন্তরালে তিনি চেয়েছেন নাম গোপন করতে। তবে চিঠির বাঁধুনি দেখে বোঝা যায়, তিনি একজন সচেতন অভিভাবক। ছেলেকে ইনি কৃতবিদ্য করে পরে 'রাজ সরকারের বড় কর্মে' নিয়োগ করার স্বপ্ন দেখেছিলেন। জানা যায় না ছেলেটির বাবার স্বপ্ন সার্থক হয়েছিল কী না! তবে সময়ের দিক থেকে হিসাব করে দেখা যাচ্ছে তখন ডিরোজিওর হাতে 'নিউলার্নিং-এর পর্ব চলছে। —ঠিক এই জাতীয় আরেকটি ঘটনার সংবাদ কয়েক মাস পরে প্রকাশিত হল 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায়। এই সংবাদ প্রকাশের তারিখ, ১৪ই মে, ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ। ঘটনাটি এই রকম :

'...কলিকাতার একজন গৃহস্থ আপন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া ৺জগদম্বার দর্শনে কালীঘাটে আসিয়া এক দোকানে বাসা করিয়া অবগাহনান্তর পূজার নৈবেদ্যাদি আয়োজন পূর্বক সমভিব্যাহারে জগদীশ্বরীর সন্নিধানে উপনীত হইয়া তাবতের সহিত অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন। কিন্তু উক্ত গৃহস্থের সুসন্তানটি প্রণাম করিলেন না। ব্রহ্মাদি দেবতার দুরারাধ্যা যিনি, তাঁহাকে ঐ ব্যলীক বালক কেবল বাক্যের দ্বারা সম্মান রাখিল, যথা 'গুডমর্ণিং ম্যডম্!'

ঘটনাটি নিঃসন্দেহে আতঙ্কজনক। যে বাবা কালীঘাটে 'জগদীশ্বরী'-কে অষ্টাঙ্গে প্রণাম জানান, তাঁরই সন্তান 'গুডমর্ণিং ম্যডম্' ব'লে সেই দেবীকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন, এর থেকে আতঙ্কজনক খবর আর কী আছে?

খবর অবশ্য আরো ছিল। এবং সে সব খবর থেকে জানা যায়, 'ছেলেরা উপনয়নকালে উপবীত লইতে চাহিত না; অনেকে উপবীত ত্যাগ করিতে চাহিত, অনেকে সন্ধ্যা-আহ্নিক পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাহাদিগকে বলপূর্বক ঠাকুর ঘরে প্রবিষ্ট করিয়াদিলে তাহারা বসিয়া সন্ধ্যা-আহ্নিকের পরিবর্তে হোমরের ইলিয়ড গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ সকল আবৃত্তি করিত।'[২৬]

মোটকথা এ এক প্রবল নৈরাজ্য। 'নিউলার্নিং' এসে সবরকম প্রাচীন মূল্যবোধকে দিল নস্যাৎ করে। কিছুতেই যেন সমন্বয় হয় না। নিজের দেশ ও নিজের সংস্কৃতির প্রতি এরকম কালাপাহাড়ী মনোভাব পিতৃকুলের পক্ষে সত্যিসত্যিই অসহনীয় হয়ে উঠল। এই অসংগতিকে কবি ঈশ্বর গুপ্ত 'অনাচার' নামে একটি কবিতায় সুন্দর ভাবে ধরে রাখলেন। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাটি পাঠ করলে উপলব্ধি করা যায় যে এটি কেবল একটি কবিতাই নয়, যুগ-যন্ত্রনার এ এক আশ্চর্য দলিল। যন্ত্রণাকে নিয়ে কৌতুক করে কবি লিখলেন,

> ভূতের সংসারে এই হয়েছে অদ্ভুত।
> বুড়া পূজে ভূতনাথ, ছোঁড়া পূজে ভূত॥
> পিতা দেয় গলে সূত্র পুত্র ফেলে কেটে।
> বাপপুজে ভগবতী বেটা দেয় পেটে॥
> বৃদ্ধ ধরে পশুভাব জন্তুভাব শিশু।
> বুড়া বলে রাধাকৃষ্ণ ছোঁড়া বলে যিশু॥

হাসি পায় কান্না আসে কব আর কাকে ?
যায় যায় হিঁদুয়ানী আর নাহি থাকে ॥[২৭]

এইসব দেখে মনে হতে পারে, কলেজীয় শিক্ষার ধারা বুঝি সত্যি সত্যিই এইখাতে ছিল বাহিত। এবং ডিরোজিও এ কারণেই অভিযুক্ত হয়ে পরে অপসারিত হয়েছিলেন। তাই খুব স্বাভাবিক কারণেই আমাদের জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়, ডিরোজিও যে-সব বিতর্ক-সভা পরিচালিত করেছিলেন, তার ভেতর কী এ ধরনের বাড়াবাড়ির কোনো সুযোগ ছিল ?

সম্ভবতঃ ছিল না। যাঁরা এ ব্যাপারে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের একজনের লিখিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে তদানীন্তন অধঃপতিত হিন্দুসমাজকে মুক্ত করবার জন্য এঁরা 'লিবারেল এডুকেশন' চেয়েছিলেন। এঁদের স্বীকারোক্তি;— 'The degraded state of the Hindus formed the topic of many debates; their ignorance and superstition were declared to be the causes of such a state and it was then resolved that nothing but a liberal education could enfranchise the minds of the people'[২৮]

এখন এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে যদি কোনো তরুণ বাঙালী ছাত্র বাড়াবাড়ি করে, তবে তা' নিতান্তই আতিশয্য হিসাবে ধরতে হবে। এবং তরুণদের ক্ষেত্রে সব সময়েই থাকে এই আতিশয্য। —এদিকে যদিও 'হিন্দু কলেজ ছাত্রের' বাবা তাঁর পুত্রের প্রসঙ্গে এঁদের অভিযুক্ত করেছেন 'মিথ্যার সেবা যথেষ্ট করে' বলে, কিন্তু প্রকৃত সত্য ছিল সম্ভবত ঠিক এর বিপরীত।—কলেজের ছাত্রদের সেদিন বরং দেখা হত 'সত্যের প্রতীক' হিসাবে। এঁদের ভাষায়, 'Indeed, the *college boy* was a synonym for truth and it was a general belief and saying amongst our country men, which those that remember the time, must acknowledge, that 'such a boy is incapable of falsehood because he is a *college boy*.'[২৯] যে 'সমাচার চন্দ্রিকা'র পাতায় এসব ছাত্রদের নিন্দার খবর বেরিয়েছিল, সেই কাগজেই পরের বছর এ খবরও দেখা গেল, '…হিন্দু কলেজ প্রভৃতি ক'একটা পাঠশালা স্থাপিত হওয়াতে উপরের লিখিত কুনীতি বা রীতি আর প্রায় দেখা যায় না। বরং হিন্দু বালকেরা ক্রমে জ্ঞানবান এবং বিদ্বান হইতেছে। এবং তদ্দৃষ্টে অনেকেরি বিদ্যাভ্যাসে উৎসাহ জন্মিতেছে।[৩০]

কলেজ এবং 'নিউলার্নিং' সম্পর্কে এরূপরে দীনবন্ধুর মনোভাব কী রকম হবে, তা বোধহয় সহজেই অনুমেয়। যদিও 'বিয়েপাগলা বুড়ো' নাটকের রাজীবলোচনের সংলাপে কিছুকিছু বাঁকা কথা আছে, কিন্তু আমরা যেন বিস্মৃত না হই যে রাজীবলোচন একটি পুরাতন-পন্থী ধিককৃত চরিত্র। সুতরাং তার মুখেত আমরা শুনবোই, 'তোমার বাপ অতি মূর্খ তাই তোমাকে কলেজে পড়তে দিয়েচে—কলেজে পড়ে কেবল কথার কাপ্তেন হয়,'[৩১] বা 'কালেজে পড়ে যখন জলপানি পেয়েচে তখন ওর জাত কি?'[৩২] ইত্যাদি।

'কলেজ' যে দীনবন্ধুর কাছে একটি আদর্শও নব্যতন্ত্রের প্রতীক এবং সত্যের ধারক ও বাহক, এ কথা নানাভাবে তাঁর নানা নাটকে আছে ছড়িয়ে। 'লীলাবতী' নাটকে হরবিলাস যখন তাঁর শিক্ষিতা কন্যাকে মূর্খ নদেরচাঁদের হাতে কেবল কৌলীন্যের খাতিরেই তুলে দিতে চলেছেন, তখন আত্মীয়কুল থেকে প্রতিবেশীরা পর্যন্ত সকলেই বলেছেন, 'ললিত এবং সিদ্ধেশ্বর আজকাল কালেজের চূড়া স্বরূপ। আপনি নদেরচাঁদকে ছেড়ে দিয়ে ললিতের সঙ্গে লীলাবতীর বিয়ে দেন। শতজন্ম তপস্যা না করলে ললিতের মত জামাতা পাওয়া যায় না; ছেলে যার নাম।'[৩৩]—'নীলদর্পণ' নাটকে বিন্দুমাধব যে একটি আদর্শবান ছেলে, তার একমাত্র কারণ সে কলকাতার কলেজে পড়ে। এবং এই ছোটবাবুর ভালো পরিবারে বিয়ে হয়েছে ঠিক এই কারণে; দেওয়ান গোপীনাথকে একজন গোপ অন্ততঃ এই কথাই বলেছে, 'ছোটবাবুর শ্বশুরগার মান বড়, গারনাল সাহেব টুপি না খুলে এস্‌তি পারে না, পাড়াগাঁয় ওঁরা কি মেয়ে দেয়? ছোটবাবুর ন্যাকাপড়া দেখে চাসা গাঁ মানলে না।'[৩৪]

গোপের ভাষায় এই যে-'ন্যাকাপড়া', এই লেখাপড়ার কথা তুলে 'সধবার একাদশীর' নিমচাঁদ স্বগতোক্তি করে আত্মবিশ্লেষণ করেছিল, 'তুমি স্কুল হতে বেরুলে একটি দেবতা'...।[৩৫] মোটকথা, এই আধুনিক শিক্ষা যে মানুষকে খারাপ করে না, বরং ভালো করতে করতে তাকে দেবত্বের পর্যায়ে উন্নীত করতে পারে, এ বিশ্বাস নাট্যকার দীনবন্ধুর মনে ছিল দৃঢ়-নিশ্চয়। —তাই যখনই কলেজ এবং নতুন শিক্ষার সম্পর্কে অভিযোগ উঠেছে, তখনই অন্য চরিত্রের মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ করেছেন এই নাট্যকার। 'সধবার একাদশীর' সৌদামিনীর ধারণা ছিল অটলবিহারীর উচ্ছৃঙ্খলতার মূলে আছে 'কালেজীয় শিক্ষা'। কিন্তু এই ধারণা যে কতখানি ভ্রান্ত ভ্রাতৃবধূ কুমুদিনী

মুহূর্তে তা' বুঝিয়ে দিয়েছে। মদ্যপান, গণিকচর্চা ইত্যাদি চরিত্রস্খলনকে যাঁরা 'কালেজীয় শিক্ষা'র কুফল হিসাবে গণ্য করতে চান, তাঁরা সৌদামিনী-কুমুদিনীর সংলাপ শুনে নিশ্চয় ক্ষান্ত হবেন, এ ধারণা দীনবন্ধুর খুব স্পষ্ট-ভাবেই ছিল।— অটল সম্পর্কে উভয়ের আলোচনাটি তাই অবশ্য উদ্ধৃতি-যোগ্য :

'সৌদা। ও ভাই কলেজে পড়ার দোষ।

কুমু। তোর ভাই আবার কোন্‌কালে কলেজে পড়লে? আদরের ঢেঁকি কলেজে নিলে না, তাই গৌরমোহন আড্‌ডির স্কুলে দিন দুই একখান বয়ের পাত উলটিচ্‌লো আর হেয়ার সাহেবের স্কুলে মাস কত পড়েচ্‌লো।

সৌদা। তবে ইংরিজি পড়ার দোষ।

কুমু। কেন গোকুল কাকা কি ইংরিজি পড়েন নি? চন্দ্রবাবু যে কলেজে পাঁচ বচ্ছোর চল্লিশটাকা করে জলপানি পেয়েচেন, বিরাজের ভাতার যে ইংরিজি টোলের ভট্‌চাযি্য হয়ে বেরুয়েচে, এরা কি মাগ্‌কে ঘরে একা রেখে বাগানে কাঞ্চনকে নিয়ে আমোদ করে, না মদ খেয়ে শিয়ালের মত হাল্লো হাল্লো করে ডাকতে থাকে?'[৩৬]

আধুনিক শিক্ষার ব্যাপারে কুমুদিনীর ধারণা যে কত পরিষ্কার, ওপরের সংলাপই তার প্রমাণ। কুমুদিনী ঠিক কতখানি লেখাপড়া জানতেন, সে বিবরণ নাট্যকার দেন নি। তবে এই নতুন শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নতুন সমাজ যে জেগে উঠেছে, এ ব্যাপারে অনেক মেয়েই ছিলেন সেদিন উৎসাহী। ডিরোজিয়ানদের অনেক সাধু উদ্দেশ্যের ভেতর একটি উদ্দেশ্য ছিল, 'দ্যাট হিন্দু উইমেন শুড বি টট্‌' [৩৭]এবং কী রকম শিক্ষা দেওয়া হবে সে ব্যাপারেও বোধহয় এঁরা একটু চিন্তা করেছিলেন। এঁদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে এঁদের উদ্যোক্তাদের একজনের স্ত্রী ছিলেন শিক্ষিতা ও সুরুচি সম্পন্না এবং ইনি চেয়েছিলেন যে 'মরাল ফিলজফি' ও গণিতশাস্ত্রও মেয়েদের শিক্ষনীয় বিষয় হোক। এঁদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্যটি এইরকম : '…the wife of one of the leaders of this movement was a most accomplished lady, who included amongst the subjects, with which she was acquainted, moral philosophy and mathematics.'[৩৮]

এই মহিলা যে কে, তা গবেষণা-সাপেক্ষ। আর ইনি যদি আমাদের এ দেশীয় হন, তবে বিষয়টি কেবল জটিল নয়, জটিলতর। এহ বাহ্য, রেনেসাঁস

যে মেয়েদের কাছে নতুন যুগ নিয়ে আসে, তা কে না জানে? সুতরাং তা' আমাদের কাছেও এলো। ইটালীয় রেনেসাঁসের লেখক জ্যাকব বুকহার্ট আমাদের জানিয়েছেন যে ওদেশে নবজাগরণের শুরু থেকেই ফ্লোরেনটাইন বণিক ও রাজনীতিবিদ্‌রা কেবল নিজেরাই যে নানারকম ভাষা শিখতেন, তাই নয়, 'even the daughters of the house were highly educated',[৩৯] আর শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ ছিলেন পরস্পরের সহযোগী। বুকহার্টের দেওয়া সংবাদ এই রকম: 'The education given to women in the upper classes was essentially the same as that given to men. The Italian, at the time of the Renaissence, felt no scruple in putting sons and daughters alike under the same cause of literary and even philogical instruction.'[৪০] এডিথ শিজেল্‌ও নবজাগরণের ক্ষেত্রে নারীদের আগমনকে স্বাগত জানিয়ে লিখলেন, তাদের এই নতুন সমাজে আসা,—'নট্‌ অ্যাজ কুইনস্‌ অব শিভালরি, বাট্‌ অ্যাজ কম্‌পানিয়ন্‌স্‌।'[৪১]

আমাদের এই বাঙ্‌লাদেশে নারী-জাগরণের ব্যাপারটি খুব সহজ ছিল না। কেননা নানান কুসংস্কারের পাকে তাঁদের এমন ভাবে বাঁধা হয়ে ছিল যে, সেই পাক খুলতেই রামমোহন বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীরা হিমসিম খেয়ে গেলেন। অজস্র কুসংস্কারের জালে এঁদের জড়িয়ে রাখা হয়েছিল। ঐ কুসংস্কারগুলির ভেতর একটি কুসংস্কার এই ছিল যে, যে-মেয়ে লিখতে এবং পড়তে শিখবে বিবাহের পর তার বৈধব্য সুনিশ্চিত,—'There was a superstitious idea that a girl tanght to read and write would soon after marriage become a widow.'[৪২]

নবজাগরণের প্রভাবে চারদিকে যখন দেখা দিল নবীন উদ্যম, তরুণ বাঙ্‌লা যখন মেতে উঠল কলেজ, কাছারি, সভা-সমাজ ইত্যাদি নিয়ে, তখন মেয়েরাও যে এই উদ্যোগের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চেয়েছিল, তার প্রমাণ আছে দীনবন্ধুর সাহিত্যে। এখানে নারী কেবল রমণী নয়, এ নারী হতে চেয়েছে সহধর্মিনী, 'কম্‌পানিয়ন'। 'নীলদর্পণে'র সরলতা তাঁর কলেজে পড়া স্বামীকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন, 'প্রাণেশ্বর, আমাদের নারী কুলে জন্ম, আমরা পাঁচ বয়স্যায় একলা উদ্যানে যাইতে পারি না, আমরা নগর ভ্রমণে অক্ষম, আমাদিগের মঙ্গলসূচক সভাস্থাপন সম্ভবে না, আমাদের কলেজ নাই, ব্রাহ্ম সমাজ নাই, কাছারী নাই—রমণীর মন কাতর হইলে বিনোদনের কিছুমাত্র উপায় নাই... ।'[৪৩]

'সধবার একাদশী'র কুমুদিনীর হৃদয়েও ছিল অনুরূপ যন্ত্রণা। কিন্তু অটল তার নামের মতই ছিল অটল, স্ত্রীর প্রতি উদাসীন। তাই কুমুর আহ্বানে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। 'নীলদর্পণে'র বিন্দুমাধব কিন্তু নবীন যুগের প্রতিনিধি, তাই স্ত্রীর ব্যাকুলতায় সঙ্গে সঙ্গে সে চিঠি লিখে জানাল, '...প্রেয়সি, আমি তোমার বঙ্গভাষার সেক্সপিয়ারের কথা ভুলি নাই, এক্ষণ বাজারে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রিয় বয়স্য বঙ্কিম তাঁহার থান দিয়াছেন, বাড়ী যাইবার সময় লইয়া যাইব—বিধুমুখি, লেখাপড়ার সৃষ্টি কি সুখের আকর, এত দূরে থাকিয়াও তোমার সহিত কথা কহিতেছি।'[৪৪]

দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে'র রচনাকাল, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ। ডিরোজিও-রামমোহনের মৃত্যুর পরে প্রায় তিন দশক তখন আমরা এসেছি এগিয়ে। সুতরাং শিক্ষার ব্যাপারে এই নারী-সমাজ পুরুষের কাছাকাছি একবারে না আসুন, 'নিউলার্নিং'-এর প্রভাবে যে তাঁদের মনে এ ধরণের তৃষ্ণা দেখা দেবে, এতে আর আশ্চর্য কী!—কিন্তু চরিতার্থতা? পূর্ণতা?—জিজ্ঞাসা থেকে যায়, মনে প্রাণে, সেদিন কী আমরা স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতার ব্যাপার গুলিকে সর্বতোভাবে মেনে নিতে পেরেছিলাম?

সম্ভবতঃ না। 'নীলদর্পণ' প্রকাশের ঠিক এক বছর আগে দীনবন্ধুর সাহিত্য-গুরু ঈশ্বরগুপ্তের তিরোধান। এবং তিনি তাঁর দেহত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে স্ত্রী-শিক্ষার ওপর কটাক্ষ করে যে কৌতুক-কবিতাটি রচনা করেন, তার মধ্য দিয়ে কী আমাদের সমাজের এক শ্রেণীর লোকের মনোভাব প্রকাশিত হয় নি? রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন এক শ্রেণীর লোকের মনে কী এ আশঙ্কা দেখা দেয় নি—

> 'লক্ষ্মী মেয়ে যারা ছিল,
> তারাই এখন চড়বে ঘোড়া চড়বে ঘোড়া!
> ঠাঠ ঠমকে চালাক চতুর,
> সভ্য হবে থোড়া থোড়া!!...
> কপালে যা লেখা আছে,
> তার ফল তো হবেই হবে!
> (এরা) এ বি পোড়ে বিবি সেজে
> বিলিতী বোল কবেই কবে![৪৫]

মেয়েদের মুখে 'বিলিতি বোল' বলানোর ব্যাপারে শিষ্যের সঙ্গে গুরুর

মত পার্থক্য যে সুস্পষ্ট, তা' নতুন করে বলবার আর অপেক্ষা রাখে না। তবে নাট্যকার যেহেতু সব রকম অভিজ্ঞতাই তাঁর নাটকে তুলে ধরবার জন্য প্রতিশ্রুত, তাই তাঁর নাটকে রক্ষণশীলদের ক্ষীণ কণ্ঠও শোনা যায়। 'লীলাবতী' নাটকে হরবিলাস তাঁর কন্যার শিক্ষার ব্যাপারে বলেছেন, 'নবীন সম্প্রদায়ের অনুরোধে অনেক করিচি—মেয়েকে অনেককাল পর্যন্ত আইবুড়ো রেখেচি, পণ্ডিত রেখে লেখা-পড়া শেখাচ্চি—ঢের হয়েছে, আর পারি নে'—।[৪৬] এত গেল পিতার আক্ষেপ, ওদিকে স্বামী হেমচাঁদের উক্তি আমাদের শুধু ক্লান্ত করে না, হতাশও করে। শারদার পরিচ্ছন্ন রুচি ও তীক্ষ্ণ শালীনতাবোধের ওপর কটাক্ষ করে সে মন্তব্য করেছে, 'পুরুষ জ্যাটা সওয়া যায়, মেয়ে জ্যাটা বড় বালাই।'[৪৭]

ভাবতে অবাক লাগে, সেই সুদূর পঞ্চদশ শতাব্দীতে ফ্লোরেনটাইন বণিকসমাজ ও রাজনীতিবিদ-ব্যক্তিরা যা বুঝেছিলেন, আমরা উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পেরিয়ে এসেও সে-আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে পারলাম না!

এই যে আধুনিক শিক্ষা আমাদের মধ্যে এলো, এই 'শিক্ষা'র ভেতরেই আমরা দেখতে পেলাম আমাদের মুক্তির পথ। সুতরাং এই মুক্তি যে কেবল শহরের ভেতরে আবদ্ধ থাকবে, তা' হয় না। তাকে পৌঁছে দিতে হবে সর্বত্র। তরুণ-বাঙ্‌লার নব্য শিক্ষিতরা নিজেদের অজ্ঞাতেই বহন করলেন এ দায়িত্ব। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে এঁরা গ্রামে গ্রামে শিক্ষার প্রসার নিয়ে মেতে উঠলেন। 'নীলদর্পণে'র নবীনমাধবের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। 'বালকদের পাঠের জন্য স্কুল স্থাপনে'[৪৮] তিনি যে উৎসুক, তাঁর সংলাপেই এ চিন্তা অভিব্যক্ত। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র ছেলের দল স্কুলের ছাত্র। ছাত্র নসিরাম যে বৃদ্ধ রাজীবের ওপর ক্ষুব্ধ, তার অন্যতম কারণ হল, '···স্কুলে একটি পয়সা দিতে হলে আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ'[৪৯] ইত্যাদি কেন সে বলে! প্রাসঙ্গিক ভাবে 'সধবার একাদশী' নাটকের কেনরাম ডেপুটির কথাও মনে পড়তে পারে। নাটকীয় চরিত্র হিসাব কেনারাম কৌতুকজনক চরিত্র, হাস্যরসের উৎস, এবং বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থসর্বস্ব; তবু এই কেনারামের মনেও ছিল এই স্কুল স্থাপনের স্বপ্ন। যদিও আত্মপ্রচারের জন্য নিবেদিত, তবু তার মুখেই আমরা শুনেছি, 'আমি জেলায় স্কুল করবার জন্য কতটাকা চাঁদা দিইচি।'[৫০] এবং এই কেনারাম গণিকা কাঞ্চনের কাছেও অনুরোধ জানাতে ভোলে নি, '···তোমার অনেক বিষয় আছে, তুমি অনেক টাকা করেছ, তোমার পুত্র কন্যা নাই, তোমার উচিত একটি দরিদ্রতারণ

বিদ্যালয় করে যাওয়া, যাতে তোমার নাম করে গরিবের ছেলেরা অনায়াসে পড়তে পারে।[৫১]

নবজাগরণের সঙ্গে এই স্কুলগুলির কী সম্পর্ক হতে পারে, তা বোধহয় পুনরুক্ত না করলেও চলে। হিন্দুকলেজ যে ভূমিকা নিয়ে আমাদের দেশে দেখা দিয়েছিল, গ্রামে গ্রামে এই-যে স্কুলগুলি স্থাপিত হলো, এগুলির পক্ষে সে ভূমিকা নেওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং নেয়ও নি। কিন্তু রেনেসাঁসের মূল যে দায়িত্ব, সে দায়িত্ব পালনে সম্ভবতঃ এই স্কুলগুলি ব্যর্থ হয় নি। দিব্য-চেতনার পরিবর্তে এগুলি যে তরুণ ছাত্রদের কাছে মানবিক-চেতনা প্রসারিত করতে এসেছিল এগিয়ে, তা' ঐতিহাসিক সত্য। আর তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগেরও যে এই উদ্দেশ্যই ছিল, অন্ততঃ এই স্কুলগুলির শিক্ষার বিষয় সে ভাবেই যে নির্ধারিত হয়েছিল, তারও প্রমাণও পাওয়া যায়। অলৌকিক কার্যকারণ পরম্পরায় নয়, ঐহিক বা প্রাকৃতিক কার্যকারণ বিষয়েই ছাত্রদের আকর্ষণ করা হত মনোযোগে। বিদেশী ও অপরিচিত একগাদা শব্দ দিয়ে এদের মগজ ঠেসে দেওয়া হত না, বরং যা শেখানো হত তা' হল, জমি মাপবার বিদ্যা, সরল বাংলা ব্যাকরণ, ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং প্রাথমিক পর্যায়ের ভূগোল বিদ্যা। যে-বছর 'নীলদর্পণ' নাটকটি প্রকাশিত হয়, ঠিক সেইবছরেই এবং প্রায় ঐ সময়ে শিক্ষা-বিভাগ থেকে একটি নির্দেশ জারি করা হয়েছিল এই গ্রামের স্কুলগুলির শিক্ষনীয় বিষয় সম্পর্কে। এবং অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় বলা হয়েছিল, '· exclude all attempts at English instruction; or at imparting to Bengali village boys information which can in their case serve no purpose but to puzzle their heads with strange names, and foreign ideas।'[৫২]

এই চিঠির শেষে শিক্ষনীয় বিষয় সম্পর্কে যে নির্দেশে ছিল, তা হল, '· short Bengali grammer of the simplest kind; and to the very first elements of geography and of Indian History.'[৫৩]—অবশ্য এই সঙ্গে 'মেজারমেন্ট অব ল্যাণ্ড' সম্পর্কেও শেখাবার নির্দেশ ছিল।

নবজাগরণের প্রথম পর্বে 'আধুনিক শিক্ষা' যখন এলো, তখন শিক্ষনীয় বিষয় কী রকম ছিল, সে তথ্য বিবৃত করা বর্তমান প্রসঙ্গে বাহুল্যমাত্র। তবে অভিভাবকদের অভিযোগের উত্তাপ থেকে এটুকু বোঝা গিয়েছিল যে তা' স্বদেশমুখী ছিল না।—কিন্তু কয়েক দশকের ব্যবধানে এ চরিত্রের যে পরিবর্তন ঘটেছে, তা ঐ গ্রাম্যস্কুলগুলির দিকে তাকিয়েই বোঝা যায়। দীনবন্ধুর নাটক আলোচনায় ভূমিকায় এটুকু মনে রাখলেই বোধ হয় যথেষ্ট।

পানাসক্তি ও গণিকাচর্চা

'কলিকাতায় যেখানে যাওয়া যায় সেইখানেই মদ খাইবার ঘটা। কি দুঃখী, কি বড় মানুষ, কি যুবা, কি বৃদ্ধ সকলেই মদ্য পাইলে অন্ন ত্যাগ করে। কথিত আছে, কোন ভদ্রলোক এক গ্রামে কিছু দিবস অবস্থিতি করিয়াছিলেন; তথায় দেখিলেন, প্রায় সকল লোক অহোরাত্র অবিশ্রান্ত গাঁজা খাইতেছে। এই ব্যাপার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এ গ্রামে কত লোক গাঁজা খায়? গাঁজাখোরের মধ্যে একজন উত্তর করিল, আমরা সকলেই গাঁজা খাইয়া থাকি, গ্রামে শালগ্রাম ঠাকুর ও আমাদের টেঁপি পিসি যাহার বয়স ৯৯ বৎসর, কেবল তাঁহারাই খারিজ আছেন। কলিকাতা এক্ষণে প্রায় তদ্রূপ।'[৫৪]

উদ্ধৃত এই লেখাটুকু পড়লে হঠাৎ মনে হতে পারে এ বুঝি কোনো উপন্যাসের অংশ। কেননা, গোটা কলকাতা মদের সমুদ্রে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে, এ জাতীয় কোনো ভাবনা ভাবতে গেলে কষ্ট হয়। কষ্ট হলেও, এক সময় একথা ছিল অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এই সঙ্গে আরো একটি নির্মম সত্য এই প্রসঙ্গে পরিবেষণ করা যায়। একজন নকশাকার সামাজিক-নকশা আঁকতে গিয়ে এই সমসাময়িক কলিকাতার বিবরণে লিখেছেন, 'বেশ্যা-বাজিটি আজকাল এ সহরে বাহাদুরির ও বড় মানুষের এলবাত পোষাকের মধ্যে গণ্য, অনেক বড় মানুষ বহুকাল হলো মরে গেছেন কিন্তু তাঁদের রাঁড়ের বাড়ীগুলি আজও মণিমেণ্টের মত তাঁদের স্মরণার্থ রয়েছে—সেই তেতলা কি দোতলা বাড়িটি ভিন্ন তাঁদের জীবনে আর এমন কিছু কাজ হয় নি যা দেখে সাধারণে তাঁকে স্মরণ করে।'[৫৫]

ভাবতে অবাক লাগে, নবজাগরণের নবলব্ধ জীবনীশক্তির অপরিসীম উৎসাহে চারদিকে যখন কুসংস্কারের দেওয়াল পড়ছে ভেঙে, তখন এ জাতীয় নোঙ্‌রামি প্রশ্রয় পায় কী করে?—শুধু প্রশ্রয় পাওয়া নয়, অনুসন্ধানে দেখা যায়, এরা দিনে দিনে হয়েছে পুষ্ট। যাঁরা নবযুগের আলোকবর্তিকা নিয়ে অন্ধকার দূর করতে বেরিয়েছেন, সেই তাঁদেরই দীপবর্তিকার তলায় এই অন্ধকারটুকু কী করে রয়ে গেল, এটা বিস্ময়ের। তবে বিস্ময়ের হলেও কথাটি সত্য। নির্মম ভাবে সত্য। দীনবন্ধু মিত্রের নাটকে চিত্রিত নিমচাঁদ ও কাঞ্চন কোনো কাল্পনিক চরিত্র নয়, এরা হল সে যুগের প্রতিনিধি। 'সধবার একাদশীর' এই নিমচাঁদ একবার আত্মবিশ্লেষণ করে স্বাগত ভাষণে বলেছিল, 'তুমি স্কুল হতে

বেরুলে একটি দেবতা, এখন হয়েছে একটি ভূত, যতদূর অধঃপাতে যেতে হয় তা গিয়েছ।'[৫৬] নিমচাঁদের এই 'অধিঃপাত' যে পানাসক্তি ও গণিকা চর্চার পিচ্ছিল পথে নেমে যাওয়া, তা নাট্যকার খুব স্পষ্টভাবেই দেখিয়েছেন।

তবে নাট্যকার দীনবন্ধু যে-টুকু গোপন রেখেছিলেন, এঁরা সমালোচকরা তা' করলেন না। নিমচাঁদের মধ্যে এঁরা রেনেসাঁসের অনেক নামকরা নায়ককেই পেলেন দেখতে। কেউ কেউ এই চরিত্রটির মুকুরে মাইকেল মধুসূদনকে দেখেছিলেন প্রতিবিম্বিত, পরে প্রশ্ন দেখা দিল মাইকেল কেন, রামগোপাল-হরিশ্চন্দ্রও কী নিমচাঁদের থেকে খুব একটা দূরে ছিলেন?—সমালোচক-সমাজ নাট্যকারের কাছে প্রশ্ন তুলে ধরলেন, 'নিমচাঁদের প্রয়োজন ছিল কোনো এক নরকাগ্নি। এ স্বর্গভ্রষ্ট সমাজে তাহার অভাব কোথায়! যে নরকাগ্নি হরিশ্চন্দ্রকে অকালে অতলে লইয়া গেল, যে অগ্নিতে রামগোপাল একদিন দগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিতে অটলের টেবিলে, গোকুলের উপবনে, চাঞ্চলের ভবনে, নিমচাঁদকে পাঠান কেন?'[৫৭]

এই অমোঘ উক্তির পর আর আমাদের কোনো সন্দেহ থাকে না যে নবজাগরণের সরষের ভেতরই কোনো এক সময় এই ভূত গিয়ে ঢুকে বসেছিল। সুতরাং যা অঘটন ঘটবার, তা ঘটল।

'রেনেসাঁসের' প্রথম পর্বে মানবিক অধিকার-কে প্রসারিত করবার স্বপ্ন দেখছিলেন যখন আমাদের নব্য সম্প্রদায়ের তরুণ নায়করা, সেদিন চলার পথে প্রথম ও প্রধান বাধা হিসাবে যা গণ্য করা হয়েছিল, তা' হল আমাদের 'কুসংস্কার'। নানারূপে ও নানা মূর্তিধরে এই কুসংস্কারগুলি আমাদের সামনে উপস্থিত ছিল। নব্যবাঙ্‌লার তরুণ নায়করা এই সংস্কারগুলিকে চূর্ণ করবার জন্য হলেন কৃতসংকল্প। এ ব্যাপারে এঁরা হলেন নির্মম ও বেপরোয়া। যাচাই করবার মতন তাঁদের তখন না ছিল ধৈর্য, না মন। তাই আঘাত হানতে গিয়ে অনেক ভালো জিনিষও এঁরা ভাঙ্‌লেন।—বিধি-নিষেধের বেড়া তোলবার সময় মদ খাওয়ার সামাজিক বিধি-নিষেধটাও এঁরা উপড়ে তুলে ফেললেন।

একবারে প্রথম পর্যায়ে হিন্দুসংস্কারকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবার জন্য এঁরা বেছে নিয়েছিলেন মুসলমানদের দোকানের বিস্কুট, কিন্তু তাতে মন ভরল না। মনে হল, এটুকুই যথেষ্ট নয়। তাই পরে আরেক ধাপ এগিয়ে গিয়ে এঁরা তুলে নিলেন মদের গেলাস। রাজনারায়ণ বসু এই বিদ্রোহের কথায় লিখলেন, 'তখনকার সময়গুণে ডিরোজিওর যুবক শিষ্যদিগের এমনি সংস্কার হইয়াছিল

যে, মদ খাওয়া বা খানা খাওয়া সংযত ও জ্ঞানালোক সম্পন্ন মনের কার্য। তাঁহারা মনে করিতেন, এক এক গ্লাস মদ খাওয়া কুসংস্কারের উপর এক এক ধাপ জয়লাভ করা।'[৫৮]

কুসংস্কারের ওপর জয়লাভ করবার ইচ্ছা কী রকম দুর্বার ছিল, তা আরেকজন 'তরুণ-বাঙলা'র স্বীকৃতি থেকে আরো বিশদভাবে জানা যায়। এঁর স্বীকারোক্তি এই রকম: 'আমাদের দেশে বহুকাল হইতে সুরাপান বিশেষ দোষকর ও পাপ-জনক বলিয়া কীর্ত্তিত হইযাছে; এবং মদ্যস্পর্শ করিলে শরীর অপবিত্র হয়, এইরূপ বিশ্বাস এদেশস্থ লোকের মনে জন্মিয়াছে। কিন্তু আমাদের মনে এই স্থির হইল যে, যখন এমন বুদ্ধিমান বিদ্বান ও সভ্য জাতীয়েরা ইহা আদর পূর্ব্বক ব্যবহার করিতেছেন, তখন ইহা অহিতজনক কখনই নহে। অতএব ইহা পান না করিলে, সভ্যতাই বা কিরূপে হইবে আর পূর্ব কুসংস্কারই বা কিরূপে যাইবে? হিন্দুকলেজের শিক্ষিত ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা এ দেশের সমাজ-সংস্কার করিতে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সুরাপান করিতেন।'[৫৯] সুতরাং এই তরুণ বাঙালীটিও 'মদিরাপান' আরম্ভ করে দিলেন।

অন্যে পরে কা কথা, রামমোহন রায়ও সামিল হলেন এই সংস্কারকদলের। শিবনাথ শাস্ত্রী এ ব্যাপারে লিখেছেন, 'সে সময়ে সুরাপান করা কুসংস্কার-ভঞ্জনের একটা প্রধান উপায়স্বরূপ ছিল। যিনি শাস্ত্র ও লোকাচারের বাধা অতিক্রম পূর্ব্বক প্রকাশ্যভাবে সুরাপান করিতে পারিতেন, তিনি সংস্কারক-দলের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইতেন। স্বয়ং রাজা রামমোহন রায় পরোক্ষভাবে সুরাপান শিক্ষা বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিলেন।'[৬০]

এইভাবে হিসাব-নিকাশ করলে দেখা যায়, রামমোহন থেকে মধুসূদন এবং ওদিকে নিমচাঁদ থেকে অটলবিহারী বা অটলের ইয়ার ভোলা থেকে রামমাণিক্য, সকলেই 'নব্যসংস্কৃতি'র নাম করে হাতে তুলে নিলেন পানপাত্র। সুতরাং 'নরকাগ্নি' যে জ্বলে উঠবে, তাতে আর আশ্চর্য কী?—এঁদের ভেতর যাঁরা এই মদের বিষময় পরিণাম সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, তাঁরাই পরিমিত মদ্যপানে বৃত থাকলেন। আর যাঁরা তা করতে পারলেন না, তাঁদের শেষবেশ যে কী পরিণাম হল, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল, নিমচাঁদ। এদিকে কবি ঈশ্বরগুপ্ত পর্যন্ত এই পানাসক্তির গৌরব করে কবিতা লিখলেন:

ছাড়িয়ে ঘরের কড়ি ঢেলে দাও গলে।
দেখো দেখো লোকে যেন মাতাল না বলে ॥
তবে তুমি পাত্র লও পাত্র যদি হও।
ছুঁয়ো না বিষের পাত্র পাত্র যদি নও ॥[৬১]

সাধারণ লোকে ঈশ্বরগুপ্তের এই প্রথম চরণের দ্বারাই ছিল অনুপ্রাণিত, পরের চরণগুলির কথা আর ভেবে দেখে নি। তা ছাড়া প্রথম চরণের কৃত্য পালন করতে গেলে, পরের চরণের দিকে এগিয়ে আসা বোধহয় আর সম্ভব হয় না।—মোটকথা, সভ্যতার নাম করে এই চরম অসভ্যতা একটি অসাধারণ শক্তিমান নবজাগ্রত জাতিকে অচিরেই ফেলল পঙ্গু করে।

এই পানাসক্তির সঙ্গে দেখা গেল আরেকটি দোষ। আমাদের ভেতর যে দ্বিতীয় ব্যাধিটি সংক্রামিত হয়ে গেল, সেটি হল, গণিকাচর্চা। নবজাগরণের ইতিহাসে এই গণিকারা, কেন জানি না, আর সকলের সঙ্গে বেশ খানিকটা জায়গা দখল করে নিয়েছে। ইটালীর রেনেসাঁসের লেখক বুকহার্ট সাহেব পর্যন্ত আরো অনেক তথ্যের মধ্যে এদের খাতিয়ান ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে ভোলেন নি।—১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে নভেম্বর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় এই সমস্যা নিয়ে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। মধ্য উনিশ শতকে গণিকাচর্চা কোথায় গিয়ে পৌঁচেছে, তার খবর অন্ততঃ এই চিঠি থেকে পাওয়া যায়। পত্রলেখক আতঙ্কিত হয়ে জানাচ্ছেন, '··কেবল যে বেশ্যাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবায় এত উৎপাত হইতেছে তাহা নহে, বঙ্গদেশীয় ধনবানগণ স্বীয় স্বীয় বসত-বাটিতেও অধিক ভট্টলোভী হইয়া ভদ্রপল্লীমধ্যে বেশ্যাগণকে স্থানদান করিয়া অতুল সুখ প্রাপ্ত হইতেছেন, যদ্দারা একঘর বেশ্যাবৃদ্ধি হইবায় সেই ভদ্রপল্লী একেবারে অভদ্র নিয়মে পরিপূর্ণ হইতেছে, অতি নির্মল নিষ্কলঙ্ক ধনবান মান্যবংশের প্রাসাদের নিকটেই বেশ্যানিকেতনে কেবলই ভয়ানক ব্যবহার প্রদর্শিত হইতেছে।'

বুকহার্ট সাহেব ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের পরিসংখ্যান ধরে দেখিয়েছেন যে কেবল রোম শহরেই এই গণিকাকুলের সংখ্যা ছিল ৬,৮০০ এবং এদের মধ্যে একজনেরও উল্লেখ করবার মত তেমন কোনো গুণ ছিল না। বুকহার্ট সাহেবের ভাষায়, 'Scarcely a single woman seems to have been remarkable for any higher gifts'[৬২]—'মৃচ্ছকটিক' নাটকে গণিকা বসন্তসেনার যে সাংস্কৃতিক পরিচিতি ছিল, তা ঈর্ষ্যযোগ্য। মৌর্যযুগে এবং পরবর্তীকালে গুপ্তযুগে রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে যে-সব তথ্য পাওয়া যায়, তা'

থেকে 'বসন্তসেনা'র উত্তরাধিকারীদের চিনে নিতে কষ্ট হয় না। এঁরা ছিলেন পরিশীলিত ও মার্জিত রুচির অধিকারিণী। তদানীন্তন এক জাতীয় সংস্কৃতিকে এঁরা নিয়ে চলেছিলেন বহন করে। কিন্তু 'রেনেসাঁসে'র থেকে আমরা এ জাতীয় কোনো সংস্কৃতির পরিচয় পাই না, অন্ততঃ যাকে সুস্থ বলে গ্রহণ করা যায়।

এই গণিকাকুলের বিস্তৃত পরিচিতির সূত্রে বুকহার্ট জানিয়েছেন, এই মহিলাদের চলাফেরা, জীবন-যাত্রা, নীতিবোধ, ইত্যাদি কিছুই উল্লেখ্য ছিল না। এঁর ভাষায়, 'The mode of life, the morals and the philosophy of the public women, who with all their sensuality and greed were not always incapable of deeper passions'...।[৬৩] আমাদের উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এই মহিলাদের যে চিত্র পাই, তা কেবল কুৎসিত নয়, ঘৃণ্য। 'সধবার একদশী' নাটকে সৌদামিনী তার ভ্রাতৃবধূ কুমুদিনীকে বলেছিল, 'দাদার ভাই কেমন পিরবিত্তি—তোর এই ভরা যৌবন, এমন সোমত্তো মাগ রেখে সেই সুঁটকো মাগীকে নিয়ে থাকে,—দেখেচিস্ তার হাত পা গুলো যেন বাকারি।'[৬৪]—বলা বাহুল্য, সৌদামিনী কেবল বাইরের খবরই জানত, তাই বাইরের রূপের কথাই চলেছে।—কিন্তু নিমচাঁদ? এই নিমচাঁদ এদের অন্তরের যথার্থ পরিচিতি যে জানত, তা' কাঞ্চনের প্রতি সম্ভাষণে পরিস্ফুট। নিমচাঁদের চোখে এই কাঞ্চনরা হল,

> ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ বৈরিনি!
> নব্যবঙ্গ বৃন্দ ধ্বংস ডায়িনি!
> সাধ্বি পুঞ্জ চিত্ত দুঃখ দায়িনি!
> নাস্তি ধর্ম নাস্তি কর্ম পাপিনি! [৬৫]

নিমচাঁদের কাঞ্চণ-সম্ভাষণে আরো অনেক কঠিন শব্দ আছে, যা অত্যন্ত নির্মমভাবে ঐ গণিকাকুলের ওপর বর্ষিত হয়েছে।—তবু নিমচাঁদ এই মোহকে কিছুতেই অতিক্রম করতে পারে নি, এবং নব্যবঙ্গের ধ্বংসের মূলে এরা আছে জেনেও।

এই ভয়ঙ্কর সর্বনাশের সূচনা কী ভাবে হয়েছিল, তা অবশ্য নিশ্চিত করে বলা শক্ত। তবে নবজাগরণের একটি শর্ত ছিল, 'সম্ভোগ'। সম্ভবতঃ সেই রন্ধ্রপথেই এই শনি হয়েছিল প্রবিষ্ট।—রামমোহন রায় তাঁর বাড়িতে যে 'নিকি বাঈজী'র নাচ দিয়েছিলেন, ইংরাজ-ললনা ফ্যানী পার্কস ছিলেন তার সাক্ষী। সেকালে এই নিকি-কে 'ক্যাটালানি অব দি ইস্ট'[৬৬] বলা হত।—জীবন

সংখ্যা এক নয়, একাধিক। কোপারনিকাস-গ্যালিলিও-ব্রুনো-ইরাসমাস প্রমুখ অনেক নামই এ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

হেলেনিক আদর্শের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় আদর্শের ব্যবধান যতখানি দুস্তর ছিল, ততখানি ব্যবধান কিন্তু নব্যচিন্তার সঙ্গে আমাদের ছিল না। আমাদের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে একদা যে মানবিক আদর্শ ছিল, তা' হারিয়ে গিয়েছিল কুসংস্কারের আবর্জনায়। এবং ইসলামী আদর্শ তাকে রেখেছিল অনেকখানি আড়াল করে। তবু মাঝে মাঝে চৈতন্য-নানক-কবির-দাদূ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে তা' হঠাৎ হঠাৎ এসেছিল বেরিয়ে। এবং মাঝে মাঝেই শোনা গেছে, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই', বা 'এই মানুষে আছে সেই মানুষ' ইত্যাদি—তাই 'সমন্বয়ের' কথা যদি তুলতেই হয়, তা' আমাদের পক্ষে বরং সহজ ছিল, যা খ্রীষ্টীয় ইউরোপের পক্ষে ছিল না।

একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, 'রেনেসাঁসে'র মানবিক শক্তি প্রথমেই যার উপর আঘাত হানে, তা হল, 'ধর্ম'। মধ্যযুগে সব মানুষের কাছে এই 'ধর্ম' একটি সাংঘাতিক অবলম্বন। তা' ইসলাম-খ্রীষ্টানী-হিন্দু-বৌদ্ধ যাই হোক না কেন।—আমাদের দেশে ডিরোজিয়ানদের কাছে 'হিন্দুধর্ম' তাই সর্বাধিক আলোচিত, পরিশেষে সর্বাধিক নিন্দিত। সেকালে এক আলোচকের স্বীকারোক্তি থেকে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়, 'The Hindu religion was denounced as vile and corrupt and unworthy of the regard of rational beings.'[৬৯] যুক্তিবাদী মানুষ যে হিন্দুধর্মের প্রতি কখনো শ্রদ্ধাশীল হতে পারেন না, তা দেখিয়ে দিলেন সে যুগের কলেজের এক তরুণ ছাত্র, মাধবচন্দ্র মল্লিক। ইনি 'Athenium' পত্রিকায় একটি অত্যন্ত উষ্ণ প্রবন্ধ লিখে জানালেন, 'If there is any thing that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism'[৭০] অর্থাৎ 'যদি হৃদয়ের অন্তস্তম তল হইতে কিছুকে যদি ঘৃণা করি, তবে ইহা হিন্দুধর্ম।'

বলা বাহুল্য, 'হিন্দুধর্ম' সম্পর্কে এ জাতীয় ঘৃণার উক্তি, চেষ্টা করলে, অনেকগুলিই সঞ্চয় করা যায়। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে, এ জাতীয় উক্তি যাঁরা করেছেন, তাঁরা কেউই কিন্তু হিন্দুধর্মের গভীরে যাবার শ্রম স্বীকারে উৎসাহ অনুভব করেন নি। ফলে, এঁরা অকারণে ঘুরে মরেছেন, ভুগেছেন গভীর সংশয়ে, কেউ হয়েছেন ঘোর নাস্তিক, আবার কেউ-বা নব্য ইউরোপকে কামনার মোক্ষধাম ভেবে নিজেকে সমর্পণ করেছেন খ্রীষ্টধর্মের

পদতলে। অবশ্য মুক্ত-মানবিক আদর্শে সমর্পিত-প্রাণ কিছু মানুষ ছিলেন কিছুদিনের জন্য। সে মানুষ হলেন, বিদ্যাসাগর-রামমোহন। এবং মাইকেল ও দীনবন্ধুর নামও বোধহয় যোগ করা অসঙ্গত নয়।

এদিকে ইতিহাসের দিক থেকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় রামমোহনই প্রথম মানুষ যিনি তখনকার মানুষকে সংস্কার মুক্ত পথ দেখাতে সমর্থ ছিলেন এবং দেখিয়েছেনও। আদর্শহীন মানুষকে রামমোহন যে খুব একটা শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন না, এ তথ্য সুবিদিত। আর ধর্মহীন শিক্ষাকে তিনি ভয় পেতেন সব থেকে বেশি ; তিনি মনে করতেন ঐ শিক্ষা মানুষকে কখনও প্রকৃত 'মানুষ' করে তুলতে পারে না। যা করে তোলে, তা হল পশু। এ প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী কথিত একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে, ঘটনাটি এইরকম: 'হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কিছুদিন পরে একজন আসিয়া তাঁহাকে বলিল, 'দেওয়ানজী, অমুক আগে ছিল polytheist, তারপর হইয়াছিল diest' এখন হইয়াছে atheist. রামমোহন রায় হাসিয়া বলিলেন, শেষে বোধহয় beast.'[৭১]—দিশাহীন পথের পথিকদের জন্য, এবং ধর্মহীন শিক্ষায় মানুষ যাতে পশুতে পরিণত না হয়, তার তাগিদে শেষপর্যন্ত কিন্তু এই রামমোহনকেই বেরিয়ে আসতে হল পথ দেখাতে।

এই পথেই ব্রাহ্মধর্মের আবির্ভাব। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, 'গৌড়ীয় সমাজ'। এর পাঁচ বছর পরে ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট স্থাপিত হল 'ব্রহ্মসভা'। 'কমল বসু'র ভাড়াটিয়া বাড়ী হল এই সভাস্থান। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে যে 'আত্মীয় সভা' স্থাপিত হয়েছিল, এবং সে সভায় যে বেদান্তধর্মের ব্যাখ্যা ও বিচার হত, এ তথ্য পূর্বেই নিবেদিত হয়েছে। এখন তার চূড়ান্ত পরিণতি দেখা গেল 'ব্রহ্মসভা' স্থাপনের মধ্য দিয়ে। আধুনিক শিক্ষা ও মানবিক আদর্শের সমন্বিত রূপ এখানে হল অভিব্যক্ত। এই অভিব্যক্তিকে পাকাপাকি করবার জন্য ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী ব্রহ্মসভা-কে নিয়ে যাওয়া হল জোড়াসাঁকোর চিৎপুরের রাস্তার ধারে নবনির্মিত ভবনে। এই বছরই রামমোহন নভেম্বরের ১৯ তারিখে সাগর পাড়ি দিলেন।

নবজাগরণ যে-মানবিক ধর্মের প্রবক্তা, তার চরিত্র মোটামুটি 'সেকুলার'। তথাকথিত কোনো ধর্মের পথ ধরে যে সে চলবে না, এ সিদ্ধান্তে সে অটল। খবর নিলে দেখা যায়, রামমোহনের নতুন ধর্ম, ধর্মের লক্ষণে কিন্তু পুরোপুরি 'সেকুলার'। সব সম্প্রদায়ের লোকের জন্যই তাঁর দরজা

ছিল খোলা। তিনি চেয়েছিলেন যে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বমানবের আধ্যাত্মিক সাধনার মিলনক্ষেত্র হয়ে গড়ে উঠুক এই সভা। বলাবাহুল্য, রামমোহনের এই নতুন পথের সংকেত, ধর্মীয় সংস্কারের সঙ্কীর্ণ বাঁধনে যাঁরা আবদ্ধ, তাঁরা কেউই বুঝে উঠতে পারেন নি। এবং এ প্রসঙ্গে একটি মজার ঘটনার কথা উল্লেখ করা যায়। রামমোহন যে সত্যি সত্যিই রেনেসাঁসের সন্তান এবং মনে প্রাণে যে সম্পূর্ণ 'সেকুলার' এই ঘটনাটি তা প্রমাণ করে দেবে।

ঘটনাটি এই রকম: ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মাদ্রাজ প্রেসিডেনসির গন্‌জাম জেলা থেকে সূর্যনারায়ণ নামে এক অন্ধ্র নেতা এলেন রামমোহনের কাছে দর্শনার্থী হিসাবে। অনেক ক্লেশ করেই আসতে হয়েছিল এঁকে। এসেছিলেন সরজমিনে রামমোহনের 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য ধর্ম' বুঝতে। না, অনেক চেষ্টা করেও রামমোহনের ধর্মের অর্থ বোঝা এঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। দেশে ফিরে গিয়ে ওখানকার গভর্ণরকে উনি জানালেন, রামমোহনের ধর্ম কোনো ধর্মই নয়—'is no religion and his laws are no laws, but a conglomeration of all stitched into singular one. ··· He is neither a Christian, a Mahammadan, or a Hindu, but a free-thinking man, abandoned by all religions',[৭২]

আশা করি, মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। আমাদের 'রেনেসাঁস' যে ভারতীয় চরিত্র হারায়নি তার সূত্রও রয়েছে এইখানে। ঠিক এই কথারই সমর্থন পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথে, তবে তার ভাষা একটু অন্যরকম। এখানে রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ করে দেখালেন, '···তিনি হিন্দুধর্মের উপর আঘাত করিলেন। কিন্তু তিনিই হিন্দুধর্মের জীবন রক্ষা করিলেন।··· তিনি যে বাঁধ নির্মাণ করিয়া দিলেন খৃষ্টীয় বিপ্লব সেখানে আসিয়া প্রতিহত হইয়া গেল। সে সময়ে তাঁহার মতো মহৎলোক না জন্মাইলে এতদিন বঙ্গদেশে হিন্দুসমাজে এক অতি শোচনীয় মহাপ্লাবন উপস্থিত হইত।'[৭৩]

কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এই, রামমোহনের এই ভারতীয় চরিত্র এবং তাঁর 'সেকুলার' মনোভাব বোঝবার মত লোক সেদিন খুব কমই ছিল; তাই অভিনন্দনের বদলে তাঁর কপালে জুটল অজস্র নিন্দা। এবং তাঁর নামে ছড়াদার দিয়ে ছড়া বাঁধানো হল:

সুরাই মেলের কুল,
বেটার বাড়ী খানাকুল,

বেটা সর্ব্বনাশের মূল,
ওঁ তৎসৎ বলে বেটা বানিয়েছে স্কুল;
ও সে জেতের দফা, করলে রফা
মজালে তিন কুল।—[৭৪]

তিনকুল মজিয়ে রামমোহন যেদিন বিলেত চলে গেলেন, সমাজের ভার সেদিন থেকে ন্যস্ত হল রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ নামে একজন পণ্ডিতের ওপর। তাঁর ভেতর আগুন ছিল না, তাই দীর্ঘদিন সমাজ রইল ম্রিয়মান হয়ে। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় দেবেন্দ্রনাথ প্রথম সমাজগৃহ দেখতে এলেন।—তাঁর মাথায় নতুন ভাবনা এলো। এ বছরেই এপ্রিল মাসে 'তত্ত্ববোধিনী' সভার মাধ্যমে সমাজের ভার নিলেন তিনি। আর এই বছরেই ৭ই পৌষ কুড়িজন যুবকের সঙ্গে তিনিও দীক্ষা নিলেন নতুন ধর্মে। এবং বলতে দ্বিধা নেই, এঁদের উদ্যোগে এই সমাজ যে-রূপ নিল, তা' চরিত্রের দিক থেকে রামমোহনের থেকে একবারে গেল আলাদা হয়ে। একজন ঐতিহাসিকের ভাষায় এই পরিবর্ত্তনকে এইভাবে প্রকাশ করা যায়: 'This Universal and completely non-sectarian character of the Brahmo Samaj as conceived and founded by Rammohan Ray makes it something radically different from the organization into which it was transformed in the days of Debendranath Tagore, Keshab Chandra Sen and Sivanath Sastri'[৭৫]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে 'ব্রাহ্মসমাজ' আত্মপ্রকাশ করল বিশিষ্ট একটি ধর্ম হিসাবে। শুধু তাই নয়, তাঁর আমলে কয়েকটি আশ্চর্য পরিবর্তনও ঘটল। দেবেন্দ্রনাথ বেদের অভ্রান্ততায় ছিলেন বিশ্বাসী, এবং সমাজেরও ধারণা ছিল বেদসমূহে যা প্রচারিত হয়েছে, তা' হল বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ। পরে সংশয় দেখা দেওয়ায় চারজন পণ্ডিত-ব্রাহ্মণকে কাশী পাঠানো হল বেদ অধ্যয়ন করে প্রকৃত সত্য যাচাই করে আনতে। সত্য যাচাই হল, দেখা গেল ঈশ্বর চিন্তায় 'একমেবাদ্বিতীয়মের' অস্তিত্ব একমাত্র উপনিষদেই রয়েছে। বেদে রয়েছে বহু দেবতার অস্তিত্ব ও অর্চনা।—বলাবাহুল্য, এর ফলে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বাধীন ব্রাহ্মসমাজে বেদের অভ্রান্তবাদ হলো পরিত্যক্ত। যুক্তিবাদ বড়ো না ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ বড়ো—ঐ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ জিজ্ঞাসা হল বিস্ফোরিত এবং তার আন্দোলনও অনুভূত হল তীব্রভাবে; বিপিনচন্দ্র পালের ভাষায়, 'This was really the first serious movement of rationalism and individualism in the country.'[৭৬]—

এই দ্বিধার মধ্যে থাকবার ফলে ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ হয়ে পড়ল দুর্বল। স্তিমিত। পরে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের নতুন ভূমিকায় আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে নবাদর্শে এটি আবার হয়ে উঠল সঞ্জীবিত। এবং ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম চলল একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। তবে এরপরে রামকৃষ্ণের আবির্ভাব, এবং 'নব্যহিন্দুধর্মের' জয়যাত্রা। সুতরাং পটভূমি বদলে গেল।

ধর্মীয় অন্দোলনের সমসাময়িক ইতিহাস আলোচিত হল। এখন একটা প্রশ্ন দেখা দেবে, এই ব্যাপারে আমাদের অলোচ্য নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের ভূমিকাটি কোথায়?—না, ধর্মীয় আন্দোলনের ব্যাপারে তাঁর যে কোনো সক্রিয় ভূমিকা ছিল না, একথা সুবিদিত। তবে চোখের সামনে দিয়ে তিনি যখন ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুদয় ও বিকাশ দেখেছেন তখন সাহিত্যের মধ্যে তাঁর অভিজ্ঞতার ছাপ পড়া স্বাভাবিক। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যখন ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন, তখন তিনি কিশোর বালক। সম্ভবতঃ কলকাতায় এসে পৌছন নি। আঠারোশ পঞ্চাশে যখন ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ এবং যুক্তিবাদের দ্বন্দ্ব চলছে, তখন তিনি সম্ভবতঃ হিন্দু কলেজের ছাত্র। আর কেশব সেনের সাহচর্যে ব্রাহ্মধর্মে যখন নতুন করে প্রাণাবেগ সঞ্চারিত হলো, তখন দীনবন্ধু কলম ধরে ফেলেছেন এবং তিন বছর পর থেকে নাটক লিখে চলেছেন একটির পর একটি।—তাই খুব উদাসীন না হলে ব্রাহ্মধর্মের এই দুর্বার প্রভাব দীনবন্ধুর পক্ষে এড়ানো ছিল কঠিন।

বলাবাহুল্য, দীনবন্ধু এড়াতে পারেন নি। আর তিনি যে উদাসীন ছিলেন না, তারো বহু প্রমাণ আছে। ব্রাহ্মসমাজেরই একজন বিখ্যাত নেতা এই দীনবন্ধু সম্পর্কে লিখেছেন, 'ইংরাজি শিক্ষার প্রথমফল সমাজ ও ধর্মসংস্কার। প্রাচীন ও প্রচলিত ধর্ম-বিশ্বাসে, সামাজিক আচারানুষ্ঠানাদিতে ইংরাজিনবিশ বাঙ্গালীর নূতন আদর্শে ও ধর্মবুদ্ধিতে আঘাত লাগে। ইহারা স্বদেশের আচারানুষ্ঠানাদির প্রতি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া, এ গুলির সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হলেন। বাংলার নবযুগের প্রথম পবের নাট্যকলাতে এই সমাজ সংস্কারের আদর্শটাই বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠে। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' 'জামাই বারিক' প্রভৃতি প্রহসনে, 'কুলীন কুলসর্বস্ব' 'বিধবাবিবাহ নাটক' 'সধবার একাদশী' প্রভৃতি নাটকে এই ধর্ম ও সমাজ সংস্কারেব ভাবটাই খুব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজ যে সকল ভাব ও আদর্শ জাগাইয়াছিলেন, ষাট বৎসর পূর্বকার বাংলা নাট্যকলা তাহাই স্বল্পবিস্তর প্রচার ও

প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিল। বাংলার নূতন রঙ্গালয়ের সাহচর্যে এই সকল ভাব ও আদর্শ দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।…'নবীন তপস্বিনী'কে বাংলায় ব্রাহ্ম যুগের নাটক বলিতে পারা যায়। ফলতঃ দীনবন্ধুর সকল নাটকের মধ্যেই স্বল্পবিস্তর পরিমাণে তদানীন্তন কালের ব্রাহ্মসমাজের ভাব ও আদর্শ ফুটিয়া আছে। ইহা কিছু আশ্চর্যের কথাও নহে। কারণ পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বে দেশের নব্যশিক্ষিত সমাজের সকলেই অন্তরে অন্তরে ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন।'[৭৭]

এই বিস্তৃত বিশ্লেষণটি যিনি করেছেন, ইনি হলেন বিপিনচন্দ্র পাল।—বিপিনচন্দ্র এখানে যে বিষয়টির ওপর সবিশেষ জোর দিয়েছেন তা হল 'সমাজ সংস্কারের আদর্শ'। পরে অবশ্য 'ধর্ম ও সমাজ সংস্কার' দুটি বিষয়কেই একই সঙ্গে ইনি যুক্ত করেছেন। তবে এ ব্যাপারে ব্রাহ্মধর্মের ভূমিকা ঠিক কতখানি ছিল এবং দীনবন্ধু ঠিক সেই ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে চেয়েছিলেন কী না সে সব তর্কের ভেতর তিনি ঢুকতে চান নি। আর সকলের মত দীনবন্ধু যদি 'অন্তরে অন্তরে ব্রাহ্মভাবাপন্ন' থেকে থাকেন, তবে সচেতন ভাবে হোক বা অচেতন ভাবে হোক ইনি ব্রাহ্মধর্মের হয়ে যে কাজ করেছেন, এটুকুই হল বিপিনচন্দ্রের অনুমান ও প্রতিপাদ্য বিষয়। যাইহোক, বিপিনচন্দ্র অনুমানের ওপর ছেড়ে দিলেও, এ অনুমান যে একবারে ভ্রান্ত নয়, তার প্রমাণ হিসাবে দীনবন্ধুর নাটক থেকে কিছু কিছু 'ব্রাহ্ম-চিন্তা উদ্ধার করা কঠিন নয়। সমসাময়িক ধর্মের প্রতি উদাসীন[৭৮] থাকা তাঁর কাছে যে শক্ত ছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে, এবার নাটকের সংলাপগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করলে দেখা যাবে এই ব্রাহ্মসমাজ ও তার প্রভাব সম্পর্কে তাঁর একটি সুনির্দিষ্ট বক্তব্যও ছিল।

যদিও বিপিনচন্দ্র 'নবীন তপস্বিনীর' উল্লেখ করে লিখেছেন, 'নবীন তপস্বিনী'কে বাংলায় ব্রাহ্ম যুগের নাটক বলিতে পারা যায়', কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ 'ব্রাহ্ম-চিন্তা' এই নাটকে পাই না। প্রত্যক্ষভাবে যেখানে ব্রাহ্ম-আদর্শ আলোচিত হয়েছে, তা হল 'সধবার একাদশী' এবং 'লীলাবতী' নাটক। প্রথম নাটকটির এক জায়গায় 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'-এর প্রসঙ্গে ও পৌত্তলিকতার বিষয়ে তথাকথিত ব্রাহ্মদের ওপর সামান্য একটু কটাক্ষ আছে। এই নাটকের অন্যতম চরিত্র হল, কেনারাম ডেপুটি। এই কেনারাম আবার আধুনিকতার প্রতীক হিসাবে নিজেকে গণ্য করেন, সুতরাং ইনি ব্রাহ্ম না-হয়ে যাবেন কোথায়? এই কেনারামকে এই নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে নিমচাঁদ একটি প্রশ্ন করেছিল, সে প্রশ্নটি হল, 'তুমি ব্রাহ্ম হয়েছ, হিন্দু শাস্ত্রে তেত্রিশ কোটি দেবতা আছে, এর তুমি সব ত্যাগ করেছ, কি দুটি একটি রেখেছ?'—বলাবাহুল্য, কেনারাম এর উত্তর দিতে পারেন নি। প্রথমে বলেছিলেন, 'The question is very pointed', পরে আবার বলেছেন, (বোধ হয় 'বউবাজারের ফিরিঙ্গি কালী'র কথা ভেবে) 'আমি কেতাব না দেখে উত্তর দিতে পারি না' ইত্যাদি। এই নির্বুদ্ধিতা দেখে এরপর স্বভাব সুলভ ব্যঙ্গোক্তি ছুড়ে দিয়ে নিমচাঁদ বলে উঠেছে, 'দূর ব্যাটা ঘটিরাম—তুমি ব্রাহ্মধর্ম যত বুঝেছ, তা এক আঁচড়ে জানা গিয়েছে—যখন ব্রাহ্মধর্মের মূল হচ্ছে 'একমেবাদ্বিতীয়ং', তখন তেত্রিশ কোটি দেবতার সব ত্যাগ করেচিস কি না বলতে কতক্ষণ লাগে।'[৭৯] এ ছাড়া একেবারে নাটকের উপসংহারে অর্থাৎ তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে শ্রাদ্ধের প্রসঙ্গে নিমচাঁদের 'ব্রাহ্ম শ্রাদ্ধের' ওপর সামান্য একটু কটাক্ষ আছে। এখানে নিমচাঁদের বক্তব্য হল, শ্রাদ্ধ যদি করতেই হয়, তবে 'ব্রাহ্ম মতে করতে হবে; অনেক বৃষ পার করিছি, এখন আর বৃষ উৎসর্গ ভাল লাগবে না।'

নিমচাঁদের সংলাপের ভেতর যে সামান্য একটু কটাক্ষ রয়েছে, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু এ কটাক্ষ কার ওপর? একটু অভিনিবেশ করলেই বোঝা যায় যে নিমচাঁদ সোজাসুজি ব্রাহ্মধর্ম-কে আক্রমণ করতে চায় নি। তার আক্রমণের লক্ষ্য হল ডেপুটি কেনারামের মূর্খতা এবং দ্বিতীয়টিতে রামবাবুর প্রচার—এ সব ব্যাপারে যা হয়, তাই হয়েছে। নিমচাঁদের স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা ও বাগ্-বৈদগ্ধ্য সামান্য একটু বাধা পেয়ে অনেক কথার উচ্ছলতায় হয়ে উঠেছে উচ্ছ্বসিত।

এই নাটকেই ব্রাহ্মধর্ম সম্পর্কে প্রশংসাসূচক মন্তব্য অবশ্য রয়েছে। অটলচন্দ্রের বাবা জীবনচন্দ্র একবার নাটকের সূচনাতেই ব্রাহ্ম গোকুলকে অভিনন্দিত করে বলেছেন, '· আমি তোমার নিন্দা করতেম,—তুমি জাত মান না, ব্রহ্মসভায় যাও, আপনি দীক্ষা হলে না, ব্যানকেও দীক্ষা হতে দিলে না—কিন্তু এখন আমি দেখচি তোমরা মাতার মণি, তোমাদের মধ্যে মদও চলে না, বেশ্যাও চলে না, আর তোমরা একত্র হযে পরোপকার, স্কুল, ডিসপেন্সারি করবার সুযোগ কর।'[৮০]

এই উদ্ধৃত সংলাপের ভেতর একটি জিনিষ সবিশেষ লক্ষণীয়। এই লক্ষণীয় বিষয়টি হল, নাট্যকার ব্রাহ্মধর্মের যে মহিমা ব্যাখ্যা করেছেন, সে মহিমার ভেতর সামাজিক স্বাস্থ্যের কথাই হয়েছে একমাত্র আলোচিত। মদ্যপান ও

গণিকাচর্চা থেকে মুক্ত হওয়াকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আর তারপর বিবৃত হয়েছে পরোপকার-স্কুল-ডিস্‌পেনসারি ইত্যাদি।

'লীলাবতী' নাটকেও এই সমাজসংস্কারের পটভূমিতেই দেখা হয়েছে ব্রাহ্ম-সমাজকে। এই নাটকের 'পবিত্রা ব্রাহ্মিকা' হলেন শারদা। তাঁর বিপথগামী স্বামী হেমচাঁদকে উদ্ধার করাই তাঁর পক্ষে এক বিরাট সমস্যা। তবু এ ব্যাপারে তিনি কৃত-সঙ্কল্পা, তিনি স্বামীকে সোজাসুজিই বলেছেন, 'আমি তোমাকে ব্রাহ্মধর্মের সব পুস্তক পড়াবো, আমি তোমাকে ব্রাহ্ম করবো, আমি তোমাকে কুপথে যেতে দেব না।'[৮১] এই নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র ললিতও শারদার স্বামী হেমচাঁদকে পরিবর্তিত কববার ব্যাপারে শারদাকে উৎসাহিত করে বলেছে, ' ভাব দেখি, আমাদের মধ্যে কত ব্রাহ্ম আছেন, যাঁরা পূর্বে পশুবৎ ছিলেন, এক্ষণে তাঁরা দেবতা স্বরূপ। আমার নিতান্ত অনুরোধ, তুমি হেমকে সমাজভুক্ত কর—যদি পরের উপকার কবতে না পারলেম, মন্দকে ভাল না করতে পারলেম, তবে আমাদের সমাজ করাত বৃথা।'[৮২]

না, কোনো ধর্মীয় কাবণে নয়, বেদ-উপনিষদের গুরুত্ব বিচার করে নয়, এমন কী ধর্ম-সমন্বয়ের মহৎ অনুপ্রেরণাতেও নয়, দীনবন্ধু ব্রাহ্ম আদর্শকে যাচাই করে দেখেছেন মানব-কল্যাণে তার ভূমিকা কতখানি ছিল, সেই পরি-প্রেক্ষিতে। তাই সামাজিক স্বাস্থ্যের কথা খুব স্বাভাবিক কারণেই তাঁকে তুলতে হয়েছে। আমাদেব উনিশ শতকেব সমাজ কী রকম ছিল, তা' না জানলে দীনবন্ধুর এই দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি কবা সাধারণ পাঠকদের পক্ষে একটু কঠিন। অন্ততঃ দীনবন্ধু কী আদর্শে চলেছেন, সেটুকু জানতে গেলেও তদানীন্তন সমাজের দিকে একটু তাকান দবকার।

অন্যান্য ব্যাপারের মতন সমাজ-সমীক্ষাতেও শিবনাথ শাস্ত্রীকেই প্রথমে শরণ নেওয়া যাক। ইনি তখনকার কথায় লিখেছেন, 'সহরের অবস্থা যেরূপ ছিল, নীতির অবস্থা তদপেক্ষা উন্নত ছিল না। তখন মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, উৎকোচ, জাল, জুয়াচুবি প্রভৃতির দ্বারা অর্থসঞ্চয় করিয়া ধনী হওয়া কিছুই লজ্জার বিষয় ছিল না। বরং কোনও সুহৃদ্‌গোষ্ঠীতে পাঁচজন লোক একত্র বসিলে এরূপ ব্যক্তিদিগের কৌশল ও বুদ্ধিমত্তাব প্রশংসা হইত।'[৮৩] এতো গেল নীতির কথা, ওদিকে চারিত্রিক অনাচারও কী দুর্বার ছিল এবং এই অনাচারের গৌরব কী রকম আরো পাঁচজনকে উৎসাহিত করত, সে খবর জানতে হলে আরেকটু পড়া দরকার, এবং এ ব্যাপারে যা জানা যায়, তা হল, 'ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্যভাবে বারবিলাসিনীগণের সহিত আমোদ প্রমোদ

করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। ...কোন্ ধনী কোন্ প্রসিদ্ধ বাঈজীর জন্য কত সহস্রটাকা ব্যয় করিয়াছেন সেই সংবাদ সহরের ভদ্রলোকদিগের বৈঠকে বৈঠকে ঘুরিত এবং কেহই তাহাকে তত দোষাবহ জ্ঞান করিত না। এমন কি বিদেশিনী ও যবনী কুলটাদিগের সহিত সংসৃষ্ট হওয়া দেশীয় সমাজে প্রাধান্য লাভের একটা প্রধান উপায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।' ৮৪

'পানাসক্তি ও গণিকাচর্চা' প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা হয়ে গেছে। সুতরাং 'বারবিলাসিনীগণের সহিত আমোদ-প্রমোদে'-র প্রসঙ্গে আরো আলোচনা করে লাভ নেই। বরং কৌলীন্যপ্রথা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, ঘরজামাই-প্রথা সতীদাহ, বিধবাবিবাহ থেকে সাগরে শিশু বিসর্জন দেওয়া বা পণ্ডিতদের কাছে কন্যা বিক্রয় ইত্যাদি প্রসঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে। এই জাতীয় কুৎসিত নিন্দিত প্রথাগুলি আমাদের সমাজের অঙ্গে যে ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল, তা' শেষ পর্যন্ত আমাদের মৃত্যুর কারণ হয়ে দেখা দিতে পারত। অন্ততঃ আমাদের সমাজ যে মুমূর্ষু হয়ে ধুঁকছিল, সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেয়। সামাজিক ছুঁৎমার্গ নিয়ে সেদিন আমাদের গর্বের আবার সীমা ছিল না। এবং এই গর্ব যে কত অন্তঃসার শূন্য ছিল, 'জ্ঞানান্বেষণে'র এক পত্র লেখক অনায়াসেই তা তুলে করতে সমর্থ হয়েছিলেন। অত্যন্ত জোরালো ভাষায় ইনি লিখেছিলেন, 'আমি সাহসপূর্বক বলিতে পারি ভারি ভারি পণ্ডিত ন্যায়রত্নের ও প্রধান প্রধান বাঁড়ুয্যের ঘরে যে তাঁহাদিগের পুত্রপৌত্রাদির গৃহিনী সকল আছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই ধোপা নাপিত বৈষ্ণব মালি কামার কাপালির কন্যা, কিন্তু সম্পত্তিশালী ব্রাহ্মণের ঘরে পড়িয়া পবিত্রা ব্রাহ্মণী হইয়া গিয়াছেন এখন তাঁহাদিগের পাকান্ন সকলেই পবিত্র জ্ঞান করেন।' ৮৫

আত্মগর্বী সমাজের পরতে পরতে এজাতীয় কালিমা সুপ্রচুর। অথচ সেকালে আমরা এতই অন্ধ ছিলাম যে নিজেদের ভুল ত্রুটি গুলি দেখতে পেতাম না। কিন্তু বাইরের যাঁরা লোক, তাঁদের কাছে আমাদের এই চরিত্র খুব সহজেই ধরা পড়ে যেত। ফলে, বিদেশীদের কাছে বাঙালীদের চরিত্র ছিল কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত, ঐতিহাসিকদের ভাষা উদ্ধৃত করে বলা যায়, 'Many Englishmen regarded the Bengalis almost as barbarians, In a book written in 1792, Charles Grant has painted the Bengalis in blackest colour and described them as inferior to the most backward classes of Europe.'৮৬ ইউরোপের সর্বাধিক অনুন্নত শ্রেণীর সঙ্গে আমাদের ব্যবধান কতখানি ছিল বা আদৌ ছিল কী না

ইত্যাদি কূট তর্কের ভেতর না যাওয়াই ভালো। হয়ত ইংরেজরা বিদ্বেষবশতঃই আমাদের এ ভাবে চিত্রিত করেছে। কিন্তু একথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই, আইন করে আমাদের দেশে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করতে হয়েছিল, আইন করে নিষিদ্ধ করতে হয়েছিল সাগরে শিশু-বিসর্জন এবং আবার আইন করেই বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। নাট্যকার দীনবন্ধু, বলাবাহুল্য, এ জাতীয় কোনো ব্যাপারেই উদাসীন থাকতে পারেন নি। তাই সূক্ষ্ম হৃদয়গত সমস্যার বদলে এ ধরণের স্থূল সমস্যাগুলিকেই তাঁর নাটকের বিষয়বস্তু করতে হয়েছে। বহুবিবাহ, সপত্নীসমস্যা, কৌলিন্যপ্রথা, ঘরজামাই রাখবার জন্য কুপ্রথা এবং এই একই সঙ্গে পানাসক্তি ও গণিকাচর্চা তাঁর নাটকের মধ্যে বিরাট পরিসর জুড়ে আছে।

নৈতিক বোধগুলিও যে আমাদের উন্নত ছিল না, তা' সাধারণ লোকত দূরের কথা, অনেক বড়ো বড়ো মানুষদের চরিত্র বিশ্লেষণ করলেও এ দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই। দীনবন্ধুর একটি নাটকের একটি প্রধান চরিত্র বলেছিল, 'আরে আমি মল্লিকদের বাড়ী পাঁচ টাকা মাইনেতে পঞ্চাশটাকা উপার্জন করিচি। যদি কেবল পাঁচটাকায় নির্ভর করতেম তা হলে বাড়ীও কত্তে পাত্তেম না,বাগানও করতে পাত্তেম না, পুকুরও করতে পাত্তেম না—একবার আমারে চুন কিনতে পাঠিয়েছিল, আমি দরের উপর কিছু রাখলেম আর বালি মিস্য়ে কিছু পেলেম—এরূপ সকলেই করে থাকে, তুমিও উপ্‌রি পেয়ে থাকো পাছে বুড়ো কিছু চায় তাই বল্‌চো না, বটে?'[৮৭]

সকালে এই ছিল ধনী হওয়ার তত্ত্ব কথা। আত্মকেন্দ্রিক সমাজপতিরা নীতিকথার ধার আদৌ ধারতেন না। ধনীরা শোষণ করতেন গরিবদের, আর গরিব কর্মচারীরাও সুযোগ পেলে ধনী মনিবের সর্বস্বান্ত করে ছাড়ত। আদর্শের ধার কেউ-ই ধারতেন না। 'ব্রাহ্মসমাজ' এই মুমূর্ষু সমাজকে নতুন করে বাঁচিয়ে তোলবার দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের পথে এলো এগিয়ে। ডিরোজিয়ানরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে সামাজিক কুসংস্কারের প্রাচীরগুলি ভেঙ্গে দিয়েছিলেন যদিও, কিন্তু ঠিক মত পথের দিশা তাঁরা দেখতে সমর্থ হন নি। রামমোহন পথের দিশা দেখিয়েছিলেন বটে, কিন্তু দেশব্যাপী আন্দোলন করে সূক্ষ্মনীতি-বোধ, সুরুচি ও উচ্চতর জীবনাদর্শে বিপুল জনসাধারণকে উদ্বোধিত করার সুযোগ পান নি। তখনকার দিনের শিক্ষিত জনসাধারণ তথাকথিত সংস্কার-পীড়িত ধর্মের প্রতি ছিলেন বীতশ্রদ্ধ, তাঁরা এমন কোনো ধর্ম চান নি যার মধ্যে আচার-আচরণের আধিক্য প্রবল।

তাই শিক্ষিত মানুষেরা সেই 'ধর্মই' চেয়েছিলেন যা যুক্তি দ্বারা যাচাই করা যায়, যার মধ্যে লোক-কল্যাণের একটি ভূমিকা আছে এবং যার মধ্যে ঈশ্বর-জিজ্ঞাসায় ভক্তি ও পৌত্তলিকাতার পরিবর্তে জ্ঞানের ভূমিকাই অধিক। দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত 'ব্রাহ্মধর্ম' এই প্রয়োজনগুলির সব কটিকেই উপস্থাপিত করতে সমর্থ হয়েছিল বলেই শিক্ষিত মানুষের সমর্থন পেয়েছিল সে। নাট্যকার দীনবন্ধুও এই কারণেই ব্রাহ্মধর্মকে ভালোবাসতে পেরেছিলেন। তথাকথিত আধ্যাত্মিক আকুলতা তাঁর সাহিত্যে কখনও অভিব্যক্ত হয় নি। কেননা, কোনোরকম আধ্যাত্মিক উপলব্ধির জন্য তিনি জীবনেও কখনোও ব্যাকুল ছিলেন না। রেনেসাঁসের মানুষের যে-ধর্ম, সেই 'মানবিকতাবাদে'র আদর্শেই ছিলেন তিনি উদ্বোধিত। আর শিল্পী হিসাবেও ছিলেন তিনি হিউম্যানিস্ট, সুতরাং মানুষই তাঁর কাছে একমাত্র সত্য হতে পেরেছে। অন্য কিছু না। অন্ততঃ 'অজানা অধরা' কিছু নয়।

তবে একটি কথা জেনে রাখা দরকার, মনে প্রাণে দীনবন্ধু ছিলেন খাঁটি বাঙালী। 'সংস্কারে'র সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংস্কৃতিও চলে যাক, এমন ভাবনা তিনি কখনো পোষণ করতেন না। অবশ্য 'সংস্কার' বলতে এখানে বাঙালীর তথাকথিত 'কুসংস্কার'গুলিকেই নির্দেশিত করা হচ্ছে। 'পৌষ-পার্বন' থেকে আহারাদির বর্ণনায় ঈশ্বরগুপ্তের যেমন খাঁটি বাঙালীয়ানা ছিল, দীনবন্ধুরও ছিল ঠিক এইরকম এক বাঙালী-প্রাণ। 'বাঙ্গালীর মেয়ে' কবিতায় ঈশ্বরগুপ্ত আধুনিকাদের শিক্ষানুরাগ দেখে সভয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন,

> আর কি এরা এমন কোরে,
> সাঁজ সেঁজুতির ব্রত নেবে ?
> আর কি এরা আদর কোরে,
> পিঁড়ি পেতে অন্ন দেবে ?[৪৪]

'সাঁজ-সেঁজুতি'র ব্রত বা 'পিঁড়িপেতে' অন্ন দেওয়ার মধ্যে বাঙালী মেয়েদের যে পরিচিতি ফুটে ওঠে, তা হল চিরকালীন বাঙালী মেয়েদের পরিচিতি। বঙ্গসংস্কৃতি এখানে ঐ ব্রত-নেওয়া বা পিঁড়ি-পেতে খেতে দেওয়ার ভেতরে আভাসিত।—দীনবন্ধুও এইরকম কয়েকটি লক্ষণ দিয়ে চিরকালের বাঙালীকে ফুটিয়ে তুলতে ছিলেন সচেষ্ট। এঁর নাটকে মেয়েরা যেমন কথায় কথায় ছড়া বলে, পুরুষ চরিত্রও অনুরূপভাবে আউড়ে চলে 'প্রবাদ-প্রবচন'। তাঁর নাটকে যে সব চরিত্র তথাকথিত আধুনিক, সে সব চরিত্র অনেক সময়ই

শিল্প হিসাবে ব্যর্থ। কিন্তু নিম্ন শ্রেণীর চরিত্র তাঁর নাটককে কখনও ব্যর্থ হয়ে যায়নি, এবং তার একটিমাত্র কারণ, আর সে কারণটি হল—নাট্যকার এদের বাঙালী করতে পেরেছেন।

তাই ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে দীনবন্ধুকে বিচার করতে গিয়ে আমরা যেন বিস্মৃত না হই, দীনবন্ধু শিল্পী হিসাবে মানুষকে যেমন লক্ষ্য বলে মনে করে রেখেছিলেন, তেমনি জেনে রাখা ভালো, সংস্কৃতির দিক এই চরিত্রগুলি দেশকাল নিরপেক্ষ ছিল না। বরং এরা ছিল ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা বাঙালী। এবং সে যুগের বাঙালী।

স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ

মাইকেল মধুসূদনের মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' একটি প্রবন্ধ লিখে বলেছিলেন, '...জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও,—তাহাতে নাম লেখ শ্রী মধুসূদন।'[৮৯]

যে মধুসূদন মনে-প্রাণে ছিলেন ইউরোপীয় ভাবাপন্ন, যিনি নিজের ধর্ম-ত্যাগ করে গ্রহণ করেছিলেন সাহেবদের ধর্ম, পোশাকে-আশাকে যিনি ছিলেন খাঁটি ইউরোপীয় এবং ইংরেজী ভাষায় যিনি স্বপ্ন পর্যন্ত দেখতেন, তাঁর ওপর এই 'জাতীয়তাবাদে'র আরোপ একটু অতিশয়োক্তি বলেই মনে হতে পারে। তবে আতিশয়োক্তি যে নয়, তা' তাঁর সাহিত্য-ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন তাবত সমালোচক কুল। সুতরাং এহ বাহ্য। কিন্তু একথা শিরোধার্য, মধুসূদনের পরিচিতির জন্য যদি জাতীয় পতাকা ওড়াতে হয়, দীনবন্ধুর বেলাতে আরেকবার তা ওড়াতে হবে। কেননা, রেনেসাঁসের অন্যতম লক্ষণই হল 'জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশানুরাগ'। আর যেহেতু দীনবন্ধু ছিলেন রেনেসাঁসের প্রভাবে পরিপুষ্ট, তাই তাঁকেও এ গৌরব থেকে বঞ্চিত করা রীতিমত কঠিন। শুধু কঠিন নয়, অসম্ভব।

প্রাচীনকে জানা এবং প্রাচীন ও অতীত-ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগকে যেমন নবজাগরণের একটি লক্ষণ বলে ধরা হয়, অনুরূপভাবে এবিষয়ে যাঁরা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাঁরা দেখিয়েছেন এই সূত্রেই আসে জাতীয় গৌরব। এঁরা দেখিয়েছেন, 'apart from antiquity, to upturn and to mature the national to mind'[৯০] ঐ রেনেসাঁসের ভূমিকা অনেক-খানি প্রসারিত ও বহুদূর বিস্তৃত। উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে ইটালী

ও রোমকে। রোমে ছিল প্রচুর পুরাকীর্তি। অর্থাৎ 'অ্যান্টিকুইটি'। এই পথ দিয়েই তাঁদের চিত্তে জাতীয় গৌরব প্রথম হয়েছিল সঞ্চারিত। বুকহার্টের ভাষায় এঁদের উচ্চ-মন্যতা এইভাবে বিশ্লেষণ করা যায়, 'the inhabitants, 'who then called themselves Romans' accepted greedily the homage which was offered to them by the rest of Italy.'[৯১]

আমরা স্বদেশ-প্রেম ও জাতীয়তাবাদের পাঠ নিয়েছিলাম বেদ-উপনিষদের গৌরব স্মরণ করে এবং বিগত গৌরবের জন্য হাহাকারও আমাদের চিত্তে দেশপ্রেমের আবেগসঞ্চারে যে সহায়তা করেছিল, তা' পুনরুক্ত না করলেও চলে। প্রথম পথটি যিনি আবিষ্কার করেছিলেন, তিনি হলেন রামমোহন, আর দ্বিতীয় পথটি যাঁকে প্রথম আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, তিনি হলেন ডিরোজিও। হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও 'ফকির অফ ঝাঙ্গিরা' নামে যে বিখ্যাত কাব্যটি লেখেন, সেই ইংরেজি কাব্যের সূচনায় ভারতবর্ষকে লক্ষ্য করে যে কবিতাটি লিখেছিলেন, তা' নিঃসন্দেহে স্বদেশপ্রেমের প্রথম কবিতা। স্বদেশের দুঃখে কবির মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত প্রথমাংশের অনুবাদটি এ প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যেতে পারে,

'স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির মণ্ডলী!
ভূষিত ললাট তব ; অস্তে গেছে চলি
সে দিন তোমার ; হায় সেই দিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে!
কোথায় সে বন্দ্যপদ! মহিমা কোথায়!
গগন বিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।[৯২]

রোমের ধ্বংসাবশেষ দেখে পেত্রার্ক ও বোক্কাচিওর মনে যে বিষাদের সুর বেজেছিল, সেই সুরই ধ্বনিত হলো ডিরোজিওর স্বদেশ-সংগীতে। বুক্হার্ট লিখেছেন, '.. ruins within and outside Rome awakened not only archeological zeal and patriotic enthusiasm, but an elegiac or sentimental melancholy'.[৯৩]

এই 'সেন্টিমেন্টাল মেলানকলি' আমাদের স্বদেশপ্রীতির ভেতর নানা ভাবে অভিব্যক্ত। তবে আমাদের আরেকটি ধারা আছে, তা হল প্রকৃতি প্রীতি থেকে জাত স্বদেশপ্রেম। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথের 'সোনার বাঙ্‌লা' এই একই সুরে সাধা।

বলাবাহুল্য, এখানে যে ক'টি দিক আলোচিত হল, সবগুলিই হল

ভাবাবেগের দিক। কিন্তু ভুললে চলবে না, আবেগ বর্জিত স্বদেশ প্রেম ও জাতীয়তাবাদের দিকও ছিল আমাদের।

এবং এদিকেও অগ্রসর হতে গেলে আবার ঐ রামমোহন-ডিরোজিও দিয়েই আরম্ভ করতে হয় আলোচনা। রামমোহনের 'গৌড়ীয় সমাজ' এবং ডিরোজিওর 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' একই প্রতিশ্রুতি নিয়ে দেখা দিয়েছিল আমাদের দেশে। 'গৌড়ীয় সমাজে'র অনুষ্ঠান পত্রে এই সমাজ তার প্রতিশ্রুতির কথা খুব সহজ ভাবেই জানিয়েছিল লিখে। খুব অকপটেই অনুষ্ঠান পত্রে নিবেদিত হয়েছিল, 'স্বদেশের হিত সাধনের জন্য এরূপ বহু প্রচেষ্টা আবশ্যক যাহা ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা এককভাবে নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। এরূপক্ষেত্রে বহুজনের সমবেত প্রয়াস প্রয়োজন।[১৪] এদিকে 'অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশানে'র আলোচ্য সূচীতে নানান আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে রয়েছে অন্যতম আলোচনার বিষয় 'নোবিলিটি অব পেট্রিয়টিজম্'।[১৫]

উনিশ শতকের প্রথম থেকে এইভাবে কত সভা, সমাজ ও সোসাইটি যে নির্মিত হয়েছিল, তা' গণনা করা কঠিন। ধীরে ধীরে এই সব সভা-সমাজ-সোসাইটি নানারকম আলাপচারি করতে করতে শাসকদের চরিত্র চিনে নেবার চেষ্টায় হয়েছে উদ্যোগী। ধীরে ধীরে শাসকদের কাছ থেকে নিজেদের অধিকার বুঝে নেবারও চেষ্টা কম চলল না। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন 'চার্টার অ্যাক্ট' অনুযায়ী কোম্পানি সনন্দ পেল, তখন ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারতবর্ষের বিষয় নিয়ে প্রভূত আলোচনা হয়। প্রভূত বিরোধী দল থেকে প্রস্তাব উঠেছিল কোম্পানিকে সরিয়ে দিয়ে ব্রিটেনের সরকার নিজের হাতে ভারত শাসনের ভার হাতে তুলে নিক। অবশ্য রামমোহনেরও এইরকই একটা ইচ্ছা ছিল। কিন্তু শেষে তা' হয়নি। বরং যা হল, তা একেবারে বিপরীত। এবং খুবই খারাপ। এতকাল ইউরোপীয়দের পক্ষে এদেশের জমির মালিক হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু ১৮৩৩-এর চার্টারে সে অসম্ভব হল সম্ভব। পরবর্তীকালে 'নীলচাষ' নিয়ে যে হাঙ্গামা, ঐ চার্টার তার অন্যতম কারণ। রূপায়িত হোক-না-হোক এই চার্টারে ভারতীয়দের চাকরীর ব্যাপারেও অনেক গালভরা কথা ছিল, জাতি-বর্ণ-ধর্ম-বংশ নির্বিশেষে ঘোষিত হয়েছিল কোম্পানির অধীনে চাকরী পাবার অধিকার। অ্যাক্টের ৮৭ নং ধারায় বলা হয়েছিল, 'And be it enacted that no native of the said territories, nor any native born subject of his Majesty resident

there in, shall, by reason only of his religion, place of birth, descent, colour, or any of them, be disabled from holding any place, office, or employment under the said company'.[১৬]

আমাদের দেশের অধিবাসীদের ভেতর দেশ-সচেতন একটি মন গড়ে উঠুক, এটি কোম্পানি কখনো চায় নি। শুধু আমাদের দেশকে নয়, নিজেদের দেশকেও এদেশের শাসন ব্যাপারের খুঁটিনাটি ও এদেশের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে অজ্ঞ রাখাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এদেশে যে দুর্ভিক্ষ হয় তার সব খবর কোম্পানি পৌছতে দেয়নি ওদেশে। ওদেশের লোক এদেশে আসতে চাইলে কোম্পানির 'কোর্ট অব ডিরেকটর্সে'র' কাছে যে অনুমতি নিতে হত একথা এখন সর্বজনজ্ঞাত। আর যাঁরা তা' না নিতেন, তাঁদের মার্শমান-ওয়ার্ডের মত ধৃত হতে হত গুপ্তচরের অভিযোগে।

এহ বাহ্য। দেশবাসীরা ধীরে ধীরে নিজেদের নিজেদের অধিকার বুঝে নেবার জন্য এলেন এগিয়ে। দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমারের নেতৃত্বে ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হল 'জমিন্দারি অ্যাসোসিয়েশন অব ক্যালকাটা'। অবশ্য মাস পাঁচেকের মধ্যেই এই সংস্থার নাম বদলে রাখা হল, 'ল্যাণ্ড হোলডারস্ সোসাইটি'। যদিও দেশি-বিদেশি ছোট বড়ো জমিদারেরাই ছিলেন এর সদস্য এবং উদ্দেশ্য সর্বজনমুখী হলেও, নিজের নিজের স্বার্থেই এটি উঠেছিল গড়ে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই সংস্থার প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'It gave to the people the first lesson in the art of fighting constitutianally for their rights, and taught them manfully to assert their claim and give expession to their opinions.[১৭]

দ্বারকানাথ- প্রসন্নকুমার যখন এইভাবে এগোচ্ছেন, ওদিকে সাগর পারে ভারতের সমস্যা এবং তার কী কী প্রয়োজন, তা' জনসাধারণের কাছে তুলে ধরার জন্য ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে লণ্ডনের ফ্রীম্যাসন হলে আয়োজিত এক সভায় স্থাপিত হল 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'। এই সোসাইটির সভাপতি হলেন বার্ক-অনুরাগী লিবারেল নেতা লর্ড ক্রয়াম। বিখ্যাত মানবতন্ত্রী রাজনীতিবিদ্ টমসন সাহেবও এগিয়ে এলেন এ ব্যাপারে।

দ্বারকানাথ ঠাকুর ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে। এই বছর শেষের দিকে ফেরবার সময় সঙ্গে করে নিয়ে এলেন জর্জ টমসনকে। টমসনের বয়স তখন আটত্রিশ-উনচল্লিশ বছর। আমেরিকায় ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে

সংগ্রাম করে মাত্র তিরিশ বছর বয়সেই তিনি হন খ্যাতিমান। সেই টমসনকে যখন দ্বারকানাথ কলকাতায় নিয়ে এলেন, তখন এক তুমুল কাণ্ড বেধে গেল। ডিরোজিও ও রামমোহনের মুক্ত-চিন্তা এখানকার তরুণ মনকে আন্দোলনের জন্য তৈরী করেই রেখেছিল। এখন তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল, এবং ব্যাপারটি কেমন দাঁড়াল, তার বিবরণ শুনতে হলে শিবনাথ শাস্ত্রী মশায়ের শরণ নেওয়া যেতে পারে। ইনি লিখেছেন, 'যেমন চুম্বকে লোহা লাগিয়া যায়, তেমনি রামগোপাল ঘোষ, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, প্যারীচাদ মিত্র, প্রভৃতি জর্জ টমসনের সহিত মিশিয়া গেলেন। নানাস্থানে নানা সভা-সমিতিতে বক্তৃতা হইয়া অবশেষে কলিকাতার ফৌজদারী বালাখানা নামক স্থানে একটি ভবনে টমসনের বক্তৃতা আরম্ভ হইল। এরূপ বাগ্মিতা এদেশে কেহ কখনও শুনে নাই। সেই সময়ে বালাহিসারে ইংরাজদিগের যুদ্ধ চলিতেছিল। তাহার উল্লেখ করিয়া শ্রীরামপুরস্থ মিশনারী সম্পাদিত 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক একবার লিখলেন, 'এখন দুইদিকে ঘন ঘন কামানের ধ্বনি হইতেছে। পশ্চিমে বালাহিসারে ও পূর্বে ফৌজদারী বালাখানাতে।' বাস্তবিক জর্জ টমসনের বক্তৃতা সামরিক তোপধ্বনির ন্যায় উন্মাদকারিণী ছিল।'[১৮]

জর্জ টমসনের এই উন্মাদকর বক্তৃতায় নব্যবঙ্গ যে সত্যি সত্যি মেতে উঠেছিল, তার দুটি ফল চোখের সামনেই দেখা গেল। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারী সংস্কৃত (তথা হিন্দু) কলেজের হলঘরে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জকা' সভার যে অধিবেশন বসেছিল, সেই সভায় সভাপতি ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী। ক্যাপটেন রিচার্ডসন তখন হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ। এই সভায় দক্ষিণারঞ্জন 'ভারতের ব্রিটিশ আদালত এবং পুলিশ বিভাগ' সম্পর্কে এমন এক বক্তৃতা দিয়ে বসলেন যে অধ্যক্ষ রিচার্ডসনের পক্ষে বসে বসে তা' হজম করা সম্ভব হল না, তিনি লাফিয়ে উঠে বলে বসলেন, 'I cannot allow the hall to be made a den of treason'[১৯]— অর্থাৎ এই কলেজঘরকে আমি রাজদ্রোহের আখরা হতে দিতে পরি না।

দ্বিতীয় ঘটনা যা ঘটল, তা হল, নব্যবঙ্গ নতুন উদ্দীপনায় ও টমসনের পরামর্শক্রমে বিলেতের ঐ 'ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র আদর্শে কলকাতাতেও তৈরী হল, 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'। এই সভা স্থাপনের তারিখ ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে এপ্রিল। অনেকেই এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে পরবর্তীকালের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব-প্রস্তুতি বলে চিহ্নিত করেছেন,

আবার কেউ কেউ এটিকে ভারতের রাজনীতির প্রথম স্থচনাও বলেছেন। তবে জেনে রাখা ভালো, নিজের অধিকারের ব্যাপারে তীক্ষ্ণ সচেতনতা থাকলেও ইংরেজ-বর্জিত ভারতের কথা তখনও কিন্তু আদৌ চিন্তা করা হয় নি। এই সোসাইটির অনেকেই ইংরেজ শাসনের তীব্র সমালোচক ছিলেন যদিও, কিন্তু তাই বলে এঁরা রাজ-বিদ্রোহের কথা ভাবতেই পারেন নি। ঐ সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পাচদিন পরে পঁচিশে এপ্রিল 'বেঙ্গল স্পেকৃটেটরে' যে কর্মপন্থা ও উদ্দেশ্যের কথা প্রচারিত হয়েছিল, তার চার নম্বর অনুচ্ছেদে খুব সুস্পষ্টভাবেই লেখা ছিল, 'এই সভার সভ্যেরা রাজবিদ্রোহী না হইয়া এবং ইংলণ্ডীয় রাজার আইনের অবিরোধে চালিত আইন সকল মান্য করত ভারতবর্ষের মঙ্গল চেষ্টা করিবেন।'[১০০]

যাইহোক, এঁরা 'রাজার আইনের অবিরোধে চালিত আইন মান্য' করে তখনকার দিনের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক কাজ করতেই সমর্থ হয়েছিলেন। তবে অনিবার্য পরিণাম হিসাবে 'ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি'র সঙ্গে বিরোধও লেগে গেল। জর্জ টমসন অবশ্য একটি মিটমাটের চেষ্টা করলেন। তিনি একদিকে হলেন 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির' সভাপতি, অপরদিকে হলেন 'ল্যাণ্ডহোল্ডার্স সোসাইটি'র লণ্ডনের প্রতিনিধি। কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে বিরোধ এখানেও মিটল না। বিরোধ মিটল আরো আট বছর পরে। অভিজ্ঞতা দিয়ে উভয় দলই যখন বুঝল যে অধিকার আদায় করতে হলে পরস্পরে এক হওয়া দরকার, তখনই মিলন ঘটল। এই মিলনের তারিখ হল ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে, ৩১শে অক্টোবর। নতুন দলের নতুন নাম করণ হল, 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন।'—রাধাকান্ত দেব হলেন এই নতুন দলের সভাপতি, আর সম্পাদক হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আর একটি ব্যাপার সকলেরই চোখে পড়ল, এবং সেই চোখে পড়া ব্যাপারটি হল, ইতিপূর্বে অনেক ইংরেজ উভয়দলেই ছিলেন। এখন এই নতুন দলে রইল না কোনো ইংরেজই।

বলাবাহুল্য, এই নবতর জাতীয় চেতনার উন্মেষ যখন ঘটল, আমাদের আলোচ্য নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তখন হিন্দু কলেজের ছাত্র এবং সবে হিন্দু-কলেজে ঢুকেছেন। 'সংবাদ প্রভাকর' ও সাধুরঞ্জন' পত্রিকায় কবিতা লেখাও আরম্ভ করে দিয়েছেন। পরে অবশ্য এই 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনে'র সঙ্গে তিনি যুক্ত হন প্রত্যক্ষভাবে। আর হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে তিনি এই সভার গৌরবের কথায় উদ্বেলিতভাবে বলেন,...'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের দ্বারা ভারতবর্ষের যে উপকার

জন্মিতেছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই, লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্নরের নিকটে, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রস্তাবটি অতি আদরণীয় হইয়াছে। তাঁহারা জানেন এই ভারতবর্ষীয় সভার যে অভিপ্রায় তাহা ভারতবর্ষের সমুদয় লোকের অভিপ্রায়, ভারতবর্ষীয় সভাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে ভারতবর্ষের সমুদয় লোক সন্তুষ্ট হইবে, তাঁহারা জানিয়াছেন এই ভারতবর্ষীয় সভা ভারতবর্ষের পার্লিয়ামেণ্ট হইয়াছে।[১০১]—১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মারা যান। দীনবন্ধু মিত্রের বক্তৃতা তার পরের ঘটনা।

তবে এর কিছু আগে ও পরে দুটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে পারে। না, দেশব্যাপী নীল আন্দোলনের ঘটনা নয়। কেননা, এ ব্যাপার প্রসঙ্গান্তরে আলোচিত হবে, সুতরাং তার কথা থাক। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্‌পানি নতুন করে চার্টার পেল যখন, তখন অধিকারের দাবিতে 'নব্য-বাঙ্‌লা'কে আবার মুখরিত হতে দেখা গেল। এই মুখরতা কেমন, তার পরিচয় দেবার জন্য একটি প্রাচীন লেখা থেকে কিছু অংশ উদ্ধার করা যেতে পারে।

'১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুন দিবসে বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি সার চার্লস উড্‌ 'হৌস অব কমন্স' সভায় ভারতবর্ষীয় রাজকর্মচারী নিয়োগ বিষয়ক একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। তখন কি কি সর্তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নূতন চার্টার বা সনন্দ প্রদত্ত হইবে, কমন্স সভায় তাহা আলোচিত হইতেছিল। স্যর চার্লসের প্রস্তাবটি কতিপয় বিষয়ে অতি উত্তম হইলেও অনেক বিষয়ে উহা শিক্ষিত ভারতবাসীর আবার অনুরূপ হয় নাই। উহাতে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং সিবিল সার্ভিসে ভারতবাসীর নিয়োগ, বিচারবিভাগে দেশীয় কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি, লাভজনক পূর্ত্ত-কার্য্যের বিস্তার প্রভৃতি অনেকগুলি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ ছিল না। এই সকল বিষয়ে এদেশে রাজনীতিক আন্দোলনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বাংলার জননায়কগণ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই দিবসে 'টাউন হলে' এক বিরাট সভা আহূত করেন।[১০২]

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্‌পানি যখন চার্টার পেয়েছিল, তখন 'ইয়ং বেঙ্গলে'র তরুণ নায়করা ছিলেন নিতান্তই শিশুমাত্র। কারো কারো বয়স সবে কৈশোরে পৌঁচেছিল। সুতরাং নিজেদের দেশ ও নিজেদের অধিকার সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো চেতনা এঁদের ছিল না। বাঙ্‌লা রেনেসাঁসের বয়স তখন সবে আট

বছর, দীনবন্ধু মিত্রের বয়স তিন, রামগোপালের বয়স বছর আঠারো, প্যারীচাঁদ ও রাধানাথ শিকদারের বয়স কুড়ি অতিক্রম করেনি, স্বদেশের স্বার্থের বুঝে নেবার মতন মানসিক পরিণতি তখন তাঁদের কোথায়? তাই ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে দেখা যায়, আমাদের প্রতীক্ষা করতে হয়েছে আরো কয়েক বছর। অন্ততঃ আরো একটা যুগ। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দ সে কারণে ব্যর্থ হল না। হ'তে পারল না।

কলিকাতার 'টাউন হলে' সেদিন যে ভিড় হয়েছিল, তা অপরিমেয়। 'হল' পড়েছিল উপচিয়ে। কাগজে কাগজে পড়ে গেল সোরগোল। সেদিনের যে জনসমাগম হয়েছিল, তার স্মরণে একজন লেখক জানিয়েছেন, 'উহার পূর্বে এদেশে কোনও প্রকাশ্য সভায় এত জনতা হয় নাই। টাউন হলে ও উহার সন্নিহিত স্থানে যে লোকসমাগম হইয়াছিল তাহার সংখ্যা সম্বন্ধে ৩০০০ হইতে ১০,০০০ পর্যন্ত নানা লোকে নানা প্রকার অনুমান করিয়াছিলেন। কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ সকল সম্প্রদায়ের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন।'[১০৩]

এই সভায় বক্তৃতা দেননি এমন বঙ্গদেশীয় নায়ক কেউই ছিলেন না। প্যারীচাঁদ থেকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—কেউ বাদ পড়েননি। রামগোপাল যে বক্তৃতা দেন, সে-বক্তৃতা ছিল রীতিমত জ্বালাময়ী, এবং সেইরকমই কার্যকর। শিবনাথ শাস্ত্রীর মন্তব্য উদ্ধার করে বলা যায়, '১৮৫৩ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পুনর্গ্রহণের সময় এক মহাসভা হয়, তাহাতে রামগোপাল এক বক্তৃতা করেন। ইহাতে যেমন ওজস্বিতা, তেমনি সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ের লেপটেণ্ট গবর্ণর হেলিডে (Sir Frederick Haliday) মহোদয় এদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে তৎপূর্বে পার্লামেণ্টের নিযুক্ত কমিটির নিকট সাক্ষ্য দিয়াছিলেন। রাম গোপাল এই বক্তৃতাতে সেই সাক্ষ্যকে সুতীক্ষ্ণ বিচার ছুরিকার দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলেন।'[১০৪]

না, এই প্রসঙ্গে আর আলোচনা বাড়িয়ে লাভ নেই। তবে এইটুকু বলবার প্রয়োজন এইজন্যই আছে যে আমাদের আলোচ্য নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র এই সময় তেইশ বছরে পড়েছেন এবং হিন্দু কলেজের ছাত্র হিসাবে তিন বছরের পাঠ সাঙ্গ করে ফেলেছেন। আর 'নীলদর্পণ' রচিত হ'তে তখনো সাত বছর দেরি।

আমাদের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের ধারাটি পরবর্তীকালে বিকশিত হতে দেখি আরো একটু অন্যখাতে এবং চরিত্রের দিক থেকেও একটু

অন্যভাবে। তবে কালের দিক থেকে ঘটনাটি একটু পরের। এখন এই পরবর্তীকালের নতুন ধারাটির নাম হল, 'হিন্দুমেলা'। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে এই মেলার সূচনা। রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্রের সঙ্গে ঠাকুর পরিবারের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় আধুনিক জাতীয়তাবাদের জন্ম হল এই কলকাতায়। 'জীবনস্মৃতিতে' রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, 'আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্ট হইয়াছিল। নব গোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম। মেজদাদা সেই সময় বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সব ভারত সন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।'[১০৫]

'হিন্দুমেলা' বা 'স্বদেশীমেলা' যে নামেই চিহ্নিত করা হোক না কেন, আনুষ্ঠানিকভাবে এই উদ্যোগের প্রথম সূচনা হয় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে। বেলগাছিয়ায় এপ্রিল মাসে এর প্রথম অধিবেশন বসল। বারোই এপ্রিল। 'ন্যাশানালিজ্‌ম' বা 'জাতীয়তাবাদ' কথাটি এঁদের দ্বারা প্রথম সচেতন ভাবে উচ্চারিত হল, এবং জাতীয়তাবাদের চর্চাও সেই আরম্ভ হল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট 'ন্যাশানাল পেপার' দিয়ে এর সূচনা, পরে ধীরে ধীরে স্বদেশী দেশলাই থেকে ন্যাশানাল পোশাক, ন্যাশানাল সার্কাস এবং আরো পরে ন্যাশানাল থিয়েটার পর্যন্ত গিয়ে পৌচেছিল।—এই জাতীয়তাবাদের উত্তাপ বঙ্কিমচন্দ্রকেও বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত করেছিল। 'জাতীয়সঙ্গীত' তাঁর কলম থেকেই সেই প্রথম যে বেরিয়ে এসেছিল, তা' কে না জানে?—কিন্তু মজার ব্যাপার এই যে বঙ্কিমচন্দ্রের সুহৃদ হয়েও এ জাতীয় উত্তাপ দীনবন্ধু ঠিক অনুভব করেন নি। রেনেসাঁসের মানুষ যে ভাবে দেশ ও জাতিকে ভালোবাসে, তিনি ঠিক সেই ভাবেই ভালোবেসেছিলেন দেশকে। জন্মভূমিকে যে দৃষ্টিতে 'মা' হিসেবে দেখা যায়, ঠিক সেই মায়ের মত করে দেখা দীনবন্ধুর দ্বারা সম্ভব হয় নি। তিনি তাত্ত্বিক বা দার্শনিক নন, তিনি জন্মভুমিকে পবিত্র ভূমি বলেই দেখবার চেষ্টা করেছেন। নাটকত দূরের কথা, তাঁর রচিত কবিতাতেও একথা আরো নির্মম ভাবে সত্য। জন্মভূমির প্রসঙ্গে ইনি যা লিখলেন, তা 'মিলে সব ভারত সন্তান' ইত্যাদির সঙ্গে একদমই মেলে না, যথা,

কোথায় জনম ভূমি শুভ বঙ্গ দেশ।
তব ক্ষেত্রে শস্যরূপে বিরাজে ধনেশ,

বাহিনী তোমার অঙ্গে পবিত্র জাহ্নবী,
শ্রেষ্ঠতম হেরি তব প্রান্তর অটবী,
তব কোলে দোলে বিদ্যা, দেশ-অনুরাগ,
সুজনতা, সুবিচার, সৌহার্দ্য, সোহাগ ;
তোমা বিনা কাঁদে প্রাণ মনে সুখ নাই,
বিদেশে বিষাদে মরি দেশে চলে যাই ।[১০৬]

উল্লেখ করা যেতে পারে, এই কবিতাটি যখন রচিত হয়, তখন 'হিন্দুমেলা' ইত্যাদিকে ঘিরে চারদিকে এসেছে 'ন্যাশানালিজমে'র বন্যা, কিন্তু লক্ষ্যণীয় ব্যাপার এই, দীনবন্ধু এ ব্যাপারে একটুকুও উৎসাহ পান নি। অথচ ভুললে চলবে না, এই মানুষই প্রকৃত গণ-আন্দোলনের প্রথম সাহিত্য-রূপ দিতে এসে-ছিলেন এগিয়ে। অন্যকারো নয়, বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা বিপিনচন্দ্র পালের ভাষা উদ্ধার করেই এই ভূমিকা ব্যাখ্যা করে বলা যায়, '.. নীলকরদিগের অত্যাচারের দৃষ্টান্তে কেবল নীলকরদিগের বিরুদ্ধেই যে লোকের মনে একটা বিদ্বেষ জাগাইয়াছিল, তাহা নহে ; সাধারণ ভাবে সকল বিদেশীয়ের এবং বিদেশী প্রতিকূলেও একটা বিরূপ ভাব জাগাইয়াছিল।'[১০৭]—আশাকরি, এরপর আমাদের এ উপসংহারে আসা অসঙ্গত নয়, 'নীলদর্পণ যে স্বাদেশিকতার বীজ বপণ করিয়াছিল, উপেন্দ্র নাথ দাস মহাশয়ের 'শরৎসরোজিনী' ও 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' তাহাকে অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও কুসুমিত করিয়াছিল।'[১০৮]

এই মন্তব্য যদিও সর্বৈব সত্য, কিন্তু মনে রাখা দরকার আমাদের দেশে 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী'র ভূমিকা আর 'নীলদর্পণে'র ভূমিকা কিন্তু এক নয়। এর বোধহয় একমাত্র কারণ, দীনবন্ধু মিত্র কখনো তথাকথিত উগ্র স্বদেশ-প্রেমে মাতোয়ারা ছিলেন না। তাঁর প্রেমের শৌর্য কখনো অতিক্রম করে নি ক্ষমাকে। অত্যাচারী ইংরেজ নীলকরদের প্রতি তাঁর যে ঘৃণা ছিল, তা' 'নীলদর্পণ' পাঠ করলেই বোঝা যায়, কিন্তু তাই বলে এর পিছনে কিন্তু সমগ্র ইংরাজ জাতির সুগভীর চক্রান্ত তিনি দেখতে পান নি। এই উৎপীড়ন বন্ধের জন্য স্বাদেশিকতার দোহাই দিয়ে ডাক দেন নি দেশবাসীকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবার জন্য। যে 'হেলেনিক' ভাবনার 'সঞ্জীবনী মন্ত্র' ইংরেজদের কাছ থেকে পেয়েছিলাম আমরা, সেই ইংরেজদের কাছেই প্রতিকারের দাবিতে ঐ অত্যাচারের ছবি তুলে ধরলেন দীনবন্ধু। 'নীলদর্পণের' ভূমিকায় তিনি লিখলেন, 'নীলকরনিকর-করে নীল-দর্পন অর্পণ করিলাম। এক্ষণে

তাঁহারা নিজ মুখ সন্দর্শন-পূর্বক তাঁহাদিগের ললাটে বিরাজমান স্বার্থপরতা-কলঙ্ক-তিলক বিমোচন করিয়া তৎপরিবর্তে পরোপকার-শ্বেতচন্দন ধারণ করুন, তাহা হইলেই আমার পরিশ্রমের সাফল্য, নিরাশ্রয় প্রজাব্রজের মঙ্গল এবং বিলাতের মুখ রক্ষা!'

দীনবন্ধু কেবল এইটুকু লিখেই ক্ষান্ত হলেন না, তিনি আরো লিখলেন 'সুধীর সুবিজ্ঞ সাহসী উদার চরিত্র ক্যানিং মহোদয় গভরনর্ জেনারল্ হইয়াছেন। প্রজার দুঃখে দুঃখী, প্রজার সুখে সুখী, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ন্যায়পর গ্র্যাণ্ট মহামতি লেফটেনেণ্ট গভরনর্ হইয়াছেন এবং ক্রমশঃ সত্যপরায়ণ, বিচক্ষণ নিরপেক্ষ, ইডেন, হার্সেল্ প্রভৃতি রাজকার্য্য-পরিচালকগণ শতদল স্বরূপে সিবিল সর্ভিস সরোবরে বিকশিত হইতেছেন। অতএব ইহাদ্বারা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে, নীলকর দুষ্টরাহুগ্রস্ত প্রজাবৃন্দের অসহ্য কষ্ট নিবারণার্থ উক্ত মহানুভবগণ যে অচিরাৎ সদ্বিচাররূপ সুদর্শনচক্র হস্তে গ্রহণ করিবেন, তাহার সূচনা হইয়াছে।'

মোটকথা, 'হেলেনিক' আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই দীনবন্ধু মানুষের ওপর বিশ্বাস হারাতে প্রস্তুত ছিলেন না। মানবিক শুভবুদ্ধির ওপর ছিল তাঁর সুগভীর আস্থা। যে 'নীলদর্পণে'র মধ্যে দিয়ে মানবিক অধিকারের জয় ঘোষণা করলেন, অত্যাচারী নীলকরদের মুখোশ দিলেন খুলে, উৎপীড়িতের যন্ত্রণাকে সভ্যসমাজের গোচরীভূত করলেন, ভুললে চলবে না, এই মহৎ অনু-প্রেরণার মূলে একটি সাদা মানুষই ছিলেন উপস্থিত। দীনবন্ধু দেখেন নি ডিরোজিও সাহেবকে, না ডেভিড হেয়ারের সান্নিধ্যধন্য হবার সুযোগও তিনি পাননি, তবে একজনকার স্নেহ থেকে তিনি কখনো বঞ্চিত হন নি, সেই এক ও অনন্য মানুষটি হলেন রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ্।—ধর্মে খ্রীষ্টান ছিলেন তিনি অবশ্যই, কিন্তু ধর্মের সংকীর্ণতা তাঁকে কখনো ধরে রাখতে পারে নি। নইলে এদেশের মানুষকে ভালোবেসে তিনি কারাবরণ করে কী করে?

এই সব দেখে শুনে দীনবন্ধু ঠিক তাই তাত্ত্বিক হতে পারলেন না। দেশকে 'মা' বানিয়ে রচনা করতে পারলেন না তাঁর বন্দনা-গীতি। আবার উগ্রজাতীয়তাবাদের তাড়নায় পারলেন না সমগ্র ইংরেজ জাতির প্রতি গালিগালাজ বর্ষণ করতে। অথচ তাঁর ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতা ও গভীর সহানুভূতি তাঁকে ভীষণ ভাবে করে তুলল দেশপ্রেমিক। স্বপ্ন দেখতে থাকলেন জাতীয় উন্মেষের। বলাবাহুল্য, এইটুকুই হল দীনবন্ধুর লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য। একজন হিউম্যানিষ্টের যা হওয়া দরকার, তিনি ঠিক

সেই দায়িত্বই গেলেন পালন করে। মানুষকে ভালোবেসে মানুষের কাছেই পৌঁছে দিয়ে গেলেন মানুষের নালিশ। দীনবন্ধু যদি এ থেকে ভিন্ন কিছু হতেন, তবে খুব নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় 'নীলদর্পনের' ভূমিকা অন্ততঃ অন্যভাষায় লেখা হত। লেখা হত অন্য ছাঁদে। আর বইটিও যে অন্যভাবে লেখা হত, তা আরো নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

মানবিকতাবাদ

রেনেসাঁসের সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের ভাষারই এক বিদগ্ধ সমালোচক লিখেছেন, 'যে কোনো দেশে যে কোন যুগে নব জাগরণ ঘটতে পারে, কিন্তু যে কোন নবজাগরণই রেনেসাঁস নামের যোগ্য নয়। যেখানে ছেদ নেই, ডিস্কন্টিনিউটি নেই, সেখানে অন্ধকার থেকে আলোকে উত্তরণের প্রশ্ন ওঠে না। তা সে খ্রীষ্টীয় আলোকেই হোক আর গ্রীক আলোকেই হোক।'—[১০৭] লেখক এখানে ছেদ বা 'ডিস্কন্টিনিউটি' বলতে যা বোঝাতে চেয়েছেন, তার মূল কথা হল জীবনের একটি বোধ থেকে নতুন এক বোধে উত্তরণ। আর এই বোধ বা উপলব্ধি এতই ব্যাপক ও গভীর যে এর ফলে সর্বস্তরে এই ছেদ পড়ে, আরম্ভ হয় নতুন জীবন। পাকের পর পাক দিয়ে যে বাঁধন করা হয়েছিল শক্ত, সেই বাঁধনগুলিকে খুলে ফেলা হয় একেকটি করে। খুলে যায় শাস্ত্রের বন্ধন, খুলে যায় দেবতার বন্ধন, গুরুও যান দূরে সরে, পুরোহিততন্ত্র হয় পরাস্ত, পলাতক হন রাজা, আর সামন্তপ্রথা, কুসংস্কার, অসাম্য ইত্যাদি সব বাঁধনের দড়ি কেটে বেরিয়ে আসে নতুন মানুষ। এ মানুষ আগেও ছিল না, পরেও অবশ্য এই মানুষ থাকেন না। যাইহোক, এই যে 'মানুষঘটিত' নতুন আবিষ্কার, স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, কী এর নাম? রেনেসাঁস যেমন একটি নতুন শব্দ ঐ নামের বেলাতেও তেমনি একটি নতুন নামের প্রয়োজন দেখা দিল। না, এটা কোনো নতুন ধর্ম নয়, এটা একটা নতুন মনোভাব, অনেক ভেবেচিন্তে পণ্ডিত ব্যক্তিরা এর নাম দিলেন, 'মানবিকতাবাদ।' ইংরেজিতে একে বলা হয়, 'হিউম্যানিজ্‌ম্'।

যে ছেদ বা 'ডিস্‌কন্টিনিউটি'কে নবজাগরণের আবশ্যিক লক্ষণ বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে, কেবল সামাজিক দিক থেকে নয়, মানুষের বেলাতেও তার ব্যত্যয় ঘটল না। বাইরের বন্ধনমুক্তির কথা যে বলা হল, তা নিতান্তই

তুচ্ছ ব্যাপার, অন্ততঃ ভেতরের বিবর্তনের তুলনায়ত বটেই! নবজাগরণের প্রভাবে নতুন যে মানুষ বেরিয়ে এলো, ভেতরের দিক থেকেও সে হয়ে গেল 'ডিস্‌কন্টিনিউটি'র আরেক স্বতন্ত্র দৃষ্টান্ত। এ সম্পর্কে কসিরার সাহেবের বিশ্লেষণটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। ইনি লিখেছেন, 'The man of the Renaissance posseses definite characteristic propertis which claerly distinguish him from 'the man of the middle ages' He is characterised by his joy in the senses his turning to nature, his roots in the world, his self-containedness for the world of form, his individualism, his paganisn, his amoralism'. ১১০

গ্রীক দার্শনিক প্রোটোগোরসের সেই যে বিখ্যাত উক্তি—'মানুষই সব কিছুর মাপকাঠি', মানবিকতাবাদের এই প্রত্যয়টি এই যুগে যেন নতুন করে আবিষ্কৃত হল। এ মানুষ যে কতখানি আধুনিক, তা' সে চিহ্নিত হল তার আনন্দের ও খুশির প্রকাশ বৈচিত্র্যে, অনুভবের সূক্ষ্মতায়, প্রকৃতির প্রতি নতুন দৃষ্টিতে এবং সর্বোপরি পার্থিব আসক্তিতে। পার্থিব ব্যাপারের আত্মসম্পূর্ণতায় ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে এই যে নতুন মানুষ হয়ে উঠলেন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, তা' নতুন করে বলবার অপেক্ষা রাখে না, তবে এই সঙ্গে যা যোগ হল তা' হল 'প্যাগানিজম্‌' এবং নৈতিক ব্যাপারে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিভঙ্গী। খ্রীষ্টীয়-তত্ত্বে 'প্যাগানিজম' একটি নিন্দিত শব্দ, সূক্ষ্ম নীতিবোধের ধার যে ধারে না, সে আর যাই হোক, খ্রীষ্টীয় সভ্যতায় সে কিন্তু অনেক পিছনের সারির লোক।

কিন্তু এই নতুন মানুষের দল, একথা সর্বজন-বিদিত, ঐ খ্রীষ্টীয় অনুশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বেপরোয়া হয়ে বেরিয়ে পড়ল বিশ্ববিজয়ে। অন্য কারো কথা নয়, 'পিকোদেলা মিরান্দোলা'র কথাই ধরা যাক। ইনি 'সুপ্রিম মেকারে'র জবানীতে অসম্ভব সম্ভাবনাময় মানুষের যে ছবি আঁকলেন, তা' সত্যি-সত্যিই প্রোটোগোরস-কথিত ঐ বিখ্যাত কথাটিকেও যেন ছাপিয়ে যায়। 'সুপ্রিম-মেকার' ঈশ্বর প্রথম মানুষ আদমকে ডেকে বললেন, '···Thou restrained by no narrow bounds, according to thy own free will, in whose power I have placed thee, shalt define thy nature for thyself···Nor have we made thee either heavenly or earthly, mortal or immortal, to the end that thou, being as it were, thy own free maker and moulder shouldst fashion

thyself in what form may like thee best.' ···Thus to Man, at his birth, the Father gave of all variety and gems of every form of life.' ১১১

অর্থাৎ আদি স্রষ্টা ঈশ্বর আদমকে ডেকে বললেন, তোমাকে বাঁধতে পারে এমন বাঁধন থাকল না, তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় যে ভাবে খুশি, সেইভাবে তুমি বিকশিত করো নিজেকে। আর এই বিকাশের জন্ম আদি পিতা ঈশ্বর সবরকম বৈচিত্র্য এবং সবরকম জীবন-প্রণালীর মণিমুক্তো জন্মলগ্নেই দিয়ে দিলেন। অর্থাৎ ইশারা দিলেন বিপুল সম্ভাবনার।

এখানে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, কসিরার সাহেব যা বলেছেন, পিকোদেলার 'মানুষের মহত্ব নির্ণয়ক' বিষয়ের সঙ্গে তার খুব একটা ফারাক হল না। বরং বলা যায় এঁরা একই বক্তব্যকে তুলে ধরলেন, বিভিন্ন প্রকাশ রীতিতে, এই মাত্র।—যাইহোক, এই মানুষ যে বিপুল সম্ভাবনার অধিকারী এ বিষয়ে কোনো সংশয়ই রাখলেন না রেনেসাঁসের মানবতন্ত্রীরা।

কিন্তু একটি জিজ্ঞাসা থেকে যায়, মানুষ তার এই বিচিত্র সম্ভাবনা সমষ্টিকে বিকশিত করবে কী করে এবং কী ভাবে! নিজের ভাগ্য জয় করবার ব্যাপারে মানুষ যাকে প্রধান হাতিয়ার হিসাবে এ সময় বেছে নিল, তা হল বুদ্ধি এবং সেই সঙ্গে যুক্তিবাদ। আর তাকে যা মাতিয়ে তুলল, পাগল করল এবং অসম্ভব রকমভাবে করল উৎসাহিত, তা'হল স্বাধীন ইচ্ছা ও মুক্তিস্পৃহা। বলে রাখা ভালো, এ সব কথা নানা ভাবে ও বিভিন্ন প্রসঙ্গে ইতিপূর্বেই হয়েছে আলোচিত। বুদ্ধি যে মানুষকে সত্যান্বেষী করে, করে অভিজ্ঞ এবং সর্বোপরি বিশ্বপ্রকৃতির কার্যকারণ সম্পর্কে ও নিজের বিষয়ে সচেতন করে, তা' কারো অজানা নয়। এই বুদ্ধির ভূমিকা বিশ্লেষণ করে আমাদের সাহিত্যের এক সমালোচক রেনেসাঁসের প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'বুদ্ধি বহুত্বের মধ্যে ঐক্য আনে, দ্বন্দ্বের মধ্যে সৌষম্য ঘটায়, পরিবর্তনকে স্থিতিস্থাপক করে তোলে। এক কথায়, বুদ্ধি ব্যক্তি-অস্তিত্বে সমগ্রতা সম্পাদন করে। শুধু তাই নয়, বুদ্ধির ভিত্তিতে মানুষে মানুষে ভাবনার লেনদেন সম্ভব হয়, বিচিত্ররূপে সামাজিক সহযোগিতা গড়ে ওঠে এবং বুদ্ধির বিকাশের ফলে মানুষ ভাষা, যন্ত্র, রীতিনীতি প্রয়োগ-পদ্ধতি ইত্যাদির উদ্ভাবন করে নিজের অন্তর্নিহিত অফুরন্ত সম্ভাবনাকে নানাভাবে সার্থক করতে পারে।'১১২

বুদ্ধির প্রসঙ্গে এতখানি ব্যাখ্যা না করলেও চলে, কিন্তু আমরা যেন বিস্মৃত না হই, পরবর্তীকালের বুদ্ধিজীবীদের উদ্ভব এই রেনেসাঁসের মানবতন্ত্রী-

দের সূত্র ধরেই, আর তা' যদি না হত, রামমোহন থেকে রামগোপাল ঘোষ এবং ভূদেব-অক্ষয়-বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম প্রমুখ বুদ্ধিজীবীদের কী আমরা পেতাম! অনুরূপভাবে নিজেদের ব্যাপ্ত করবার মত মুক্তিস্পৃহাও আমাদের জাগত না, যদি না আমাদের বাঁধনগুলি অমনভাবে খুলে যেত! বুদ্ধিকে জাগ্রত ও মার্জিত করবার তাগিদ যেমন আমরা অনুভব করেছিলাম, ঠিক সেইভাবেই ভেতর থেকে তাড়া খেয়েছিলাম অনুভূতিকে আরো সূক্ষ্মতর করতে, সম্ভোগকে সতেজ করতে এবং সর্বোপরি মনে করতে যে পৃথিবীর তাবৎ সৌন্দর্য সৃষ্ট হয়েছে আমার জন্য, আমার প্রয়োজনে। পিকোদেলা ঈশ্বরের জবানীতে বলেছিলেন, 'Nor have we made thee either heavenly or earthly', ঠিক এই ভাষাতেই মানুষ উপলব্ধি করল যে সে পার্থিব না, স্বর্গীয়ও না, সে নিজেকে নির্মাণ করবে প্রয়োজনমত। তা' সে 'সধবার একাদশী'র নিমচাঁদও হতে পারে, 'নীলদর্পণের' নবীনমাধবও হতে পারে। এখন যে ভূমিকা তার পছন্দ। যে ছাঁদে সে চায় নিজের প্রতিষ্ঠা। এখন যা তার অভিলাষ।

প্রাসঙ্গিক ভাবে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলনতত্ত্বে'র কথা উঠতে পারে, কিন্তু আলোচ্য অধ্যায়টি তার কিছু আগের পর্যায়ের। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিকাশ যে রেনেসাঁসের একটি অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য ফলশ্রুতি, তা' আলোচিত হয়েছে ইতিপূর্বে। এবং রেনেসাঁসী-সাহিত্য নাড়াচাড়া করলে দেখা যায়, ব্যক্তির এই বিকাশকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করবার চেষ্টাও করা হয়েছে। সেই স্তরের প্রথম পর্যায়ে রয়েছে 'একক মানুষ', পরের পর্যায়ে 'অনন্য মানুষ' এবং তৃতীয় পর্যায়ে 'বৈশ্বিক মানুষে'র বিকশিত রূপ।—'নবজাগরণে'র ইতিহাস থেকে এর নজির যেমন তুলে ধরা যায়, সাহিত্যের পাতা ওল্টালেও এর উদাহরণ সংগ্রহ অসম্ভব নয়। অন্ততঃ দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের চরিত্রগুলিতে এ জাতীয় নমুনা প্রচুর। এরাজ্‌মুসের প্রবন্ধে, লিওনার্ডোর নোট-বইয়ে, কী মঁতেনের গদ্যরচনায় যে ভাবে মুক্ত-চিন্তা ও মুক্ত-মনের প্রকাশ ঘটেছে, বলতে দ্বিধা নেই, বাঙলা সাহিত্যে দীনবন্ধুর নাটকেই একমাত্র সেই ছাঁদেই চরিত্র চিত্রণের আভাস আছে। আছে সেই চিন্তা ও মনের ছাপ। অন্যত্র তেমন নেই।

দীনবন্ধু সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে দীনবন্ধুর যে-দুটি গুণের কথা বঙ্কিম বলেছেন, সেই গুণ দুটি হল, 'সামাজিক অভিজ্ঞতা' এবং 'প্রবল এবং স্বাভাবিক সর্বব্যাপী সহানুভূতি'।—বলার অপেক্ষা রাখে না, যাঁরা 'মানবতন্ত্রী' লেখক, তাঁদের পক্ষে এইগুলি অপরিহার্য গুণ হিসাবেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। না অধ্যাত্ম বিদ্যা, না পুঁথিগত বিদ্যা, এদের

কোনটারই ধার ধারেননি 'হিউম্যানিষ্ট' লেখককুল বা শিল্পীরা। এঁদের কাছে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার যে কী ভীষণ প্রয়োজন ছিল, তা লিওনার্ডোর গোপনে দশটি শব ব্যাবচ্ছেদের কারণ অন্বেষণ করলেই জানা যায়।

আর 'সর্বব্যাপী-সহানুভূতির' যে-কথা বলা হল, এই বিশেষ গুণটি না থাকলে বিচিত্র মানুষের হৃদয় উন্মোচন করা কী কখনো কারো পক্ষে সম্ভব হয়? এই সহানুভূতি না থাকলে 'অমন একটা তোরাপ, কি রাইচরণ, একটা আদুরী, কি বেরতী' যে দীনবন্ধু লিখতে পারতেন না, তা সুনিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। আবার নিজে পবিত্র চরিত্র হয়েও এ কারণে 'দুশ্চরিত্রের' দুঃখ বুঝতে তাঁর কষ্ট হত না। এ ব্যাপারে বঙ্কিমের ভাষা উদ্ধৃত করে বলা যায়, 'তিনি নিমচাঁদ দত্তের ন্যায় বিশুষ্ক-জীবন সুখ, বিফলীকৃত শিক্ষা, নৈরাশ্যপীড়িত মদ্যপের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, বিবাহ বিষয়ে ভগ্ন-মনোরথ রাজীব মুখোপাধ্যায়ের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন, গোপীনাথের ন্যায় নীলকরের আজ্ঞাবর্ত্তিতার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিতেন।'[১১৩]

অবশ্য এই যে বিষয়ের সঙ্গে একাত্ম হওয়া, এর পিছনে, শিল্পী যতই বিশুদ্ধ চিত্ত হোন-না-কেন, তাঁর অন্তরের সমর্থন একটু না থাকলে চলে না। বলা বাহুল্য, রেনেসাঁসী-মনে সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা দুর্বার। এ আকাঙ্ক্ষা কেবল রমণী সৌন্দর্যকে ঘিরে নয়, সমগ্র পৃথিবী জয় করবার এবং তাকে নিজের সম্ভোগে ব্যবহার করবার আয়োজন ও উদ্যোগে সে উৎরোল। সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে শিল্পী চান একাত্মতা, তাদের মধ্যে দিয়ে চান জীবনের স্বাদ। প্রচলিত ধারায় অনেক কাজকেই মনে হতে পারে 'বিবেক'-বিরোধী। কিন্তু ভুললে চলবে না 'বিবেক' নয়, এই শিল্পীদের সকলেই হলেন কবি। আর এ 'কবি'র একটি মাত্র তৃষ্ণা, সে তৃষ্ণা হল জীবন-তৃষ্ণা। সৌন্দর্য পিপাসা। সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষা। সুতরাং 'বিবেকরূপী নীতিবাদ' সর্বদা পরিত্যাজ্য।

বাস্তবে যদি এ পিপাসা না মেটে, তার জন্য কাল্পনিক সৌন্দর্যের জগতেও পা ফেলতে এঁদের বাধে না। বলা বাহুল্য দীনবন্ধুও তার ব্যতিক্রম নন। দীনবন্ধুর নাটকেও যে এ আকাঙ্ক্ষার ছায়াপাত ঘটেছে, তা' একেকটি নাটকের আলোচনার মাধ্যমেই তুলে ধরা যেতে পারে।

এই বাহ্য, 'মানবিকতাবাদে'র বিকশিত ধারা কিন্তু কাল্পনিক আকাঙ্ক্ষায় শেষ হয়ে যায় নি।—বাস্তবের দিক থেকে সে নিজের অধিকারকে ঐ ভাবে বাড়াতে বাড়াতে গিয়ে পৌঁচেছে একেবারে 'ফরাসী বিপ্লবে'র দরজায়। আমাদেরো দেশে ঠিক অনুরূপ ঘটনাই ঘটেছে। তবে বিকাশের সুযোগ

ও আঘাত শেষপর্যন্ত অনুরূপ ভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে নি। বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে। সাধারণ মানুষও সেদিন দেখা দিয়েছে এক মঞ্চে, একই সংগ্রামের সাথী হিসাবে বলার অপেক্ষা রাখে না, এই সংগ্রামের নাম,'নীল আন্দোলন'। ফরাসী বিপ্লবের মতনই এ আন্দোলন হঠাৎ হয়েছিল বিস্ফোরিত, এবং যদিও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি, তবু ভারত-সম্রাটের রাতের ঘুম যে কেড়ে নিয়েছিল, তার ঐতিহাসিক স্বীকৃতি আছে। না, আমাদের বক্তব্য এখানেও শেষ হয়ে যায় না, আমাদের মূল বক্তব্য হল,—তখনকার ঐ উৎপীড়িত মানুষদের চোখের সামনে চাক্ষুস করেছেন নাট্যকার দীনবন্ধু, শিল্পী হিসাবে তাদের চিরকালের মতন ধরেও রেখে গেছেন তাঁর নাটকে। ব্যাখ্যাতা বা ভাষ্যকারের ভূমিকা তিনি নেন নি, তিনি যে-ভূমিকা নিয়েছেন, তা' হল জীবন-রসিকের ভূমিকা। বাঙ্লা সাহিত্যে এই ভূমিকাতে তিনিই প্রথম অবতীর্ণ হয়েছেন, তাই অনেক ব্যর্থতা সত্বেও তিনি আজো জীবিত। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যাখ্যায় দীনবন্ধুর এই জীবন-রসিকতাকে এক শিল্পীর বা ভাস্করেরর সমতুল্য বলে চিহ্নিত করা যায়। এবং এ ভাস্কর্য কেমন তার স্বরূপ বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'দীনবন্ধু অনেক সময়েই শিক্ষিত ভাস্কর বা চিত্রকরের ন্যায় জীবিত আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া চরিত্রগুলিকে গঠিতেন। সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানর সমারূঢ় দেখিলেই, অমনি তুলি ধরিযা তাহার লেজশুদ্ধ আঁকিয়া লইতেন। এটুকু গেল তাঁহার Realism, তাহার উপর Idealize করিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া, আপনার স্মৃতির ভাণ্ডার খুলিয়া তাহার ঘাড়ের উপর অন্যের গুণ দোষ চাপাইয়া সাজাইতে সাজাইতে সে একটি হনুমান বা জাম্বুবানে পরিণত হইত। নিমচাঁদ, ঘটিরাম, ভোলানাথ প্রভৃতি বন্যজন্তুর এইরূপ উৎপত্তি। এই সকল সৃষ্টির বাহুল্য ও বৈচিত্র্য বিবেচনা করিলে, তাঁহার অভিজ্ঞতা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়।[১১৪]

না, আলোচনা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র যাকে 'বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা' বললেন, তার শিল্পরূপ হল দীনবন্ধুর নাটক। আর যে যুগ ও কাল তাঁর প্রতিভার বিকাশে এই সহায়তা করেছিল, তার পিছনে উজ্জ্বল অস্তিত্ব নিয়ে রয়েছে আমাদের 'নবজাগরণ'। সামাজিক বৃক্ষে সামাজিক বানররা এই সময়েই বসেছিল ল্যাজ ঝুলিয়ে। 'গণিকাচর্চা ও পানাসক্তি' যদি এ যুগের ল্যাজ হয়, এ ল্যাজের পরিচয় যেমন জানবার দরকার আছে, ঠিক অনুরূপ ভাবে যে-উদ্যানে এই বৃক্ষগুলি অবস্থিত ছিল সেই উদ্যানের পরিচয়ও জানা আবশ্যক। আর ঠিক তখনই উঠে 'সমাজ ও ধর্মের' প্রসঙ্গ বা 'স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তা-

বাদ'এর কথাও। আর 'নিউলার্নিং ও কলেজে'র প্রসঙ্গিক বৃত্তান্তও হয়অবশ্য আলোচ্য।—'দাতাকর্ণ' ও 'দাশরথি'র পাঠকের পক্ষে মাইকেলের সাহিত্য বোঝা যেমন স্ভব নয়, অনুরূপভাবে দীনবন্ধুকে বোঝাও সম্ভব হয়ে ওঠে না ঐ প্রাচীন মনের মানুষদের পক্ষে। সুতরাং নতুন যুগের নতুন আদর্শের কথা মনে রেখেই আমাদের দীনবন্ধুর সাহিত্য আলোচনায় প্রবেশ করা ভালো।

দীনবন্ধুর আলোচনার শেষে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'সেই অসাধারণ মনুষ্য কিসে অসাধারণ ছিলেন, তাহাই বুঝান আমার উদ্দেশ্য।'[১১৫] এই কথারই প্রতিধ্বনি তুলে আমরাও বলতে পারি, সেই অসাধারণ লেখক কিসে অসাধারণ ছিলেন, সেই কথা বোঝানোর জন্যই 'নবজাগরণে'র এই বিস্তৃত ভূমিকা।

॥ সূত্র নির্দেশ ॥

১। 'সধবার একাদশী' (সা. প. সং ১৩৫৩)—পৃ. ৮২

২। 'দাতাকর্ণের' এই বৃত্তান্ত মোটেই কিন্তু গালগল্প ব্যাপার নয়। 'অ্যাডমের রিপোর্ট'-এ এই পাঠ্যবইটির উল্লেখ পাওয়া যায়। সেকালে পাঠ্যপুস্তক বিষয়ে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার যে-সব মন্তব্য করেছেন, তা হল এই রকম: 'The literary texts mostly consisted of hymns addressed to different gods and godesses, and stories, based on the epics, like *Datakarna*'— Glimpses of Bengal in nineteenth century, (1960) P. 13.

৩। A Study of History. (Abridgement by D. C. Somervell, 1960), by Arnold J. Toynbee, P. 799.

৪। এই জিয়োর্জিও ভাসারি সম্পর্কে Webster's Biographical Dictinary, (1972)-তে যা লেখা আছে, তা হল এই রকম: Vasari, Giorgio. 1511-1574. Italian Painter, architect, and art historian ; considered founder of modern art history and criticism ; studied painting under Andrea deol Sarto and Michelangelo ; protegé of the de' Medici ; known esp. for his series of biographies of Italian artists from Cimabue to Michelangelo'—যে বইটিতে ইনি 'রেনেসাঁস' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, সেই বইটির জন্যই তাঁর খ্যাতি। বইটির নাম 'Lives of Italian Painters, scul - ptors, and Architects', এই বইটির প্রশংসায় অভিধানে লেখা আছে, 'Chief source book for history of Italian artists.'

৫। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, (১৯৫৭)—শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ৯১

৬। বাংলার রেনেসাঁস (ভাদ্র, ১৩৮১)—অন্নদাশংকর রায়। পৃ. ২-৩

৬ক। The civilization of the Renaissance in Italy. (Phaidon Press, London), Memlx, P. 81,

৬খ। A Shoter History of Science : Sir Willam Cesil Dampeir, P. 47.

৬গ। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯৫৭), পৃ. ৮৪

৬ঘ। The Good old days of Honorable John Company, W. H. Carey (1964), P. 165.

৬ঙ। 'Calcutta old and New' by Cotton. P. 581.

৬চ। রামতনু লাহিড়ী তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯৫৭), পৃ. ৮৪

৭। এঁর পুরো নাম, হল, ডঃ জন গ্রান্ট। ইনি ছিলেন 'ইণ্ডিয়া গেজেট' পত্রিকার সম্পাদক।

৮। শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থের (১৯৫৭ সং) ৮৫ পৃষ্ঠায় এই উক্তি লিপিবদ্ধ রয়েছে। এখানে ডিরোজিওর হিন্দু-কলেজের প্রবেশের তারিখ ভুল লেখা হয়েছে। ভুল আরো অনেক জায়গায় আছে। ঠিক তারিখ হল, ২রা মে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ।

৯। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা (১৯৬৩)—যোগেশ চন্দ্র বাগল পৃ. ১৩৮

১০। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯৫৭) পৃ. ৮৫

১১। এ ব্যাপারে কী রকম ষড়যন্ত্র হয়েছিল, তার একটি মজার কাহিনী আছে 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে'র ১০২-৩ পৃষ্ঠায়। লিখিত অংশটি এই রকম: 'তখন সহরে বৃন্দাবন ঘোষাল নামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিল। সে ব্রাহ্মণের কাজকর্ম কিছু ছিল না, প্রাতে গঙ্গাস্নান সারিয়া কোসাকুশি হস্তে ধনীদের বাড়ীতে বাড়ীতে ঘুরিত এবং এই সকল সংবাদ ঘরে ঘরে দিয়া আসিত। সে বলিয়া বেড়াইত যে, ডিরোজিও ছেলেদিগকে বলেন, ঈশ্বর নাই, ধর্মাধর্ম নাই, পিতামাতাকে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য নয়, ভাই-বোনে বিবাহ হওয়াতে দোষ নাই, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের সহিত ডিরোজিওর ভগিনীর বিবাহ হইবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। ক্রমে সহরে হুলস্থুল পড়িয়া গেল।'

১২। বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর, ১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৪৩

১৩। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, (১৯৬৩) যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃ. ১৫১

১৪। ঐ, পৃ. ১৪০

১৫। আত্মদর্শন, কার্তিক, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ।

১৬। টমাস পেইন আঠারো শতকের এক বিশ্ববিখ্যাত মনীষী। বাবার নাম জোসেফ এবং মায়ের নাম ফ্রান্সিস্ (কোকে)। জোসেফ ছিলেন 'ফ্রী-ম্যান'। খেতেন চাষবাস করে।—ছেলেটি কিন্তু একবারে অন্যরকম। পুরো বিদ্রোহী। পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চি ছিল এঁর উচ্চতা, তীক্ষ্ণ নাসা চওড়া কপাল। নিখুঁত কামানো মুখ। শরীরটা বরাবরই ভালো। ভালো ঘোড়ায় চড়তে পারতেন। হাঁটাতেও ছিলেন খুব পটু। আর স্কেটিং-এ ভারি ওস্তাদ।—স্যার লেসলি স্টিফেন ও সিডনি লী সম্পাদিত 'দি ডিক্‌শনারি অব ন্যাশানাল বায়োগ্রাফি'র পঞ্চদশ খণ্ডে এঁর সম্পর্কে যে পরিচয় দেওয়া আছে, তা' অতিবিস্তৃত। তাই ওয়েবস্টার থেকেই কিছু অংশ তুলে দেওয়া গেল: সাঁইত্রিশ বছর বয়সে ইনি পালিয়ে যান আমেরিকা। ওখানে গিয়ে লিখতে আরম্ভ করেন। তেরো বছর পরে আবার এলেন ইউরোপে। এবং তারপর, 'interested In French Revolution (1789) ; inspired to write the *The Rights of Man* (1791-92), defending measures taken in revolutionary France and appealing to the English to overthrow this monarchy and organize a republic, took refuge in France (1792) ; was

tried, convicted of treason and outlawed from England (1792); became member of French convention (1792-93); arrested, imprisoned in Paris as an Englishman (Dec. 1793—Nov. 1794); released on request of American minister, James Monroe, who said Paine was an American Citizen';—ঘটনা আরো আছে। বহুঘটনার নায়ক টমাস পেইন শেষ পর্যন্ত বিস্মৃত হয়েছিলেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই জুলাই ইনি মারা যান।

১৭। Life of Alexander Duff—Vol. 1 (London, 1879)—George Smith, P. 144—45.

১৮। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯৫৭), পৃ. ৯১

১৯। Freedom Movement in Bengal (1818-1904) Who's who, (1968), Edited by Nirmal Sinha, P. 70.

২০। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, (১৯৫৭), পৃ. ৬০

২১। ঐ, পৃ. ৬১

২২। বাংলার রেনেসাঁস, (ভাদ্র, ১৩৮১) অন্নদাশংকর রায়, পৃ. ৬

২৩। দীনবন্ধু মিত্র, (১৩৫৮), সুশীল কুমার দে, পৃ. ৭

২৪। সধবার একাদশী (সা. প. সং.), পৃ. ৩৭

২৫। ঐ, পৃ. ৭

২৬। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, (১৯৫৭), পৃ ১০২

২৭। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী, (বসুমতী সং) পৃ. ১৬৯

২৮। রামতনু লাহিড়ী ইত্যাদি, পৃ. ১০১-২

২৯। ঐ, পৃ. ১০১

৩০। সমাচার চন্দ্রিকা, ২২শে জানুয়ারী, ১৮৩১ খ্রীঃ

৩১। বিয়ে পাগলা বুড়ো, (সা. প. সং), পৃ. ৩৮

৩২। ঐ, পৃ. ১

৩৩। লীলাবতী, (সা. প. সং), পৃ. ৭৫

৩৪। নীলদর্পণ (সা. প. সং) পৃ. ৭৩

৩৫। সধবার একাদশী (সা. প. সং) পৃ. ১৬

৩৬। ঐ, পৃ. ১৯

৩৭। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ (১৯৫৭) পৃ. ১০২

৩৮। ঐ, পৃ. ১০২

৩৯। The Civilization of Renaissance in Italy by Burckhardt, P. 85,

৪০। Ibid, p. 241

৪১। The Renaissance, Edith Sichel, P. 129

৪২। Glimpses of Bengal etc. by R. C. Majumder, P. 13

৪৩। নীলদর্পণ (সা. প. সং) পৃ. ৪৩

৪৪। ঐ, পৃ. ৪৩

৪৫। এখানে যে কবিতাটি উদ্ধার করা হয়েছে, কবিতাটির নাম, 'বাঙ্গালীর মেয়ে', বসুমতী সংস্করণের ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলীতে ৩৪৩ পৃষ্ঠায় এই কবিতাটি আছে।

৪৬। লীলাবতী, (সা. প. সং), পৃ. ৩৮

৪৭। ঐ, পৃ. ২২

৪৮। 'নীলদর্পণ' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে নবীনমাধব এই স্কুল স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। মূল উক্তিটি একটু দীর্ঘ। নাটকের পক্ষে এ জাতীয় দীর্ঘ সংলাপ হয়ত অনুপযোগী, তবে যা একান্তভাবে সত্য, তা' হল এই সংলাপের প্রতিটি শব্দের ভেতর দিয়ে স্কুল স্থাপনের ব্যাকুলতা অত্যন্ত প্রবল। নবীন মাধব বলেছেন, 'নীলের দৌরাত্ম্য যদি রহিত হয়, তবে আমি পাঁচ দিবসের মধ্যে এই সকল বালকদের পাঠের জন্য স্কুল স্থাপন করিয়া দিতে পারি··· আমার বড় আটচালা পরিপাটি বিদ্যামন্দির হইতে পারে। দেশের বালকগণ আমার গৃহে বসিয়া বিদ্যার্জন করে, এর অপেক্ষা আর সুখ কি, অর্থের ও পরিশ্রমের সার্থকতা এই'।—উনিশ শতকের 'নিউলার্নিং'কে বোঝাবার জন্য এই সংলাপটি অবশ্যই পাঠকরা দরকার।

৪৯। বিয়ে পাগলা বুড়ো (সা. প. সং), পৃ. ১

৫০। সধবার একাদশী, (সা. প. সং), পৃ. ৬৭

৫১। ঐ, পৃ. ৬৭

৫২। Bengal under Lt. Governors, Vol I (1901), C. E. Buckland, P. 211.

৫৩। Ibid, P. 211

৫৪। 'মদ খাওয়া বড়দায়, জাত থাকার কি উপায়'? গ্রন্থের সূচনাতেই এই কাহিনী নিবেদিত হয়েছে।

৫৫। 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' (সা. প. সং), ১৩৫৫, পৃ. ৮৯

৫৬। সধবার একাদশী, (সা. প. সং), পৃ. ৭৬

৫৭। 'বান্ধব' পত্রিকা, ১২৮৩

৫৮। সেকাল আর একাল, (শক ১৭৯৬), রাজনারায়ণ বসু, পৃ. ২৭

৫৯। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, (১৯৫৭ সং), শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ ৮৮-তে এ উক্তিটি পাওয়া যাবে। তবে এই উক্তিটির মূল উৎস কিন্তু 'স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ের আত্মচরিত,' (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড সং), ১৩৬৩, পৃ. ৯৭-৯৮

৬০। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, পৃ. ৮৬

৬১। কবিতাটির নাম 'মদ'। বসুমতী সংস্করণের ঈশ্বর গুপ্তের রচনবলী, পৃ. ৩৪২

৬২। The Civilization of the Renaissance in Italv, (Phaidon Press, London) MCMLX, P. 242

৬৩। Ibid, P. 243

৬৪। সধবার একাদশী, (সা. প. সং) পৃ. ১৯

৬৫। 'সধবার একাদশী' নাটকের প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কেই অর্থাৎ নাটকে 'কাঞ্চন'কে যখন প্রথম দেখা গেল, ঠিক সেই মুহূর্তেই নিমচাঁদ ষোলো লাইনের একটি কবিতা দিয়ে তাকে স্বাগত জানিয়েছেন। শুধু 'নব্য-বঙ্গবৃন্দের মাথা চিবিয়ে খাওয়া নয়, বিকৃত রুচির প্রতীক হিসাবে দেখা হয়েছে এই গণিককুলকে, যথা, "নৃত্যগীত হাব ভাব শালিনি! / পাপ তাপ পুষ্প

মাল মালিনি ! / কেটনাখ্য গাড়ি যোড়ি হাঁকিনি ! / উল্‌সনের ভোগরাগ চাকিনি / ব্রান্ডি দেশ জাত মদ্য লোভিনি !' ইত্যাদি।

৬৬। Wanderings of pilgrim, etc. by Fanny Parkes, vol. I, (London, 1850), P. 29-30 দ্রষ্টব্য। এখানে খুব পরিষ্কার ভাবেই রামমোহনের নাম উল্লিখিত আছে এবং বাঈজীর প্রসঙ্গে যে বিবরণ আছে, তাতে বলা হয়েছে, '...one of the women was Nickee, the *Catalani* of the East.'

৬৭। বেলগাছিয়া কর্তৃপক্ষের অনুরোধেই 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও ' বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ' লিখিত হয়েছিল। কিন্তু এঁরাই শেষ পর্যন্ত বিষয়বস্তুর জন্য অভিনয়ের ঝুঁকি নিতে সমর্থ হন নি।—এ ব্যাপারে বিরক্ত হয়ে অভিনেতা কেশব গঙ্গোপাধ্যায়-কে একটি চিঠি লিখে মধুসূদন ক্ষোভের সঙ্গে জানিয়েছিলেন, 'Mind you, you all broke my wings once about the farces ; if you play a similiar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew and chinese !'

৬৮। The Renaissance (1961) Walter Pater, P. 54

৬৯। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (১৯৫৭ সং), শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ: ১০২

৭০। ইংরেজি উদ্ধৃতি এবং উক্ত বাঙলা অনুবাদ—দুইই রয়েছে 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ' গ্রন্থের (১৯৫৭ সং) ৮৭ পৃষ্ঠায়।

৭১। রামতনু লাহিড়ী ইত্যাদি, পৃ: ৮০।

৭২। 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য, (বিশ্বভারতী. ১৯৭২)—প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত, ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৭৩। 'ভারত পথিক রামমোহন রায়'। রবীন্দ্ররচনাবলী, (শতবার্ষিকী সং), ১১ খণ্ড, পৃ: ৪২৬।

৭৪। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ (১৯৫৭ সং), পৃ ৬৫।

৭৫। The History of Bengal (1757-1905), C. U. Publication, P. 657

৭৬। 'The Brahma Samaj and the battle for Swaraj' ; Bipin Chandra Pal, 'Sadharan Brahma Samaj,' (New Edn.) May 1945. P. 15.

৭৭। 'নবযুগের বাঙলা' (১৩৬২) বিপিনচন্দ্রপাল, পৃ. ২৪৪-৪৫

৭৮। 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাপারে দীনবন্ধু যে উদাসীন ছিলেন না, তা' তাঁর 'সুরধুনী কাব্যে'র দ্বিতীয় ভাগের শেষ অংশটুকু পড়লেই বোঝা যায়। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ-রাজনারায়ণ-কেশবসেন প্রমুখ কোনো মনীষীর কথাই তিনি বাদ দেন নি, বরং অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে এঁদের কথা বিবৃত করেছেন। যথা, দেবেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে,—'ধার্মিক দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম উপাসক, / ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ কলুষ নাশক ; / ব্রহ্মধ্যানে গদ গদ স-নীর নয়ন ; / ব্রাহ্মধর্ম বিস্তারিতে বিক্রীত জীবন।'

৭৯। এই প্রসঙ্গে যে ক'টি সংলাপ ব্যবহৃত হল, এদের সব কটিই রয়েছে 'সধবার একাদশী'র দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে।

৮০। সধবার একাদশী (সা. প. সং), পৃ. ১২

৮১। লীলাবতী (সা. প. সং) পৃ. ২০

৮২। লীলাবতী (সা, প, সং) পৃ. ৩৪।

৮৩। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ, (১৯৫৭ সং), পৃ. ৫৫

৮৪। ঐ, পৃ. ৫৫-৫৬

৮৫। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, (২য় খণ্ড, ১৩৫৬ সং) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত পৃ. ২৫৬

৮৬। Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century. (1960), P. 8.

৮৭। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (সা. প. সং). পৃ. ৩৮ দ্রষ্টব্য। এ প্রসঙ্গে Mocdonald-এর লেখা 'Rajah Rammohan Roy' etc. গ্রন্থের ৫ পৃষ্ঠায় রামমোহনের অল্পসময়ের ভেতর ধন সঞ্চয়ের প্রতি কটাক্ষ করে বলা আছে, '.. a matter which is not supposed to add to his fame.'

৮৮। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী, (বসুমতী সং), পৃ. ৩৪৩

৮৯। 'বঙ্গদর্শন', ভাদ্র ১২৮০, পৃ. ২০৯-১০, প্রবন্ধটির নাম, 'মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

৯০। The Civilization of the Renaissance in Italy to J. Burckhardt, P. 104.

৯১। Ibid, P. 111

৯২। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা, (১৯৬৩), যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃ. ১৩৫

৯৩। The Civilization of the Renaissance etc. P. 113

৯৪। বাংলার নব্যসংস্কৃতি (১৯৫৮), যোগেশ চন্দ্র বাগল, পৃ. ৪

৯৫। Henry Derozio (1884), by Thomas Edwards P. 32.

৯৬। সংবাদপত্রে বাংলার সমাজ চিত্র, ১ম খণ্ড, (১৯৬২) বিনয় ঘোষ সম্পাদিত ও সংকলিত, পৃ ৪৯৫

৯৭। 'এক্ষণ' পত্রিকা, সংখ্যা ফাল্গুন-চৈত্র, ১৩৭৬, প- ২২

৯৮। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ (১৯৫৭), পৃ. ১৫৩

৯৯। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা (১৯৬৩) যোগেশ চন্দ্র বাগল, প. ২২৫-২৬

১০০। বেঙ্গল স্পেক্টেটর, (ফেব্রু-মার্চ), ১৮৪৩

১০১। দীনবন্ধু রচনাবলী (মে, ১৯৬৭) সাহিত্যসংসদ প্রকাশিত। পৃ. ৪৪৩

১০২। সেকালের লোক (১৩৪৬)—মন্মথ নাথ ঘোষ, পৃ. ১৯-২০

১০৩। ঐ, পৃ. ২০

১০৪। রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, (১৯৫৭), পৃ. ১১৮

১০৫। রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, (জন্মশতবার্ষিকী সং) পৃ. ৬৬

১০৬। 'দ্বাদশ কবিতা'র 'প্রবাসী' কবিতাটির প্রথম কয়েক পংক্তি।

১০৭। 'নবযুগের বাংলা,' বিপিন চন্দ্র পাল, প্. ২৪৯

১০৮। ঐ, প্. ২৬৭

১০৯। এই মন্তব্যের লেখক হলেন অন্নদাশংকর রায়। অন্নদাশংকর তাঁর 'বাংলার রেনেসাঁস' গ্রন্থের ৭ পষ্ঠায় এই 'ডিসকন্টিনিউটি'র কথা বলেছেন।

১১০। The philosophy of Ernst Cassirer, edited by P. A. Schilpp, প্. ৭২০

১১১। Picodella Mirandola তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ ' Discourse on the Diginity of Man'-এ এই কথাগুলি বলেছেন। পিকোদেলা মিরান্দোলা একটি অতিবিখ্যাত নাম। ইটালীয় হিউম্যানিস্ট হিসেবে এঁর বিশ্বজোড়া খ্যাতি। এঁর জন্ম ১৪৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। মাত্র একত্রিশ বছরের আয়ুষ্কাল। আলোচ্য উদ্ধৃত অংশটি John Addington Symonds-এর লেখা Renaissance in Italy গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের ৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধার করা হল।

১১২। প্রাবন্ধিক হিসাবে শিবনারায়ণ রায় সাম্প্রতিক কালের বাঙলা সাহিত্যে একটি বিখ্যাত নাম। কেবল বিখ্যাত নন, সমালোচনার ক্ষেত্রে ইনি 'বিতর্কিত'ও। তবে রেনেসাঁসের বিষয়ে যে লেখাগুলি, সেগুলি বর্তমান লেখকের বড়ো প্রিয়। আলোচ্য উদ্ধৃতিটি শ্রীরায়ের লেখা 'কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা' গ্রন্থের ৫৮ পৃষ্ঠা থেকে নেওয়া।

১১৩। 'বঙ্কিমরচনা সংগ্রহ', প্রবন্ধ খণ্ড শেষ অংশ, (৭ই জুন, ১৯৭৩), সাক্ষরতা প্রকাশন পৃ. ১১৩২

১১৪। ঐ, পৃ ১১৩১

১১৫। ঐ, পৃ. ১১৩৬

দুই

।। নাট্যকারের জীবনী ।।

রেনেসাঁসের যুগে জীবনী ও আত্মজীবনী লেখবার ঝোঁক যে প্রবলতর, একথা সর্বজন বিদিত। আমাদের 'নবজাগরণের' ইতিহাসও এ ব্যাপারে কম সমৃদ্ধ নয়। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এই যে, দীনবন্ধু মিত্রের জীবনের খুঁটিনাটি বৃত্তান্ত প্রায় অজ্ঞাত, যদিও তাঁর জীবনের বিকাশ ও সমৃদ্ধি ঘটেছে 'নবজাগরণে'র পরিবেশ ও পটভূমিতে। তাই এই নাট্যকার সম্পর্কে যাঁরাই আলোচনা করতে গিয়েছেন, তাঁরাই ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছেন, 'A full and detailed biography of Dinabandhu is still a long-felt want and Jogindra Basu's 'Life of Madhusudan' just helps us to realise actually what is lacking in the case of other dramatists'[১]

দীনবন্ধু নিজে তাঁর জীবন-কথা কোথাও লেখেননি। অবশ্য লেখবার মত অবকাশ ও দীর্ঘজীবন তিনি পান নি। তবে এঁর সর্বাপেক্ষা অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং, ইচ্ছে করলে এই বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর একটি বিস্তৃত জীবনী লিখতে পারতেন। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার, এই দায়িত্ব তিনি তিনি ঘাড় পেতে নিলেন না। অবশ্য 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা' নামক একটি প্রবন্ধ তিনি লিখেছিলেন, কিন্তু আকারে সেটি অনেক ক্ষুদ্র এবং প্রকারে খুব উৎকৃষ্ট হলেও অনেক জিজ্ঞাসারই জবাব ঠিকমত এতে পাওয়া যায় না। মানবতন্ত্রী নাট্যকারকে বুঝতে হলে যে-সব ঘটনা এবং তাঁর কাছাকাছি যে-সব মানুষের পরিচয় জানা দরকার, বলা বাহুল্য, তার কিছুই এখানে ব্যক্ত হয় নি। আগেই বলেছি বঙ্কিমচন্দ্র এ দায়িত্ব পালন করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তা' করলেন না।

তবে একটি কৈফিয়ৎ ইনি দিয়েছেন। এই কৈফিয়তে বঙ্কিম লিখেছেন, 'দীনবন্ধুর জীবনচরিত লিখিবার এখন সময় হয় নাই। কোন ব্যক্তির জীবনের ঘটনা পরম্পরার বিবৃতমাত্র জীবনচরিতের উদ্দেশ্য নহে। কিয়ৎ পরিমাণ তাহাও উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু যিনি সম্প্রতিমাত্র অন্তর্হিত হইয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধীয় প্রকৃত ঘটনা সকল বিবৃত করিতে হইলে, এমন অনেক কথা বলিতে

হয় যে, তাহাতে জীবিত লোক লিপ্ত। কখন কোন জীবিত ব্যক্তির নিন্দা করিবার প্রয়োজন ঘটে; কখন জীবিত ব্যক্তিদিগের অন্যপ্রকার পীড়াদায়ক কথা বলিবার প্রয়োজন হয়; কখন কখন গুহ্যকথা ব্যক্ত করিতে হয়, তাহা কাহারও না কাহারও পীড়াদায়ক হয়। আর, একজনের জীবন বৃত্তান্ত অবগত হইয়া অন্যব্যক্তি শিক্ষাপ্রাপ্ত হউক, ইহা যদি জীবন চরিত প্রণয়নের যথার্থ উদ্দেশ্য হয়, তবে বর্ণনীয় ব্যক্তির দোষগুণ উভয়েরই সবিস্তর বর্ণনা করিতে হয়। দোষশূন্য মনুষ্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই; দীনবন্ধুরও যে কোন দোষ ছিল না, ইহা কোন্ সাহসে বলিব? যে কারণেই হউক, এক্ষণে তাঁহার জীবন-চরিত লিখিতব্য নহে।'[২]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই অকপট কৈফিয়ৎ হতে সামান্য যা বোঝা যাচ্ছে, তা থেকে একথা খুবই স্পষ্ট যে জীবিত কোনো ব্যক্তির নিন্দাসূচক কথা বলতে তিনি প্রস্তুত নন, যদিও প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের জন্য তা' বলবার প্রয়োজন ছিল। তা' ছাড়া স্বয়ং দীনবন্ধুর ভেতরেও এমন কিছু কিছু দোষ রয়ে গিয়েছিল, যা বঙ্কিমচন্দ্র বিবৃত করতে চান নি। বলা বাহুল্য, এই সব সাত পাঁচ ভেবে হাকিম বঙ্কিমচন্দ্র রায় দিয়ে বসলেন, 'এক্ষণে তাঁহার জীবন-চরিত লিখিতব্য নহে।'

বলতে দ্বিধা নেই, দীনবন্ধুর অভিন্নহৃদয়বন্ধু এই যে রায় দিলেন, এই রায়ই শেষ পর্যন্ত বহাল রয়ে গেল। হাকিম টললেও, হুকুম টলল না।

তবু বিভিন্ন উৎস থেকে যে-সব উপকরণ সংগ্রহ করা যায়, সেই উপকরণ-গুলির মাধ্যমে 'হিউম্যানিস্ট' দীনবন্ধুর একটি ছবি যে ফুটে উঠে না, তা' নয়। পরবর্তীকালে তাঁর সাহিত্যে মানবিকতাবাদের যে চূড়ান্ত প্রকাশ দেখা যায়, সেই প্রকাশক্ষম শক্তি কী ভাবে তিনি দিনে দিনে সঞ্চয় করেছেন, তা জানতে হলে তাঁর জন্মলগ্ন থেকেই জীবনী পর্যালোচনা করা ভালো।

তবে মজার ব্যাপার এই, সূচনাতেই গোলযোগ। দীনবন্ধুর জন্ম-তারিখ নিয়ে অনেকেই একটু গোল বাধিয়ে বসেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই এঁর জন্মসনের কথায় লিখেছেন 'দীনবন্ধু বাংলা ১২৩৬ বা ইংরেজী ১৮২৯ সালে কলকাতার অদূরবর্তী চৌবেড়িয়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।'[৩] কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন, 'সন ১২৩৮ সালে দীনবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন।'[৪] দীনবন্ধুর পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র জানালেন যে তাঁর বাবার জন্মসন '১২৩৬ চৈত্র।'[৫] এদিকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর লেখা 'সাহিত্যসাধক চরিতমালায়' দীনবন্ধুর

জন্মসন প্রসঙ্গে যে তারিখ দিয়েছেন, তা' হল, '১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ', আর বাজলা সাল বঙ্কিমের অনুসারী। এইভাবে তল্লাশ-তদন্ত করলে দেখা যায়, অনেক বিশিষ্ট লেখকই এমন অসর্তকভাবে দীনবন্ধুর জন্মতারিখ লিপিবদ্ধ করেছেন যে তার ফলে, গোল বেধেগেছে। বঙ্কিমের দেওয়া বাঙলা সন ১২৩৮ সাল ধরে হিসাব করলে দেখা যায়, ইংরেজি সনে এটি দাঁড়ায় ১৮৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দ। বলাবাহুল্য, এই খ্রীষ্টীয় সনটি কেউই দীনবন্ধুর জন্মসন বলে চিহ্নিত করেন নি। আর ওদিকে শিবনাথ শাস্ত্রীর ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দকে গ্রহণ করলে চৈত্রমাসের নিরিখে ১২৩৬ বঙ্গাব্দকে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এইসব নানাদিক বিচার বিবেচনা করে গবেষকদের কাছে ললিতচন্দ্র মিত্রের বাঙ্‌লা সনটিই গ্রহণীয় বলে গণ্য হয়েছে। তাই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, দীনবন্ধুর জন্মতারিখ হল, 'চৈত্র, ১২৩৬ বঙ্গাব্দ এবং খ্রীষ্টীয় ১৮৩০ সন।'[৬]

জন্মসন থেকে সরে এসে এবার দীনবন্ধুর জন্মভূমির দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে। নদীয়া-কাঁচড়াপাড়ার কয়েক ক্রোশের ভেতর ছোট্ট একটি গ্রামে এঁর জন্ম। জন্মভূমির নাম, চৌবেড়িয়া। এই গ্রামের পরিচয় প্রসঙ্গে 'সুরধুনীকাব্যে' দীনবন্ধু লিখেছেন,

'পাক দিয়ে বেড়ে যাব চৌবেড়িয়া গ্রাম,
বিনত দীনের যথা অতি দীন ধাম।'[৭]

দীনবন্ধুর পুত্র বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র তাঁর 'আকিঞ্চন' কাব্যগ্রন্থের একটি জায়গায় এই গ্রামের স্মৃতিকে রেখেছেন আরে সুন্দর করে ধরে। এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে এই গ্রামটির বর্ণনায় কবি লিখেছেন,

'· চৌবেড়িয়া তোমার কানন-মাঝে
ত্রিদিবের গন্ধরাজ ফুটিল অতুল সাজে;
তোমার মৃত্তিকাধন্য দীনবন্ধু পরশনে,
চির-প্রতিভাত তুমি তাঁর 'নীল-দরপণে'।[৮]

চৌবেড়িয়াকে ঘিরে যে নদীটি ছিল, তার নাম হল 'যমুনা'। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণে' এই গ্রাম আভাসিত কী না, তার বিচার করা কঠিন। তবে 'স্বরপুরের' বর্ণনায় যদি চৌবেড়িয়ার স্মৃতি নাট্যকার ব্যবহার করে থাকেন, তাতে অবশ্য আশ্চর্য হবার কিছুই নেই, বরং সেটাই স্বাভাবিক।

বাবার নাম, কালাচাঁদ। এই কালাচাঁদ মিত্র হলেন ছয় ছেলের বাবা। কনিষ্ঠতম ছেলেটি হল, গন্ধর্বনারায়ণ। পিতা কালাচাঁদের পৈত্রিক নিবাস অবশ্য ছিল চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত বেলিনী গ্রামে, কিন্তু মাতুলালয় চৌবেড়িয়ার

ইনি মানুষ হন এবং পরে এখানেই স্থায়ীভাবে রয়ে যান। তবে এর সংসারটি ছিল অভাবের সংসার। তাই গ্রামের পাঠশালায় লেখাপড়া শেষ হতে-না-হতে পিতা কালাচাঁদ তাঁর এই কনিষ্ঠ পুত্রটিকে ঢুকিয়ে দেন জমিদারী সেরেস্তায়। মাসে মাসে আট টাকা মাইনে।

না, কিশোর গন্ধর্বনারায়ণের এ জীবন পছন্দ হল না। না নাম, না পেশা, কোনোটিকেই পারল না সে মেনে নিতে। নামের ব্যাপারে বেচারি যে কী পরিমাণ নাকাল হয়েছিল, তার বিবরণ পাওয়া যায় শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা থেকে, ইনি লিখেছেন, 'তাঁহার পিতা তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন 'গন্ধর্বনারায়ণ', লোকের মুখে এই নাম দাঁড়াইল 'গন্ধ', সমবয়স্ক বালকদিগের মুখে হইয়া পড়িল, 'থু থু গন্ধ'। এইরূপে পিতৃদত্ত নামটি বালকের একটা অশান্তির কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। যদিও তাঁহার জননী বিদ্রূপকারী বালকদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন 'তোরা একদিন দেখবি ওর গন্ধে দেশ আমোদিত হবে' তথাপি সমবয়স্কদিগের বিদ্রূপে শিশু গন্ধর্বনারায়ণ নিশ্চয় উত্যক্ত হইতেন।'[৯]—এতো গেল নামের ব্যাপার, ওদিকে আট টাকার চাকরিও পছন্দ হল না ঐ কিশোরটির। কেননা কলকাতা তখন দুর্বার বেগে তাঁদের টানছে, অন্ততঃ যাঁদের মনে আগুন আছে। সেইটানে গন্ধর্বনারায়ণও পড়ল। এরপর 'বিশ্বকোষের' রচয়িতা নগেন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, 'বালক দীনবন্ধুর কিছুতেই চাকুরীতে মন টিকিল না। তিনি পিতাঠাকুরের কথায় অবাধ্য হইয়া চাকুরী পরিত্যাগ করিলেন এবং কলিকাতায় আসিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তখন বাহির সীমুলীয়ায় পিতৃব্যের বাটি আসিয়া খুড়তুতা ভাইগণের আশ্রয়ে ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করিলেন। এখানে তাঁহাকে পালাক্রমে রন্ধনকার্য করিতে হইত।'[১০]

এই পিতৃব্যের নাম সম্ভবতঃ নীলমণি। সীমুলিয়ায় শিবনারায়ণ দাস লেনে সেদিন এই পিতৃব্য এবং তাঁর ছেলেরা থাকতেন। যাইহোক 'কলিকাতায় আসিয়া প্রথমে তিনি তাহার ভাবী নীলদর্পণ নাটকের ইংরাজী অনুবাদক (?) মহাত্মা লঙ্ সাহেবের অবৈতনিক ইংরাজী বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন। লঙ সাহেব বালক দীনবন্ধুকে পুস্তক ও অর্থ দিয়া সাহায্য করিতেন। কলিকাতায় ইংরেজী শিখিতে আরম্ভ করিয়া দীনবন্ধু পিতৃদত্ত গন্ধর্বনারায়ণ নাম পরিত্যাগ করিয়া দীনবন্ধু নাম গ্রহণ করেন। তখন হইতে দীনবন্ধু নামে পরিচিত হইয়াছেন।'[১১]

এরপর যা ঘটল, তা এই রকম: 'লং সাহেব তাঁহাকে বড়ই স্নেহ

করিতেন। কিন্তু তখন কেহই জানিতেন না যে, তাঁহাদিগের নাম ভবিষ্যতে অত ঘনিষ্ঠরূপে একত্রিত হইবে। লং সাহেবের স্কুল হইতে দীনবন্ধু মাসিক দুইটাকা মাহিনায় একস্কুলে ভর্ত্তি হন। স্কুলের মাহিনা তাঁহাকে চাঁদা লইয়া সংগ্রহ করিতে হইত। সেই স্কুল হইতে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং বৃত্তি পাইয়া হিন্দুকলেজে প্রবেশ করেন।'[১২]

লং সাহেবের স্কুল এবং হিন্দুস্কুলের মাঝে কিছুদিনের জন্য দীনবন্ধু যে স্কুলে পড়েন, সে স্কুলটি যে 'হেয়ার স্কুল', তা' ব্যাখ্যা করে না বললেও চলে। অবশ্য ঐ স্কুলটি 'কলুটোলা ব্রাঞ্চ স্কুল' নামেই তখন ছিল পরিচিত, ১৮৬৭ থেকে এর নামকরণ হয় 'হেয়ার স্কুল'।

হিন্দু কলেজের শিক্ষা দীনবন্ধুকে কী ভাবে প্রভাবিত করেছিল, তা' বিস্তৃতভাবে বলবার আগে রেভারেণ্ড জেম্‌স লঙের কথা একটু বলে নেওয়া ভালো। না, ইনি ডিরোজিও বা ডেভিড হেয়ার নন, এমন কী কবিতা লেখায় রিচার্ডসনের মতন অনুপ্রাণিত করবার মত কবিমনও এঁর ছিল না। তবে এঁর মধ্যে যা ছিল, তা' হল প্রচুর মানবিক গুণ। যে-মানবিক গুণ থাকার জন্য হিউম্যানিষ্টরা 'হিউম্যানিষ্ট' বলে চিহ্নিত, এ হল সেই মানবিক গুণ। যদিও লঙ্‌ সাহেবের এ দেশে আগমন খ্রীষ্টীয় সূত্রেই ঘটেছিল, কিন্তু মজার ব্যাপার এই, এ বাঁধন ছিঁড়ে ধর্মের বেড়া টপ্‌কে মানব সেবায় নিজেকে সমর্পণ করতে তাঁর অসুবিধা ঘটেনি এতটুকু। বরং অলৌকিক ঈশ্বর সেবার পরিবর্তে ইনি অধিকতর উৎসাহ বোধ করেছিলেন দীন-দরিদ্রের সেবায় নিজেকে নিয়োগ করে। লাঞ্ছিত মানুষদের জন্য যে-কোনো দুঃখ বরণ করিতে ইনি ছিলেন প্রস্তুত, এবং শেষপর্যন্ত যে কারাবরণ পর্যন্ত করেছিলেন পরবর্ত্তীকালের ইতিহাস তার সাক্ষী। জন্ম বিলেতে, ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে, কৈশোর কাটল রাশিয়ায়, পরেও সেখানে গেছেন একাধিক বার। ভাষা জানতেন অনেকগুলি। যে খ্রীষ্টীয়-সূত্রে এদেশে আগমন, সে সূত্রটি হল, ইংল্যাণ্ডের 'চার্চ মিশনারী সোসাইটি'র প্রচারকের কাজ। প্রথমে এই কলকাতাতেই কার্যারম্ভ। সেকালে মির্জাপুরে চলত সোসাইটির একটি স্কুল। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে ছাব্বিশ বছর বয়সে এ দেশে যখন তিনি এলেন, তখন তাঁর ওপর সম্ভবতঃ প্রথম যা' কাজ পড়েছিল, তা' হল এ' স্কুল পরিচালনা। সম্ভবতঃ দীনবন্ধুর সঙ্গে এখানেই তাঁর প্রথম পরিচয়, এবং সে পরিচয় দুজনকে যে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল, তা বিশদ করে বলবার অপেক্ষা রাখে না।

ডিরোজিও বা তারো আগে ডেভিড ড্রামণ্ডের কথা আমরা বিস্তারিতভাবে

আলোচনা করেছি। শিক্ষক হিসাবে তাঁদের ভূমিকা আমাদের অজ্ঞাত নয়। এখন আমাদের কৌতূহল, পাদরি লঙ্ 'হিউম্যানিষ্ট পণ্ডিত হিসাবে সেই ভূমিকার এক কণাও পালনে কী সমর্থ ছিলেন? শিক্ষার ব্যাপারে তিনি কী আমাদের যুগের সাথী ছিলেন, না খ্রীষ্টীয়করণের দিকেই তাঁর আকর্ষণ ছিল প্রবল?

১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড আমহার্ষ্টকে লেখা চিঠিতে রামমোহন যে বস্তুমুখী ইউরোপীয় শিক্ষার জন্য আকুলতা প্রকাশ করেছিলেন, এ সব তত্ত্ব যাচাই করবার আগে ঐ আকুলতার কথা আমাদের মনে রাখা দরকার। রামমোহনের ইচ্ছা ছিল, আমাদের দেশে চালু হোক 'এ মোর লিবারেল অ্যাণ্ড এনলাইটেন্‌ড সিস্‌টেম অব এডুকেশন' আর এই শিক্ষায় পাঠ-ক্রম হিসাবে অন্তর্গতহোক গণিত, ন্যাচারেল ফিলোজফি, কেমিষ্ট্রি, অ্যানাটমি ইত্যাদি প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান-শাস্ত্র। অবশ্য রামমোহন যে এই শিক্ষা-ব্যবস্থার কথা বলেছিলেন, তা' অবশ্যই গণশিক্ষার জন্য নয়। 'নীলদর্পণে'র তোরাপ-রাইচরণের ছেলেমেয়েরা ঠিক কী রকম শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত হবে, এই গণশিক্ষার কথা রামমোহন ভাববার অবকাশ পান নি, আর ড্রামণ্ড-ডিরোজিও যাঁদের ছাত্র হিসাবে পেয়েছিলেন, তাঁরা আর যেখানকারই হোক-না-কেন নিচুতলার মানুষ অন্ততঃ ছিলেন না।—ঐ মাটির কাছাকাছি মানুষদের কথা প্রথম যিনি ভাবলেন, যতদূর জানা যায়, সেই প্রথম মানুষটি হলেন রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ্। না, কেবল ভাবা নয়, একটি শিক্ষাদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য তিনি যে আত্মনিয়োগ করে-ছিলেন, সে খবরও পাওয়া যায়। কোলস্‌ওয়ার্দি গ্রাণ্টের লেখা 'রুরাল লাইফ ইন্ বেঙ্গল' গ্রন্থের পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে একটি জায়গায় অবশ্য চোখ আটকে যেতে বাধ্য, যেখানে গ্রান্ট সাহেব আমাদের লঙ্ সাহেবকের ঠাকুরপুকুরের কাছে একটি স্কুল পরিচালনায় দেখছেন। গ্রান্ট তাঁর অভিজ্ঞতার কথায় লিখেছেন, 'I lately paid a visit to a school at a place called T*hakoor pookor* about ten miles south of calcutta, and which owes its origin to the zeal of the Rev. Mr. Long, whose meritorious object was the education of the *lower classes*—the peasantry.

না, লেখক গ্রান্ট এখানেই থামেন নি, ইনি লঙ্ সাহেবের বিশেষ একটি শিক্ষাপদ্ধতির সন্ধানও পেয়েছেন। সে কথায় ইনি লিখেছেন, 'Mr

Long's plan is very much upon the Pestalozzian system—an endeavour to cultivate the mind by aid of the Book of God, and the Book of Nature.'[১৩]

'পেস্তালোজিয়ান' শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশে এবং ঈশ্বরের ও প্রকৃতির বই থেকে পাঠ নিয়ে শিশুরা বড়ো হয়ে উঠুক, এ সত্যে ভলত্যার রুশো যেমন বিশ্বাসী ছিলেন, অনুরূপভাবে, অবশ্য একটু অন্যরীতিতে, 'পেস্তালোজিওরও[১৪] ছিল সুগভীর আস্থা ও বিশ্বাস। ভাবতে অবাক লাগে, যে শিক্ষাবিদের শিক্ষা-ব্যবস্থা ইউরোপেও যখন ভালো করে চালু হয়নি, সেই নতুন রীতির শিক্ষা নিয়ে আমাদের বাঙ্‌লাদেশের একটি অখ্যাত গ্রামে চলছে পরীক্ষা-নিরীক্ষা! আর যে ব্যক্তি এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালাচ্ছেন, নিঃসন্দেহে তিনি আসন্ন একটি নতুন যুগের স্বপ্নও দেখছেন, নতুবা কেন তাঁর এই প্রয়াস?

ঐ নতুন যুগ যে দূরবর্তী ছিল না, পরবর্তীকাল তার সাক্ষী। 'নীল আন্দোলন'-কে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে যখন অত্যাচারের বন্যা প্রবাহিত হয়ে গেল, এবং অবশেষে দেখা দিল গণ-জাগরণ, ঐ গণ-জাগরণের পিছনে যে একটি বিদেশী মানুষ ছিলেন, আর সেই মানুষটি যে লঙ্‌ সাহেব তা' নতুন করে বলবার আর অপেক্ষা রাখে না!

এরপরে এই সিদ্ধান্তে সহজেই পৌঁছুন যায়, প্রথম কৈশোরে দীনবন্ধু ঐ রকম একটি বিরাট মানুষের সান্নিধ্যে আসতে পেরেছিলেন বলেই তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষদের প্রতি তিনি হতে পেরেছিলেন সহানুভূতি-সম্পন্ন, আর হতে পেরেছিলেন ওদের ওপর অতখানি দরদী! সর্বোপরি, এদের প্রতি যে অত্যাচার দেখেছিলেন, সেই নিপীড়ন দেখে একজন নীরবদর্শক হয়ে থাকতে পারেন নি। এদের জন্যই রাজশক্তি বিরুদ্ধে ধরলেন কলম। ডিরোজিও-ডেভিড হেয়ার যেমন মুক্ত-চিন্তা ও নতুন-শিক্ষার জগতে ডেকে এনেছিলেন এ দেশের তরুণ সমাজকে, ক্যাপটেন রিচার্ডসন যেমন অনুপ্রাণিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন ঐ 'তরুণ-বাঙ্‌লা'কে কাব্য লিখতে ও সাহিত্যচর্চায় মাতিয়ে তুলতে, এই রেভারেণ্ড জেমস্‌ লঙ্‌ও ঠিক অনুরূপ একটি ভূমিকা আমাদের দেশে পালন করলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রয়োজনে রাজ-শক্তিকেও তিনি করলেন না পরোয়া। তাই সাত সমুদ্দুর তের নদী পারের একটি বিদেশী মানুষ আমাদের দেশে 'স্বদেশী' করে প্রথম

করলেন কারাবরণ।—পৃথিবীর ইতিহাসে এ দৃষ্টান্ত বোধ হয় বিরল। কেবল বিরল নয়, সম্ভবতঃ দুর্লভ।

উনিশ শতকের পাঁচের দশকের একদল তরুণের ওপর এই মানুষটির যে কী ভীষণ প্রভাব ছিল, তা' তাঁর কারাবরণ উপলক্ষে যে সব ঘটনা ঘটেছিল, সেগুলির দিকে তাকালেই বোঝা যায়।—আর দীনবন্ধুর ওপর এঁর প্রভাব কী পরিমাণে পড়েছিল, তার বিচার করতে হলে 'নীলদর্পণে'র রচনার পিছনের ইতিহাসও সংগ্রহ করতে হয়। যদি দেখা যায়, লঙ্‌ সাহেবের উৎসাহেই এ গ্রন্থটি রচিত হয়েছিল, তা' হলে আমাদের পক্ষে তা' কী খুবই বিস্ময়ের বিষয় হবে?

না, আলোচনা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। তবে জেনে রাখা দরকার, দীনবন্ধু আলোচনা প্রসঙ্গ রেভারেণ্ড জেমস্‌ লঙের কথা শুধু অপরিহার্য নয়, অনিবার্য। তাই এটুকু আলোচনা করতে হল।

এবার প্রসঙ্গান্তরে আসা যাক। যে তরুণ ছেলেটি একদা কলকাতার টানে এসেছিল নতুন শিক্ষায় শিক্ষিত হযে নতুন জীবনে দীক্ষা নিতে, লেখা পড়ায় সে কী ভাবে মনোনিবেশ করেছিল, তার পরিচয় একটু নেওয়া যাক। এ প্রসঙ্গে 'প্রদীপ' পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু অংশ-বিশেষ উদ্ধার করা যেতে পারে, এই পত্রিকায় লিখিত আছে, '... তিনি অবিচলিত অধ্যবসায় ও প্রতিভাবলে সকল বাধাই অতিক্রম করিতে লাগিলেন। তাঁহার পাঠে কিরূপ মনোযোগ ছিল, তৎসম্বন্ধে একদিনকার ঘটনার উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। একদিন প্রাতঃকালে বাসাতে একজন গায়ক অতি উৎকৃষ্ট গান করিতেছিল। সকলে আনন্দ সহকারে এবং অতি আগ্রহের সহিত গান শুনিতে ব্যস্ত হইযাছিল। বলাবাহুল্য সে গানের গোলমালে সকলকেই নিজকার্য্য পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। এইরূপ গোলমাল হইলেও কেহই দীনবন্ধুকে তথায় দেখিতে পাইলেন না। অনুসন্ধানে জানা গেল যে, তিনি নিকটস্থিত গৃহে পাঠে নিবিষ্টচিত্ত রহিয়াছেন। তাঁহাকে গোলমালের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন, 'কৈ আমিত কিছুই টের পাই নাই'। বাহ্য জগৎ হইতে বিছিন্ন হইয়া যোগীদিগের ন্যায় নিজ কার্য্যে মনোনিবেশ করিবার ক্ষমতা উত্তরকালেও তাঁহার জীবনে দেখা যায়। একদিন তিনি সুকিয়া ষ্ট্রীটে মেট্রোপলিটান স্কুলের (তখন কলেজ হয় নাই) পূর্বপার্শ্বের বাটির রাস্তার উপরিস্থিত বৈঠকখানায় বেলা দশটার সময় বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। সেই সময়ে একখানি জুড়ি গাড়ী রাস্তার ধারের

খানায় পড়িয়া যায়। স্কুলের ছাত্র এবং অন্যান্য সমস্ত লোক চীৎকারে ও গোলমালে একটি ক্ষুদ্র বিপ্লবের যোগাড় করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু দীনবন্ধু বাবুকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করায় তিনি বলিয়াছিলেন যে, অফিসের কাজে এত নিবিষ্ট ছিলেন, জানিতে পারেন নাই।'[১৫]

পাঠের প্রতি মনোযোগ এবং কর্মে অভিনিবেশ এই দু' ব্যাপারেই দীনবন্ধু কী পরিমানে নিবিষ্ট ছিলেন, বর্তমান ঘটনাটি তারই পরিচিতি। ছাত্র হিসাবে তাঁর বিস্তৃত পরিচিতি অবশ্য উদ্ধার করা একটু কঠিন, তবু যেটুকু পাওয়া যায়, তা' থেকে জানা যায়, 'দীনবন্ধু হেয়ারের স্কুল হইতে হিন্দু কলেজে যান, এবং তথায় ছাত্রবৃত্তি গ্রহণ করিয়া কয়বৎসর অধ্যয়ন করেন। তিনি কলেজের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া গণ্য ছিলেন।'—[১৬] যাইহোক, গৌরবের সঙ্গেই দীনবন্ধুর ছাত্রজীবন শেষ হল। এই ছাত্রজীবন শেষ হবার ঠিক অব্যবহিত পরে এবং পোষ্টমাষ্টারের কর্মপ্রাপ্তির মাঝামাঝি সময় তিনি কিছুদিনের জন্য হিন্দু কলেজে যে শিক্ষকতা করেছিলেন, এমন একটি বিবরণও পাওয়া যায়।[১৭]

দেড়শ' টাকা মাইনেতে পাটনার 'পোষ্টমাষ্টারে'র চাকরি দিয়ে, ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে, দীনবন্ধুর প্রকৃত চাকরি জীবনের সূচনা। ছয়মাসের ভেতরেই তিনি প্রমাণ করে দিতে সক্ষম হন যে তিনি একজন দক্ষ কর্মচারী। তাই দেড়বছর ঘুরতে-না-ঘুরতে তাঁর হল প্রমোশন। পোষ্টমাষ্টার থেকে হলেন ইন্সপেকটিং পোস্টমাষ্টার। এই কাজের দরুণ তাঁর ঘাড়ে যে কাজ চাপল, তা' হল ঘোরার। দীনবন্ধুর কথা লিখতে গিয়ে বঙ্কিম অবশ্য এই জাতীয় ভ্রমণের নিন্দা করেছেন, কেননা এই অতিভ্রমণ, তাঁর অনুমানে, দীনবন্ধুর অকাল মৃত্যুর একটি কারণ। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলা যায় দীনবন্ধুকে 'সংবৎসরই ভ্রমণ করিতে হইত। কোন স্থানে একদিন, কোন স্থানে দুই দিন, কোন স্থানে তিন দিন—'[১৮]

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুমান যে অমূলক নয়, দীনবন্ধুর অকাল মৃত্যুই তার প্রমাণ। —তবে একথাও নিশ্চিত যে দীনবন্ধু যদি এই ভ্রমণের সুযোগ না পেতেন, তা' হলে কিন্তু তাঁর পক্ষে মানব-চরিত্র সম্পর্কে অত বিপুল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা কখনো কী সম্ভব হ'ত?—বঙ্কিমচন্দ্রও এ কথা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'দীনবন্ধু নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া নানাবিধ চরিত্রের মনুষ্যের সংস্পর্শে আসিয়াছিলেন। তজ্জনিত শিক্ষার গুণে তিনি নানাবিধ রহস্যজনক চরিত্রসৃজনে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত নাটক সকলে যেরূপ চরিত্র বৈচিত্র্য আছে, তাহা বাঙ্গলা সাহিত্যে বিরল।'[১৯]

বিচিত্র মানুষের সঙ্গে কত সহজে দীনবন্ধু যে মিশে যেতে পারতেন, তা' নিয়ে বহু ঘটনা আছে। এ প্রসঙ্গে এক-আধটির উল্লেখ বোধহয় বাহুল্য হবে না। 'প্রদীপ' পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায়,'··রাজকার্যানুরোধে তাঁহাকে যেরূপ পরিভ্রমণ করিতে হইত, তদ্বিষয়ক কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিতে হইবে, কেননা, তাঁহার নাটকের চরিত্র বৈচিত্র্যের সহিত ইহা কতকাংশে সংশ্লিষ্ট। তিনি বাঙ্গলার প্রায় সর্বত্রই পরিদর্শন করিয়াছিলেন। গ্রামে গ্রামে তাঁহাকে গমন করিতে হইত। তাঁহার লোকের সহিত মিশিবার ও আলাপ করিবার অদ্বিতীয় ক্ষমতা ছিল, এবং তিনি সকল শ্রেণীর লোকের সহিত মিশিতেন এবং তাহাদের জীবনের কার্য্যকলাপ দেখিয়া যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, নাটক প্রণয়নকালে তাহা সম্যকরূপে কার্য্যোযোগী করিতেন। লোকের সহিত আলাপ করিবার উপলক্ষে তিনি কখন কখন অভিনব পন্থা অবলম্বন করিয়া লোককে বিস্ময়াবিষ্ট করিতেন। আমরা এক্ষণে তাহার একটি দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করিব। একদিন তিনি পালকী করিয়া এক গ্রামের ভিতর দিয়া গমন করিতেছিলেন, অদূরে এক ভদ্রলোকের বাটীর বৈঠকখানায় কতিপয় ভদ্রলোক সমবেত দেখিয়া বেহারাকে তথায় পালকী লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। পালকী তথায় পৌছিলে তিনি পালকী হইতে নামিয়া বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন, বেহারা তাঁহার বাক্স তাঁহার সমীপে রাখিয়া দিল। তিনি কাহারও সহিত বাক্যালাপ না করিয়া বাক্স হইতে কাগজ বাহির করিয়া একটি বিশেষ দরকারী রিপোর্টের অবশিষ্টাংশ নিবিষ্টচিত্ত হইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন। উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিলেন। তাঁহার লেখা শেষ হইয়াছে, এমন সময় সংবাদ আসিল যে পাতা হইয়াছে। সকলে গাত্রোত্থান করিলেন, দীনবন্ধুও সেই সঙ্গে গাত্রোত্থান করিয়া একটি পাতা দখল করিলেন ; সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই কথা বলিতে সাহস করিলেন না। অবশেষে ভোজনান্তে কথাবার্তা কহিতে কহিতে দীনবন্ধু স্বীয় পরিচয় প্রদান করেন। গৃহস্বামী তাঁহার এই অযাচিতভাবে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করায় যার পর নাই সন্তুষ্ট হইযা স্বীয় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। সেই অবধি তিনি দীনবন্ধুর বন্ধুর মধ্যে গণ্য হইয়াছিলেন এবং দীনবন্ধুবাবু ঐ গ্রামে গমন করিলে উপরিউক্ত বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া ফিরিতেন না।'[২০]

দীনবন্ধুর জীবনের এই ঘটনা উল্লেখ করতে গিয়ে যার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, তা' হল, 'তাঁহার লোকের সহিত মিশিবার ও আলাপ করিবার

অদ্বিতীয় ক্ষমতা'। বলে রাখা ভালো, তথাকথিত 'হিউম্যানিষ্ট'দের এটিকে একটি বিশেষ লক্ষণ বলেই গণ্য করা হয়। যদিও মানুষ হিসাবে বর্ণিত ঐ চরিত্রগুলিই কেউই 'রিমারকেব্‌ল' নন, তবু শিল্পীর কাছে এঁরা যে বিশেষ মর্য্যাদাসম্পন্ন, তাতে আর সন্দেহ কী? আমরা যেন বিস্মৃত না হই, রেনেসাঁসের অন্যতম বৈশিষ্ট্যই হল এ জাতীয় মানুষ অন্বেষণ, '...the search for the characteristic features of remarkable men was a prevailing tendency; and this it is which seperates them from the other western peoples, among whom the same thing happens but seldom, and in exeptional cases.'[২১]

যদিও জ্যাকব বুকহার্টের এই উক্তিটি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কার করবার প্রসঙ্গে ব্যবহৃত, কিন্তু নাটকীয় চরিত্র আবিষ্কারের ক্ষেত্রে যদি এটিকে আমরা ব্যবহার করি, তাতে ক্ষতি কী?—বিচিত্র ঘটনা ও বিচিত্র মানুষের মুখোমুখি হওয়া যে 'তাঁহার নাটকের চরিত্র-বৈচিত্র্যের সহিত কতকাংশে সংশ্লিষ্ট', এ কথা সকলেই জানতেন।

জীবনে চলার পথে চলতে গিয়ে এ জাতীয় অনেক হীরে-মুক্তো-মাণিকের দেখা তিনি পেয়েছিলেন। আর প্রয়োজনমত তিনি এদের অনেককেই নাটকের ভেতর যে অমর করে রেখেছেন, তা দু'-একটি ঘটনার মুখোমুখি হলেই উপলব্ধি যায়। এ প্রসঙ্গে আরেক কাছের মানুষের জবানী এইরকম'...দীনবন্ধুর সম্বন্ধে একটি ঘটনা যাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি,তাহা এখানে বলিব। বহুকাল হইল সপ্তমী কি অষ্টমী পূজার রাত্রিতে, দীনবন্ধু, কার্তিকেয়চন্দ্র রায় (দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা) ও আমি নৈহাটী ষ্টেশন হইতে প্রশস্ত বারাকপুর ফীডার রোড দিয়া বাটী আসিতেছিলাম। স্টেশন হইতে প্রায় এক বিঘা পথ অন্তরে রাস্তার পশ্চিম দিকের ড্রেনে একটি ধবল পদার্থ দেখিলাম। মেটে মেটে জ্যোৎস্না, ভাল বুঝিতে পারিলাম না, সেই ধবল পদার্থটি কি? উহা মাঝে মাঝে নড়ায়, প্রথমে বোধ হইল একটা গরু ড্রেনে পড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না। কিন্তু নিকটস্থ হইয়া দেখিলাম, উহা গরু নয়, একটা বাবু মাতাল ড্রেনে পড়িয়া রহিয়াছে। আমরা তিনজনে তাহাকে ধরিয়া তুলিয়া দেখিলাম একটি নবীন যুবা, পরিপাটি বেশ বিন্যাস, কিন্তু খানায় পড়িয়া উহা বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে। তিনি আমাদের তিনজনেরই অপরিচিত। দীনবন্ধুর জিজ্ঞাসায় মাতালবাবু বলিলেন, তিনি কলিকাতা হইতে শ্বশুর বাড়ী আসিতেছিলেন। স্টেশনের বাবুদের সহিত শুঁড়ীর দোকানে মদ খাইয়া শ্বশুর বাটী যাইতে যাইতে খানায়

পড়িয়া গিয়াছেন। শ্বশুরের নামধামের পরিচয় দিলেন। তাঁহার শ্বশুর সেখানকার একজন সম্ভ্রান্ত লোক, আমরা সকলেই তাঁহাকে জানিতাম। দীনবন্ধু ঐ বাবুর শ্বশুরের নাম শুনিয়া বলিলেন, 'আপনি অমুকের জামাই!' এই কথাতে মাতালবাবু বলিলেন, 'You know my father-in-law sir, then you are my father-in-law sir, yes sir, son-in-law sir, I sir, son-in-law sir.' এই বুলি ধরিলেন।'[২২]

এই স্মৃতিচারণটি বিস্তৃত, তাই বিস্তারিত উদ্ধৃতি থেকে বিরত থাকা গেল। তবে ঐ শেষের 'বুলি' থেকে চিনে নিতে কষ্ট হয় না যে দীনবন্ধু এই চরিত্রটিকে তাঁর নাটকের কোথায় স্থাপিত করেছেন! এই স্মৃতিচারণের শেষে তাঁর নাটকে চিত্রিত আরেকটি চরিত্রের আভাসও পাওয়া যায় এবং সেই চরিত্রটির সঙ্গে পরিচয় ঘটল তখন, যখন দীনবন্ধু সহানুভূতি সম্পন্ন হয়ে ঐ মাতালটিকে ড্রেন থেকে তুলে তার একটি হাত চেপে ধরে বড়ো রাস্তা ধরে ফিরছিলেন। উক্ত প্রত্যক্ষদর্শীর জবানী থেকে জানা যায়, পথ চলতে চলতে, 'পশ্চিম দিকে বৈদিক পাড়ার একটি গলি হইতে দুই জন বৈদিক ঠাকুর বড় রাস্তায় আসিয়া পড়িলেন। দীনবন্ধুকে তাঁহারা চিনিতেন, আনন্দসহকারে তাঁহরে সহিত কথা কহিতে কহিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু দীনবন্ধু একজনের হাত ধরিয়া টানা-টানি করিতেছেন দেখিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, 'এ কি, ইনি কে?'—তখন মাতালরাজ দক্ষিণ হস্তদ্বারা বুক চাপড়াইয়া 'Son-in-law sir, yes sir, son-in-law sir!' বলিয়া তাঁহাদের দিকে ধাবমান হইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দীনবন্ধু তাঁহার হাত ছাড়িলেন না। সহসা এইরূপ সম্বোধনে বৈদিক ঠাকুরদ্বয় নিঃশব্দে টিকি উড়াইয়া দৌড়াইতে লাগিলেন, তাঁহাদের চটাজুতার ফট্ ফট্ শব্দ অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিতে লাগিলাম।'[২৩]

না, দীনবন্ধুর কাছে এই আশ্চর্য অভিজ্ঞতাটিও ব্যর্থ হল না। মাতাল-ভীত বৈদিক ঠাকুরদেরও তিনি অক্ষয় করে রাখলেন তাঁর নাট্য সাহিত্যের ভেতর। তবে এই চরিত্র-চিত্রণের ব্যাপারে এ ধরণের চরিত্র ছাড়া দীনবন্ধু ও বঙ্কিম—উভয়েরই ঝোঁক ছিল 'ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট'দের কৌতুক-চিত্র অঙ্কনে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ইংরাজস্তোত্রে'র মধ্যে সকল বাঙালীবাবুদের হয়ে ইংরেজদের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, '…হে বরদ, আমাকে বর দাও। আমি শামলা মাথায় বাঁধিয়া তোমার পিছু পিছু বেড়াইব—তুমি আমাকে চাকরী দাও। আমি তোমাকে প্রণাম করি।'[২৪] বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র এ প্রসঙ্গে

লিখেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু উভয়ে অফিসের কি সাহেব-সুভার কথা বলিতে ভালবাসিতেন না, ঐরূপ কথোপকথন তাঁহাদের ভাল লাগিত না। কিন্তু ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মাত্রেই সাহেবের কথা ও অফিসের কাজকর্মের কথা না কহিয়া থাকিতে পারিতেন না।' ঐ ডেপুটিদের নিয়ে আলোচনা করবার একটিই মাত্র কারণ, আর সেই কারণটি হল, তাদের অজ্ঞতা, মূর্খতা, আত্ম-ম্ভরিতা এবং সর্বোপরি তাদের অযোগ্যতা। বলাবাহুল্য, তখনকার দিনের সাহিত্যিকদের পক্ষে এ জাতীয় সকৌতুক চরিত্র আঁকবার লোভ সম্বরণ করা ছিল অসম্ভব। দীনবন্ধু এই তথাকথিত আত্মপ্রচার-সর্বস্ব ডেপুটিদের যে মুখের ওপর মুখের মতন জবাব দিতে পারতেন, তারও প্রমাণ রয়েছে। একবার কোনো এক ডেপুটিকে স্বীয় যোগ্যতার বিস্তারিত বিবরণ দিতে দেখে ইনি মন্তব্য করেছিলেন, 'ওহে, তবে তুমিই বুঝি ত্রেতা যুগে সমুদ্র পার হইয়া লঙ্কা দগ্ধ করিয়াছিলে!'[২৫] মোটকথা 'ঘটিরাম ডেপুটি'র রচয়িতার কাছে সে যুগের ডেপুটিরা সহজে কেউ আসতে চাইতেন না। এবং প্রকৃত খবর হল এই, 'ডেপুটী বাবুরা দীনবন্ধুকে যমের ন্যায় ভয় করিতেন; তাঁহার নিকটে বড় ঘেঁষিতেন না'।[২৬]

তবে এই ডেপুটিদের কারো কারো আক্রোশের তিনি যে শিকার হয়েছিলেন, এ কথাটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ থাকা ভালো। 'সধবার একাদশী'র বিরুদ্ধে যে অশ্লীলতার অভিযান হয়েছিল এবং প্রচার বন্ধের যে ব্যবস্থা হয়েছিল, তার কারণ এই অভিযানের পিছনে ছিল ক্ষমতা-সম্পন্ন ডেপুটিদের সক্রিয় হস্তক্ষেপ। এ প্রসঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের পৌত্রের একটি বিবরণী উদ্ধার করা যেতে পারে। পৌত্র দুলালচন্দ্র মিত্রের বক্তব্য হল, 'কেনারাম ডেপুটি' কোন্ ব্যক্তির আদর্শে চিত্রিত তাহা দীনবন্ধুর পুত্রগণ বিশেষভাবে জ্ঞাত ছিলেন, কিন্তু সেই ডেপুটি প্রবরের নাম এখনও প্রকাশ করা যুক্তি সঙ্গত নহে; দীনবন্ধু যদি 'সধবার একাদশীতে' এই 'ঘটিরাম ডেপুটি' বা 'কেবলা হাকিমের' চরিত্র অঙ্কিত না করিতেন এবং জীবিত ব্যক্তির প্রকৃত চরিত্র অবলম্বনে সমাজের দুর্নীতি না দেখাইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় 'সধবার একাদশী'র বিপক্ষে অশ্লীলতার অভিযোগ হইত না।'[২৭]

না, দীনবন্ধু এ-জাতীয় আক্রমণকে ভয় খেতেন না। বিদ্যাসাগরের মতনই তাঁর চরিত্র ছিল কোমলে-কঠিনে গড়া। বাঙালী মায়ের মতনই তাঁর মন ছিল ভীষণ নরম, কিন্তু কোনো অন্যায় দেখলে তার প্রতিবাদে তিনি ভীষণভাবে হয়ে উঠতেন উদ্দীপিত। আর এই প্রতিবাদের জন্য

যে-কোনো ঝুঁকি নিতে তিনি ছিলেন প্রস্তুত। আচার্য উমেশচন্দ্র দত্ত এই চারিত্রিকগুণের উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'ডাকবিভাগের কর্মচারী হইয়াও দীনবন্ধু এই বইখানা প্রকাশিত করিয়া যে চরিত্রবলের পরিচয় দিয়াছিলেন. তাহা তোমরা আজিকার দিনে বুঝিতে পারিবে না।'[২৮] কেবল বই প্রকাশ নয়, বইয়ের ভেতর প্রকৃত সত্যকে চিত্রিত করা যে আরেক দুঃসাহসের ব্যাপার, তা' তৎকালীন ঘটনা খতিয়ে না দেখলে উপলব্ধি করা সত্য। 'আর্কিবলড্ হিলস্'নামে যে নীলকর সাহেবটি জনৈকা কৃষক-রমণীকে জোর করে কুঠিতে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, তার আদলে 'রোগ-ক্ষেত্রমণি'কে নাটকে চিত্রিত করা, অনেক সাহস না থাকলে যে হয় না, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। কেবল এটুকু নয়, আরো ভেতর পর্যন্ত তাঁর অভিজ্ঞতার অনুপ্রবেশ যে ঘটেছিল, তার বিবরণ তুলে ধরেছে 'প্রদীপ' পত্রিকার ঐ লেখাটি। ওখানে লিখিত আছে, 'তিনি মফস্বলে গমন করিলে লোক তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য ব্যস্ত হইতেন এবং তাঁহার আগমন উপলক্ষে গ্রামস্থ সম্ভ্রান্ত লোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া একত্রে মিলিত হইতেন। একবার এইরূপ নিমন্ত্রণ উপলক্ষে একটি হাস্যজনক ঘটনা ঘটিয়াছিল। তখন 'নীলদর্পণ' প্রচারিত হইয়াছে। সমবেত ভদ্র ব্যক্তিগণ 'নীলদর্পণের' কথা লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন। তন্মধ্যে একজন নীলকুঠীর দেওয়ান উপস্থিত ছিলেন। তিনি দীনবন্ধু বাবুকে চিনিতেন না, সুতরাং দেওয়ানী ভাষায় বলিযাছিলেন যে 'পুস্তকের ঘটনা ও বর্ণনাগুলি এমনি ঠিক ঠিক হইয়াছে, যেন বোধ হয় 'শা—' আমাদের কুঠির ভিতরে বসিয়া পুস্তক লিখিয়াছে।' এই বাক্যের পর গৃহস্বামী দেওয়ান মহাশয়কে দীনবন্ধু বাবুর সহিত পরিচিত করিয়াছিলেন। দেওয়ান নিতান্তই অপ্রতিভ ও ম্রিয়মান হইয়াছেন দেখিয়া গ্রন্থকার বলিলেন যে, 'মহাশয়, আপনার গালাগালি আমার বড় মিষ্টি লাগিযাছে। কারণ, আপনার গালাগালিতে অলক্ষিত ভাবে নাটকের যৎপরোনাস্তি প্রশংসা নিহিত রহিয়াছে।' দেওয়ান মহাশয় আর উত্তর করিতে পারিলেন না।'[২৯]

কী পরিমাণ ঝুঁকি নিয়ে দীনবন্ধু যে 'নীলদর্পণ' প্রকাশে ব্রতী হয়েছিলেন, বর্তমান আলোচনায় তার দু' একটি 'স্মৃতিচারণ' উদ্ধার করা যেতে পারে। প্রখ্যাত চিকিৎসক আর. জি. করের ভাই প্রবীন নাট্যাচার্য রাধামাধব কর তাঁর স্মৃতিচারণে বলেছিলেন, 'দীনবন্ধু মিত্র তখন ঢাকায় ডাকঘরের ইনস্পেকটর, আমার পিতাঠাকুর ছিলেন সরকারী ডাক্তার,···দীনবন্ধু বাবুর সঙ্গে বাবার খুব ঘনিষ্ঠতা বন্ধুত্ব ছিল। ঢাকার একটি ছাপাখানায়

'নীলদর্পণ' মুদ্রিত হইতেছিল। প্রত্যহ রাত্রি ৯/১০টার সময় দীনবন্ধু বাবু আমাদের বাসায় আসিতেন। বাবা তাঁহাকে লইয়া তাঁহার নিজের শয়ন ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া দু'জনে নীলদর্পণের প্রুফ সংশোধন করিতেন।'[৩০]

দ্বাররুদ্ধ করে দিয়ে না হয় প্রুফ সংশোধন করা গেল, কিন্তু বিপদ কী তাতে ঠেকান যায়? এ ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রকে উদ্ধৃত করে বলা যায়, 'দীনবন্ধু বিলক্ষণ জানিতেন যে, তিনি যে নীলদর্পণ'-প্রণেতা, একথা ব্যক্ত হইলে, তাঁহার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। যে সকল ইংরেজের অধীন হইয়া তিনি কর্ম করিতেন, তাহারা নীলকরের সুহৃদ্। বিশেষ, পোষ্ট-আপিসের কার্য্যে নীলকর প্রভৃতি অনেক ইংরেজের সংস্পর্শে সর্বদা আসিতে হয়। তাহারা শত্রুতা করিলে বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারুক না পারুক, সর্বদা উদ্বিগ্ন করিতে পারে; এ সকল জানিয়াও দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ' প্রচারে পরাঙ্মুখ হয়েন নাই।'[৩১]

অর্থাৎ শিল্পী হিসাবে যাকে সত্য বলে মনে করেছেন, তা' প্রচারের জন্য কখনো পিছিয়ে আসবার কথা দীনবন্ধু ভাবতেই পারতেন না। বরং এ ব্যাপারে সকল 'হিউম্যানিষ্ট'দের মতই তিনি ছিলেন বে-পরোয়া এবং বে-হিসাবী। না, কেবল সত্য-ভাষণ ও মুক্ত-চিন্তার ক্ষেত্রে নয়, 'নবজাগরণের' আরেকটি অপরিহার্য গুণ তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন, তা' হল হাস্যকৌতুকের ও হাস্যরসের মহার্ঘ সম্পদ। রেনেসাঁসের প্রথম পর্বের হাস্যরস ও বাগবৈদগ্ধ্য যে সব সময় অনাবিল থাকে না, এ তত্ত্ব আশা করি সমালোচকদের অজ্ঞাত নয়। পরে তার বিশুদ্ধী-করণের চেষ্টা হয়। বুকহার্ট সাহেবও তা' জানতেন এবং সে প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'About the middle period of the Renainssance a theoritical analysis of wit was undertaken, and its practical application in good society was regulated more precisely.'[৩২] আমাদের দেশেও অবশ্য একদা 'নির্মল শুভ্র হাস্যরসে'র, কথা উচ্চারিত হয়েছিল এবং দীনবন্ধুর তা' অনেক পরে। বলা বাহুল্য, হাস্যকৌতুকের ব্যাপারে দীনবন্ধু কখনো সুনীতি ও সুরুচি ইত্যাদির ধার ধারেন নি। আর তথাকথিত শালীনতা বোধেরও তোয়াক্কা তিনি করেন নি। এখন ব্যক্তিগত জীবনে ইনি কেমন রসিক ছিলেন, তা' জানতে হলে, বঙ্কিমচন্দ্রেরই শরণ আমাদের নিতে হয়। হাস্যরসের 'ঐন্দ্রজালিক' হিসাবে চিহ্নিত করে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ক্ষণভিন্ন-

সুহৃদ' দীনবন্ধু সম্পর্কে লিখেছেন, 'তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ সকল বাঙ্‌লা ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট হাস্যরসের গ্রন্থ বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত হাস্যরস পটুতার শতাংশের পরিচয় তাহার গ্রন্থে পাওয়া যায় না। হাস্যরসাবতারণায় তাঁহার যে পটুতা, তাহার প্রকৃত পরিচয় তাহার কথোপকথনেই পাওয়া যাইত। অনেক সময় তাঁহাকে মূর্তিমান হাস্যরস বলিয়া বোধ হইত। দেখা গিয়াছে যে, অনেকে 'আর হাসিতে পারি না' বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিয়াছে। হাস্যরসে তিনি প্রকৃত ঐন্দ্রজালিক ছিলেন।'[৩৩] নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন, 'দীনবন্ধুর নাটকসকল উগ্রহাস্যরসাত্মক হইলেও, তাঁহার আলাপ ততোধিক উগ্র হাস্যোদ্দীপক ছিল। তাঁহার কাছে আধঘণ্টা বসিলে পার্শ্বব্যথা উপস্থিত হইত। তাঁহার কথা শুনিয়া লোকে হাসিয়া গড়াগড়ি দিত, কিন্তু তিনি কদাচিৎ হাসিতেন।'[৩৪]

এই সদা- প্রসন্ন রসিক মানুষটির কাছাকাছি যাঁরাই এসেছেন, তাঁরাই মুগ্ধ হয়েছেন এঁর সৃষ্ট অজস্র হাস্যরসধারায়। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় তাঁর জীবনের উত্তর-তিরিশের স্মৃতিচারণায় লিখেছেন' '...সে সময় আমার কয়েকজন নূতন বন্ধু লাভ হইয়াছিল। তন্মধ্যে বঙ্গবন্ধু দীনবন্ধু মিত্রের সহিত আমার বিশেষ প্রণয় হয়। এই সময়টি আমার সুখের হইয়াছিল। যেন সুখ সাগরে নিরন্তর সন্তরণ করিতেছিলাম'।[৩৫] অক্ষয় সরকার লিখেছেন'...'দীনবন্ধু বড়ই পরিহাসরসিক এবং সদাই প্রফুল্ল চিত্ত ছিলেন।'[৩৬] পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জবানী থেকে জানা যায়, 'হাস্যরসে ও বাক্যপটুতায় দীনবন্ধু অপরাজেয় ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র হেমচন্দ্র এইরূপ অনেকেই তাঁহার নিকট পরাস্ত হইতেন'।[৩৭]

এখানে দীনবন্ধুর যে 'হাস্যরসের' কথা বলা হল, তা' তাঁর পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের সকলকে ঘিরেই ছিল উৎসারিত। 'সুরধুনী কাব্যে' এঁদের সম্পর্কে প্রচুর প্রশংসা থাকলেও, নাটকে এঁদের নিয়ে কম কৌতুক উৎসারিত নয়। এখানে ছোট-বড়ো কাউকেই ছেড়ে দেন নি তিনি। 'নীলদর্পণে' বিন্দুমাধবের চিঠিতে কলকাতার কথা ও নব্যসংস্কৃতির প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে তাঁর প্রিয়বয়স্য বঙ্কিমের উল্লেখ, কারোরই নজর এড়িয়ে যাবার কথা নয়। আর 'জামাইবারিকে'র জামাইদের চিনে নিতে সম্ভবতঃ কারো অসুবিধা হয় না। যতীন্দ্রমোহন, দিগম্বর, রাজেন্দ্রলাল, কিশোরীচাঁদ, কৃষ্ণদাস, দ্বারিকানাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, মনোমোহন, উমেশচন্দ্র, হেমচন্দ্র, প্যারীচরণ, ভূদেব, জগদীশ, গৌরদাস, রঙ্গলাল ও বঙ্কিম প্রমুখ কোনো

মনীষীই তাঁর হাতে জামাই হওয়ার গৌরব থেকে বঞ্চিত হন নি। এমন কী আবদুল লতিফকে পর্যন্ত দীনবন্ধু রেয়াৎ করেন নি। তাঁকেও জামাই হবার গৌরবে করা হয়েছে ভূষিত।—'নবীন তপস্বিনী' নাটকে কার্তিকের চন্দ্র রায়কে নিয়ে একটি আশ্চর্য কৌতুক-কবিতাও আছে, কবিতাটি একটি চিঠি। হোঁদলকে লিখেছে তার প্রেয়সী। অবশ্য কেবল কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায়ই নন, 'কৃষ্ণনগর রাজবংশের' দৌহিত্র পূর্ণচন্দ্র রায়ও এখানে আছেন। হোঁদল কুৎ-কুৎ-প্রেয়সীর চিঠিটির ঐ দুই-চরণ হল,

যদবদি হাঁদা পেট হেরেচি নয়নে
পূর্ণচন্দ্র কার্ত্তিকেয় নাহি ধরে মনে।[৩৮]

জানিনা, পূর্ণচন্দ্র ও কার্ত্তিকেয়চন্দ্রের চেহারা কেমন ছিল। যদি সত্যি সত্যিই 'হাঁদা পেটে'র অধিকারী এঁরা হয়ে থাকেন, তবে কৌতুক যে লক্ষ্য ভেদে সমর্থ হয়েছিল, এ বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া যায়।

এ যুগের আরেকজন শ্রেষ্ঠ রসিক ব্যক্তির নাম, এ প্রসঙ্গে, উপস্থাপিত করা দরকার। এই রসিক ব্যক্তিটি হলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর মশাই সাধারণত বিরাট পণ্ডিত, বড়ো সমাজসংস্কারক, এবং ভারি ও গুরু গম্ভীর গদ্যের লেখক হিসাবেই আমাদের কাছে পরিচিত। এমন কী তিনি দয়ালু ও পারোপকারী ছিলেন, এ তথ্যও আমাদের অজানা নয়। কিন্তু যা' অজানা, তা' হল, তাঁর কৌতুক-প্রবণতা এবং দীনবন্ধুর সঙ্গে তাঁর গভীর ঘনিষ্ঠতা। এই ঘনিষ্ঠতার সংযোগ যে হাস্যরসের উৎস থেকে আসে নি, তা' হলফ করে কে বলতে পারে?—তা' উৎস যাই হোক না কেন, এঁদের বন্ধন যে কতখানি নিবিড় ছিল, সে সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের জীবনীকারদের শরণ নিলেই জানা যায়। একজন জীবনীকার লিখেছেন, 'মধ্যম ভ্রাতা দীনবন্ধুর ন্যায় বিদ্যাসাগর মহাশয় বিখ্যাত নাট্যকার ৺ রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরকেও প্রাণাধিক ভালবাসিতেন। দীনবন্ধু মিত্র বহুপূর্বে বিদ্যাসাগরকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। দীনবন্ধুবাবুর সহিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যেরূপ সৌহার্দ্দ্য ছিল বোধহয় আর কাহারও সহিত সেরূপ ছিল না। সুকীয়া ষ্ট্রীটে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাসার নিকট দীনবন্ধুবাবুর বাসা ছিল। ব্রাহ্মণ কায়স্থ হইলেও উভয়ের পরিবার সৌহার্দ্দ্য ব্যবহারে এক জাতীয় হইয়াছিলেন।'[৩৯]

হাস্যরসের বন্ধনে এই সৌহার্দ্দ্য কেমন করে বাঁধা পড়েছিল, তারো কিছু কিছু উদাহরণ আছে। 'প্রদীপ' পত্রিকার বিবরণ থেকে দুটি সুন্দর ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে লেখকের দেওয়া বিবরণটি এই রকম:

'বর্তমান পাঠক মণ্ডলীর অনেকেই পূজ্যপাদ স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সরস কথোপকথনের বিষয় অবগত আছেন। একদিন কোন বাবুর বৈঠক-খানায় বিদ্যাসাগর মহাশয় গল্প করিয়া শ্রোতৃবর্গকে মোহিত করিতেছিলেন; এমন সময় দীনবন্ধুর বাবু তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কহিলেন, 'এই যে আমার ভায়া এসেছেন, এইবার আমি অবসর গ্রহণ করি' এবং দীনবন্ধুকে আসর ছাড়িয়া দিলেন। আর একদিনের ঘটনা এইরূপ; দীনবন্ধু বাবু গুটি কত বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া-ছিলেন। রাত্রি আট ঘটিকা না হইতেই দুই একজন বন্ধু আহারের জন্য ব্যস্ত হইলেন। দীনবন্ধু বাবু রন্ধনশালায় সংবাদ লইয়া জানিলেন যে, এগারটার আগে আহার প্রস্তুত হইবার সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প। বিদ্যাসাগর মহাশয়ও সে ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। তখন দীনবন্ধুবাবু ও বিদ্যাসাগর মহাশয় পাশাপাশি বাটিতে অবস্থিতি করিতেন। দীনবন্ধুবাবু বিদ্যাসাগর মহাশয়কে রন্ধনশালার অবস্থা জানাইলেন এবং দুইজনে পরামর্শ করিয়া মজলিসে বসিলেন, পরে কথোপকথনে সকলকে এরূপ মুগ্ধ করিলেন যে অভ্যাগত ব্যক্তিগণ আহারের বিষয় একবারে বিস্মৃত হইলেন। রাত্রি প্রায় এগারটার সময় আহার প্রস্তুত হইয়াছে সংবাদ আসিল; কিন্তু বন্ধুবর্গ দীনবন্ধুবাবুর সৃষ্ট হাস্যরস সাগরে ভাসিত এবং গাত্রোত্থানে অসম্মত। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিলেন, 'আর কথোপকথনে প্রয়োজন নাই, আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে।'—ইহার পর সভা ভঙ্গ হইল।'[৪০]

তবে রসিক দীনবন্ধুর পরিচয় কেবল বিদ্যাসাগর-কেন্দ্রিক হয়ে বিকশিত নয়, আশে-পাশে যারাই এসেছেন তাঁরাই পেয়েছেন এ রসের স্বাদ। আর বঙ্কিমচন্দ্র যেহেতু দীনবন্ধুর সর্বাধিক প্রিয় ছিলেন, তাই তাঁকে কেন্দ্র করেই বহু বিখ্যাত সরস গল্পের উৎসার। সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সঙ্কলিত 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গে' ধৃত পূর্ণচন্দ্রের লেখায় এ জাতীয় অনেক গল্প আছে। কখনো দেখা যাচ্ছে, দীনবন্ধু কবিতায় 'গালি' লিখে পাঠাচ্ছেন বঙ্কিমকে, আর বঙ্কিম বলছেন তিনিও উপযুক্ত জবাবদেবেন। আবার কখনো দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমের দ্বিতীয়পক্ষের বিবাহের পাত্রী অন্বেষণে বেরিয়ে পড়েছেন দীনবন্ধু, সঙ্গে অবশ্য সাথী হিসাবে বঙ্কিম রয়েছেন।—এ ছাড়া 'প্রদীপ' পত্রিকায়, শচীশচন্দ্রের 'বঙ্কিম জীবনী'তে এবং পারিবারিক ইতিহাস সূত্রে পাওয়া নানা সরস গল্প রয়েছে ছড়িয়ে। অভিমানী বঙ্কিমকে হাসাবার জন্য দীনবন্ধু একবার যে কৌতুককর ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাতে ছেলেমানুষীর ভাবটা ছিল একটু

বেশি এবং লোক-সংস্কৃতির ঝোঁকটা হয়ে উঠেছিল প্রবল। তবে উপসংহারে একটু 'উইট্'-এর ছোঁয়া আছে, যখন দীনবন্ধু তাঁর পিঠে বঙ্কিমের আঁটা একটুকরো কাগজটি নিয়ে কৌতুক করে বলেছেন, 'আমায় বলে দাও গো, আমার কি আছে। হাতীর কপাল মন্দ তাই তার পিঠের কোথায় মশাটা মাছিটা বসছে সে দেখতে পায় না।' বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, 'দেখতে পায়না বলিয়াইত আমরা তাকে হস্তিমূর্খ বলি।'[৪১] —'প্রদীপ' পত্রিকায় কথিত সেই আশ্চর্য কৌতুকজনক ঘটনার বিবরণও বর্তমান প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তখন মজিলপুরে। দীনবন্ধু এবং উভয়ের আরেক বন্ধু, জগদীশনাথ রায় যিনি একদা ২৪ পরগণার 'এ্যাসিস্ট্যান্ট্ ডিস্ট্রিক্ট সুপারিন্টেনডেন্ট' ছিলেন, এই দু'জনে বঙ্কিমের মজিলপুরের বাঙ্লোয় একবার হাজির হয়েছিলেন গিয়ে রাত আটটা সাড়ে-আটটা নাগাদ। বঙ্কিমকে চমকদেবার জন্য সেই রাতে তাঁরা একটু মজা করলেন। এবং সেই মজাটি ছিল এই রকম, 'তাঁহারা বঙ্কিমবাবু যাহাতে তাঁহাদের গাড়ীর শব্দ শুনিতে না পান, এমন স্থানে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার বাসা বাটীর সম্মুখস্থ হইয়া গান ধরিলেন, 'আমরা বাগবাজারের মেথরাণী'। বঙ্কিমবাবু তাঁহাদের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ পাঠ ত্যাগ করিয়া বারাণ্ডায় আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন 'কালুয়া নিকাল দেও, কালুয়া নিকাল দেও'। এইরূপে সম্ভাষিত হইয়া তাঁহার বন্ধুদ্বয় তাঁহার সঙ্গে আসিয়া মিলিত হইলেন।'[৪২] পারিবারিক সূত্রে পাওয়া অনেক খোশ গল্পের উপাদানও এ-জাতীয়। 'বঙ্কিম কেমন জুতো'!—এই চিঠি লিখে দীনবন্ধু কর্তৃক বঙ্কিমকে জুতো উপহার দেওয়া এবং 'তোমার মুখের মতন' এই উত্তর পাওয়া, কিংবা এক সোনারগোট-পরা দেমাকী ভদ্রলোক কে 'হি-গোট' 'শি-গোটে'র ব্যাখ্যা করে অপদস্থ করবার কাহিনী বহু প্রচলিত। তবে এর ভেতর যা উল্লেখযোগ্য, তা' হল, এ জাতীয় কৌতুকের অবলম্বন একটু মোটা। রসিকতা একটু স্থূল। এবং বলতে দ্বিধা নেই, এটি অবশ্য সে যুগেরই লক্ষণ। এ ব্যাপারে ডঃ সুশীলকুমার দের বিশ্লেষণটি অনুধাবন যোগ্য। কেননা ইনি দেখিয়ে দিয়েছেন, 'যাঁহারা নূতন কালচার বিলাসী আদব-কায়দায়, চাপাহাসি ও মাপা কথার কৃত্রিম সৌজন্যে এখনও আত্ম-বিস্মৃত হন নাই, তাঁহারাও গত যুগের জীবন ও জগতের বৈশিষ্ট্যকে সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না।[৪৩]

উনিশ শতকের সামাজিক পরিচিতি সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান না থাকলে

দীনবন্ধুর হাস্যরসের মর্মার্থ উপলব্ধি করা যে একটু কঠিন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কেননা দীনবন্ধু কখনো কখনো শ্লীলতার মাত্রাকে যে অতিক্রম করে গেছেন, এ প্রমাণও পাওয়া যায়। 'আমার জীবন' দ্বিতীয় খণ্ডে নবীন চন্দ্র যেখানে, দীনবন্ধুর প্রসঙ্গে লিখেছেন সেখানে দেখা যায় শিশির কুমার ঘোষের সঙ্গে কথাপ্রসঙ্গে 'ব্লাডসেডে'র কথায় দীনবন্ধু যে কৌতুক করেছেন, তা' আধুনিক রুচিতে রীতিমত নিন্দিত। অনুরূপ ভাবে এমন কোনো দৃশ্যের কথা ভাবতে আমাদের কষ্ট হয়, সে দৃশ্যে যদি দেখাযায় বঙ্কিম-দীনবন্ধুর ইত্যাদি খ্যাতিমান ও মর্যাদাবান ব্যক্তিদের সামনে ঘুমুর পরে এক অর্ধশিক্ষিত বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ নাচছেন এবং দীনবন্ধুকে নিয়ে কৌতুক করে গান গাইছেন, বা ছড়া কাটছেন,—

'কালা তাই বটে', কালা তাই বটে,
বাবলার গাছে গোলাপ ফুল ফোটে।'৪৪

এখানে 'বাবলা' হলেন দীনবন্ধু মিত্র স্বয়ং এবং 'গোলাপ' হলেন দীনবন্ধুর গৃহিনী। 'বাবলা'র তাৎপর্য বুঝতে গিয়ে কৌতুহল হতে পারে, 'দীনবন্ধু' দেখতে কেমন ছিলেন! নবীনচন্দ্র সেন দীনবন্ধুর আকৃতি বর্ণনারঃ প্রসঙ্গে 'আমার জীবনে'র দ্বিতীয়খণ্ডে সাতাশ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, 'দীনবন্ধু বাবুর শ্যামবর্ণ, স্থূল দেহ, চক্ষু ক্ষুদ্র কোটরস্থ, কিন্তু তীক্ষ্ণ জ্যোতি সম্পন্ন।' অর্থাৎ দীনবন্ধু দেখতে ছিলেন কালোকালো মোটাসোটা, চোখ দুটি ভেতরে ঢোকা। পক্ষান্তরে দীনবন্ধুর গৃহিনী ছিলেন রূপে-গুণে অতুলণীয়া। তাই রসিক বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ তাঁর ছড়ায় 'গোলাপ' বলে তাঁর বর্ণনা করেছেন। আর 'বাবলা' হয়েছেন দীনবন্ধু।—কবি হেমচন্দ্র একদা অসাধারণ স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক হিসাবে চিহ্নিত করতে গিয়ে বিদ্যাসাগর মশাইকে উপমায়িত করেছিলেন 'শেঁকুল কাঁটা'র সঙ্গে।—ছড়াদার বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য সে অর্থে এ শব্দটিকে ব্যবহার করেন নি, তবু আমরা প্রয়োজন হলে ঐ 'বাবলা'-কে একটি অসাধারণ স্বাতন্ত্র্যের প্রতীক হিসাবে গণ্য করতে পারি।—অন্য কোথাও না, শুধু হাস্যরসের আলোক দেখলেই ঐ প্রতীকের যথার্থ্য প্রমাণ করা যায়। দীনবন্ধু অপরকে নিয়ে যেমন কৌতুক করতে ভালোবাসতেন, তেমনি অপরেও যদি তাঁকে নিয়ে কৌতুক করত, তিনি তা' মজা করে উপভোগ করতেন। এখানে পদমর্যাদা বা সামাজিক প্রতিষ্ঠা তাঁর কাছে রসাস্বাদের পক্ষে বাধা হতে পারত না। মর্যাদা-প্রতিষ্ঠা নির্বিশেষে তাঁর কাছে হাস্যরসের দরজা ছিল অবারিত।—এমন কী দাম্পত্য-জীবনেও এই

হাসি-খুশি মানুষটির এই বিশেষ প্রভাব লক্ষণীয় ভাবে চোখে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রও এই প্রভাবটি এঁর দাম্পত্যজীবনে প্রতিফলিত হতে দেখে লিখেছেন, 'দীনবন্ধু চিরকাল গৃহসুখে সুখী ছিলেন। দম্পতি-কলহ কখন না কখন সকল ঘরেই হইয়া থাকে, কিন্তু কস্মিন্-কালে মুহূর্ত নিমিত্ত ইঁহাদের কথান্তর হয় নাই। একবার কলহ করিবার নিমিত্ত দীনবন্ধু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞা বৃথা হইয়াছিল। বিবাদ করিতে পারেন নাই। কলহ করিতে গিয়া তিনিই প্রথমে হাসিয়া ফেলেন, কি তাঁহার সহধর্মিনী রাগ দেখিয়া উপহাস দ্বারা বেদখল করেন, তাহা এক্ষণে আমার স্মরণ নাই'।[৪৫]

এই অসাধারণ মানুষটি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত যে তাঁর মুখের হাসি বহন করে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন, তারও প্রমাণ রয়েছে। এই প্রমাণ দাখিল করে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ক্রমে দুর্বল হইতেছিল। তথাপি তাহার ব্যঙ্গশক্তি একেবারে নিস্তেজ হয় নাই। মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও তাহা ত্যাগ করেন নাই। অনেকেই জানেন যে, তাঁহার মৃত্যুর কারণ বিস্ফোটক, প্রথমে একটি পৃষ্ঠদেশে হয় তাহার কিঞ্চিৎ উপসম হইলেই আর একটি পশ্চাৎভাগে হইল। তাহার পর শেষ আর একটি বামপদে হইল।'[৪৬]

এইভাবে পর পর 'বিস্ফোটকে'র আক্রমণে দীনবন্ধু যখন মৃত্যুর দরজার কাছে এসে পৌঁচেছেন, তখন একবন্ধু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। রসিক দীনবন্ধু তখনো কিন্তু রসিকতায় অম্লান, অনতিদূরবর্তী মেঘের ক্ষীণ বিদ্যুতের ন্যায় ঈষৎ হেসে বলেছিলেন, 'ফোড়া এখন আমার পায়ে ধরিয়াছে'।[৪৭]

না, আলোচনা বাড়িয়ে লাভ নেই, হাস্যরসের সৃষ্টি দীনবন্ধুর ব্যক্তিত্বেরই যে একটি বিশেষ দিক, তাকে বোঝাবার জন্যই এত কথা বলতে হল। এবং এ রসবোধ তাঁর অন্তরের গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে তিনি হতে পেরেছিলেন নির্মল অন্তঃকরণের অধিকারী। আর গভীর সহানুভূতি সম্পন্ন। পরের দুঃখে দুঃখী হওয়ার মতন চিত্তও পেয়েছিলেন। কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের চোখে নয়, সকলের চোখেই তিনি অনন্য, অসাধারণ। জাষ্টিস্ সারদাচরণ মিত্র এই অসাধারণ মানুষটির স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'শোভাবাজারের রাজ-বাটিতে কুমার রাজেন্দ্র নারায়ণ দেবের বৈঠকখানায় আমার সু-অদৃষ্টবশতঃ দীনবন্ধুর দর্শন পাইলাম। 'নীলদর্পণ' ও 'সধবার একাদশী'র রচয়িতাকে

দেখিবার জন্য, তাহার সহিত কথাবার্তার জন্য যে মহান আগ্রহ হইয়াছিল, তাহা সেইদিন তৃপ্ত হইল। তাঁহার পরিচিত হইলাম, ইহা আমার পরম সৌভাগ্য মনে করিলাম; কিন্তু দীনবন্ধুর কথাবার্তায়, অমায়িকতা ও সরলতায়, বিশেষতঃ বাকপটুতায় ও রসিকতায় আমি এইরূপ আকৃষ্ট হইলাম যে বয়স ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে পার্থক্য সত্ত্বেও আমি তদবধি অনেক সময়ই তাঁহার নিকট থাকিতাম।'[৪৮] বুদ্ধিজীবীরা যেমন দীনবন্ধুর ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কাছে ছুটে আসতেন, অনুরূপভাবে উপকার-প্রত্যাশী বহু দুঃস্থ লোকও যে তাঁর কাছে সামান্য সাহায্যের আশায় দৌড়ে আসত, তারও বহুদৃষ্টান্ত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে যা খবর পাওয়া যায়, তা হল, 'কত দরিদ্র সন্তানকে যে তিনি চাকুরী দিয়া অন্নদান করিয়াছেন, তাহার গণনা হয় না। কাহাকেও কেরানী গিরি, কাহাকেও সব-পোষ্টমাষ্টারী, যে যাহার যোগ্য, তাহাকে তাহাই দিতেন। সে জন্য উমেদারগণের মধ্যে তিনি প্রাতঃ স্মরণীয় ছিলেন।'[৪৯]

দীনবন্ধু যে সত্যিসত্যিই প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি ছিলেন, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। গন্ধর্বনারায়ণের খোলস থেকে আধুনিক যুগের যে মানুষটি বেরিয়ে এসেছিলেন, তিনি নিজের চারিদিক ঘিরে নিজের মনের মতনই একটি পরিবেশ গঠনে যে সক্ষম হয়েছিলেন, তাতেও কোনো সংশয় নেই। তবে এই রেনেশাঁসের 'মানবিকতাবাদী' লোকেদের কোথায় যেন এক অভিশাপ আছে। সেই অভিশাপ কীভাবে আসে এবং কখন আসে, তা' জানা যায় না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা' যে চূড়ান্ত অশান্তি এবং মৃত্যুপর্যন্ত নিয়ে আসতে পারে, তা' যেন অমোঘ সত্য। দীনবন্ধুর বেলাতেও তা' ঘটতে দেখা গেল। এবং এই অসাধারণ মানুষটির জীবনে অশান্তি এলো তাঁর কর্মক্ষেত্র থেকে। দীনবন্ধুর কর্মজীবন মোটামুটি আঠারো বছরের। 'পোষ্টমাস্টার' হিসাবে পাটনা থেকে তাঁর কর্মজীবনের যে সূচনা, পূর্বেই বলা হয়েছে। পরে 'ইনস্‌পেকটিং পোষ্টমাষ্টার' হিসাবে তাঁর পদোবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে ঘুরতে হয়েছে অবিরাম; পাটনার কথাত আগেও বলা হয়েছে, পরে ওড়িশা এবং কাছাড়ও তাঁকে যেতে হয়েছে। এদিকে ঢাকা-নদীয়া-কলকাতা-হাওড়া প্রভৃতি জায়গাগুলিও বাদ পড়েনি। বঙ্কিমচন্দ্র এই অবিরাম ভ্রমণকে দীনবন্ধুর অকাল মৃত্যুর কারণ হিসাবে দেখিয়েছেন। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি সর্বৈব সত্য। চোদ্দবছর অবিরাম ঘোরবার পর ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ বা ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে 'সুপরনিউমররি ইনসপেকটিং পোষ্টমাষ্টার' হিসাবে এলেন তিনি কলকাতায়। অবশ্য মাঝখানে সামান্য কয়েকমাস 'লুসাই

যুদ্ধে' ডাকের ব্যবস্থা করতে তাঁকে যেতে হয়েছিল কাছাড়। নতুবা প্রায় এ চারবছরই কলকাতা'তে থাকলেন দীনবন্ধু। কর্মক্ষেত্রে অসাধারণ যোগ্যতা দেখানোর জন্য সরকার কর্তৃক যদিও তিনি 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে হলেন ভূষিত, কিন্তু অনিবার্য লাঞ্ছনা থেকে কিছুতেই শেষ পর্যন্ত যেন মুক্তি পেলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য এ ব্যাপারে 'কৃষ্ণচর্ম' ও 'বাঙালী' হওয়াকেই সব থেকে বেশি দোষ দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হল, 'দীনবন্ধুর যেরূপ কার্য্য-দক্ষতা এবং বহুদর্শিতা ছিল, তাহাতে তিনি যদি বাঙালী না হইতেন, তাহা হইলে মৃত্যুর অনেকদিন পূর্বেই তিনি পোষ্টমাষ্টার জেনারেল হইতেন এবং কালে 'ডাইরেক্টর জেনারেল' হইতে পারিতেন। কিন্তু যেমন শতবার ধৌত করিলে অঙ্গারের মালিন্য যায় না, তেমনি কাহারও কাহারও কাছে সহস্র গুণ থাকিলেও কৃষ্ণবর্ণের দোষ যায় না। charity যেমন সহস্র দোষ ঢাকিয়া রাখে, কৃষ্ণ চর্মে তেমনি সহস্র গুণ ঢাকিয়া রাখে। পুরস্কার দূরে থাকুক, দীনবন্ধু অনেক লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হইযাছিলেন।'[৫০]

অবশ্য এই লাঞ্ছনার মূলে ছিল পোষ্টমাস্টার জেনারেল টুইডি সাহেবের সঙ্গে ডাইরেক্টর জেনারেল মিঃ হগের কলহ। দীনবন্ধুর অপরাধ এই যে, তিনি পোষ্টমাস্টার জেনারেল টুইডি সাহেবকে সাহায্য করতেন তাঁর অফিসের কাজে। তাই ও পক্ষের হগ সাহেবের রাগ এসে পড়ল এঁর ওপর। এই রাগ দীনবন্ধুকে কেবল বদলিই করল না, তাকে লাঞ্ছিতও করল পদ থেকে নামিয়ে দিয়ে। যে মানুষটি এই পূর্ব-ভারতে ডাক-ব্যবস্থাকে গড়ে তুললেন তিল তিল করে, তাঁর কপালে জুটল এই পুরস্কার! আর তাঁর জায়গায় 'সুপার নিউমররি ইনস্পেক্টর' হিসাবে আনা হল এমন দুজন ইউরোপীয়কে, যাঁরা সব দিক থেকে দীনবন্ধুর তুলনায় অযোগ্য। কিন্তু বেতন দেওয়া হল এঁদের দীনবন্ধুর থেকে দ্বিগুণ। বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন, 'তিনি প্রথম শ্রেণীর বেতন পাইতেন বটে, কিন্তু কাল সাহায্যে প্রথম শ্রেণীর বেতন চতুষ্পদ জন্তুদিগেরও প্রাপ্য হইযা থাকে। পৃথিবীর সবত্রেই প্রথম শ্রেণীভুক্ত গর্দভ দেখা যায়'।[৫১]

বলাবাহুল্য, দীনবন্ধুর জীবনে এইটুকুই হল বিধাতার নির্মম ও নিষ্ঠুর পরিহাস, তাঁর কুসুমের মত জীবনে এইটুকুই হল কাঁটা। এবং অকাল-মৃত্যুর কারণও হল এই। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর, যখন তাঁর অকাল মৃত্যু হল, এই মৃত্যুকে সেদিন কেউই তাই সহজভাবে মেনে নিতে পারেন নি, না কোন বাঙালীই পারেন নি। ৬ই নভেম্বর 'অমৃতবাজার পত্রিকা' অত্যন্ত ক্ষোভের

সঙ্গে লিখল : 'A few days before his death, Babu Dinabandhu while in a very bad state of health, told us that he was sure to die and its real cause was the party sprit which was rampant between Mr. Tweedie and Mr. Hogg. Will Government enquire this matter ?'

'না, সরকারের কাছে এই তদন্তের কোন প্রয়োজন ছিল না। দীনবন্ধুর জীবন তাঁদের কাছে কী এমন মূল্যবান, যে তা, নিয়ে এই তদন্ত করতে হবে ? তবে দীনবন্ধুর জন্য দুঃখ বরণ করবার লোক যে ছিল না, তা' নয়। অন্ততঃ রেভারেণ্ড জেমস্ লঙ্ তো আসতে পারতেন! না, তাঁরও আসবার সেদিন কোনো উপায় ছিল না। কেননা, আগের বছর ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমের দিকে তিনি এদেশ থেকে নিয়ে গেছেন,—চিরবিদায়। সুতরাং দীনবন্ধুর হয়ে লড়াই করতে তিনি আসবেন কী করে ?

এদিকে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে। 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র আর ওদিকে 'জাতীয় রঙ্গমঞ্চ' হয়েছে প্রতিষ্ঠিত। এবং নতুন করে দেখা দিয়েছে 'জাতীয়তাবাদে'র হাওয়া। সুতরাং এই সময় সেই মানুষদেরই প্রয়োজন দেখা দিল সর্বাধিক, যাঁরা নতুন করে আমাদের ভাবনার খোরাক যোগাবেন এবং নির্দেশ দেবেন যথার্থ পথের। কিন্তু সে সুযোগ আর মিলল না, বছর ঘুরতে-না-ঘুরতে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে, আমাদের সাহিত্যের জগতের দুটি জ্যোতিষ্ক খসে পড়ল, প্রথম জন হলেন মাইকেল মধুসূদন এবং দ্বিতীয়জন হলেন দীনবন্ধু মিত্র। নতুন যুগের সূচনা নয়, এঁরা নিজেদের একটি যুগের অবসান ঘোষনা করে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

দীনবন্ধুর মৃত্যুতে বাঙ্লা সাহিত্যের যে অপরিমেয় ক্ষতি হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এবং সে আলোচনার অবকাশ প্রসঙ্গান্তরে আছে। তবে একটি জিজ্ঞাসা থেকে যায়, রামমোহন-বিদ্যাসাগরের মতন তিনিও কী কোনো পথের দিশা দিতে চেয়েছিলেন ? এবং যদি দিয়ে থাকেন, সেটা কোন্ পথের ? রেনেসাঁসী মানুষরা সর্বদাই আপন আপন স্বাতন্ত্র্যে চিহ্নিত। এমন কী পোশাকের ব্যবহারে পর্যন্ত তাঁরা ভীষণ স্বাতন্ত্র্য-বাদী। এই পোশাকের কথা তুলেই বুকহার্ট সাহেব জানিয়েছেন, 'By the year 1390, there was no longer any prevailing fashion or dress for men at Florence, each preferring to, clothe himself in his own way.'[৫২] বলতে দ্বিধা নেই 'তরুণ বাঙ্লা'র ক্ষেত্রেও

এ-জাতীয় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র সমুজ্জ্বল 'ফ্যানটাসটিক অ্যাণ্ড এভার ভ্যারিইং ড্রেসের'[৫৩] কথা উচ্চারিত হয়েছিল। আর দীনবন্ধু নিজেও, নিজের জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে, নিজের মতনই স্বতন্ত্র পোশাক পরতেন। ভাবনা বা চিন্তার ক্ষেত্রে উত্তরাধিকারের কথা আলোচিত হওয়ার আগে, এ খবর বিশ শতকের প্রথমে পাওয়া যাচ্ছে, 'এখন বঙ্গের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথের বেশভূষার যেমন কেহ কেহ অনুকরণ করিয়া থাকেন, তখনকার দিনে আমাদের শ্রেষ্ঠ নাট্য-কারের বেশভূষার অনুকরণও অনেকে গৌরব বলিয়া মনে করিতেন।[৫৪]

এখন আমাদের কথা, দীনবন্ধুর জীবনী আলোচনার উপসংহার আমরা এরকম জিজ্ঞাসা তুলে ধরতে পারি কী না, পোশাক-স্বাতন্ত্র্যের মত দীনবন্ধুর চিন্তা-স্বাতন্ত্র্য কিছু ছিল কী না! এবং যদি থাকে, তা কী রকমের?—উত্তরে বলতে হয়, অবশ্যই ছিল। তাঁর নিজস্ব চিন্তা-ভাবনার জগত না থাকলে তিনি 'নীলদর্পণ' বা 'সধবার একাদশী'র মতন নাটক লিখলেন কী করে? এবং তাঁর এই চিন্তা-স্বাতন্ত্র্যের প্রকৃতি কী রকম ছিল, তা জানতে হলে আমরা যা দেখতে পাই, তা হল উভয় ধারার সমন্বয়ের জন্য তাঁর একটি আশ্চর্য এ চেষ্টা। রামমোহনের মত ইউরোপীয় ভাবধারাকে তিনিও গ্রহণ করেছিলেন মনে প্রাণে, চেয়েছিলেন নতুন ও পরিবর্তিত একটি সমাজ, কিন্তু তাই বলে সেই সমাজ ভারতীয় চরিত্র হারিয়ে অন্য রকম কিছু একটা হোক, তা' তিনি চান নি। নতুন ও পুরনো ধারা দুইই মিলিত হোক, কী সাহিত্যে, কী জীবনে, এ ছিল তাঁর কাঙ্ক্ষিত আদর্শ। এবং এই তত্ত্বটিকেই বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বিশ্লেষণ করে ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে বলা যায়, 'সেই ১৮৫৯।৬০ সাল বাঙ্গলা সাহিত্যে চির-স্মরণীয়—উহা নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরাণ দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ। দীনবন্ধু ইহাদের সন্ধিস্থল। বলিতে পারা যায় যে, ১৮৫৯।৬০ সালের মত দীনবন্ধুও বাঙ্গলা কাব্যের নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল।'[৫৫]

বঙ্কিমের, এই উক্তি কী গভীর তাৎপর্যপূর্ণ, তা বুঝতে হলে তাঁর সাহিত্য আলোচনা বিশেষভাবে দরকার। সুতরাং এবার সেদিকেই অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

॥ সূত্রনির্দেশ ॥

(১) Western Influence in Bengai Literature (Second Edition, 1947), by Priyaranjan Sen, P. 167

(২) বঙ্কিমরচনাসংগ্রহ, প্রবন্ধখণ্ড শেষ অংশ, সাক্ষরতা প্রকাশন, (৭ই জুন, ১৯৭৩), পৃ. ১১১৯

(৩) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, (১৯৫৭), পৃ ২৪৯

(৪) বঙ্কিমরচনাসংগ্রহ, প্রবন্ধখণ্ড শেষ অংশ. পৃ ১১১৯

(৫) 'দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী' (১৯১৪ ,—ললিতচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত ভূমিকা।

(৬) কবি অজিত দত্ত তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ-গ্রন্থ 'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস' বইটি ৫৯-৬০ পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে নানা তারিখ সনের উল্লেখ করে শেষ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁচেছেন।

(৭) দীনবন্ধু রচনাবলী, (মে, ১৯৬৭), পৃ ৩৭১

(৮) বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র রচিত 'আকিঞ্চন' কাব্যগ্রন্থের ১১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৯) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ (১৯৫৭), পৃ ২৪৯

(১০-১১) 'বিশ্বকোষ', (১৩০৪), ১৮৯৭, ৮ম খণ্ড, পৃ ৫৮৫—নগেন্দ্রনাথ বসু মশাই দীনবন্ধুর প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে একটি তথ্য ভুল পরিবেশণ করেছেন। সেই তথ্যটি হল, নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদক লঙ্‌। আশাকরি একথা বলবার অপেক্ষা রাখে না যে 'নীলদর্পণে'র ইংরেজির অনুবাদ আর যেই করে থাকুক না কেন, লঙ্‌সাহেব অন্ততঃ করেন নি।

(১২) 'প্রদীপ' পত্রিকা, ১৩০৫ সাল, 'ভাদ্র' সংখ্যা।

(১৩) Rural life in Bengal গ্রন্থটি কোলসওয়র্দি গ্রান্টের একটি বিখ্যাত বই। এই গ্রন্থের ১৬৬ পৃষ্ঠায় লঙ্‌সাহেবের পরীক্ষামূলক শিক্ষা ব্যবস্থার যে বিস্তৃত বিবরণ আছে, তার আংশিক তোলা হয়েছে মাত্র। বিস্তৃত বিবরণ পড়লে বোঝা যায়, তথাকথিত 'লোয়ার ক্লাশে'র সঙ্গে এঁর সম্পর্ক কতখানি ছিল নিবিড়।

(১৪) পেস্তালোজি ছিলেন সুইজারল্যাণ্ডের লোক। 'গ্রেট এডুকেটার' দের ভেতর ইনি একজন। পুরোনাম, জোয়ান হেনরিক পেস্তালোজি, আয়ুষ্কাল ১৭৪৬-১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ। এঁর মৃত্যুর পর দু'দশক পেরোতে-না-পেরোতে লঙ্‌সাহেব এদেশে এসে ওঁর আদর্শে শিক্ষাদানে উদ্যোগী হয়েছেন। আধুনিক ইওরোপ কী দ্রুত আমাদের কাছে এসে পৌঁচেছে, অন্ততঃ শিক্ষার ক্ষেত্রে এটি তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

(১৫) প্রদীপ পত্রিকা, ১৩০৫ সাল, 'ভাদ্র' সংখ্যা।

(১৬) এ তথ্যটি বঙ্কিমচন্দ্রের দেওয়া। বঙ্কিমরচনা সংগ্রহ (১৯৭৩), পৃ ১১২১।

(১৭) দীনবন্ধুর মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তাঁর সম্পর্কে যে সব লেখা প্রকাশিত হয়, সেই সব লেখা থেকে এ তথ্য পাওয়া যায়। 'ভারতসংস্কারক' ও তমোলুক পত্রিকা' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'তমোলুক পত্রিকা' এই তথ্য দিয়ে লিখেছেন, '...দীনবন্ধুবাবু বিদ্যালয় পরিত্যাগের পর কিছুদিন কলিকাতার হিন্দুকলেজের শিক্ষার কাজে নিযুক্ত থাকেন...।'

(১৮) বঙ্কিমরচনা সংগ্রহ (১৯৭৩), পৃ ১১২২

(১৯) ঐ, পৃ. ১১২২

(২০) 'প্রদীপ' পত্রিকা, ১৩০৫, ভাদ্রসংখ্যা।

(২১) Civilization of the Renaissance in Italy, P 200

(২২-২৩) সুরেশ সমাজপতি সঙ্কলিত 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গে' এই স্মৃতিচারণ সঙ্কলিত আছে। পৃ. ৮৫-৮৮।

স্মৃতিচারণ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। প্রবন্ধটির নাম, 'বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু।'

(২৪) 'ইংরাজস্তোত্র', বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্যে'র অন্তর্ভুক্ত একটি বিখ্যাত ব্যঙ্গ রচনা।

(২৫-২৬) বঙ্কিমপ্রসঙ্গ : সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সঙ্কলিত, পৃ. ৭৮-৮০

(২৭) দুলালচন্দ্র মিত্র লিখিত 'দীনবন্ধু-কথা', (১৩৪৫), গ্রন্থের পৃ. ২৫ দ্রষ্টব্য।

(২৮) 'পুরাতন প্রসঙ্গ', (দ্বিতীয় বিদ্যাভারতী সং, ১লা চৈত্র, ১৩৭৩), বিপিন বিহারী গুপ্ত, পৃ. ১৮৫

(২৯) 'প্রদীপ' পত্রিকা, ১৩০৫, ভাদ্রসংখ্যা।

(৩০) পুরাতন প্রসঙ্গ, (দ্বিতায় বিদ্যাভারতী সং, ১লা চৈত্র, ১৩৭৩), বিপিনবিহারী গুপ্ত পৃ. ২৫১

(৩১) বঙ্কিমরচনা সংগ্রহ, প্রথমখণ্ড শেষ অংশ, পৃ ১১২২

(৩২) The Civilization of the Renaissance in Italy, by Jacob Burckhardt P. 97

(৩৩) বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ শেষ খণ্ড প্রথম অংশ। পৃ. ১১২৭

(৩৪) আমার জীবন, (২য় খণ্ড), নবীনচন্দ্র সেন। পৃ. ২৭-২৮

(৩৫) স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্ররায়ের আত্মজীবনচরিত (নতুন সং, ৭ই ভাদ্র, ১৩৬৩) পৃ ১৪৮

(৩৬) বঙ্গভাষার লেখক, (১৯০৪), হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৩১৪

(৩৭) বঙ্কিমপ্রসঙ্গ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সঙ্কলিত, পৃ. ৬৭

(৩৮) 'নবীন তপস্বিনী' নাটক, তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(৩৯) বিদ্যাসাগর, [১৩০৭), বিহারীলাল সরকার প্রণীত, পৃ. ৫৬০

(৪০) 'প্রদীপ পত্রিকা', ১৩০৫, ভাদ্রসংখ্যা।

(৪১) 'বঙ্কিমজীবনী', (১৩১৮), শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত, পৃ. ৪০৫-৪০৭ দ্রষ্টব্য।

(৪২) 'প্রদীপ' পত্রিকা, ১৩০৫, ভাদ্রসংখ্যা।

(৪৩) দীনবন্ধু মিত্র (১৩৫৮), সুশীলকুমার দে, পৃ. ৬

(৪৪) 'বঙ্কিমপ্রসঙ্গ', সুরেশ সমাজপতি সঙ্কলিত, পূর্ণচন্দ্রের 'বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

(৪৫) বঙ্কিমরচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড. শেষ অংশ, পৃ. ১১২৯

(৪৬-৪৭) ঐ, পৃ ১১২৭-২৮

(৪৮) 'দীনবন্ধু মিত্র', (বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ, ১৩১২)

(৪৯) 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ', সুরেশ সমাজপতি সঙ্কলিত, পৃ. ৮০

(৫০-৫১) বঙ্কিমরচনা সংগ্রহ, প্রথমখণ্ড শেষ অংশ, পৃ. ১১২৪

(৫২) The Civilization of the Renaissance in Italy, by Jacob Burckhardt, P. 82.

(৫৩) The Bengal Magazine পত্রিকা দ্রষ্টব্য, লালবিহারী দে সম্পাদিত এই পত্রিকার প্রথম ভল্যুমের 'August 1872-July1873' সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(৫৪) 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার ১ম বর্ষ (১৩২০), দ্বিতীয় সংখ্যায় রসরাজ অমৃতলালের একটি ছবির পরিচিতিতে এই কথাগুলি লেখা হয়েছিল।

(৫৫) বঙ্কিমরচনা সংগ্রহ, প্রবন্ধ খণ্ড/শেষভাগ, পৃ. ১১২৯। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই ব্যাখ্যা যে যথার্থ ব্যাখ্যা, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সবটাই রেনেসাঁসী মনোভাবের দ্বারা চালিত। এবং সকলেই নিজের নিজের পথে পালন করে গিয়েছেন নিজের ভূমিকা। ডঃ সুশীলকুমার দের ব্যাখ্যাটি এই প্রসঙ্গে উদ্ধার করা যেতে পারে, তাঁর প্রতিবেদন হল, 'ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে আপন সাহিত্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াসই ছিল নব যুগের একটি প্রধান লক্ষণ।...মধুসূদন আনিলেন সর্বসংস্কার-বন্ধন হইতে কবিকল্পনার জড়তা মুক্তি, ভাব ভাষা ও ছন্দের আবেগ ও অবারিত প্রবাহ। তখন একদিকে, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী জীবনের ক্ষুদ্র সুখদুঃখকে লোকাত্তর কল্পনার উচ্চক্ষেত্রে তুলিয়া ধরিয়া রোমান্সের সৃষ্টি করিয়া বাঙালীর ভাবচেতনাকে উদ্বুদ্ধ করিলেন। অন্যদিকে, দীনবন্ধু বাঙালীর যে সহজ ভাবভঙ্গী ও তীক্ষ্ণ রসবুদ্ধি তাহাকেই নিত্য প্রবহমান জীবন ধারার মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়া বাঙালীর বাঙালিয়ানাকে নানা সরস ভঙ্গিমায় রূপায়িত করিলেন।'—(দীনবন্ধু মিত্র, পৃ ২২-২৩ (— আশাকরি বলার অপেক্ষা রাখে না, বাঙ্‌লা সাহিত্যে দীনবন্ধু কী দায়িত্ব পালন করতে এসেছিলেন, অন্ততঃ এই ব্যাখ্যার পরে।

তিন

॥ বাংলা নাটকের স্বপ্নভঙ্গ ঃ নীলদর্পণ ॥

বারোশ' আশি সালের বৈশাখ সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শন পত্রিকায়' 'তুলনায় সমালোচনা' শীর্ষক একটি আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এই লেখায় বাঙলা সাহিত্যের বিভিন্ন লেখকদের এক একেকটি ফলের গাছের সঙ্গে তুলনা করে অখ্যাত লেখক ভারতচন্দ্র রায় লিখেছিলেন, '...দিনবন্ধু (?) বাবু কাঁচা মিঠা আমগাছ। নীলদর্পণ তাহার মুকুল, তখন একবার দক্ষিণ মলয় বায়ুতে তাহার সৌরভ দিগ্বিস্তার করিয়াছিল; তাঁহার নিমচাঁদ, মল্লিকা, শ্রীনাথ, ক্ষীরোদবাসিনী, প্রভৃতি তাঁহার সেই কাঁচা মিঠার কাঁচা অবস্থা; আর তাঁহার 'দ্বাদশ কবিতা', 'সুরধুনী'তে সেই ফল যে পাকিয়া উঠিয়াছে আমরা যেন বুঝিতে পারিয়াছি।'

দীনবন্ধুর সাহিত্যের যাঁরা অনুরাগী পাঠক, বলতে দ্বিধা নেই, এই আলোচনাটি তাঁদের কাছে একান্তই কাঁচা লেখা বলে অনুমিত হবে এবং গ্রহনীয় যে কখনও হবে না তা', অতি সহজেই বলা যায়। কেননা, দীনবন্ধু যদি কাঁচা মিঠা আমগাছও হন, তাঁর প্রতিভার চরম বিকাশ কখনও 'দ্বাদশ কবিতা' ও 'সুরধুনী'তে নয়। অন্যেপরে কা কথা, 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদকের পক্ষেই এই বক্তব্য মেনে নেওয়া ছিল রীতিমত কঠিন। বরং তিনি এর বিপরীত কথাই লিপিবদ্ধ করেছেন। ইনি লিখেছেন, 'আমি যতদূর জানি, দীনবন্ধুর প্রথম রচনা 'মানব চরিত্র'-নামক একটি কবিতা। ঈশ্বরগুপ্ত কর্তৃক সাধুরঞ্জন নামক সাপ্তাহিক পত্রে উহা প্রকাশিত হয়।...সেই অবধি, দীনবন্ধু মধ্যে মধ্যে 'প্রভাকরে' কবিতা লিখিতেন। তাঁহার প্রণীত কবিতা সকল পাঠক-সমাজে আদৃত হইত। তিনি সেই তরুণ বয়সে যে কবিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহার অসাধারণ 'সুরধনী-কাব্য' এবং 'দ্বাদশ কবিতা' সেই পরিচয়ানুরূপ হয় নাই।'[১]

মোটকথা, যদি কেবল কবিত্বের কথাই ধরতে হয়, এই সূত্র ধরেই বিশ্লেষণে দেখা যায়, 'তরুণ বয়সে যে কবিত্বের পরিচয়' নাট্যকার দীনবন্ধু দিয়েছিলেন, পরিণত বয়সের কবিতায় তা' নেই। আর সব থেকে বড়োকথা, বাঙলা

সাহিত্যে দীনবন্ধুর পরিচিতি কবি হিসাবে নয়, নাট্যকার হিসাবে। তাঁর যে কবিতা গ্রন্থ আছে, ঐগুলি তাঁর বিস্মৃতির পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু নাটকগুলির বেলায় এ রকম উপেক্ষার কথা বলা যায় না। তাঁর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' কেবল তাঁর স্রষ্টাকে নয়, নাটকের ইতিহাসে যথার্থ আধুনিকতাকে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচিতিকেও সেই প্রথম আমাদের কাছে করেছে উপস্থাপিত। দীনবন্ধুর প্রসঙ্গে এক জায়গায় বঙ্কিম লিখেছেন, 'তিনি এই সময় 'নীলদর্পণ' প্রণয়ন করিয়া বঙ্গীয় প্রজাগণকে অপরিশোধনীয় ঋণে বদ্ধ করিলেন।'[২] বলে রাখা ভালো, এই ঋণ কেবল 'বঙ্গীয় প্রজাগণ'কেই ঋণে বাঁধে নি, ঋণে বেঁধেছিল নাট্যরসিক সব বাঙালীকেই। কেননা, এই নাটকের আবির্ভাবেই স্বপ্নভঙ্গ হল বাঙলা নাট্যসাহিত্যের।

ইউরোপীয় আদর্শে বাঙলা নাটক লেখার প্রচেষ্টা অবশ্য 'নীলদর্পণ' প্রকাশের বছর আষ্টেক আগে থেকেই দেখা যায়, কিন্তু এ উদ্যোগ খুবই সামান্য। আর সাফল্য তার থেকেও কম। জি. সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' ও তারাচরণ শীকদারের 'ভদ্রার্জুন' একই খ্রীষ্টীয় সনে প্রকাশিত। এবং প্রকাশের তারিখ হল, ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ। যে 'হেলেনিক' আদর্শের কথা ইতি-পূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে, সেই আদর্শ ইউরোপীয় রীতিতে আমাদের নাটক রচনায় অনুপ্রাণিত করল। মৌলিক নাটক রচনার এই প্রথম প্রচেষ্টা[৩]। হিসেব নিলে দেখা যায়, এ উদ্যোগ 'নীলদর্পণ' রচনার মাত্র আট বছর আগেকার ঘটনা। এই নাট্যকারেরা সেক্সপীয়রকেই গ্রহণ করেছিলেন আদর্শ হিসাবে। এবং খুব সচেতনভাবে তাঁকেই করা হয়েছে অনুসরণ। জি. সি. গুপ্ত লিখেছেন 'ট্রাজেডি' এবং দ্বিতীয় নাট্যকার শীকদার লিখে-ছিলেন 'কমেডি'। প্রথম জন কেবল ঐ ট্রাজেডি লিখেই ক্ষান্ত হননি, একটি কৈফিয়ৎও জুড়ে দিয়েছেন এবং তাতে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, 'শোকজনক ঘটনা আন্দোলন করিলে মনোমধ্যে এক বিশেষ সুখোদয় হয়, এ কারণ সেক্সপিয়র নামা ইংলণ্ডীয় মহাকবি লিখেছেন—আমার অন্তঃকরণ শোকানলে দহণ হইতেছে, তথাপি আমার মন অবিরত শোক প্রয়াসী' ইত্যাদি[৪]। —না, আলোচনা বাড়িয়ে লাভ নেই, তবে খুব সংক্ষেপে যা বলা যায়, তা হল নাটক রচনার ব্যাপারে আমাদের সাহিত্য খুব সচেতন ভাবেই ইউরোপের পথ ধরল। সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় পাতায় এই নতুন পথের বৃত্তান্ত রয়েছে ছড়িয়ে। এবং একেকটি পর্যায় এই রকম: '১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে রোয়ার (Edward Roer) কৃত 'মহাকবি সেক্ষপীর

প্রণীত নাটকের মর্মানুরূপ কতিপয় আখ্যায়িকা' ভার্নাকিউলার লিটারেচর সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই বৎসরে সেকস্‌পীয়ারের প্রথম বাংলা নাট্যানুবাদ হরচন্দ্র ঘোষ (১৮১৭-৮৪) কৃত 'ভানুমতী চিত্তবিলাস নাটক'ও বাহির হয়।'[৫] এইভাবে সেক্সপীয়রকে কেন্দ্র করে আমাদের বাঙলা নাটক দ্রুত একটি নিজস্ব রূপ নেবার চেষ্ট' করল।

এ সব উদ্যোগ ছাড়াও দেশীয় আদর্শে রামনারায়ণ তর্করত্ন এবং উমেশচন্দ্র মিত্রের লেখা কয়েকটি মৌলিক নাটকও দেখা দিল। না, তবু আমাদের নাটক উন্নীত মানের হতে পারে নি। আঠারোশ উনষাটের জানুয়ারীতে মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' যখন প্রকাশিত হল, মধুসূদন সখেদে লিখলেন, 'অলীক কুনাট্য রঙ্গে / মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে / নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।'— 'অলীক কুনাট্যে'র হাত থেকে আমাদের সাহিত্যকে বাঁচাবার জন্য এবং প্রকৃত সার্থক নাটক দিয়ে আমাদের সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করবার সুকঠিন সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে এলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় সাহিত্যেই তিনি ছিলেন পারঙ্গম। দক্ষ শিল্পী। এবং পূর্ব-পশ্চিম মেশানোর ব্যাপারে তাঁর নিজের ভূমিকা সম্পর্কে তিনি ছিলেন সচেতন। ঐ সচেতনতা নিয়েই খুব অল্প সময়ের ভেতর তিনি লিখে ফেললেন কয়েকটি নাটক। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ এপ্রিল বা মে মাসের প্রথমেই প্রকাশিত হল তাঁর 'পদ্মাবতী' নাটক। তারো আগে ঐ খ্রীষ্টীয় সনেই আমরা পেলাম তাঁর বিখ্যাত প্রহসন দুটি। যদিও তাঁর 'কৃষ্ণ কুমারী' পরের বছর ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের একেবারে শেষের দিকে হয়েছিল প্রকাশিত, কিন্তু এর প্রকৃত রচনাকাল ছিল এহ ষাটসালেব শরৎকাল। তারিখের হিসেবে ৬ই আগষ্ট থেকে ৭ই সেপ্টেম্বরের ভেতরে। অর্থাৎ ভাদ্রমাসের তৃতীয় সপ্তাহেই 'কৃষ্ণ কুমারী' লেখা শেষ হয়। আর এর কয়েকদিনের ব্যবধানে আশ্বিন মাসের দু তারিখে সকলকে চমক দিয়ে ঢাকা থেকে বের হল, 'নীলদর্পণ'।

কোথায় ঢাকা আর কোথায় কলকাতা। সুতরাং 'কৃষ্ণকুমারী' লিখতে গিয়ে মধুসূদন কী ভাবছেন, তা' ঢাকায় বসে দীনবন্ধুর পক্ষে জানা কী সম্ভব? কিন্তু কী আশ্চর্য, এই নাটক লেখার সূত্রে দু'জনের ভেতরে সেই আশ্চর্য মানসিক ভাবনার সমন্বয় কী সুন্দর ভাবেই না ঘটে গেল!—দীনবন্ধু যখন কবিতার কলমকে সাময়িক বিরতি দিয়ে কঠিন বাস্তব ঘটনা নিয়ে লিখে চলেছেন প্রকৃত বাস্তব নাটক, ঠিক তখনই কলকাতায় বসে প্রখ্যাত অভিনেতা কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে একটি চিঠি লিখে মধুসূদন জানাচ্ছেন, 'In the

great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget tho world of reality and dream of Fairy Lands. The genious of the Drama has not yet received even a moderate degree of development in this country.'[৬]

কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়ে দীনবন্ধু কেন যে নাটক লিখতে আরম্ভ করলেন, এ কৈফিয়তের জবাব দেওয়া কঠিন। কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তা ভাবনা যতই রোমান্টিক হোক না কেন, নাটকের বেলায়, অন্ততঃ নীলদর্পণে, তিনি যে তা'নন, তা' প্রমাণ করলেন সগৌরবে। ভারতচন্দ্র রায়ের ভাষায় তিনি যদি 'কাঁচামিঠা আম গাছ'ও হন, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যায় প্রথম মুকুল 'নীলদর্পণে'ই তিনি জবাব দিয়ে দিলেন যে বাঙলা নাটকেব ক্ষেত্রে বসন্ত সমাগত। মধুসূদন যা যা নিয়ে আক্ষেপ করেছিলেন, দীনবন্ধু তাদের অপসারিত করে সূচিত কবলেন নতুন দিনের। পরীর দেশের স্বপ্ন বিদায় নিল, বিদায় নিল অকারণ কোমলতা এবং রোমান্স্। 'স্টার্ণ রিয়ালিটিজ অব লাইফ' এবং 'ওয়ার্লড অব রিয়ালিটি' ইত্যাদি শব্দগুলি যে বাঙলা নাটকের পক্ষে নিতান্ত বাহুল্য মাত্র নয়, 'নীলদর্পণ' তা' অতি সহজেই প্রমাণ করতে পারল। এবং যা এতদিন ঘুমিয়েছিল, সেই নাট্য প্রতিভাকে তিনি করলেন জাগ্রত, বিকশিত এবং সব রকম মোহ থেকে মুক্ত। জি. সি. গুপ্ত থেকে মধুসূদন পর্যন্ত যা হয় নি, 'নীলদর্পণ' হঠাৎ এসে তাই করে ফেলল। বাঙলা নাটকের হল স্বপ্নভঙ্গ।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখা দরকার, রেনেসাঁস-রিফরমেশন-এনলাইটেনমেণ্ট ও ফরাসী বিপ্লব যদি 'মানবিকতা' বিকাশের একটি ধারারই কয়েকটি পর্যায় হয়, এবং তা' যদি একইসঙ্গে সামান্ত দু'চার বছরের ব্যবধানে এ দেশে ঘটে থাকে, তবে রেনেসাঁসের প্রয়োজনেই 'নীলদর্পণ' রচনার ভূমিকাও হয়ে গিয়েছিল প্রস্তুত। বাংলার রেনেসাঁসের এক সমালোচক লিখেছেন, নব-জাগরণের যাঁরা অগ্রদূত তাঁরা হলেন, 'কেউবা অভিজাত কেউ বা মধ্যবিত্ত। জনগণ হঠাৎ একদিন জেগে উঠে রেনেসাঁস করে নি, রেফরমেশনও না, এনলাইটেনমেণ্ট তো নয়ই। এক ফরাসী বিপ্লবেই জনগণকে রঙ্গমঞ্চে দেখা গেল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফরাসী বিপ্লবের পুনরাবৃত্তির লেশমাত্র সম্ভাবনা ছিল না এ দেশের মাটিতে। প্রথম তিনটির অনুবৃত্তির সম্ভাবনা

যে ছিল এটা রামমোহনেরই চোখে পড়ে।'[৭] —এবং এই লেখকের বিশ্লেষণ থেকে একথাও জানা যায়, 'রামমোহনের মধ্যে তিনটেই একসূত্রে গ্রথিত। ফরাসী বিপ্লবের সঞ্চালিকা ভাবধারাও তাঁর মধ্যে কাজ করছিল, তিনিও ভালোবাসতেন সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা। তবে বিপ্লবটার অনুরূপ তাঁর স্বকালে ও তাঁর নেতৃত্বে সংঘটিত হয় নি।'[৮] —রামমোহনের আমলে ও রামমোহনের নেতৃত্বে সাধারণ মানুষের অধিকার প্রসারিত করবার ঘটনা ঘটলেও, উৎপীড়িত মানুষদের শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মত কোনো ঘটনা যে ঘটেনি, ইতিহাসই তার সাক্ষী। কিন্তু তাঁর ভারত ত্যাগের পরে তিন দশকের ভেতরেই নীলচাষকে নিয়ে যে সব ঘটনা ঘটে গেল, তাকে 'মিনি' বিপ্লব বললে বোধহয় অত্যুক্তি করা হয় না।—অবশ্য এ জাতীয় ঘটনা যখন ঘটতে চলেছে, তখন রেনেসাঁসের কল্যাণে আমাদের সঠিক সচেতনতা ছিল অনেক বেশি এবং অভিজ্ঞতার পর অভিজ্ঞতায় আমাদের মন তখন হয়েছিল অনেক পরিণত। ফলে নীলকরদের উৎপীড়নের ব্যাপারে শাসকশ্রেণী রীতিমত বিব্রত বোধ করেছিল, এবং হঠকারী নীলকরদের কথা ভেবে ভারত সম্রাটের রাতের ঘুম গিয়েছিল চলে। এদিকে জনগণের কাছে এই আন্দোলনটি ছিল রীতিমত উত্তেজনাপূর্ণ এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ঘটনা এদেশের ইতিহাসে আর কখনো ঘটেনি। ঐতিহাসিকদের কাছ থেকেও এই বক্তব্যের সমর্থনে শোনা যায়, 'This was the first Organised Passive Resistance during British rule and it scored a great victory.'[৯]

ফরাসী বিপ্লবের আগে ও পরে অনেক বই লেখা হয়েছে। অনেক বড়ো বড়ো হিউম্যানিষ্টদের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। টমাস পেইনের নাম আমরা আগেই করেছি। তবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এঁদের ভূমিকা ছিল কখনো রাজনীতিকের, আবার কখনো বা মানবিকতাবাদীর। শিল্পীর ভূমিকায় এঁরা আসেন নি। এবং অন্যকোনো শিল্প নয়, কেবল নাটক এ জাতীয় পটভূমিতে কী কাজ করতে পারে, এ তথ্য আমাদের কাছে অজানা নয়। তবে ইংরেজি সাহিত্যের ক্ষেত্রে নাটকের যে একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল, তা' যে-কোন সাহিত্যের ইতিহাস লেখক ইংরেজের শরণ নিলে জানা যায়। এবং এঁরা গৌরবের সঙ্গে যা জানিয়েছেন, তা হল, 'Upon our literature the drama is in comparably the greatest force of the time : it inspired our grandest poetry as well as

our sweetest lyrics ; it gave variety; flexibility, and clarity to our prose.'[১০] —কেবল সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নয়, জাতীয় জীবনে জাতীয়তার উদ্দীপনে এই নাটকের ভূমিকা যে কম ছিল না, তা' ওঁরা নিজেরাই সগৌরবে নিবেদন করে লিখেছেন, 'It focussed the patriotic feeling of the nation and enabled Englishmen to feel more clearly and intensely, that spirit of nationality which had been growing up ever since the battle of Bosworth.'[১১]—বলে রাখা ভালো, ইংরেজী সাহিত্যের নাটকের এই ভূমিকার কথা নিবেদিত হয়েছে তখন, যখন রেনেসাঁস ওদেশে সবে শুরু হয়েছে। আমাদের দেশে ঠিক এই পর্বে নাটকের কোনো ভূমিকা ছিল না। কিন্তু তার যে একটি ভূমিকা থাকতে পারে, তা' প্রথম যে জানাল, সে হল, 'নীলদর্পণ'। তাই বাঙলা নাটকের স্বপ্নভঙ্গে 'নীলদর্পণে'র ভূমিকা অতিশয়োক্তি নয়, বরং অনুক্ত থেকেছে বলেই আমরা দুঃখ করতে পারি।

নীলচাষের পটভূমি

সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালানোর আগে সকালে সলতে পাকানোর যেমন একটি ইতিহাস আছে, তেমনি 'নীলদর্পণে'র শিল্পমূল্য যাচাই করবার আগে জানতে হবে নীল চাষের ব্যাপারে কর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবীদের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন ছিল এবং ইংরেজ আগমণের পর এ দ্বন্দ্ব কতখানি হয়ে উঠেছিল জটিল!—নীল যে ভারতবর্ষেরই নিজস্ব পণ্য তা' প্রাচীন 'গ্রেকো-রোমান' নাম দেখেই বোঝা যায়। প্লিনি, আরিয়ান্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকদের গ্রন্থ থেকে 'ইণ্ডিকাম্' নামটি পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ ঐ 'হণ্ডিকাম্' বা 'হণ্ডিকম্' থেকেই ইউরোপে যে নামটি ছড়িয়ে পড়েছিল, তা' হল, 'ইণ্ডিগো'। অবশ্য ফারসী ভাষায় এই নীলকে বলা হত, 'তুখমে নীল', আর আরবীতে 'নাভুন-নীল'। সংস্কৃত ভাষায় বলা হয়েছে এই নীলকে 'বিষ-শোধনী'। গ্রীক লেখক ডিওস্কোরিডেসের লেখা থেকেও নীল সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়, এবং রোমান লেখক প্লিনির বিবরণ থেকে এ তথ্যও জানা যায় যে সিন্ধুনদের তীরে অবস্থিত 'বারবারিকন' বন্দর থেকে ভারতের 'হণ্ডিগো' চালান যেত দেশ-বিদেশে।[১২]

'সংহিতা'র রচয়িতা মনুর আমলেও যে এদেশে নীলের ফলাও কারবার ছিল, তা' তার দশম অধ্যায়ের উননব্বই সংখ্যক শ্লোক থেকে অনায়াসেই বোঝা

যায়। সব রকমের আরণ্য ও দংস্ট্রী পশু, অখণ্ডিত ক্ষুর অশ্বাদি, এবং পক্ষী, মদ এবং লাক্ষার সঙ্গে যে ব্যবসা ব্রাহ্মণদের কাছে নিষিদ্ধ ছিল, তা'হল 'নীল'। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সমুদ্রপথে ফেরবার সময় মার্কোপোলো ত্রিবাঙ্কুরের একটি বন্দরে 'নীলের' সাক্ষাৎ যে পেয়েছিলেন, তা' তাঁর বিবরণী থেকেই জানা। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কন্তে, ষোড়শে জন হুইঘেন ভান্ লিন্সোটেন এবং সপ্তদশে যায়। ত্রাভারনিয়ের-এর কাছ থেকে নীল বিষয়ে আমরা আরো অনেক খবর পাই। 'আইন-ই-আকবরী'র পাতা উল্টালেও দেখা যায় আগ্রার কাছে রায়নাতে এবং গুজরাটের কাছে আহ্‌মদাবাদে উৎকৃষ্ট নীল রঙ্‌ প্রস্তুত হত এবং তখনকার দিনে মন প্রতি তার দাম কখনো দশ বারো টাকার বেশী ছিল না।—[১৩] অবশ্য ইংরেজ লেখকেরা কখনো কখনো এ দামকে ষোলো টাকাও বলেছেন। এঁরা আবুল ফজলের উৎস ধরেই লিখেছেন, 'From the same source we gather that the highest price realised per maund of superior indigo produced at Biana, near Agra, was only Rs. 16!'[১৪]—মুঘল আমলের প্রখ্যাত পরিব্রাজক ফ্রাঁসোয়া বার্ণিয়েরের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে আবার এমন তথ্যও জানা যায় যে 'বায়না' প্রভৃতি জায়গায় নীল জোগাড়ের কারবারী ছিলেন যাঁরা, তাঁরা হলেন ওলন্দাজ বণিককুল।[১৫]

মোটকথা, একটি ব্যাপার আগাগোড়া লক্ষণীয় এবং সেই লক্ষণীয় ব্যাপারটি হল এই যে ভারতের যে প্রান্তেই নীল উৎপন্ন হোক না কেন, নীলের খরিদ্দার ছিল ইউরোপ। আর এই ইউরোপ যে সেই প্রাচীন যুগ থেকে নীলের জন্য হ্যাংলার মতন হাত বাড়িয়ে বসেছিল, তাও কিন্তু নয়। ইউরোপ তার নিজের ঘরে বসে 'ওযাড' নামে এক ধরণের পণ্য উৎপাদন করত, যদিও গুণগত উৎকর্ষে তা' নীলের থেকে অনেক কমা ছিল, কিন্তু এ দিয়েই তার কাজ মোটামুটি চলে যেত। জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, ইংল্যাণ্ড, প্রভৃতি সব দেশেই এই ওয়াডের চাষ ছিল। পরে ভারতের নীল এসে এদেশে ঢুকল, তখন ঐ ওয়াডের চাষ বন্ধ হল। তার ফলে ঐ চাষে লিপ্ত এবং পণ্যের ব্যবসায়ীরা যে ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল, তার কথা না তোলাই ভালো। নীলাতঙ্কে বেচারিরা ভীষণ ভাবে হল জর্জরিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা উদ্ধৃত করে এই ইতিহাসটা এ ভাবে উদ্ধার করা যেতে পারে, 'পূর্বে য়ুরোপে Woad নামক একপ্রকার নীলোৎপাদক উদ্ভিজ দ্রব্যের বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে য়ুরোপে ভারতবর্ষীয় নীলের এত কাটিং হয় যে তাহাতে য়ুরোপ জাত 'ওয়াডে'র বাণিজ্য অনেকটা কমিয়া যায়—এবং সেই হেতু

১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে নীলের বাণিজ্য নিষিদ্ধ করিয়া এক রাজাজ্ঞা প্রচার হল। তখন নীলকে ভুতুড়ে রং (Devil's dye) বলা যাইত।'[১৬]

'ওয়াড' এবং 'নীলে'র সংগ্রামে ইউরোপ ভূখণ্ড থেকে 'ওয়াড' চিরতরে নির্বাসিত হয়েছিল যে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু জেনে রাখা ভালো, ওলন্দাজ বণিককুলের দ্বারা আমদানী করা ভারতীয় নীলের চেহারায় ইউরোপ মোহিত হলেও, সপ্তদশ শতক থেকে ইউরোপ যেখান থেকে প্রভূত নীল আমদানি করত তা' কিন্তু ভারত নয়, তা' হল 'ওয়েষ্ট-ইণ্ডিজ'।—ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকরা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এবং ফরাসীরা 'সেইন্ট ডোমিঙ্গো'তে উৎকৃষ্ট নীল তৈরী করত। সেই নীলের সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা ভারতের ছিল না। তবে ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানে ক্রীতদাস প্রথা রহিত হওয়ায় নীলকর সাহেবরা বেকায়দায় পড়লেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁদের এই চাষ ও ব্যবসা দিতে হল তুলে।—আর তারপরই ভারতীয় নীলের কাছে একটি সুযোগ এসে গেল। এ ব্যাপারে সাহেবদের ভাষা উদ্ধৃত করেই বলা যায়, 'It was only on the destruction of St. Domingo, that a fair field was once more open to the East Indies.'[১৭]

এই 'ফেয়ার ফীল্ডে' সুযোগ নেবার জন্য ভারতীয় বণিকদের উচিত ছিল এগিয়ে আসা। কিন্তু কোথায় তারা? -পরিবর্তে এলো যে, সে হল, 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি'। ১৭৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দের কোমপানির পুঁথিপত্র নাড়াচাড়া করলে দেখা যায় কোমপানি হঠাৎ উৎসাহিত হয়ে ইউরোপের বাজারে কিছু বাঙলার নীল চালান দিয়ে এবং লোকসান খেয়ে তখনই আবার পড়ল ঝিমিয়ে, ঐতিহাসিকের ভাষায়, 'The East India Company commenced their investments in 1779-80, but for some years they were not profitable and ordered to be discontinued.'[১৮]—আসলে প্রস্তুত না হয়ে নামবার জন্য কোমপানির কাছে নীলের ব্যবসাটা হয়ে দাঁড়াল সাপের ছুঁচো গেলা। আমেরিকার চাষ তখনো ঠিক বন্ধ হয়নি, আবার আমাদের এই বাংলাদেশের চাষ তখনো এমন উৎকর্ষ লাভ করে নি যে সোজাসুজি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ইউরোপের বাজার দখল করতে পারে।

তাই প্রতিদ্বিন্দ্বিতা করবার মতন উৎকৃষ্ট নীল যাতে উৎপন্ন হতে পারে এবং সেই নীল বিক্রয় করে যাতে কিছু 'নাফা' করা যায়, এ ব্যাপারে অসীম উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে এলো জন কোমপানি। এ প্রসঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নাথের

লেখা সবিশেষ অনুধাবন যোগ্য। ইনি লিখেছেন, 'উৎকৃষ্ট পদ্ধতি অনুসারে কি রূপে নীল প্রস্তুত করিতে হয় কোম্পানি তাঁহাদিগের কর্মকর্তাদিগের প্রতি ভূয়োভূয়: উপদেশ পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন এবং অন্য দেশের উৎকৃষ্ট নমুনা এবং ভারতবর্ষ প্রেরিত নীল সম্বন্ধে বিলাতী দালালদিগের রিপোর্ট তাঁহাদিগের নিকট প্রেরণ করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত ১৭৮৯ ও ১৭৯০ এই দুই বৎসরের জন্য শুল্ক রহিত করিলেন এবং জাহাজ ভাড়াও কমাইয়া দিলেন। আরও কোম্পানি কতকগুলি নীলকারখানা ওয়ালাদিগকে বেশি বেশি করিয়া টাকা দাদন দিতে লাগিলেন'।[১৯] 'জন কোম্পানি'র এত উদ্যোগ আয়োজন যে বৃথা যায়নি, তা' ইংল্যণ্ডে নীল আমদানির পরিসংখ্যানের ওপর চোখ বোলালেই বুঝতে পারা যায়। ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড যে পরিমান নীল আমদানি করেছিল, ওজনের হিসাবে তা' হল, ১, ৮৪০, ৮১৫ পাউণ্ড। এর ভেতর আমেরিকাব যোগান ছিল ৬২৬, ০৪২ পাউণ্ড, স্পেনের ছিল ৩৫৫, ৮৫৯ পাউণ্ড, ওয়েস্ট-ইণ্ডিজ যোগান দিয়েছিল ১২৬, ২২০ পাউণ্ড, আর বাকি ৫৩১, ৬১৯ পাউণ্ড যা গিয়েছিল, তার সবটাই যোগান দিয়েছিল এই ভারত।[২০] —তবে মাত্র পাঁচ বছরের ব্যবধানে এই চেহারা বদল হয়ে যায়। ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কেবল বাংলাদেশ থেকেই ওদেশে যে পরিমান নীল গিয়েছিল, তার পরিমান হল ২, ৯৫৫, ৮৬২ পাউণ্ড। অর্থাৎ এই বৃদ্ধি পাঁচ বছরের ব্যবধানে প্রায় পাঁচগুণ।—এই তথ্যের সঙ্গে ডব্লু. এইচ. কেরি লিখিত তথ্য যোগ করলে যা দাঁড়ায়, তা' হল এই রকম: 'In 1790, the amount of indigo exported was 531, 619 lbs. In 1795, Bengal became the chief source of supply. In that year Bengal contributed to the English market 2, 955, 862 lbs. About the year 1800, exports from the American states almost ceased and in 1802-3 indigo began to be imported by those states from Bengal. From that time British India has had no rival in the traffic except Java. In 1796, Bengal produced 62, 500 mounds of indigo, but did not reach that quantities again till 1805, when 64, 803 mounds were manufactured.'[২১]

না, এরপর নীল আর পিছিয়ে থাকেনি, দিনে দিনে তার উৎপাদন বেড়েই চলল। ১৮১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দের পরিসংখ্যান নিলে দেখা যায়, এ সময়ে নীলের

উৎপাদেনর পরিমান হল ১,২৮,০০০ মন।[২২] বলা বাহুল্য, এর পরের থেকেই আমাদের এই বাংলাদেশই গোটা ইউরোপের নীল যোগানের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিল। —আর ঠিক এই সময়েই, রামমোহন কলকাতায় এলেন স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে।

এ পর্যন্ত যা নিবেদিত হল, তা' একান্তভাবেই বাইরের খবর। কেবল বাইরে থেকে নয়, এবার একটু চাষ-বাসের ভেতরের দিকে ঢোকা যাক।—পুরনো দিনের কথা ছেড়ে দিলে, প্রশ্ন দেখা দিতে পারে, প্রথম আধুনিক নীলকর কে? —বলে রাখা ভাল, এ ব্যাপারে যার নাম প্রথমে আসে, তিনি কিন্তু কোনো ইংরেজ নন, তিনি একজন ফরাসী, নাম লুই বুন্নো। রামমোহন যখন দামাল ছেলে, টলমল করে চলে বেড়াচ্ছেন, কিংবা সবে মাত্র হাতে খড়ি হয়েছে, সেই সময়, ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আধুনিক পদ্ধতিতে নীল চাষ আরম্ভ করলেন লুই বুন্নো। এঁর দেশ ছিল মার্সেই। স্বদেশ মার্সেই থেকে অতি অল্প বয়সে ইনি পাড়ি দেন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। ওখানে গিয়ে রোজগারপাতি ভালোই করছিলেন, কিন্তু নানা ঝামেলায় ওখানে বেশিদিন থাকা সম্ভব হয়নি। চলে এলেন বুরবঁ দ্বীপে। বণিকবৃত্তি নিয়ে বণিক হিসাবেই এখানে রইলেন কিছুদিন। কিন্তু বুরবঁ তার প্রসন্ন মুখ দেখাল না এই ভিন্‌দেশী বণিককে। অগত্যা এই দ্বীপটি ছাড়তে হল বুন্নোকে। বুন্নো এবার ভাগ্যান্বেষণে সোজা চলে এলেন কলকাতায়। কলকাতা থেকে চন্দননগবে। এখানে এসে আবিষ্কার করলেন যে এখানকার যুগ ও কাল নীলচাষের পক্ষে অনুকূল। সুতরাং ভাবলেন, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে আপত্তি কী? এবং তা' কাজে লাগাতেই চন্দননগরের কাছে তালডাঙ্গাতে একটি বিরাট বাগান ইজারা নিলেন। কিন্তু এই বাগানটি বিশেষ বড়ো না-হওয়ায়, ছেড়ে দিয়ে আরেকটি বাগান ভাড়া করলেন তেলিনী পাড়ার কাছে গোঁদল পাড়ায়। নদীর ধারে বাগান, চাষের পক্ষে উপযোগী, এখানেই আরম্ভ করলেন নীলচাষ। বাংলার মাটিতে আধুনিক প্রথায় নীলচাষ সেই প্রথম। এবং প্রথম নীলকর হিসাবে ইতিহাসের পাতায় যাঁর নাম উঠল তিনি হলেন, এই 'লুই বুন্নো'। অবশ্য ঠিক একবছর পরেই এলেন ইংরেজ নীলকর ক্যারেল ব্লুম। বেচারি এক বছর পরে আসার জন্য ইতিহাসের পাতায় প্রথম হবার গৌরব থেকে হলেন বঞ্চিত।

এর পরের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, নীলকরেরা পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে আসতে থাকলেন দলে দলে। এই নীলকরদের

মোটেই কিন্তু সুনাম ছিল না। বরং যা ছিল তা' একবারে বিপরীত। নিগ্রো ক্রীতদাসদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে এঁরা হতে পেরেছিলেন নির্মম; তার ওপর এঁদের না-ছিল চোখের চামড়া, না-হৃদয়। ঐতিহাসিকের ভাষা উদ্ধার করে এঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে যা বলা যায়, তা' হল, এঁরা ছিলেন,… 'rough set of planters, some of whom had been slave-drivers in America and carried unfortunate ideas and practices with them.'[২৩]—এই নীলকরেরা যখন একে একে আসতে থাকলেন, ঠিক এই সময়েতেই এদেশে ভূমি ও রাজস্ব ব্যাপারেও একটি বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হল। এই পরিবর্তনের নাম হল, 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' এবং পরিবর্তনের সন হল ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ। এই বন্দোবস্তের কল্যাণে আমাদের দেশে বড়ো বড়ো জমিদারেরা দেখা দিলেন একে একে। কোমপানির সঙ্গে এঁদের চুক্তি হল রাজস্বের। আর জমি বিলির দায়িত্ব রইল জমিদারদের হাতেই। —তবে বিদেশীদের জমি বিলির ব্যাপারে কিন্তু আইনের ভীষণ বাধা ছিল। কোমপানির এই সময়ের শাসনকালে বিদেশীদের এদেশে আসতে হলে প্রয়োজন হত অনুমতির। এবং কোমপানি যে বুঝে সুঝে এই অনুমতি দিত, তা' উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। আর অনুমতি না নিলে কী রকম বিপদ হতে পারত, তার জাজল্যমান প্রমান হলেন ওয়ার্ড ও মার্শমান। প্রয়োজনীয় অনুমতি না-থাকার জন্য এঁরা ধরা পড়েছিলেন গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে। এবং এ তথ্য প্রসঙ্গান্তরে আগেই দেওয়া হয়েছে। সুতরাং ভাগ্যান্বেষী ইংরেজদের কাছে এ নিষেধের খবর যে অবিদিত ছিল না, তা' বলা বাহুল্য মাত্র।

'রুরাল লাইফ ইন্ বেঙ্গল' গ্রন্থের লেখক কোলস্ওয়ার্দি গ্রান্ট সাহেব তাঁর গ্রন্থের এক জায়গায় লিখেছেন, 'Previous to the year 1829 Europeans were prohibited holding lands upon lease in India.'[২৪]—লেখক গ্রান্ট এই সংবাদটুকু পরিবেষণ করেই যে চুপ করে গেছেন, তা' নয়। তিনি এই নিষেধের ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, 'It was conceived to be fraught with danger, not only to the security and well doing of the Government, but to the interests and well-being of the people, anongst whom Europeans, thus mixing, would acquire a poor liable, it was feared, to abuse'[২৫]—এই ব্যাখ্যা থেকে একথা সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে ইউরোপীয়দের অবাধ প্রবেশ

এদেশে কোনো গোলযোগ বাধাক, কোমপানির কর্তৃপক্ষের সেরকম ইচ্ছা ছিল না।

তবে এই ইচ্ছাকে শেষ পর্যন্ত যে রক্ষা করা গেল না, তার কারণ হল আমাদের দেশের লোকেদের তাগিদা। এবং এ তাগিদা মূলত: নীলচাষকে কেন্দ্র করেই। রামমোহন-দ্বারকানাথ-প্রসন্নকুমারের মত সেকালের সচেতন মানুষরা চেয়েছিলেন যে এই নীলচাষের মাধ্যমে আমাদের গ্রামের দরিদ্র জনগণের একটু আর্থিক স্বচ্ছলতা আসুক। রামমোহনের বিশ্বাস ছিল, 'If Europeans of character and capital were allowed to settle in the country,···it would greatly improve the resources of the country and also the condition of the native inhabitants, by showing them superior methods of cultivation and the proper mode of treating their labourers and dependents.'২৬—বিদেশ যাত্রার আগে একটি বক্তৃতায় রামমোহন নীলচাষের ব্যাপারে তাঁর চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করে লিখেছিলেন, '···As to the indigo planters, I beg to observe that I have travelled through several districts in Bengal and Behar, and I found the natives residing in the neighbourhood of indigo plantations evidently better clothed and better conditioned than those who lived at a distance from such stations.'২৭—যে আর্থিক স্বচ্ছলতার কথা পূর্বে বলা হয়েছে, এই কথাই রামমোহন বললেন।— আর ইউরোপীয়দের অবাধ আগমনের ব্যাপারে তিনি যা বিশ্বাস করতেন, তার ভেতর একটি জিনিষ বিশেষভাবে লক্ষনীয়, এবং লক্ষনীয় বিষয়টি হল, 'ইউরোপীয়ানস্ অব কারেকটার'।—মোটকথা, রামমোহন বিশ্বাস করতেন ইউরোপীয় চরিত্র এবং ইউরোপীয় বিত্ত আমাদের একদিন যথার্থ পথের নির্দেশ দেবে। রামমোহনের মত দ্বারকানাথেরও ছিল ঐ একবিশ্বাস। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারি নীলচাষকে স্বাগত জানিয়ে 'সংবাদ কৌমুদী'তে তিনি যে চিঠিখানি লেখেন তাতে রামমোহনের কণ্ঠস্বর যেন শোনা যায়। জমিদারী পরিচালনার অভিজ্ঞতা সূত্রে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে আগে যে-সব শ্রমিক এক মুঠো চালের বিনিময়ে বা বেগার দিয়ে কালাতিপাত করত জমিদারদের আশ্রয়ে, তারা নীলকরদের কাছে পেয়েছে স্বাধীনতা ও সুখের স্বাদ। মাসে মাসে তারা চারটাকা করে পান বেতন। আর 'সরকার'

ইত্যাদি উচ্চতর বেতন পেয়ে ধীরে ধীরে জন্ম দিচ্ছে মধ্যবিত্তের।[২৮]—প্রায় ঠিক এই সময়েতেই প্রসন্নকুমার ঠাকুরও নীলচাষকে স্বাগত জানিয়ে লিখছেন, 'India wants nothing but the application of European skill and enterprises to render her poweful, prosperous and happy;'[২৯]

এইভাবে সমৃদ্ধতর স্বদেশের ছবি যখন আমরা দেখতে আরম্ভ করেছি, আর্থিক উন্নয়নের জন্য 'নীলকর'দের নীলচাষকে জানাচ্ছি স্বাগত, ঠিক সেই সময় সরষের ভেতরেই যে ভুত ঢুকে বসে আছে তা' কে জানত! আগেই বিবৃত করা হয়েছে, বিদেশীদের পক্ষে এদেশে আসা যেমন কোম্পানির অনুমতি সাপেক্ষ ছিল, তেমনি তাঁদের ব্যবসায়ের ব্যাপারে আরো কঠোর আইন ছিল। কোম্পানির কাছে নিতে হত তার লাইসেন্স। এদিকে মওকা বুঝে এদেশে কোম্পানির কাছে কর্মরত অনেক ইংরেজ কলকাতার ধনী ইংরেজ ব্যবসাদারদের কাছ থেকে টাকা হাওলাত নিয়ে নেবে পড়ত ব্যবসাতে। অবশ্য বেনামীতে। এই বেনামীতে তাঁরা সংগ্রহ করতেন জমি এবং ঐ জমিতে গড়ে উঠত নীলকুঠি। প্রশ্ন উঠতে পারে, জমি এঁরা পেতেন কাদের কাছ থেকে?—১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে 'অষ্টম আইনের' কল্যাণে পরে জমিদাররাই পেয়েছিলেন সেদিন পত্তনীতালুক বিলি করবার অধিকার, সুতরাং জমি সংগ্রহে বাধা কোথায়? ঐতিহাসিকদের ভাষা উদ্ধার করে বলা যায়, '...১৮১৯ অব্দের অষ্টম আইনে (Regulation VIII of 1819) জমিদারদিগকে পত্তনী তালুক বন্দোবস্ত করিবার দেওয়ায় এক এক পরগণার মধ্যে অসংখ্য তালুকের সৃষ্টি হইল এবং জমিদারগণ নবাগত নীলকরদিগের বড় বড় পত্তনী দিতে লাগিলেন'।[৩০]

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের পর ১৮২৩-এ হল 'ষষ্ঠ আইন', অর্থাৎ 'রেগুলেশন সিক্স'। এই আইনের বলে 'দাদনের টাকা' আইন সিদ্ধ হল। এবং একটু বিস্তারিত করে যা বলা যায়, তা' হল, 'যদি প্রজালোক নীলকর সাহেবের স্থানে দাদনী লইয়া নীলের আবাদ তরকুদ না করে তবে ঐ সাহেব ঐ প্রজার নামে নালিশ করিয়া দাদনীর টাকা ও সেই টাকার শতকরা বার্ষিক বারটাকার হিসাদে সুদ ধরিয়া তাহার স্থানে পাইতে পারেন।... যে কোন প্রজালোক নীলের দাদনী লইয়া কালক্রমে তাহার চাষবাস করিতে না পারিলে ঐ দাদনীর টাকা এবং শতকরা বারটাকার হিসাবে সুদ ধরিয়া সুদ সমেত দাদনীর টাকা ফিরিয়া দিলে প্রজালোক ঐ দায় হইতে মুক্ত হইতে পারেন।'[৩১]

ঐ আইনের পর আমরা পেলাম ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের 'পঞ্চম আইন'। অর্থাৎ 'রেগুলেশন ফাইভ অব এইট্টিন থার্টি'। এ বছর রামমোহন বিলেত রওনা দিলেন এবং এ বছরেই ভূমিষ্ঠ হলেন আমাদের আলোচ্য নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। এদিকে বাঙ্‌লা রেনেসাঁসের বয়সও হয়ে গেল পাঁচ বছর। এ বছরের আইনে ঘোষিত হল, দাদন-গ্রহণকারী নীল-রায়তদের পক্ষে নীলচাষ না করা হবে বে-আইনী। এ আইনে অভিযুক্ত হলে ফৌজদারী বিচারে কারাদণ্ড ছিল অবধারিত। ভাবতে অবাক লাগে, 'নিউ লার্নিং'-এর কল্যাণে এবং ডিরোজিও-রামমোহনের নায়কতায় যখন চারদিকের বন্ধন মুক্তি ঘটছে, তখন মানুষকে দাসে পরিণত করার এ চক্রান্ত কেন? না, পরবর্তী কাল নয়, ঠিক এই সময়েই 'জনৈক মফস্বলবাসী এ প্রশ্ন তুলেছিলেন এবং এই আইন সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, '....When the cultivator has once received an advance, neither he nor any of his posterity can obtain diliverence from the engagement, for the accounts are so dexterously obscure, that he always appears in arrears that is to say, he can never expect to be emancipated from his bondage under a thousand similiar acts of oppression the community groans.' ৩২

এই আইনটি অবশ্য পাঁচ বছরের মাথায় ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্যাহৃত হয়, কিন্তু তার আগেই ১৮৩৩-এ 'চার্টার অ্যাক্টের' কল্যাণে ইংরেজরা অবাধে আসবার, জমির মালিক হবার এবং স্বাধীনভাবে ব্যবসা করবার পেয়ে গেলেন অনুমতি।—তাই বলতে দ্বিধা নেই, এরপর আমরা যে ইতিহাস পাই, তা' হল, প্রবল কী ভাবে উদ্ধত অন্যায়ে লিপ্ত হয়, তার ইতিহাস।

দীনবন্ধু তাঁর 'নীলদর্পণে'র ভূমিকায় নীলকরদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন, 'তোমরা এক্ষণে দশ মুদ্রা ব্যয়ে শতমুদ্রার দ্রব্য গ্রহণ করিতেছ, তাহাতে প্রজাপুঞ্জের যে ক্লেশ হইতেছে, তাহা তোমরা বিশেষ জ্ঞাত আছ,' ইত্যাদি। দীনবন্ধু যে অতিশয়োক্তি করেন নি, তা Watts-এর লেখা Dictionary of Economic Products of India, (1890)—গ্রন্থের ৪২৮ পৃষ্ঠা দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। এই গ্রন্থের এই পৃষ্ঠায় যে তথ্য আছে, তা' থেকে জানা যায়, নীলকরদের লাভ ছিল শতকরা একশ টাকা। অন্যে পরে কা কথা, 'কমিশনে'র কাছে প্রখ্যাত নীলকর মিঃ লারমুরের সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, 'বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানীর' ভিন্ন ভিন্ন কুঠিতে ১৮৫৮-৫৯ অব্দে যে

৩৩,২০০ জন প্রজা নীলচাষ করেছিল, তাদের ভেতর ২,৪৪৮ জন প্রজা দাদনের অতিরিক্ত মূল্য বাবদ কিছু পেয়েছিল, বাকি কেউই দাদনকে অতিক্রম করতে পারে নি। —লারমুরের ঐ সাক্ষ্য দানের বছর দশ আগে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফরিদপুরের ম্যাজিস্ট্রেট প্রখ্যাত সিভিলিয়ান ডিলাটুর সাহেব নীলকরদের অত্যাচারের বহর দেখে দুঃখের সঙ্গে মন্তব্য করতে বাধ্য হয়েছিলেন, 'মনুষ্য-রক্তে কলঙ্কিত না হয়ে নীল ইংলণ্ডে পৌছয় না।'[৩৪]

প্রবলের এই যে উদ্ধত অন্যায়, এই অন্যায় যে সামন্ততান্ত্রিক ভোগসর্বস্বতায় ডুবে ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একদিকে নির্মম শোষণ, অপর দিকে রাজকীয় প্রাচুর্য অবশ্য 'ফরাসী বিপ্লবে'র পূর্বের ফ্রান্সের কথা মনে করিয়ে দেয়।

তবে বলে রাখা ভালো, বিপ্লব হিসাবে তুলনা করলে যদিও অনেক ব্যাপারে 'ফরাসী বিপ্লবে'র সঙ্গে এর মিল পাওয়া যায়, কিন্তু এটি একটি মিনি বিপ্লব মাত্র।—আমাদের রেনেসাঁস যেমন দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি, এবং গভীরতার দিক থেকেও যেমন তা মাটির মানুষকে তেমন ভাবে পারেনি স্পর্শ করতে, তেমনি এই বিপ্লবও সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণীকে পাথেয় করে শাসক সমাজকে পারেনি চিরতরে নির্বাসিত করতে। তবুও এটিযে অনিবার্য ছিল এবং অগ্নিগর্ভ ছিল, তাতে কোন সংশয় নেই। রেনেসাঁসের পথ ধরেই সে এসেছে। সুতরাং রেনেসাঁসের লক্ষণ তার ভেতর থাকবেই।

প্রসঙ্গে ফেরা যাক। 'রুরাল লাইফ ইন্ বেঙ্গল' গ্রন্থের লেখক গ্রাণ্টের চোখের সামনে যা পড়ত, রেখায় ও লেখায় তাকেই তিনি রাখতেন ধরে। মোল্লাহাটির কুঠিতে ফারলং ও লারমুরের শৌখীন প্রাসাদে থাকবার অভিজ্ঞতা হয়েছিল এই গ্রাণ্টের। প্রাচীর ঘেরা প্রকাণ্ড বাগান। হরিণ চরত। আরাম ও বিলাসে পুরোপুরী ছিলেন এঁরা বাদশাহী। কুঠি নয়, এ যেন রাজভবন। মোল্লাহাটি কেন, যশোরের নহাটা, বাবুখালি, এবং হাজরাপুরের বেলাতেও এ কথা বলা যায়। নিশ্চিন্দিপুরের কুঠিতে ঘোড়ার আস্তাবলে থাকত সত্তরটি বাছাই করা ঘোড়া। ফরলং-লারমুরের মালিকানায় 'বেঙ্গল ইণ্ডিগো কোম্পানি'র অধীনে ৫৯৫টি গ্রাম ছিল, রীতিমত জমিদারী, এ বাবদে কোমপানি বছরে খাজনাই দিত তিন লক্ষ চল্লিশ হাজার তঙ্কা। 'নীলদর্পণে' কথিত বিখ্যাত চাবুক 'শ্যামচাঁদ' (বা রামকান্ত)-এর আবিষ্কারের গৌরব ঐ লারমুরের পাওনা। ঐতিহাসিকদের ভাষা উদ্ধার করে বলা যায়, 'The authorship of this, was ascribed to Mr. Larmour, the leading

planter in Bengal.'[৩৫]—লারমুরের নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার কিংবদন্তীর মত যে লোকের মুখে মুখে ঘুরত, তা' আরো অনেক ঐতিহাসিকের কাছ থেকে জানা যায়। এবং এ কথাও প্রচারিত, 'এই কুঠির অত্যাচার কাহিনীর উপর লক্ষ্য রাখিয়া দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' প্রণীত হয়।'[৩৬]

নীল-বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্বে হিসাব নিলে দেখা যায়, এ জাতীয় কুঠির সংখ্যা এদেশে ন'শ। আর সব কুঠিয়ালই লারমুরের মতনই ছিলেন এক ছাঁচে গড়া। ক্রীতদাসদের ওপর অত্যাচার চালিয়ে এঁদের হাত পাকা হয়েছিল, সুতরাং ঐ পাকা হাতেই এ দেশীয় দরিদ্র রায়তদের ওপর চালিয়ে গেলেন পীড়ন।—এঁদের পরিচালনায় লুণ্ঠিত হলো গ্রামের পর গ্রাম, আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া চল অনেকের বাড়ী-ঘর, দাদনের নামে চলল স্বেচ্ছাচারিতা, চলল গোপন কয়েদ ও সাত কুঠির জল খাওয়ানো, গৃহস্থ কন্যাদের ওপরও পড়ল এঁদের নজর এবং শেষ পর্যন্ত এই চাষীকন্যা ও বধূদের পবিত্রতাও এঁরা বিনষ্ট করলেন অত্যন্ত তুচ্ছতার সঙ্গে।—মোটকথা, ঐ নীলকর কুঠিয়ালদের কল্যাণে সারা দেশটা পরিণত হল সন্ত্রাসের রাজত্বে। এদিকে এসে গেল সিপাহীদের বিদ্রোহ। গোটা উত্তর ভারতে দেখা দিল বহ্নি-বন্যা। এই বিদ্রোহ-বহ্নি দমন করতে কোমপানির সরকার এতই ব্যস্ত হয়ে পড়ল যে এ দেশের শাসনের ব্যাপারে তাঁরা যথেষ্ট মনোযোগ দিতে হলেন অক্ষম। বুদ্ধিতে ও বিদ্যায় যাঁরা পেয়াদা হবার যোগ্যতা রাখেন, কেবলমাত্র সাদা চামড়ার গৌরবে তাঁরা মফস্বল পাড়ি দিলেন ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ নিয়ে।—সুতরাং শাসন ও বিচার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ল। এর ওপর ঐ 'ম্যাজিষ্ট্রেটরা' যদি দেখা যায় নীলকরদের বন্ধু বা আত্মীয়, তবেত কথাই নেই! বিচারের বানী নীরবে নিভৃতে যে কাঁদবে, তাতে আর আশ্চর্য কী! দেখা গেল, বাদীর থেকে প্রতিবাদীর খাতির এদের কাছে বেশি, 'নীলকর সাহেবরা ম্যাজিষ্ট্রেটদিগের নিকট প্রতিবাদী রূপে উপস্থিত হইলেও অতি সম্ভ্রমের সহিত গৃহীত হয়েন, হরিহর মূর্তির ন্যায় একাঙ্গ হইয়া হাস্যবদনে 'সেক্‌হেন' করেন, ইংরেজী ভাষায় কথা কহিয়া যাহা বুঝাইয়া দেন সাহেব তাহাই বুঝেন। কোনো কুঠিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের শ্যালা, কেহ ভাই, কেহ ভগিনীপতি, কেহ পিসে, কেহ জ্ঞাতি, কেহ কুটুম্ব, কেহ গ্রামস্থ, কেহ সমধ্যায়ী, এই প্রকার পরস্পর সম্বন্ধে এক একটা সংযোগ আছে, এবং তাহা না থাকিলেও সকলেই 'এক সানকির ইয়ার' কোন মতে ছাড়াছাড়ি হইবার জোটি নাই।'[৩৭]

সিপাহী বিদ্রোহ মিটল। এদিকে কিন্তু কুঠিয়াল নীলকরদের অত্যাচার বাড়ল। সব জায়গা থেকেই আসছে অত্যাচারের খবর। মুর্শিদাবাদ, রাজসাহী, কৃষ্ণনগর, যশোহর, পাবনা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, ঢাকা—কোনো জায়গাই বাদ নেই। কাগজে কাগজে মন্তব্য বেরতে থাকল,…'সকল জিলাতেই নীলকরের অত্যাচার প্রবল হইয়াছে। ঐ সমুদয় সাহেবের কুটির অধীনস্থ ও নিকটস্থ প্রজাপুঞ্জের দুঃখ বর্ণনা করিতে হইলে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়।'[৩৮]

বলার অপেক্ষা রাখে না যে সকল ক্রিয়ারই আছে প্রতিক্রিয়া। বাঙলা প্রবাদ দিয়ে বলা যায়, ইঁট মারলেই খেতে হয় পাটকেল। তাই অবাধ উৎপীড়নের প্রতিবাদে জন্ম নিল সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধ কী রকম সুসংগঠিত ছিল, ইতিহাসের ভাষায় তা' এহ ভাবে বলা যায়, '· the indigo cultivators rose as one man against oppressions of the European planters and refused to sow indigo even if they had to lay down their life This was the first organised Passive Rasistance during British rule, and it scord a great victory.'[৩৯]

'গুয়াতেলির মিত্র পরিবার' কী ভাবে নীলকরদের পীড়নে বিনষ্ট হয়েছিল এবং রায়তদের ওপর এই অত্যাচার কীরকম ছিল, 'নীলদর্পণে' তার চিত্র দেখানো আছে। এবং এর ভেতরেই আবার যে প্রতিরোধের দিকটাও কিছু দেখানো রয়েছে, এ কথা না বিবৃত করলে অনৃতভাষণ হবে। এই প্রতিরোধের দুটি ধারা—একটি ধারায় নবীনমাধব, অন্যধারায় তোরাপ। বাস্তবেও তাই ছিল।—চৌ-গাছার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাসের নেতৃত্ব অনেকটা নবীনমাধবের মতন। নীলকুঠির 'দেওয়ান' ছিলেন এঁরা, অনেক অত্যাচার দেখে দেওয়ানী ত্যাগে বাধ্য হন। পরে সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থানের জন্য সচেষ্ট হন। এঁদের ত্যাগ বিরাট, এ ব্যাপারে এঁদের আনুমানিক সত্তর হাজার টাকার ক্ষতি স্বীকার করতে হয়। মোল্লাহাটির কুখ্যাত লারমুরের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন যিনি, তিনি হলেন, ঝিনাইদহের মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। 'নীলকমিশনে'র এই কাছে মানুষটির কথা কবুল করে লারমুর অভিযোগ করেছিল নিশ্চিন্দিপুরের কুঠির গোলযোগের জন্য মহেশচন্দ্রই দায়ী। আর্কিবল্ড হিল্স, যিনি 'কুলচিকাটা' কুঠির ছোটবাবু ছিলেন এবং কৃষককন্যা হরিমণি-কে কুঠিতে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরও অভিযোগ ছিল মহেশচন্দ্রের

বিরুদ্ধে। কৃষক খ্যাপানোর অভিযোগে ইনি মহেশচন্দ্রের বিরুদ্ধে মামলা পর্যন্ত করেছিলেন। মোটকথা, নানা অঞ্চলে তখন আঞ্চলিক নেতৃত্ব। বাঁশবেড়েতে রয়েছেন বৈগুনাথ সর্দার ও বিশ্বনাথ সর্দার। হাঁসখালি গোবিন্দপুরে ছিলেন জমিদার গোপাল তরফদার এবং তাঁরই কাছাকাছি বৃন্দাবন সরকার চৌধুরীর কথাও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। জমিদার গোপাল তরফদারকে এই বিদ্রোহ-বহ্নিতে করতে হয়েছিল প্রাণোৎসর্গ। চৌ-গাছার বিশে ডাকাত এবং তার সঙ্গী 'মেঘা'-ও একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন এই বিদ্রোহ পরিচালনায়। 'মেঘা' ছিল জাতিতে মুসলমান এবং ভীষণ বেপোরোয়া। এই 'মেঘা'রই আদলে তোরাপ চরিত্র অঙ্কিত। নাটকের তোরাপ মারা যায় নি, কিন্তু বাস্তবের এই 'মেঘা' নীলকরদের হাতে নিহত হয়েছিল অত্যন্ত নৃশংসভাবে।—মোটকথা, এ এক দুর্যোগপূর্ণ অধ্যায়। উনিশ বছরের তরুণ যুবক শিশির কুমার ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এ বিদ্রোহে, আর 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' সম্বল করে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁর সর্বস্ব সমর্পণ করেছেন এই নীল-রায়তদের বাঁচাবার জন্য। ও দিকে নীলকরেরা এমনই বেপরোয়া যে ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিম চাটুয্যের মাথার জন্য 'এক লক্ষ টাকা' খরচ করতেও তাঁরা ছিলেন প্রস্তুত।

নীল-রায়তরাও এদিকে সমান বেপরোয়া। দলে দলে এরা বেরিয়ে পড়েছে। গাঁইতি, তরোয়াল, লাঠি, সড়কি ইত্যাদি নিয়ে। কুঠির পর কুঠিতে এরা লাগাচ্ছে আগুন এবং সেরেস্তার অর্থ হচ্ছে লুণ্ঠন এবং তা' ফেলে দেওয়া হচ্ছে আগুনে।—দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্রের ভাষায়, 'Factories began to be attacked and plundered, and in some cases burnt. It is said that a most flourishing factory was burnt down and in a single night the out turn of a year was redudced to ashes. Accounts were ransacked from *sherista* and burnt.'[৪০]—সরকারী কর্মচারীরাও যে নিগৃহীত হচ্ছে, এমন ঘটনাও দুর্লভ নয়। ই. এফ. লিংহাম নামে একজন ডেপুটি-ম্যাজিস্ট্রেট খুব সামান্যর জন্য যে বেঁচে গিয়েছিলেন এ তথ্যও ঐ একই সূত্রে গাঁথা রয়েছে।

এইসব ঘটনা এত দ্রুত বাঁকাপথে এগোতে লাগল যে, তা' শেষ পর্যন্ত লাঠসাহেবকে পর্যন্ত করল বিচলিত। তাঁর দিনের চিন্তা ও রাতের ঘুম নিল কেড়ে। সিপাহী বিদ্রোহের রক্তস্নান সেরে সবে তখন ভারতবর্ষ উঠে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং তুচ্ছ ঘটনাও যে উপেক্ষা করা যায় না, অভিজ্ঞতা দিয়ে

তা' উপলব্ধি করেছেন ইংরেজ সরকার। লর্ড ক্যানিং তখন লাটসাহেব, ঠিক এ-কথাই কবুল করে তিনি নীল-বিদ্রোহের সম্পর্কে লিখলেন, 'I assure you, that for about a week, it caused me more anxiety than I have had, since the days of Delhi.'[৪১] এবং নির্বোধ নীলকরদের আচরণে যে কোনো সময় বিস্ফোরণ যে ঘটতে পারত, সে কথায় লিখলেন, 'And from that day I felt that a shot fired in anger or fear by one foolish planter might put every factory in *Lower Bengal* in flames.'

'নীল-কমিশন' বসাতে শেষ পর্যন্ত সরকার বাধ্য হলেন। সার জন পিটার গ্রাণ্ট্ ছোট লাট হয়ে আসবার পর এই কমিশন গঠিত হল। সরকার পক্ষে প্রতিনিধি সীটনকার হলেন সভাপতি, অবশ্য সরকারের আরেকজন প্রতিনিধি রইলেন আর. টেম্পল। মিশনারীরাও নীল আন্দোলনে একটি ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাই তাঁদের তরফেও একজন প্রতিনিধি রইল, এই প্রতিনিধি হলেন রেভারেণ্ড্ সেইল; নীলকর সমিতির থেকে থাকলেন ফারগুসন, আর 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েসন্' তখন আমাদের বিশেষ 'আশ্রয়স্থল', তাই সেই সূত্রে দেশীয় লোকদের প্রতিনিধি হয়ে কমিশনে এলেন চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মে 'কমিশন' আরম্ভ করল কাজ এবং কর্ম-সমাপনে তিন মাসের ভেতরেই আগষ্ট মাসে রিপোর্ট বের হল।[৪৩] এই রিপোর্ট মোটা-মুটিভাবে প্রজাবৃন্দের জয় ঘোষণা করল। তবে দুঃখের ব্যাপার এই যে, এই একই বছরে 'অ্যাক্ট ইলেভেন' বা 'এগারো আইন' নামে যে আইনটি পাশ হল, তা' সাময়িক হলেও, অল্প সময়ের ভেতর সেটি যে সর্বনাশ করে দিয়ে গেল তা' তুলনা রহিত। এই আইনটি পাশ হবার পর 'নীলদর্পণে' উড সাহেব উল্লাসের সঙ্গে বলেছিল, 'এই আইনটা শ্যামচাঁদের দাদা হইয়াছে।'[৪৪] এবং কেন আইনটা 'শ্যামচাঁদের দাদা হইয়াছে', তার ব্যাখ্যা করে উড সাহেব আরো যা বলেছেন, তা' হল, 'মোকদ্দমা কিছু হইবে না, এ মাজিষ্ট্রেট বড় ভাল লোক আছে। দেওয়ানি করলে পাঁচ বছোরে মোকদ্দমা শেষ হোবে না। মাজিষ্ট্রেট আমার বড় দোস্ত।'[৪৫]

কৌতূহল হতে পারে, 'এগারো আইন' কেন এত খারাপ?—কী ছিল এর ভেতরে?—এ আইনে যা ছিল, তা' হল, (১) বৈধ ভাবে যে সব চুক্তি করা হয়েছিল, বর্তমান মরসুমে সে সব শর্ত পুরণের জন্য সরাসরি বিচার করা চলবে এবং (২) কেউ ভয় দেখিয়ে বা অন্যকোনোভাবে কাউকে চুক্তি ভঙ্গ করতে

বা নীলের ফসল নষ্ট করতে বাধ্য করলে, সে হবে দণ্ডিত। যদিও 'নীলদর্পণ' প্রকাশের সপ্তাহ দুই পরেই এ আইন গ্রান্টসাহেব করে নিয়েছিলেন প্রত্যাহার কিন্তু আমরা যেন না-ভুলি, এই আইনটিই বিশেষ ভাবে 'নীলদর্পণ' নাটকের পারিবারিক বিপর্যয়ের জন্য দায়ী।

যাইহোক, এই সব ঘটনা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁচেছে, ঠিক এই সময় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয়ে বেরিয়ে এলো 'নীলদর্পণ' নাটক। যে-সামাজিক পরিস্থিতিতে এই নাটক প্রকাশিত হল, তাতে লোকের মনোহরণ করা এই নাটকেরও নাট্যকারের পক্ষে মোটেই কঠিন হল না। বরং যা লেখকের পাওনা ছিল, তার থেকেও তিনি যেন পেয়ে গেলেন বেশি। এ প্রসঙ্গে একজন লেখক তাঁর অভিজ্ঞতা নিবেদন করে জানিয়েছেন, 'হঠাৎ যেন বঙ্গ-সমাজ ক্ষেত্রে উল্কাপাত হইল; এ নাটক কোথা হইতে কে প্রকাশ করিল, কিছুই জানা গেল না। নীলদর্পণ আমাদিগকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল; তোরাপ আমাদের ভালোবাসা কাড়িয়া লইল; ক্ষেত্রমণির দুঃখে আমাদের রক্ত গরম হইয়া গেল; মনে হইতে লাগিল রোগ সাহেবকে যদি একবার পাই অন্য অস্ত্র না পাইলে যেন দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিতে পারে।'[৪৬]

না, এ উক্তি কোন বিপ্লবী তরুণের নয়। এ উক্তি যিনি করেছিলেন, তিনি হলেন উন্নত রুচির মানুষ, ব্রাহ্ম সমাজের পুরোধা, শিবনাথ শাস্ত্রী স্বয়ং। বঙ্কিমচন্দ্রও এই নাটকটির সম্পর্কে যে মন্তব্য করলেন, তা আরো তাৎপর্যপূর্ণ। ইনি লিখলেন, 'নীলদর্পণ বাঙ্গালার Uncle Tom's Cabin, 'টমকাকার কুটীর' আমেরিকার কাফ্রিদের দাসত্ব ঘুচাইয়াছে। নীলদর্পণ, নীলদাসদিগের দাসত্ব মোচনের অনেকটা কাজ করিয়াছে। নীলদর্পণে গ্রন্থকারের অভিজ্ঞতা এবং সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় যোগ দিয়াছিল বলিয়া, নীলদর্পণ তাঁহার প্রণীত সকল নাটকের অপেক্ষা শক্তিশালী। অন্য নাটকের অন্য গুণ থাকিতে পারে কিন্তু নীলদর্পণের মত শক্তি আর কিছুতেই নাই।'[৪৭]

এই শক্তি যে কতখানি তা' আরো বিশেষভাবে প্রমাণিত হল ইংরেজি অনুবাদের পরে।—মূল বাঙলায় বইখানি পড়বার পর, অনেক ইউরোপীয়ই যে এটিকে অনূদিত দেখতে চেয়েছিলেন, তা' বাকল্যাণ্ড সাহেবের মত ব্যক্তিও স্বীকার না করে পারেননি। সাহেব কবুল করেছেন, 'দি ওরিজিনাল প্লে হ্যাভিং অ্যারাউজ্‌ড গ্রেট ইন্‌টারেস্‌ট, এ উইশ ফর এ ট্রানস্লেসন ওয়াজ এক্‌সপ্রেস্‌ড বাই সেভারেল ইউরোপীয়ান্‌স।'[৪৮]—সুতরাং অনূদিত হল। প্রচারিত রয়েছে, এই গ্রন্থের অনুবাদক হলেন স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন দত্ত।[৪৯]

রেভারেণ্ড লঙের উদ্যোগে এই অনুবাদ প্রকাশিত হল। কিন্তু গ্রন্থের ভেতর কারোর নামই থাকল না। না লেখকের, না অনুবাদকের এবং না প্রকাশকের। কেবলমাত্র যাঁর নাম রইল, তিনি হলেন মুদ্রাকর। এঁর নাম ম্যানুয়েল।

অনূদিত গ্রন্থের ভূমিকায় 'ইংলিশ ম্যান' ও 'হরকরার' সম্পাদক দু'জন, এবং গ্রন্থের ভিতর নীলকর সাহেবরা নিজেদের সম্মান হানির সন্ধান পেলেন। বাঙ্‌লা সরকারের পক্ষ থেকে ছোট লাটের অনুমতির অপেক্ষা না রেখে বইগুলি হয়েছিল প্রকাশিত। এবং এ কাজটি যিনি করেছিলেন, তিনি হলেন, সীটনকার। যাইহোক, এই প্রচারিত বই সংগ্রহ করেই হাইকোর্টে একদফা মামলা ঠুকে দিলেন আক্রান্ত পক্ষ। প্রথমে ম্যানুয়েল, পরে তাঁর নির্দেশে লঙ্‌সাহেব এগিযে এসে অনুবাদের শুভাশুভ নিজের ঘাড় পেতে নিলেন। বিচারক মরডান্ট ওয়েল্‌স বিচার করলেন। বিচারে লঙ্‌সাহেবের কারাবাস ও জরিমানা দুইই হল। জরিমানার টাকা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মিটিযে দিলেন সেকালের বিখ্যাত ব্যক্তি ও শ্রুতকীর্তি কালীপ্রসন্ন সিংহ স্বয়ং। কিন্তু কারাবরণটা লঙ্‌কে নিজেই করতে হল।—যে কোনো দেশের ইতিহাসে, প্রায সুনিশ্চিত ভাবেই বলা যায়, এ জাতীয় উদাহরণ দুর্লভ। আমাদেব দেশে 'স্বদেশী' করে প্রথম যিনি জেল খাটলেন, ভাবতে অবাক লাগে, তিনি হলেন একজন বিদেশী এবং সর্বোপরি সাদা চামড়ার মানুষ। আর তারো থেকে বড় কথা হল এই, তিনি যাঁদের অপরাধ (অবশ্য যদি হয়ে থাকে) নিজের কাঁধে তুলে নিলেন, তাঁদের একজন হলেন নিজের হাতে-গড়া ছাত্র, আরেকজন তখন বাঙ্‌লার বিখ্যাত কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। তাই সেদিন আমাদের তথাকথিত বুদ্ধিজীবীমহল লঙ্ সাহেবের এই বিরাট-চিত্ত ও সহায়তার পরিচয় পেয়ে বিগলিত না-হয়ে পারল না। গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর নাম তখনকার বাঙালীদের ঘরে ঘরে হতে থাকল উচ্চারিত।

রেভারেণ্ড জেম্‌স লঙের এই কারাবরণ কেবল এ দেশেই নয়, সাগর পারের কাগজে কাগজেও যে আলোড়ন তুলেছিল, তারও খবর রয়েছে। এদেশীয় মিশনারীরা যে মর্ডান্ট ওয়েলসের বিচারে খুশি হতে পারেন নি, এ কথা পুনরুক্ত করা বাহুল্যমাত্র। এবং এই বিচারক সম্পর্কে এদেশীয় মানুষদের সঙ্গে অনেক শ্বেত মানুষদেরও খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল যে মর্ডান্ট সাহেব হলেন,...the least judicial of all the judges of the Supreme Court.'[৫০]

নীলদাসদের দাসত্ব মোচনের কাজে 'নীলদর্পণের' যে সুনির্দিষ্ট একটি ভূমিকা ছিল, তা' বর্তমান ঘটনাগুলিই প্রমাণ করে। তবে নীলকরেরা বিনা লড়াইয়ে যে সুচ্যগ্র ভূমিও ত্যাগ করেন নি, তা' সেকালে সকলেই ছিলেন অবহিত। নকশার লেখক 'হুতোম' কৌতুক করে লিখেছিলেন, 'শেষে ঐ দলের একটা বড় হাঙ্গেরিয়ান হাউণ্ড পাদরি লং সাহেবকে কামড়ে দিলে!…হরিশ মলেন, লঙের মেয়াদ হলো, ওয়েলস্ ধমক খেলেন, গ্রান্ট রিজাইন দিলেন, তবু হুজুক মিটল না!'[৫১]—বঙ্কিমচন্দ্র এই সঙ্গে আরও একটু যোগ করে লিখেছেন, 'সীটনকার অপদস্থ হইয়াছিলেন। ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি শেষে তাঁহার জীবন নির্ব্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকুরী পর্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গ্রন্থকর্তা নিজে কারাবদ্ধ কি কর্মচ্যুত হয়েন নাই বটে, কিন্তু তিনি ততোধিক বিপদগ্রস্ত হয়েছিলেন।'[৫২]

নীল আন্দোলন ও 'নীলদর্পণ'-কে কেন্দ্র করে কে কীভাবে এবং কতখানি বিপর্যস্ত হয়েছিলেন, তা' বিস্তৃতভাবে বিবৃত করবার অবকাশ এখানে কম। হাঙ্গেরিয়ান হাউণ্ড হরিশকে ধরতে না পেরে শেষ পর্যন্ত তাঁর বিধবা স্ত্রীকে যে ভীষণ কামড় দিয়েছিল, এ তথ্য সম্ভবতঃ কারো অজানা নয়। হারমণি কলঙ্কের কথা 'হিন্দুপেট্রিয়টে' উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় আর্কিবল্ড হিল্‌স সম্পাদক হরিশের বিরুদ্ধে রুজু করেছিলেন মানহানির মোকদ্দমা, মামলা চলা অবস্থায় হরিশের ঘটল অকাল মৃত্যু, বলাবাহুল্য ক্ষিপ্ত ছোট সাহেবের এতেও জ্বালা উপশম হল না, তাই সে জ্বালা জুড়োবার জন্য হরিশের বিধবা স্ত্রীকে হতে হল লাঞ্ছিত।—বাঙ্‌লা সরকারের সেক্রেটারী হিসাবে অনূদিত 'নীলদর্পণ' উপযুক্ত অনুমতি ছাড়া বিলি করবার অপরাধে নিজেকে অপরাধী মনে করে ভারত সরকারের কাছে সীটনকার পাঠিয়েছিলেন পদত্যাগ পত্র, এ পত্র সরকার গ্রহণ করেছিলেন। সীটনকার তখন মার্জনা চাইলেন অজানিত অপরাধের জন্য, ক্যানিং এই আচরণে খুশি হয়ে এবং একই সঙ্গে তাঁর যোগ্যতাকে স্বীকার করে নিয়ে, তাঁকে নিযুক্ত করলেন কলকাতা হাইকোর্টের জজ হিসাবে এবং ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিবের পদে।

দীনবন্ধু তাঁর কর্মজীবনের শেষে যে-যন্ত্রণা পেয়েছিলেন, তা' গ্রন্থকর্তা হিসাবে পেয়েছিলেন কী না সেটি তর্ক সাপেক্ষ। আর বঙ্কিম যে বিপদের কথা বলেছেন, তা' মেঘনা-পাড়ি-দেওয়া যে-কোনও নৌকারোহীর কাছে

আসতে পারত, সুতরাং হাঙ্গেরিয়ান হাউণ্ডের আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে এটি অপ্রয়োজনীয়। অবশ্য অনেকে মনে করতে পারেন যে হাউণ্ডের দল দীনবন্ধুকে 'নীলদর্পণে'র রচয়িতা হিসাবে সনাক্ত করতে সক্ষম হয় নি, নইলে কী ঘটত বলা যায় না! বলাবাহুল্য এ অনুমানও সর্ব্বৈব মিথ্যা। এবং এ ব্যাপারে একবারে লিখিত প্রমাণ দাখিল করা যেতে পারে। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের এগারোই জুন যখন মুদ্রাকর ম্যানুয়েলের নামে বিচার চলছে, ঠিক তার পরের দিন 'হরকরা' পত্রিকার 'ঢাকাস্থ' সংবাদদাতার পাঠানো এবং ছাপানো খবরও 'নীলদর্পণে'র প্রসঙ্গে বেরোচ্ছে। এবং এ লেখায় সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, 'নীলদর্পণ'! তার খবর জানতে চেয়েছ? তুমি না বলা পর্যন্ত জানতামই না ঢাকা এর জন্মস্থান! অবশ্য তুমি বলবার পর থেকে একটু আধটু খোঁজ খবর নিচ্ছি। যা দেখছি তাতে মনে হচ্ছে তোমার খবর সত্যি। এখানকার 'বাঙ্গালা-যন্ত্র'ই তা' দিয়ে ফুটিয়েছে এই নাটকের ডিমটিকে। ও ছাপাখানার এটাই প্রথম বই। আমাদের নেটিব বন্ধুরা নাটক অভিনয় করে মাঝে মাঝে আমোদ-আহ্লাদ করে থাকেন। এর ভেতর 'নীলদর্পণ' তারা করেছে একদিন অভিনয়।...'বেঙ্গল অফিসে' এ বইখানি কী করে গিয়ে ঢুকল, সে সব কথা বলতে পারব না। তবে ঐ রেভারেণ্ড ভদ্রলোক—উনি হলেও হতে পারেন (হবেন কী না তুমি নিজে বিবেচনা করো), শোনা যাচ্ছে তিনি না-কী 'নীলদর্পণে'র ইংরেজী সংস্করণের ভূমিকা লিখেছেন। বাঙ্‌লা বই সম্পর্কে তাঁর কৌতূহল অপরিসীম, কী বই, কী কাগজ, কী পত্রিকা —যাই প্রকাশিত হোক-না-কেন, প্রত্যেকটি এঁর জানা চাই।...এ বই কে লিখেছে? দেশি লোক? সে কী চাকরি করে? মোটকথা, সে এক ইনটারেষ্টিং সাবজেক্ট অব এন্‌কোয়ারি। তুমি কী জানতে চাও এ সম্পর্কে?'[৫৩]

এই সংবাদ পাঠে স্পষ্টই জানা যায়, নাম ছাড়া লেখকের সকল তথ্যই খবরের কাগজের লোকেরা জানতে সমর্থ হয়েছেন। এমন কী লণ্ডের কথাও এঁদের কাছে অজ্ঞাত নয়। বরং এতই জ্ঞাত যে ইঙ্গিতে সব কথাই দিয়েছেন জানিয়ে। তবে শেষ পর্যন্ত নামও যে এঁদের কাছে অজ্ঞাত থাকে নি, তা' দিন সতেরো পরে এই একই কাগজে পরিবেষিত একটি সংবাদ থেকে খুব স্পষ্ট ভাবেই জানা যায়। পরিবেষিত সংবাদটি হল, 'অ্যাট এনি রেট অ্যাজ ইউ আর অ্যাকোয়েনটেড উইথ দি নেম অব দিস 'ফ্রেণ্ড অব পুত্তর অ্যাণ্ড নিড্ডি', কিপ্‌ অ্যান্‌ আই আপন্‌ দি অ্যাপয়েণ্টমেণ্টস অ্যাণ্ড প্রোমোশন্‌স

ইন্ কানেক শন্ উইথ দি পোষ্ট-অফিস, অ্যাণ্ড ইউ মে বি এডিফায়েড সাম মরনিং।'[৫৪]

এই লিখনের খোশখবর হল এই, 'দীনবন্ধু' নামটিকে ইংরেজীতে অনুবাদ করে লেখা হয়েছিল, 'ফ্রেণ্ড অব পুওর অ্যাণ্ড নিডি' এবং এবং এই অক্ষর ক'টি ছাপা হয়েছিল বাঁকা বাঁকা অক্ষরে। সুতরাং নাম গোপন করলেও শেষ পর্যন্ত নাট্যকারের নাম যে গোপন থাকেনি,[৫৫] এর থেকে জাজ্বল্যমান প্রমাণ আর কী আছে?

তবে মজার ব্যাপার এই যে, 'হাঙ্গেরিয়ান হাউণ্ড'রা এ খবর জেনেও এই নাট্যকারকে কোনোরকম নির্যাতন করতে এগিয়ে আসে নি। 'নীল-নাটকে'র এটাই হল সব থেকে দুর্বোধ্য অংশ। সব থেকে বড়ো হেঁয়ালি। এর কোনো উপযুক্ত ব্যাখ্যা আজ পর্যন্ত কেউ দিতে পারেন নি। এবং কেউ কোনোদিন দিতে পারবেন কী না এ বিষয়েও যথেষ্ট সংশয় আছে। সুতরাং নীলকথার আলোচনায় এখানে উপসংহার টানা যেতে পারে।

'নীলদর্পণে'র সাহিত্য মূল্য

দীনবন্ধু মিত্রকে যে 'বিতর্কিত নাট্যকার' বলা হয়ে থাকে, তার অন্যতম কারণ হল, দীনবন্ধুর কোনো নাটকই সকলশ্রেণীর সমালোচককে খুশি করতে সমর্থ হয় নি। বরং সমালোচকরা কেউ কেউ অখুশি হয়ে এমন মন্তব্য করে বসেছেন যা দীনবন্ধুকে একবারে নস্যাৎ করে দিয়েছে। এবং প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' থেকেই এর সূচনা বলা যায়। এই 'নীলদর্পণে'র প্রসঙ্গে আমাদের এদেশীয় একজন পণ্ডিত সমালোচক মন্তব্য করেছেন, 'As a drama, strictly speaking, Nil Darpan is an insignificant production. It is neither well written nor does it lend itself to successful production on stage.'[৫৬] নাটক হিসাবে যদিও এটি একটি উদ্দেশ্যমূলক নাটক, তবু ভাবতে কষ্ট হয় যে এটি সুলিখিত নয়, মঞ্চের পক্ষে অভিনয়ে অনুপযোগী, এবং শেষ পর্যন্ত এটি একটি 'ইন্‌সিগনিফিকান্ট' রচনা। সমালোচক মশাই এ রকম আরো অনেক কারণ দেখিয়েছেন যা সকলের পক্ষে মেনে নেওয়া রীতিমত কঠিন। পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের মত সমালোচক, ঐ নাটকের উদ্দেশ্যের কথা স্বীকার করে নিয়েও লিখতে বাধ্য হয়েছেন, 'নীলদর্পণে'র মুখ্য উদ্দেশ্য এবম্বিধ হইলেও কাব্যাংশে তাহা উৎকৃষ্ট।'[৫৭] অর্থাৎ কেবল নাটক হিসাবেই

নীলদর্পণ'কে যদি বিচার করা হয়, শিল্পধর্মে এটি উৎকৃষ্ট।—এখন প্রকৃত সত্য কী, তা' আমাদেরই দেখতে হবে শেষ পর্যন্ত যাচাই করে।

'নীলদর্পণ' যেমন বিশেষ একটি সমস্যাকে অবলম্বন করে রচিত হয়েছিল, এ ধরণের সমস্যাবহ সাহিত্য পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও প্রায়শই লিখিত হয়ে থাকে। গত শতকে 'নীলদর্পণ'কে কেন্দ্র করে যখন এলোমেলো ঝড় বইছে, তখন এ-জাতীয় একাধিক গ্রন্থের নাম যে উল্লিখিত হয় নি, একথা বলি কি করে? ক্রীতদাসদের সঙ্গে নীলদাসদের বারবার সেদিন তুলনা করা হয়েছে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মত মনীষীকুলকে 'টমককার কুটীরে'র দাসত্ব উচ্ছেদের সঙ্গে 'নীলদর্পণ'কে দেখা গেছে তুলনা করতে। আর 'নীলদর্পণে'র মোকদ্দমা চলাকালীন রেভারেণ্ড জেমস্ লঙের পক্ষের উকিলকে যে গ্রন্থদুটির কথা বারবার উল্লেখ করতে দেখা গেছে, সে গ্রন্থ দুটি হল চার্লস ডিকেন্স লিখিত 'অলিভার টুইস্ট' ও 'নিকোলাস নিকলেবি'।—এঁদের বক্তব্য ছিল, সামাজিক সত্য-উদ্ঘাটনের জন্য উৎপীড়নের চিত্র অঙ্কন করা ডিকেন্সের পক্ষে যদি অপরাধ না হয়ে থাকে, 'নীলদর্পণে'র তা' হলে অপরাধ হবে কেন?—'ওয়ার্ক-হাউস' ব্যবস্থার উচ্ছেদের জন্য লিখিত হয়েছিল 'অলিভার টুইসট,' আর 'নিকোলাস নিকলেবি' রচনার মূলে যে উদ্দেশ্য ডিকেন্সের মনে ছিল, তা' হল 'ইয়র্কশায়া'র স্কুলের নোঙ্‌রামি পাঁচজনের গোচরীভূত করা এবং তা' দূরীভূত করা। এই প্রসঙ্গে মিসেস্ বিচার স্টো, যিনি 'টম্‌কাকার কুটীরে'র রচয়িতা, তাঁর নামও উঠেছিল; কৌঁসুলী মি. এগলিন্টন এ সব তথ্য নিবেদন করবার পর জুরীদের সামনে প্রশ্ন তুলেছিলেন, '...each of the bodies I have referred to might, if they choose, have instituted proceedings in respect of the writings, in question, yet there never has been a hint of anything of the kind; and why not?'[৫৮]

কৌঁসুলী এগলিন্টনের মত এ জাতীয় কোনো প্রশ্ন তোলবার অবকাশ বর্তমান আলোচনায় যে নেই, তা' বিবৃত করা বাহুল্যমাত্র। তবে উল্লিখিত ঐ তিনটি গ্রন্থের দ্বারা আলোচ্য নাটক 'নীলদর্পণ' প্রভাবিত হয়েছিল কী না, সে ব্যাপারে আমরা পরীক্ষা করতে পারি। কিন্তু এ পরীক্ষার সুযোগও সীমিত হয়ে আসতে বাধ্য, কেননা যুযুধান সৈনিকের ভূমিকায় 'নীলদর্পণ' ঐ গ্রন্থত্রয়ের সামিল হলেও, আকৃতি-প্রকৃতি, এমন কী মেজাজের দিক থেকেও 'নীলদর্পণে'র সঙ্গে এদের কোনো মিল নেই। বরং শিল্পগত

ব্যবধান এত বেশি যে 'নীলদর্পণে'র ওপর এদের প্রভাব খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

বিশেষ কোনো গ্রন্থ দিয়ে নয়, সামাজিক দোষ-উদ্‌ঘাটনের সূত্রে 'নীলদর্পণে'র রচয়িতাকে কখনো কখনো ফরাসী নাট্যকার মলিয়েরের সঙ্গেও তুলনা করা হয়ে থাকে। বলার অপেক্ষা রাখে না, দীনবন্ধুর সঙ্গে মলিয়েরের মিল অবশ্য অনেকটা আছে। ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারী যে শিশু ফরাসী দেশে জন্ম গ্রহণ করেছিল, তাঁর নাম ছিল, জঁা বাপ্‌তিস্‌ত পোকলিন। গন্ধর্বনারায়ণের মতনই ঐ নামটির খোলস থেকে বেরিয়ে এসেছিল অন্য একটি মানুষ, সেই অন্য মানুষটিই হলেন, মলিয়ের। সুতরাং দীনবন্ধুর সঙ্গে মলিয়েরের মিল নেই, একথা বলবে কে?—তবে প্রাসঙ্গিক ভাবে এ তথ্যও নিবেদিত হওয়া দরকার, 'Molière was no reformer of the militant stamp; although he was the intellectual superior of most men of his generation, he was a true son of the age, He never roared like Jonson, he simply laughed.' ৫৯—মলিয়েরের প্রসঙ্গে এখানে যে সব গুণ ও বৈশিষ্ট্যের কথা ব্যক্ত হয়েছে, তার সবকটিই নির্দ্বিধায় দীনবন্ধুর ওপর প্রয়োগ করা যায়। অবশ্য একবারে শেষের বাক্যটি ছাড়া। না, কেবল হেসেই আমাদের আলোচ্য নাট্যকার ক্ষান্ত থাকেন নি, জনসনের মত গর্জনও তিনি করে উঠেছিলেন, অন্ততঃ 'নীলদর্পণে,' উভয়ের ভেতর এটুকুই যা পার্থক্য। তাই 'নীলদর্পণে'র সূত্রে মলিয়েরের সঙ্গে দীনবন্ধুর এই তুলনা বাহুল্য বলেই বর্জনীয় মনে করা যায়।

তবে নাট্যকার হিসাবে বিশ্বসাহিত্যের কোনো মহারথের সঙ্গে যদি 'নীলদর্পণে'র রচয়িতাকে তুলনা করতে হয়, এবং ঐ 'নীলদর্পণে'র সূত্রে, তা' হলে একটি মাত্র নামই সম্ভবতঃ উপস্থাপিত করা যায়, আর সে নামটি হল 'দি উইভার্সে'র' (Die Webner) রচয়িতা গেরহার্ট হপ্‌টমান। কালের বিচারে ইনি দীনবন্ধুর থেকে অনেক পরের যুগের। 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হবার দু' বছর পরে আঠারোশ বাষট্টিতে এঁর জন্ম। সুতরাং নাটকটি আরো অনেক পরের। হপ্‌টমান জার্মানির লোক। ১৮৪৪-এর 'মিলেশীয়' তন্তুবায় বিদ্রোহের পটভূমিতে তাঁর ঐ বিখ্যাত নাটকটি হয়েছিল রচিত। বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লেখকের ছিল না, কিন্তু তাই বলে শ্রমিক বিদ্রোহের জীবন্ত ছবি আঁকতে তাঁর কোনো অসুবিধা হয়নি। হপ্‌টমানের সমালোচকরা এঁর সম্পর্কে যা বলে থাকেন, তা' হল, 'If Hauptman had died after

writing Die webner; he would have been acclaimed a great dramatist.'[৬০]—দীনবন্ধুর প্রসঙ্গেও এই একই কথা বলা যায়। মাত্র 'নীলদর্পণ' নাটকটি লিখে, যদি এর নাট্যকারের দেহান্তর ঘটত, তবু তিনি অমরতা লাভ করতেন এবং মহৎ নাট্যকার হিসাবেই হতেন বন্দিত।

এহ বাহ্য। 'দি উইভার্স' যেহেতু পরবর্তী কালের লেখা, তাই 'নীলদর্পণে' তার কোনো প্রভাবের কথা আসতেই পারে না।—যাই হোক, এ পর্যন্ত 'নীলদর্পণের' সূত্রে যে ক'টি রচনার নাম আমরা করেছি, তাদের ভেতর একমাত্র 'টমকাকার কুটীর' ছাড়া আর সব লেখাই সাময়িক একটি প্রয়োজনে ও বিশেষ একটি উদ্দেশ্যে লিখিত হলেও চিরায়ত সাহিত্যের গৌরব থেকে কেউই বঞ্চিত হয় নি।—এখন আমাদের বিচার করে দেখা দরকার, 'নীলদর্পণ'ও সেই দুর্লভ গৌরবে সম্মানিত হতে পেরেছে কী না!

নীলকরদের পীড়নের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে 'প্রজাবৃন্দের সুখ-সূর্যোদয়' হোক, এটুকুই ছিল নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নাটক লেখার প্রধানতম কাঙ্ক্ষিত অভিপ্রায়। নীলচাষ করতে গিয়ে কী ভাবে কর্ষণজীবী মানুষেরা শোষিত হয়ে শেষ পর্যন্ত নীলকরদের পীড়নে নিঃস্ব ও রিক্ত অবস্থায় মৃত্যুর মুখে এসে পৌঁছায়, 'নীলদর্পণ' নাটকে তার নিখুঁত ছবি আছে। অসহায় মানুষদের এই দুঃখ নাট্যকার চোখের সামনে দেখেছেন, পীড়িত মানুষদের যন্ত্রণা ইনি প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করেছেন, তাই এদের প্রতি গভীর সহানুভূতিতে এদের দুঃখ-মোচনের জন্য দীনবন্ধু বাধ্য হয়েছেন কলম তুলে নিতে। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যা হরিশ মুখোপাধ্যায় করতে চেয়েছিলেন, বা ঝিনাইদহের মহেশ চাটুয্যে ও চৌ-গাছার বিষ্ণুচরণ-দিগম্বর যা করতে চেয়েছিলেন, নাটক লিখে দীনবন্ধু ঠিক ঐ কাজই করতে এগিয়ে এলেন। কেবল তফাৎ এই যে, অন্যসকলের থেকে তাঁর হাতিয়ারটা ছিল আলাদা। আর সেটি যে অভিনব, তাতে আর সন্দেহ কী!—নতুন যুগ এই নতুন অস্ত্রটি তুলে দিয়েছিল তাঁর হাতে। অর্থাৎ আবার সেই 'রেনেসাঁসে'র প্রসঙ্গ।

উদ্দেশ্য মূলক নাটকের গঠনরীতি যেমন হওয়া দরকার, দীনবন্ধু ঠিক সেই ভাবেই তাঁর নাটকটিকে গঠন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। নাটকের মধ্যে পটভূমি হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে একটি গ্রামীন সমাজ। এ সমাজের সকলেই কৃষি নির্ভর। ক্ষেতের শ্রমিক থেকে জমির মালিক পর্যন্ত সকলেই কর্ষণজীবী। 'গুয়াতেলির মিত্র পরিবারে'র বাস্তব ছবি নিশ্চিত দীনবন্ধুর চোখের সামনে ছিল, সেই পরিবারের আদলেই এই নাটকের 'বসু-পরিবার' চিত্রিত। এই বসু

পরিবারের মাথা হলেন গোলোক বসু। গোলোক বসু বিত্তবান লোক। তবে তাঁর যা কিছু বিত্ত, সেই সব এসেছে কৃষি উৎপাদনের প্রাচুর্য থেকে। কেবল ঐশ্বর্যে নয়, সংসারটি এমনিতেই যে পূর্ণ ছিল, তা' পরিবারের পারিপার্শ্বিক দিকগুলি দেখলেই বোঝা যায়। গোলোক বসুর দুই ছেলে—নবীন মাধব আর বিন্দুমাধব। দুই পুত্রবধূ—সৈরিন্ধ্রী আর সরলতা।—গৃহিনী সাবিত্রী সত্যি সত্যিই 'সাবিত্রীসমানা। এই পরিবারের ঝি আদুরী। সে প্রাচীনা এবং পরিবারের চোখে সেও সার্থক-নামা। নীলের করাল গ্রাসে না পড়লে এ পরিবারটি যে দীর্ঘকাল সুখে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারত, একথা খুব সুনিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। কিন্তু নীলের অশুভ দৃষ্টি এই পরিবারের ওপর অমঙ্গলের একটি ছায়া ফেলল ।ভবিষ্যৎ কী রকম হবে, তাই নিয়ে দেখা দিল অনিশ্চয়তা। 'দক্ষিণ পাড়ার মোড়লদের বাড়ি' যা একদা সুখে-স্বচ্ছলতায় ছিল সমৃদ্ধ এবং বর্তমানে যা শ্মশান-ভূমি, এই ছবিটি কংকালের মতন বিশেষ একটি ইংগিত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই জীবন্ত বসু-পরিবারের সামনে। সূচনা এই ভাবে, তারপরে ঘটনা প্রবাহ দ্রুত এগিয়ে চলেছে অমোঘ পরিণামের দিকে।

বসু পরিবার ছাড়া আরেকটি কৃষক পরিবারও মূল নাটকের ঐ অমোঘ পরিণামের সঙ্গে যুক্ত। এই পরিবারটি হল সাধুচরণ-রাইচরণের পরিবার। সাধুচরণ 'বসু পরিবারে'র সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠ। রাইচরণের পক্ষে এই ঘনিষ্ঠতার অবকাশ কম। কেননা, সে লাঙ্গল-ধরে জমিতে চাষ করে, কৃষিকর্ম করে কৃষি শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে। তোরাপ ও রায়তদের সঙ্গেই তার তাই ঘনিষ্ঠতা একটু বেশি। সে এই বৃত্তের মানুষ। এই পরিবারেরই 'কৃষক-কন্যা' হল ক্ষেত্রমণি, যার ওপর কুঠির ছোট সাহেবের লোলুপ দৃষ্টি।

আরেক শ্রেণীর মানুষ এই গ্রামীন সমাজের সঙ্গে এবং নাটকের সঙ্গে ঐ অমোঘ পরিণামের সূত্রে জড়িত, তারা হল রাযত। মুসলমান তোরাপ এই রায়তদের ভেতর সর্বাপেক্ষা তেজী এবং নাটকের ভেতরেও সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য চরিত্র। এরা কেউই জমির মালিক নয়, এরা শ্রমিক মাত্র। যাকে সাধারণত ভূমিহীন কৃষক বলা হয়, এরা সেই শ্রেণীর। কী আশ্চর্য, এরাও নীলের করাল গ্রাস থেকে বাঁচতে পারছে না।

নীলের করাল ছায়া যে সর্বত্র প্রসারিত এবং ঘটনা পরম্পরায় সব ক'টি মানুষই যে একটি পরিণতির দিকে ধাবমান, এ জাতীয় একটি পরিকল্পনা যে নাট্যকারের মনের মধ্যে রয়েছে, তা' প্রথম অঙ্ক থেকেই বোঝা যায়।

নীলকরদের পীড়ন যে কত বিচিত্র রকমের হতে পারে এবং তা' কত ব্যাপ্ত ও কত গভীর, সে কথা বিবৃত করবার জন্য লেখক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

'নীলদর্পণে'র পটভূমিতে যে নীল-আন্দোলনের ইতিহাস আছে, সে ইতিহাস নাট্যকার তাঁর প্রয়োজনমত কাজে লাগাতে ত্রুটি করেন নি। বিন্যাস ও গঠনরীতিতে এই 'ব্যাকগ্রাউণ্ড' যে কতখানি শিল্প-সম্মত হয়েছে, তা' অবশ্যই বিচার্য। এবং তা' এইভাবে বিচার্য, 'howfar that backg1ound in itself 1s adequate and skillfully blended with the action revealed before us.'[৬১]—পটভূমিগত তথ্যের সঙ্গে নাটকীয় সংঘাতের সমন্বয় নাটকের প্রায় সর্বত্রই যে ঘটেছে একথা নির্দ্ধিধায় বলা যায়। পুরুষ রায়তদের গোপনে কয়েদ করা, তাদের এক কুঠি হতে আরেক কুঠিতে পাঠিয়ে সাত কুঠির জল খাওয়ানো, 'দাদন' দেবার কৌশল, মেয়েদের কয়েদ করা, স্ত্রীলোক-দের ওপর নীলকর সাহেবদের লালসার দৃষ্টি, ঐ নীলকর সাহেবদের বিচিত্র অত্যাচারের পদ্ধতি, মিশনারীদের ওপর তাদের আক্রোশ, 'এগারো আইনে'র কথা, নীলকরদের স্কুল ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার পিছনে গোপন উদ্দেশ্য, গ্রাম লুণ্ঠনে যাত্রার চিত্র, সংবাদ পত্রের ভূমিকা, শাসন ব্যবস্থার তৎকালীন ছবি, এদেশীয় কর্মচারীদের ক্রিয়া-কর্ম, হার্শেল-গ্রান্ট প্রমুখ মহাপ্রাণদের সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উল্লেখ এবং আরো নানা সমকালীন তথ্য এই নাটকে নানা সূত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু নাট্যকারের শিল্পচেতনা এতই সতর্ক যে কোনো-সময়ের জন্য তিনি এইগুলির ভারে শিল্পকে দেন নি ক্ষুন্ন হতে। বা ভারাক্রান্ত হতে।

তবে সব ব্যাপারেই নাট্যকার যে শিল্পধর্ম রক্ষা করতে পেরেছেন একথাও জোরের সঙ্গে বলা যায় না। অন্ততঃ কাহিনী ও চরিত্রের পরিণতি চিত্রণে লেখক কিছু পরিমাণে যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন, তা' একটু বিশ্লেষণ করলেই ধরা যায়। গ্রামীন সমাজের যে তিনটি স্তরের কথা আগে বলা হয়েছে, ঐ তিনটি স্তরের প্রসঙ্গে তৃতীয় অঙ্কের পর নাট্যকার যথেষ্ট অসচেতন। একমাত্র তোরাপ ও রাইচরণ ছাড়া তৃতীয় স্তরের অপরাপর চরিত্র সম্পর্কে লেখক আমাদের আব কারো খবর দেওয়ার আবশ্যকতার কথা চিন্তা করেননি। এর ভেতর আবার রাইচরণ ঠিক 'ভূমিহীন রায়ত'দের পর্যায়ে পড়ে না, যদিও মানসিক গঠনের দিক থেকে সে এদেরই কাছাকাছি।—এই রাইচরণের চারিত্রিক পরিণতিও কিন্তু 'নীলদর্পণ' নাটকে শেষ পর্যন্ত চিত্রিত হয়নি। আর গুদামঘরের অন্ধকারে যে কান্না ক্ষীণকণ্ঠে শ্রুত হয়েছিল, সে কান্নার সূত্র ও পরিণতি কী এবং এ

কান্না কার, এসব প্রশ্নে নাট্যকার আশ্চর্য নীরবতা পালন করেছেন। যে পীড়ন-কে নাট্যকার সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত বলে পরিচিত করেছিলেন, আশা করা অন্যায় নয়, এই পীড়ন-জনিত প্রতিবাদ সর্বস্তর থেকেই আসবে এগিয়ে প্রতিহত হয়ে।—বলার অপেক্ষা রাখেনা, নাটকের গঠনে প্রতিশ্রুত পরিকল্পনামত নাট্যকার এগিয়ে আসতে পারেননি। বরং এ জাতীয় শর্ত পালন করার দায়িত্ব তিনি যেন স্বেচ্ছায় করেছেন উপেক্ষা। সমগ্র সমাজকে জড়িত না করে শেষ পর্যন্ত তিনি একটি পরিবারকেই নিয়েছেন বেছে। তাই দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকটি গ্রামীন সমাজের সামগ্রিক দুঃখের চিত্র না-হয়ে, পরিণামে যা হয়েছে, তা' হল, একটি পরিবারের দুঃখের কাহিনী। এ হিসাবে লেখক তাঁর কাহিনী-কথনে যে কেন্দ্রচ্যুত হয়েছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। না, কেবল কাহিনী-বিন্যাসের ব্যর্থতায় নয়, বা গৌণ চরিত্রের রূপায়ণ ব্যাপারেও নয়, দীনবন্ধু প্রধান চরিত্র গুলির পরিকল্পনা ও রূপায়ণেও এই শিথিলতা দেখিয়েছেন। বিন্দুমাধব, গোলোক বসু, ক্ষেত্রমণি থেকে নবীনমাধব-তোরাপ সকলেই এই শিথিল সূত্রে গাঁথা। 'এগারো আইনে'র ফাঁদে সহজেই ধরা পড়েছেন গোলোক বসু এবং একটি চক্রান্তের শিকার হয়েও তিনি ঐ চক্রান্ত বা ফাঁদ থেকে বের হয়ে আসবার অণুমাত্র চেষ্টা করেননি, কাউকে সাহায্য করবার সুযোগ পর্যন্ত দেননি, বরং তিনি সকলকে অসহায় করে দিয়ে করে বসেছেন আত্মহত্যা। বলতে দ্বিধা নেই, নাটকীয় ঘটনা পরম্পরায় এই আত্মহত্যা অনিবার্য নয়। আর যেহেতু নাটকের দিক থেকে এই মৃত্যু শিল্প-সম্মত ও অনিবার্য হয়নি, তাই পরবর্তী ঘটনাগুলিকেও এই ঘটনাটি শিল্পসম্মত পরিণামে পৌছতে সহায়তা করেনি। ফলে, 'স্বরপুর-বৃকোদর' নবীনমাধব এবং তেজস্বী তোরাপ পর্যন্ত শিল্পের আবেগে চালিত না হয়ে, চালিত হয়েছে শিল্পীর মানবিক আবেগে। উদ্দেশ্যমূলক নাটকে সাধারণত এ জাতীয় ঘটনা ঘটে থাকে এবং সাময়িক উদ্দেশ্য সফল হলেও চিরায়ত সাহিত্যের দরবারে তা' শেষ পর্যন্ত ঠাঁই পায়না। অস্বীকার করবার উপায় নেই, 'নীলদর্পণে' অংশতঃ তা' ঘটেছে।

এ সত্যটি আরো পরিস্ফুট হবে যখন আমরা ট্রাজেডি হিসাবে এ নাটকটিকে বিচার করতে যাবো। রেনেসাঁসী সাহিত্য যে কদাচ প্রথাগত সাহিত্যাদর্শের প্রতি অনুগত নয়, এই একটি নাটক আলোচনা করলেই তা' উপলব্ধি করা যায়। ইতালীয় রেনেসাঁসের কথা বিবৃত করতে গিয়ে বুকহার্ট সাহেব লিখেছেন, 'The Italians of the fourteenth century knew little of false modesty or of hypocrisy in any shape';[৬২]

—চতুর্দশ শতাব্দীর ইতালীয়রা যেমন ভণ্ডামি ও অহেতুক বিনয় বর্জন করেছিলেন জীবনের নবলব্ধ সত্য আবিষ্কার করে, অনুরূপভাবে সাহিত্যের ভেতরেও শিল্পের খাতিরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারচুপি স্বীকার করে নেওয়াও রেনেসাঁসের শিল্পীদের পক্ষে হয়ে উঠেছিল অসম্ভব। আর নাটকের ক্ষেত্রে, কী আদর্শ নাট্যকারের অনুসরণযোগ্য, তার কথা উঠলে ইংরেজি নাটকের রেনেসাঁসী পর্বের দিকে তাকানোই বোধ হয় ভালো। এবং সঙ্গতও।

স্বীকার করে নেওয়া ভালো, প্রাচীন গ্রীসের মানবিক আদর্শ রেনেসাঁসের সূচনা ঘটালেও, গ্রীক নাট্যকারেরা এই লগ্নে নবজাগ্রত নাট্যকারদের প্রেরণাস্থল হতে পারেছিলেন কদাচিৎ। ইস্‌কাইলাস, সফোক্লিস, এবং ইউরিপিডিস্ ইংরেজী নাট্যকারদের রেনেসাঁসের প্রথম পর্বে যে প্রভাবিত করতে পারেন নি, এ কথা সুবিদিত। বরং যিনি এ সময়ের নাটককে সবিশেষ প্রভাবিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তিনি হলেন ল্যাটিন নাট্যকার 'সেনেকা'। হত্যা, নিষ্ঠুরতা, ববরতা, উন্মত্ততা, জিঘাংসা ইত্যাদি প্রবৃত্তিগুলি যে ভাবে 'সেনেকা'র ট্রাজেডিতে চিত্রিত, মানুষকে এইরকম ভাবেই প্রথম পর্বের রেনেসাঁসী নাটাকারেরা বোধ হয় দেখতে চান এবং চেয়েছিলেন। নাট্যশিল্পের এই কথায় বুকহার্টের বক্তব্য হল, 'That was the field on which to display human character, intellect, and passion, in the thousand forms of their growth, their struggles, and their decline.'[৬৩]—ইতালীর রেনেসাঁসের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁদের সাহিত্যে 'সেক্সপীয়ার' অবিভূর্ত হন নি। এবং এঁদের ট্রাজেডী খুব উঁচুমানের নয়।—বলে রাখা ভালো, ইংল্যাণ্ডে সেক্সপীয়ার কিন্তু একবারে প্রথমেই আসেন নি, আর সার্থক ট্রাজেডি রচিত হতে সময় লেগেছিল প্রথম-রেনেসাঁস থেকে আরো কিছুদিন। এবং প্রথম পর্বে 'সেনেকা'র ট্রাজেডিই যে আসর মাৎ করেছিল, এ তথ্য ছাত্র-পাঠ্য গ্রন্থেও লিখিত আছে। টমাস নর্টনের সহযোগিতায় টমাস স্যাকৃভিল্ 'গরবোডাক অর কোরেক্স্ অ্যাণ্ড পোরেক্স' নামে ইংরেজি সাহিত্যে যে প্রথম ট্রাজেডিটি লেখেন, তা' পুরোপুরি 'সেনেকা'র আদর্শে লেখা। এ প্রসঙ্গে একজন সাহিত্যের ইতিহাস লেখক যা লিখেছেন, তা এই রকম: 'Seneca's Tragedies, with their earnest and strenuous atmosphere, attracted the writers of the day; and Gorboduc, the first English drama, is the result.'[৬৪] —টমাস স্যাকৃভিল থেকে টমাস কীড পর্যন্ত সকলেই এই একই পথের পথিক।

নাট্যকার সেনেকার দ্বারা কীড এতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন যে তিনি একটি নতুন ধারা প্রবর্তনে হয়েছিলেন সমর্থ। তাঁর লেখা 'দি স্প্যানিস ট্রাজেডি' প্রায় একশ বছর ধরে ব্রিটিশ রঙ্গমঞ্চে হয়েছিল অভিনীত। সুতরাং উক্ত নাটকের প্রভাবও যে সুদীর্ঘকাল ছিল, তা' সহজেই অনুমেয়।

দীনবন্ধু লিখিত 'নীলদর্পণ' নাটকটিকে এই পরিপ্রেক্ষিতে 'ট্রাজেডি' হিসাবে বিচার করে দেখা দরকার। খাঁটি গ্রীক্-ট্রাজেডি বা সেক্সপীয়ারের ট্রাজেডির সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিল্প-কৌশলের সঙ্গে দীনবন্ধুর এই প্রথম রচনাটিকে মিলিয়ে দেখে অনুরূপ উৎকর্ষ আবিষ্কারে বৃত হওয়া নিতান্তই পাগলামি। বরং দীনবন্ধুর মধ্যে যা আছে, সেই দৃষ্টিতে তাঁকে দেখাই শ্রেয়।

ডঃ সুশীল কুমার দে এই 'নীলদর্পণ' নাটকে গ্রীক-ট্রাজেডির সাদৃশ্য আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছেন। এবং তিনি এ সম্পর্কে লিখেছেন, 'আধুনিক নাটকের না হোক, প্রাচীন গ্রীক নাটকের অন্তর্গত যে ট্রাজেডি-পরিকল্পনা তাহার সহিত 'নীলদর্পণে'র করুণ ভাবের সাদৃশ্য আছে, বাহিরের বৃহত্তর নির্মম শক্তির সহিত মানুষের অসহায় জীবনের নিষ্ফল সংগ্রাম, ক্ষুদ্র মানুষ যেন দুর্লঙ্ঘ্য দৈবের ক্রীড়নক মাত্র,—এই গ্রীক ভাবটি বোধহয় দীনবন্ধুর বিস্তীর্ণ ও বাস্তব সচেতন সহানুভূতির উপযোগী ছিল। তথাপি ট্রাজেডি হউক বা না হউক, নীলদর্পণের করুণ রস অলীক বা অসত্য হয় নাই। একদিকে বলদৃপ্ত পরস্বলোলুপ দুর্বৃত্তের অমানুষিক অত্যাচার, অন্যদিকে অসহায় দীনদুঃখীর ভাগ্যচক্রে নির্মম নিষ্পেষণ—যুগে যুগে দরিদ্র মানবের এই মর্মচ্ছেদী বেদনার জীবন্ত আলেখ্য বাংলার বিশিষ্ট পল্লীজীবনের ক্ষুদ্রায়তনের মধ্যেও যে সুস্পষ্ট হইয়া নির্বিশেষ রস পদবীতে আরোহণ পাবে, তাহা দীনবন্ধু তাঁহার সাময়িক করুণ উপাখ্যানে চিরন্তন করিয়া দেখাইয়াছেন।'[৬৫]

না, প্রভাব নয়, গ্রীকদের ট্রাজেডি পরিকল্পনার সঙ্গে 'নীলদর্পণে'র করুণ ভাবের যে সাদৃশ্য আছে, এবং ঐ ভাবটি যে দীনবন্ধুর বাস্তব-সচেতন সহানুভূতির উপযোগী ছিল, এ টুকুই হল ডঃ সুশীলকুমার দের বক্তব্য। সুতরাং প্রভাবের প্রসঙ্গ না তুলে বরং এই সাদৃশ্য ও উপযোগিতার আলোকেই 'নীলদর্পণ' নাটকটিকে বিচার করাই শ্রেয়।—প্রাচীন গ্রীক-নাটকে অলঙ্ঘ্য 'নেমেসিসে'র যে পরিচিতি আছে, তাকে ভারতীয় পটভূমিতে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করা কঠিন। দৈব-লাঞ্ছিত ও ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষের সঙ্গে ঐ 'নেমেসিস'-তাড়িত নাটকীয় চরিত্রগুলি একমাত্র তুলনীয়। অনিবার্য ট্র্যাজিক পরিণামের দিকে নাটকের নায়ক-কে 'নেমেসিস' যে নিয়ে যায়, যে কোনো গ্রীক-

ট্রাজেডির পাঠকের কাছে এ তথ্য সুবিদিত। তবে কোন্ রন্ধ্র পথে 'নেমেসিস্' এসে দেখা দেবে এবং তার ফলে নাটকে ঠিক কী জাতীয় দ্বন্দ্ব বা 'কন্‌ফ্লিক্‌ট' দেখা দিতে পারে, সেটি সর্বত্র অনুমেয় নয়। বরং এখানেই সাসপেন্স্ এবং বৈচিত্র্য। যাঁরা গ্রীক নাটক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তাঁরা নানা রকমের 'কন্‌ফ্লিক্‌টে'র কথা বিবৃত করে লিখেছেন, 'a struggle between two physical forces (which may be characters), or between two minds, or between a person and a force beyond that person, is to be found most fully expressed in the drama of ancient Greece.'[৬৬]

এখানে উল্লিখিত বিভিন্ন দ্বন্দ্বের ভেতর যেটিকে 'নীলদর্পণে'র ওপর প্রয়োগ করা যায়, তা' হল 'এ স্ট্রাগল বিটুইন্ টু ফিজিকাল ফোর্সেস'। নীলকরদের সঙ্গে শোষিত নীলচাষীদের যে সংগ্রাম, তাকে দুটি 'ফিজিকাল ফোর্সের' স্ট্রাগল বলেই অভিহিত করা যায়। এই 'স্ট্রাগ্‌লে' যদিও নীলকরদের পাশবিক শক্তিই শেষপর্যন্ত জয়ী হয়েছে, কিন্তু তাই বলে প্রতি পক্ষের কাছ থেকে কম কিছু বাধা তারা পায় নি। এখন এই উৎপীড়ন ও প্রতিরোধকে যথার্থ ও তার ঠিকমত শিল্পরূপ দেওয়া হয়েছে কী না, অন্ততঃ ট্রাজেডির শিল্পাদর্শে, তা' অবশ্যই বিচারের অপেক্ষা রাখে।

আরিষ্টটলের দেওয়া সংজ্ঞা অনুসারে আমরা তাকেই 'ট্রাজেডি' বলতে পারি, যা 'is the imitation of an action that is serious and also, as having magnitude, complete in itself ; in language with pleasurable accessories, each kind brought in separately in the parts of the work ; in a dramatic, not in a narrative form ; with incidents arousing pity and fear, where with to accomplish its *cathersis* of such emotions.'[৬৭]—এখানে উল্লিখিত অধিকাংশ শর্তকেই যে 'নীলদর্পণ' মেনে চলেছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। সংঘাতের ভেতর দিয়ে চরিত্র চিত্রণে, পরিপূর্ণ কাহিনী কথনে, মাধুর্যমণ্ডিত সংলাপ সৃষ্টিতে, যথার্থ নাটকীয় মুহূর্ত বিন্যাসে নাট্যকারের যে মুন্সিয়ানা আছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে রচয়িতার যে সূক্ষ্মশিল্পগুণে ট্রাজেডি থেকে 'পিটি অ্যাণ্ড ফীয়ার' একই সঙ্গে উৎসারিত হয়, অস্বীকার করবার উপায় নেই, 'নীলদর্পণে' তার পরিচয় অনুপস্থিত। সুতরাং ঐ 'ইমোশানে'র স্বতোৎসারিত 'ক্যাথারসিস্' যা ট্রাজেডির

অনিবার্য পরিণতির সঙ্গে যুক্ত, 'নীলদর্পণে', তার্কিক সমালোচকদের চোখে তার একান্তই অভাব।

অনাবশ্যক হলেও, এ তথ্যও জ্ঞাত থাকা প্রয়োজন যে ইতিহাসের চোখে 'নীলদর্পণ'ই হল বাঙলা সাহিত্যের প্রথম 'ট্রাজেডি'। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত জে. সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাসকে' যদিও আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের প্রথম মৌলিক নাটক এবং ঐ একই সঙ্গে প্রথম 'ট্রাজেডি' বলে দাবি করা হয়ে থাকে, কিন্তু কোনো কোনো সমালোচক এটিকে শুধু 'ট্রাজেডি' কেন, সার্থক নাটক বলে স্বীকৃতি দিতেও প্রস্তুত নন। আর নাটকের সার্থক অভিনয়তো দূরের কথা, বইখানি যে ভালো করে প্রচারিত পর্যন্ত হয় নি, এ খবর কারো কাছে অজ্ঞাত নয়।—এ সব বিচার করে এবং কালের দিক থেকে আট বছরের ব্যবধান স্বীকার করে নিয়েও, এ কথা বিবৃত করা সম্ভবতঃ অসঙ্গত নয় যে 'নীলদর্পণ'ই আমাদের সাহিত্যে প্রথম 'ট্রাজেডি'। অন্ততঃ 'নীলদর্পণ' লেখবার সময় বাঙলা ভাষায় অনুরূপ কোনো গ্রন্থ ছিল না, যার থেকে দীনবন্ধু 'ট্রাজেডি'র কেনো আদর্শ গ্রহণ করতে পারেন। তাই দীনবন্ধুকে নিজের চলাব পথ আবিষ্কার করতে হয়েছিল নিজেকেই। এ ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা একমাত্র 'ভগীরথে'র সঙ্গে তুলনীয়।

টমাস স্যাকৃভিল যেমন সেনেকার আদর্শে ইংরেজী সাহিত্যের প্রথম ট্রাজেডি লিখেছিলেন, দীনবন্ধু অসচেতন ভাবে তাঁরই অনুসরণে এথন নাটক লিখলেন। আত্মহনন, বর্বরতা, নিষ্ঠুরতা, উন্মত্ততা, জিঘাংসা, হত্যা ইত্যাদি বৃত্তিগুলি 'নীলদর্পণে'র ভেতর পেল অবাধ অনুপ্রবেশ। যদিও 'বঙ্গভাষার সেক্সপীয়ারে'র কথা বিন্দুমাধবের চিঠি মারফৎ এ নাটকে অনুক্ত নয়, কিন্তু 'নীলদর্পণ' পাঠ করে অনায়াসে বলা যায যে এ নাটকের ট্রাজেডি-পরিকল্পনায সেক্সপিয়রের প্রভাব অকিঞ্চিৎকর ও উপেক্ষনীয।

পরিকল্পিত ও প্রতিশ্রুত কাহিনীর রূপায়ণে দীনবন্ধু যে শেষ পর্যন্ত সমর্থ হন নি, সে আলোচনা আগেই করা হয়েছে। 'কন্‌ফ্লিক্‌ট' বা দ্বন্দ্বের দিক থেকেও 'নীলদর্পণে'র সাদৃশ্য যে গ্রীক নাটকের তুল্য, তা'ও আমরা দেখেছি।—এথন নায়কের দিক থেকে, তার চারিত্রিক-রীতির বিশেষ কোনো প্রবণতার জন্য পরিণামে ট্রাজেডি অনিবার্য হয়ে উঠেছে কী না, তাও একটু যাচাই করে নেওয়া যেতে পারে। কেননা, সমালোচকরা প্রায়শই বলে থাকেন যে, 'It is rhe hero who gives significance and tone to a tragedy'[৬৮]—নবীন মাধবকে যদি 'নীলদর্পণে'র নায়ক হিসাবে বিবেচনা

করা হয়, তবে স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এই নায়ক এই নাটকের অনিবার্য পরিণামকে নিয়ন্ত্রণ করতে অসমর্থ হয়েছেন। কেননা, যে-পশুশক্তির সঙ্গে নবীনমাধব সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন, এ সংগ্রামে ইনি 'বৃকোদর' আখ্যা পেলেও, নবীনমাধব পারেননি যথার্থ রণকৌশল দেখাতে। নীলকরদের কাছে এই নায়ক আশা করেছিলেন খ্রীষ্টীয় মানবিকতা, ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধারের সময় খড়খড়ি ভেঙ্গে রোগ সাহেবের ঘরে ঢুকে সাহেবকে একান্ত অসহায় পেয়েও তাঁকে একটুকুও লাঞ্ছনা করেননি, বরং হিতোপদেশে শুভবুদ্ধি জাগাবার চেষ্টায় বলেছিলেন,…"এই কি তোমার খ্রীষ্টান ধর্মের জিতেন্দ্রিয়তা? এই কি তোমার খৃষ্টানের দয়া, বিনয়, শীলতা? আহা, আহা, বালিকা অবলা, অন্তর্বত্নী কামিনীর প্রতি এইরূপ নির্দয় ব্যবহার?'(৩/৩)—তোরাপ অবশ্য এই ঘটনার সময় একটু উচিত শিক্ষা দিতেই চেয়েছিল, কিন্তু তাকে ক্ষান্ত করে নবীনমাধব বলেছিলেন, 'ওরা নির্দয় বলে আমাদের নির্দয় হওয়া উচিত নয়।' (৩/৪)—মানবিক গুণগুলির প্রতি নবীনমাধবের গভীর শ্রদ্ধাবোধ ঐ পশুশক্তিতে উন্মত্ত বিপক্ষদলকে যুদ্ধজয়ে করেছে সহায়তা। ফলে, হৃদয়সর্বস্ব 'বসু পরিবারে'র সকলকেই বরণ করে নিতে হয়েছে একটির পর একটি মৃত্যু, উন্মত্ততা এবং সব শেষে সুগভীর বিষাদ। 'বৃকোদর'-কেও উৎসর্গ করতে হয়েছে নিজের প্রাণ। আপাতদৃষ্টিতে এই ঘটনাগুলি কার্য কারণ সমন্বিত নয়, তাই 'মেলো-ড্রামাটিক' বলে মনে হতে পারে। তবে জেনে রাখা দরকার, এ-জাতীয় 'মেলোড্রামাটিক' চিত্র 'সেনেকা'র ট্রাজেডির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সুতরাং এই দৃষ্টিতে 'নীলদর্পণ'-কে বিচার করলে, উন্নত মানের শিল্প হিসাবে তাকে গ্রহণ না-করবার কোনো কারণ থাকে কী?[৬৯]—আর 'মানবিকতাবাদে'র কষ্টি-পাথরে বিচার করে এই গ্রন্থটির আরো যে একটি বিশেষ তাৎপর্য আবিষ্কার করা সম্ভব, তা' ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি। সুতরাং 'নীলদর্পণ' দীনবন্ধুর প্রথম নাটক হলেও বিপুলতর অর্থে সে যে অভাবিত সাফল্যের অধিকারী, একথা অস্বীকার করবার উপায় কোথায়?

কেবল গঠন-রীতি বা 'ট্রাজেডি' বিচারের আলোকে নয়, নাটকে চিত্রিত চরিত্রগুলির আলোচনায় অগ্রসর হলেও আমাদের ঐ একই উপসংহারে এসে পৌঁছুতে হয়। 'নীলদর্পণ' নাটকে আমরা যে-সব চরিত্রের সঙ্গে মুখোমুখি হই, ঐ চরিত্রগুলির প্রত্যেকেই সমসাময়িক যুগের ভালো-মন্দের দ্বারা আচ্ছন্ন, এবং কোনো কোনো ব্যাপারে তারা যুগের প্রতিনিধি হিসাবেও বিবেচিত হবার যোগ্য। যদিও এরা প্রত্যেকেই হৃদয়সর্বস্ব, কিন্তু কারো হৃদয়েই গভীরতর

জটিলতা নেই। এরা প্রায় সকলেই একমুখী, আবেগপ্রবণ, এবং ছোটো ছোটো সংস্কারের গণ্ডীতে আবদ্ধ। তাই বলে আমরা যদি মনে করি, এরা সকলে এক ছাঁচে ঢালা, তা' হলে কিন্তু ভীষণ ভুল হবে। এক আকাশের তলায় ও একই মাটির ওপর থাকলেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে এরা কেউই কম নয়, বরং বলা যায় এরা সকলেই 'স্বরাজ্যে স্বরাট'।—গ্রামীন সমাজের তিনটি স্তরের কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। এই স্তরগুলির পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ-গুলিকেও সুস্পষ্ট কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তবে এই শ্রেণী কিন্তু ঐ স্তরের সঙ্গে ঠিক অন্বিত নয়। গোলোক বসু, নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, সাধুচরণ এবং এদের পরিবারের মেয়েরা অর্থাৎ সাবিত্রী-সৈরিন্ধ্রী-সরলতা মোটামুটি একই শ্রেণীভুক্ত। আরেকটি শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে যাদের উল্লেখ করা যায়, তারাহল রাইচরণ-তোরাপ ও নামহীন চারজন রায়ত। এদের পারবারের মেয়ে হল ক্ষেত্রমণি। এবং আদুরীকেও শেষপর্যন্ত এই তালিকা ভুক্ত করাই শ্রেয়। এই দুটি শ্রেণী ছাড়াও নাটকে আরেক ধরণের চরিত্র আছে যারা নীলকরদের সঙ্গে একই গোষ্ঠীভুক্ত হতে পারে। সেই হিসাবে এই এই নাটকে যাদের নাম উল্লেখ করা যায়, তারা হ'ল, দু'জন নীলকর রোগ-উড এবং তাদের সহকারী গোপীনাথ, আমিন এবং পদী ময়রানী।—বলার অপেক্ষা রাখে না, এইভাবে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করলেও, এরা প্রত্যেকেই স্বাধীন, এবং প্রত্যেকেরই এক একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভূমিকা এই নাটকে বর্তমান।

যদিও আলোচ্য নাটকের নায়ক ইনি নন, তবু গোলোক বসুকে দিয়েই এই নাটকের চরিত্র-বিচার আরম্ভ করে দেওয়া যেতে পারে। গত শতকের গ্রাম-বাঙলার ধর্মভীরু ও শান্তিপ্রিয় মানুষদের প্রতীক হলেন এই গোলোক বসু। যে বাঙলাদেশে একদা ছিল গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গোরু, পুকুরভরা মাছ, গোলোক হলেন সেই বিস্মৃত বাঙলার মানুষ। সেদিন যে প্রাচুর্য ও সরলতা ছিল, সেই বৈষয়িক প্রাচুর্য ও সরল জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিলেন গোলোক। জীবন কাটাচ্ছিলেনও সেই ভাবে। কিন্তু আকস্মিক নীলকরদের আবির্ভাব এই জীবন-সুখে টানল ছেদ। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই ছায়া পড়ল আতঙ্কের। গোলোক আশঙ্কা প্রকাশ করলেন, 'পরমেশ্বর এ ভিটায় স্নান আহার করিতে দেন, এমত বোধ হয় না।'[৭০]—গোলোক যে সরল মানুষ, একথা পুনরুক্ত করা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু এই সরলতাই তাঁর জীবনে চূড়ান্ত অভিশাপ হয়ে দেখা দিল। গোলোকের ধর্মভীরুতার সুযোগ নিল চতুর গোপীনাথ। 'এগারো নম্বর' আইনে প্রজাসাধারণকে নীলচাষ

করতে না-দেওয়ার অভিযোগে দেওয়ান গোপীনাথ তাঁকে অভিযুক্ত করবার উপদেশ দিলেন তাঁর নীলকর প্রভুকে। সঙ্গে সঙ্গে ফৌজদারি আইনে ধৃত হলেন গোলোক। ধর্মভীরু হলেও গোলোক যে কাপুরুষ নন, তা' প্রমাণিত হল যখন তিনি কোর্টের সামনে দাঁড়িয়ে খুব স্পষ্ট ভাষায় বললেন, 'আমি জানি বসাহেদিগের রাজি রাখিতে পারিলেই মঙ্গল। সাহেবদের দেশ, হাকিম ভাই-ব্রাদার, সাহেবদের অমতে চলিতে আছে? আমাকে খালাস দেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যদিও হাল গোরুর অভাবে নীল করিতে না পারি, বৎসর বৎসর সাহেবকে এক শত টাকা নীলের বদলে দিব। আমি কি রায়তদের শেখাইবার মানুষ? আমার সঙ্গে কি তাহাদের দেখা হয়?'[৭১]—এই নির্ভিক পৌরুষ থাকা সত্ত্বেও গোলোক-চরিত্র 'নীলদর্পণে' সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কেননা তাঁর আকস্মিক আত্মহত্যা নীলকরদের অত্যাচারের নির্মমতাকে প্রকাশ করে দিলেও, সংঘাতের ভেতর দিয়ে এই চরিত্রটিকে এরা ক্রমবিকশিত হতে দিল না। সুতরাং শিল্পের জগতে গোলোক একটি নিজস্ব স্থান করে নিতে সমর্থ হলেন না। বরং হলেন সর্বৈব ব্যর্থ।

এ নাটকে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল নবীন মাধব। যদিও সে বাবার মতনই ন্যায়নিষ্ঠ, সত্য-সন্ধানী, এবং মানুষের সততায় বিশ্বাসী, তবু এই মানুষটিই হয়েছে-নীল-বিদ্রোহের নায়ক। ধূর্ত ও শঠ নীলকরদের সঙ্গে বিরোধিতায় লিপ্ত হতে গেলে যে পরিমাণ চতুর ও কৌশলী হওয়া দরকার, স্বীকার করতেই হয়, সেই চাতুর্য ও কৌশল নায়ক নবীনমাধবের চরিত্রে একেবারেই অনুপস্থিত।—নবীনমাধবের পথ ন্যায় ও সত্যের পথ, অর্থাৎ নবলব্ধ মানবিক আদর্শের পথ। মানবিক সততায় বিশ্বাসী এই নবীনমাধবের সঙ্গে পশুশক্তির সংগ্রাম যে নাটকীয় দিক থেকে তীব্রতর হবে, তাতে আর আশ্চর্য কী। আর এ ধরণের সংগ্রাম সাধারণত এক তরফাই হয়ে থাকে। একদিকে থাকে পীড়ন, অপরদিকে থাকে শুধুই দুঃখ ভোগ। এই দুঃখ ভোগের উৎস থেকেই শেষপর্যন্ত বিপ্লবী নায়কদের জন্ম হয়। তবে সে ঘটনা ঘটে অনেক পরে। 'নীলদর্পণে' এই পরবর্তী ঘটনা ঘটেনি। তাই নায়ক হিসাবে নবীনমাধবকে যদি প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, আমরা সেই নায়কদের শ্রেণীতেই তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারি, যাঁরা ভয়ঙ্কর কিছু করেননি, যাঁরা কেবল পীড়ন ও যন্ত্রণা সহ্য করে গেছেন নীরবে। অর্থাৎ 'সাফারিং'-এর সংজ্ঞায় যে-ধরণের নায়ক পাওয়া যায়, নবীনমাধব হলেন সেই কোটির নায়ক।—গ্রামের সকলের আশ্রয় ও ভরসাস্থল হলেন এ নবীনমাধব। নীলকরদের অত্যাচারের হাত

যেখানেই প্রসারিত হয়েছে, সেখানেই নবীন এসেছেন, সেখানেই প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন এই নবীন মাধব। নাটকের নানা ঘটনা ও সংলাপ থেকে নবীনমাধবের এই ভূমিকার পরিচয় উদ্ধার করা অসম্ভব নয়। দরিদ্র মানুষদের শিশু-পুত্রদের দায় দায়িত্বও যে কখনো কখনো তাঁকে নিতে হয়েছে, এমন ঘটনাও রয়েছে। নীলকররা ধরে নিয়ে যাচ্ছে, এমন একজন রায়তের মুখে আমরা শুনেছি,'বড় বাবু, মোর ছেলে দুটোরে দেখো, তাদের খাওয়াবার আর কেউ নেই—গেল সন আট গাড়ী নীল দেলাম, তার একটা পয়সা দেলে না আবার বকেয়া বাকি বলে হাতে দড়ি দিয়েছে, আবার আন্দারবাদ নিয়ে যাবে।[৭২]—'আন্দারবাদে'র লৌহ-যবনিকার অন্তরাল থেকে ঐ রায়তের প্রত্যাগমন অনিশ্চিত, সুতরাং তার ছেলে দুটোকে দেখবার দাযিত্ব যে চিরতরে নবীনমাধবের ওপর বর্তালো, একথা ঐ সংলাপেই প্রচ্ছন্ন।—এই সব ক্রিয়া-কর্ম দেখে গোলোক বসু নবীনমাধবের নতুন একটি নাম দিয়েছেন। এই নামটি হল, 'স্বরপুর বৃকোদর'।

না, শিল্পের দিক থেকে নবীনমাধবকে যথার্থ 'বৃকোদর' বলে অভিহিত করা কঠিন। কেননা, অল্প হলেও যে শৌর্য চিত্রটুকু বর্তমান নাটকে অঙ্কিত রয়েছে, তা' সর্বত্র নাটকীয় সংঘাতের দ্বারা সৃষ্ট নয়। বেশির ভাগই বর্ণনাভিত্তিক। কেবল একটি দৃশ্যে যথার্থ নাট্যক্রিয়ার মাধ্যমে ঐ 'বৃকোদর' স্বমহিমায় আমাদের কাছে উপস্থিত হতে পেরেছেন, এবং সে দৃশ্যটি হল ক্ষেত্রমণির ওপর অত্যাচারের দৃশ্য। এই একটি মাত্র দৃশ্যে তোরাপকে সঙ্গে করে রোগ সাহেবের কামরায় জানালার খড়খড়ি ভেঙ্গে যথার্থ ভীমের মতই নবীনমাধব প্রবেশ করতে পেরেছেন এবং বিপন্না ক্ষেত্রমণিকে পেরেছেন উদ্ধার করতে।

এ ছাড়া আরো একটি ঘটনা আছে। সেখানেও নাটকীয় সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। তবে নাট্যকার তাকে ঠিকমত কাজে লাগাতে পারেন নি। নাট্যকার এই আশ্চর্য শৌর্যজনক ঘটনা সৃষ্টিতে সংঘাতের পরিবর্তে আশ্রয় নিয়েছেন 'ন্যারেশানে'র। অর্থাৎ বর্ণনার চোখের সামনে এ ঘটনা না দেখিয়ে, অপরাপর চরিত্রের মুখ দিয়ে তিনি আমাদের এ খবর করেছেন পরিবেষণ। গোলোক বসুর মৃত্যুর পর অশৌচ অবস্থায় নবীনমাধব গিয়েছিল পিতৃহন্তার কাছে একটি প্রার্থনা নিয়ে। প্রার্থনা বিনীতভাবে নিবেদিত হলেও, পরিবর্তে সে পেয়েছিল কুৎসিত সম্বর্ধনা। তাই অনিবার্য ভাবেই এসেছিল একটি ভয়ঙ্কর নাটকীয় মুহূর্ত। নায়ক নবীনমাধবের কাছে সেই নাটকীয় মুহূর্তটি এই রকম: 'অমনি বড়বাবুর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল দন্ত দিয়া

ঠোঁট কামড়াইতে লাগিলেন এবং ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধ থেকে সজোরে সাহেবের বক্ষঃস্থলে এমন একটি পদাঘাত করিলেন, বেটা বেনার বোঝার ন্যায় ধপাৎ করিয়া চিত হইয়া পড়িল।'৭৩

'বৃকোদরের' ভূমিকা এই পর্যন্তই। এর পরে আত্মরক্ষার যে কৌশল দরকার, যে চাতুর্যের প্রয়োজন, নবীনমাধব তা' নিলেন না। ফলে, তার জন্য চরমমূল্যও দিতে হল নবীনমাধবকে। আর সে মূল্য হল, মৃত্যুর হাতে নিশ্চিত আত্মসমর্পণ।

নবীনমাধবের চরিত্রের ঐ দুর্বলতাই হল তাঁর বৈশিষ্ট্য। তথাকথিত সভ্য রুচি এবং মানবিক সত্যের প্রতি আস্থাই তাঁর একমাত্র পতনের কারণ। 'অ্যামবিশান' যদি ম্যাকবেথের ট্রাজেডির কারণ হয়ে থাকে, দীর্ঘসূত্রিতা যদি হয় 'হ্যামলেটে'র পতনের মূল, তা' হলে ঐ দৃষ্টিতে নবীনমাধবের ট্রাজেডির উৎসে আছে মানুষের শুভবুদ্ধির প্রতি তার অগাধ ও অপরিমেয় বিশ্বাস। তাই 'বৃকোদরে'র ভূমিকা তার নয়, তার ভূমিকা হল যুধিষ্ঠিরের। বা পরবর্তী কালের কথা ভেবে বলতে গেলে বলতে হয়, গান্ধীজীর আর্বিভাবের ইশারা যেন এই নবীনমাধবের মধ্যে হযেছে প্রতিফলিত। তাই এই চরিত্রটি নায়ক হিসাবে তথা কথিত ভাবে ব্যর্থ হলেও, তাত্ত্বিক দিক থেকে সে হতে পেরেছে সার্থক, হতে পেরেছে নূতন তাৎপর্যবাহী।

নবীনমাধবের পাশে দুটি গৌণ চবিত্র আছে, একটি বিন্দুমাধব অপরটি সাধুচরণ, যারা নবীনমাধবের আলোকেই আলোকিত হয়েছে বলা যায়। সমালোচকের চোখে বিশ্লেষণ করলে অনুভব করা যায় যে এরা যেন নবীনের দুটি সত্তা—একটি আধুনিক মানবিকতায় বিশ্বাসী, অন্যটি চিরায়ত শান্ত বাঙালী। 'নব জাগরণে'র কল্যাণে উনিশ শতকের মাঝামাছি সময়ে আমরা কিছু বাঙালী তরুণকে পেয়েছিলাম, যাঁরা পশ্চিমী সভ্যতায় আলোকিত হযেও তথাকথিত ভারতীয় আদর্শের প্রতি ছিলেন সবিশেষ আস্থাশীল এবং যাঁরা মনে-প্রাণে দেশের কল্যান সাধনে ছিলেন নিবেদিত-প্রাণ। নাট্যকার দীনবন্ধু নিজেও অনেকটা এই রকমের ছিলেন। স্রষ্টার এই বিনম্র ব্যক্তিত্বের ছায়া 'নীলদর্পণে'র বিন্দুমাধবের ওপর যে পড়েছে, এ কথা নতুন করে বলবার অপেক্ষা রাখে না। ইউরোপীয় মানুষদের ওপর বিন্দুমাধবের আস্থা সুপ্রচুর, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ গভীরতর, আর স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর উৎসাহ অপরিসীম। সরলতা-কে 'বঙ্গভাষার সেক্ষপীয়ার' পড়ানোর জন্য তাঁর আগ্রহ যে কতখানি, তা' ইতিপূর্বে একধিকবার

হয়েছে আলোচিত। 'নবজাগরণে'র পরিপ্রেক্ষিতে এই চরিত্রটির মূল্য অনেকখানি হলেও, শিল্পমূল্যে চরিত্রটি যে নিতান্তই তুচ্ছ, একথা বলা বাহুল্যমাত্র।

সাধুচরণ চরিত্র প্রসঙ্গে ঠিক এই কথাগুলিই সবিশেষ প্রযোজ্য। রক্তমাংসের দেহ ও হৃদয়ের স্পন্দন সাধুচরণের ভেতর আবিষ্কার করা কঠিন। যদিও সে কৃষক পরিবারের সন্তান, কিন্তু তার যোগ মাটির সঙ্গে নয়, তার যোগ অপেক্ষাকৃত ওপরতলার সমাজের সঙ্গে। কেমন যেন এক কৃত্রিম ভূমিকায় বৃত রাখতে লেখক এই সাধুচরণকে সৃষ্টি করেছেন। সে ওপর মহলেরও না, আবার নিচের মহলেরও না, জন্মলগ্ন থেকেই সে যেন ত্রিশঙ্কু। সাধুচরণ কেবল চলাফেরায় বা মেলামেশায় যে কৃত্রিম জীবন যাপন করে তাই নয়, সংলাপের দিক থেকেও সে অনুরূপ ত্রিশঙ্কু। তার বাচন-রীতিতে বিরক্ত হয়ে দেওয়ান গোপীনাথ বলেছে, 'সাধু, তোর সাধু ভাষা রাখ, চাষার মুখে ভাল শুনায় না, গায়ে যেন ঝাঁটার বাড়ি মারে'।[৭৪] কেবল গোপীনাথ নয়, কুঠির আমিনও বলেছে, 'বেটার ভাই মরে লাঙ্গল ঠেলে, উনি বলেন 'প্রতাপশালী—।'[৭৫] যদিও কুঠিয়াল নীলকরদের তরফ থেকে উচ্চারিত হয়েছে এই অমার্জিত সংলাপগুলি, কিন্তু আমরা যেন ভুলে না যাই, এর ভেতর দিয়ে এই তার চরিত্রের কৃত্রিমতাটুকু কত সহজেই না হয়েছে উন্মোচিত! তবে একথাও বিবৃত হওয়া দরকার, নাট্যকার দীনবন্ধুর এক আধটি সহানুভূতির তুলির টানে মাঝে মাঝে সে রক্তমাংসের মানুষও হতে পেরেছে। এরকম দুটি মুহূর্ত অন্ততঃ আমরা দেখতে পাই। ক্ষেত্রমণি যে এই কৃষক সাধুচরণেরই কন্যা একথা যেন আমরা ভুলে না যাই। ক্ষেত্রমণির পীড়িত হওয়ার সংবাদ পেয়ে ব্যথায় ভেঙে পড়ে সে বলে উঠেছে, 'বড়বাবু মাকে গিয়ে কি দেখতে পাব, আমার যে আর নাই'।[৭৬] একদিকে কন্যার জন্য তার এই বুকভাঙ্গা কান্না, অপরদিকে গোলোক বসুর জন্য অপরিসীম বেদনাবোধ তাকে কৃত্রিমতার নির্মোক ছিন্ন করে অনেকখানি মানবিক করে তুলেছে। গোলোকবসুর জেলে যাওয়া দেখে সে নিজেও যেতে চেয়েছে জেলে। এবং এ বিষয়ে তার স্বীকারোক্তি এই রকম: 'আমি চুরি করি, আপনারা আমাকে চোর বলে ধরে দেন, আমি একরার করিব, তাহলেই আমাকে জেলে দেবে, আমি সেখানে কর্তা মহাশয়ের চাকর হয়ে থাকিব।'[৭৭] এ সব সংলাপ যে যথার্থ জীবনের পরিচিতি বাহক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে সংলাপ ছাড়া, অন্ততঃ দু' একটি ঘটনাতেও সে যে জীবন্ত, তারো প্রমাণ আছে। আহত নবীনমাধবের শয্যাপার্শ্বে ও ক্ষেত্রমণির মৃত্যু দৃশ্যে-সাধুচরণের যে

পরিচয় দেখা যায়, তা' কেবল মানবিক গুণে অম্বিত নয়, শিল্প ধর্মেও অনন্ত।

আংশিক উৎকর্ষে নয়, 'নীলদর্পণ' নাটকে সর্বতোভাবে যে চরিত্র সার্থক, সে' হল, 'তোরাপ'। নীল-আন্দোলনের নায়ক 'মেঘা'র সঙ্গে যে তার মিল আছে, এ তথ্য পূর্বেই নিবেদন করা হয়েছে। কিন্তু 'মেঘা'র প্রকৃত ভূমিকা কী ছিল, এ সম্পর্কে খুঁটিনাটি তথ্য পাওয়া যায় না। তাই তার সঙ্গে কতখানি মিল ও অমিল বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে তা' বলা সম্ভব নয়। তবে যে কথা সহজেই বলা যায়, তা'হল, তোরাপের মতন নাটকীয় এবং জীবন্ত চরিত্র কেবল 'নীলদর্পণে' কেন, সব নাটকেই দুর্লভ। যে-কোনো শ্রেণীর শিল্পীর কাছে সে ঈর্ষাযোগ্য।

তোরাপ জাতিতে মুসলমান। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'র হানিফের সে উত্তর-সুরী।—তবে তেজস্বীতা বা সাহসিকতায় 'নীলদর্পণে'র তোরাপ, মধুসূদনের হানিফের থেকে অনেক প্রাণচঞ্চল এবং সংঘাতের নায়ক হিসাবে অনেক সক্রিয়। নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে তার সঙ্গে আমাদের প্রথম দেখা। 'বেগুনবেড়ে'র কুটির গুদামঘরে আরো চারজন রায়তের সঙ্গে সে তখন আবদ্ধ। গোলোক বসুর বিরুদ্ধে মিথ্যে সাক্ষী দেবার জন্য তাদের ধরে এনে রেখেছে কুঠিয়াল নীলকরেরা। মিথ্যার প্রতি এই রায়ত তোরাপের ভীষণ ঘৃণা। পারস্পরিক আলাপ কিছুদূর এগোতে-না-এগোতেই তোরাপ কবুল করেছে, '…মুই নেমোখ্যারামি কত্তি পারবো না—যে বড়বাবুর জন্যি জাত বাচেচে, যার হিল্লেয় বস্তি কত্তি নেগেছি, যে বড়বাবু হাল গোরু বেঁচ্য়ে নে ব্যাড়াচ্চে, মিত্যে সাক্ষী দিয়ে সেই বড়বাবুর বাপকে কয়েদ করে দেব? মুহ তো কখনুই পারবো না—জানকবুল।' [৭৮] অর্থাৎ জান কবুল, মিথ্যেকথায় যে অক্ষম, তার নাম হল, তোরাপ।—এরকম যার চরিত্র, তার সঙ্গে নীলকরদের বিবাদ যে অবশ্যম্ভাবী, একথা সহজেই অনুমেয়। কেবল বিবাদ নয়, নীলসাহেবদের প্রতি রায়ত তোরাপের ভীষণ ঘৃণা। এই সাহেবদের কথায় সহজেই সে উত্তেজিত হয়ে পড়ে, আর এই উত্তেজনা তার সংলাপের ভেতর দিয়ে যখন প্রকাশিত হয়, তখন প্রায়শই শ্লীলতার মাত্রা অতিক্রম করে। নীলসাহেবদের কথায় প্রথম রায়ত যখন উডসাহেবের স-বুট পা এবং স-পেরেক বুটের কথা বর্ণনা করছিল সবিস্তারে, তখন তোরাপ দাঁত কিড়মিড় করে উত্তেজিত হয়ে বলে উঠেছে, 'ছুত্তোর প্যারেকের মার প্যাট করো্য, লৌ দেখে গাড়া মোর ঝাঁকি মেরে ওট্‌চে। উঃ কী বলবো, সমিন্দিরি অ্যাকবার ভাতারমারির মাটে

পাই, এম্‌নি থাপ্পোর ঝাঁকি, সমিন্দির চাবালিডে আস্‌মানে উড়্‌য়ে দেই, ওর গ্যাডব্যাড করা হের ভেতর দে বার করি।' ৭৯ সংলাপে তোরপ যে অশালীন, এবিষয়ে কোনো সংশয় নেই। ব্যবহারিক জগতে সে যে আরো অশালীন, নাটকের শেষের দিকে তারো প্রমাণ আছে। তবে একথাও জেনে রাখা দরকার যে সে অবস্থা বুঝে কৌশল অবলম্বন করতে জানে। তার দুর্বার প্রাণশক্তিকে যদি পশুশক্তির সঙ্গে তুলনা করতে হয়, তবে বলতে বাধা নেই, এই পশু সভ্য নবীনমাধবের মত দাঁড়িয়ে মার খেতে প্রস্তুত নয়। এ সব ব্যাপারে নায়কের থেকেও তার বাস্তববুদ্ধি প্রখর। শত্রুপক্ষের বাধা যেখানে দুর্লঙ্ঘ্য, এবং তাদের শক্তি যেখানে অপরিমেয়, সেখানে নির্বোধের মত মার খাওয়ার থেকে সাময়িক আত্মসমর্পণ যে অধিকতর উপযোগী এবং তা' যে অবশ্য পালনীয়, 'নীলদর্পণে' একমাত্র তোরাপের আচরণ থেকেই তা' শেখা যেতে পারে। দেওয়ান গোপীনাথের চোখে 'নেড়ে বেটা ভারি হারামজাদা' এবং রোগসাহেবের সম্ভাষণে 'শূয়ার কি বাচ্চা' সে হতে পারে, কিন্তু প্রয়োজনীয় আপোসে সে যে কত কৌশলী তা এই নিয়ে উদ্ধৃত সংলাপ থেকে বোঝা যাবে,

'গোপী। এরা সব দোরোস্ত হয়েছে। এই নেড়ে বেটা ভারি হারামজাদা,
বলে নেমকহারামি করিতে পারিব না।

তোরাপ। (স্বগত) বাবা রে! যে নাদনা, অ্যাকন তো নাজি হই, ত্যাকন যা
জানি তা কর্‌বো। (প্রকাশে) দোই সাহেবের, মুইও সোজা হইচি।

রোগ। চপরাও, 'শূয়ার কি বাচ্চা! রামকান্ত বড় মিষ্টি আছে।
(রামকান্তঘাত এবং পায়ের গুঁতা)

তোরাপ। আল্লা! মাগো গ্যালাম, পরাণে চাগা এট্টু জল দে, মুই পানি
তিসেয় মলাম, বাবা, বাবা, বাবা—

রোগ। তোর মুখে পেসাব করে দেবে না? (জুতার গুঁতো)

তোরাপ। মোরে যা বলবা মুই তাই কর্‌বো—দোই সাহেবের, দোই
সাহেবের, খোদার কসম।'

[দ্বিতীয় অঙ্ক: প্রথম গর্ভাঙ্ক]

তোরাপের সংলাপের এক জায়গায় আছে, পাঁচদিন চোরের একদিন সাধুর। পাঁচদিন খাওয়ালে, একদিন খেতে হয়। তোরাপের কথার যাথার্থ্য প্রমাণিত হয়েছে। ঐ অপমান জনক ঘটনার পর তোরাপও একদিন সুযোগ পেয়েছে প্রতিশোধ নেবার। যে-রাতে ক্ষেত্রমণিকে রোগসাহেব নিজের কামরায় নিয়ে এসেছিল তার ধর্মনাশের জন্য, সেই রাতে ঠিক নাটকীয়

মুহূর্তটিতে জানালার খড়খড়ি ভেঙ্গে নবীনমাধবের সঙ্গে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধারের জন্য যে লাফিয়ে পড়েছিল সাহেবের ঘরে, সে হল এই তোরাপ। নবীনমাধব ঐ রোগ-সাহেবকে সাধুভাষায় যখন কিছু ধিক্কারের কথা শোনাচ্ছিল, তোরাপ তা' ঠিক পছন্দ করে নি, সে তার প্রাকৃতভাষায় চিৎকার করে উঠেছিল, 'বড়বাবু, সমন্দির কি মান আছে তা ধরম কথা শোনবে, ও ঝ্যামন কুকুর মুই তেমনি মুগুর, সমিন্দির ঝ্যামন চাবালি, মোর তেমনি হাতের পোঁচা (গলদেশ ধরিয়া গালে চপেটাঘাত) ডাকবি তো জোরার বাড়ী যাবি (গাল টিপে ধরে) পাঁচদিন চোরের একদিন সেদের, পাঁচদিন খাবালি একদিন খা (কানমলা)।' ৮০

এমন অবাধ সুযোগে তোরাপের পীড়ন যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারত, এমন কী গোপন খুনও যে অসম্ভব ছিল না, তা' এই 'কানমলনে'র ঘটা দেখেই বোঝা যায়। কিন্তু তোরাপ তা' করে নি। আর তা' সে করে নি একটি মাত্র কারণে। মানুষের সহজাত সততায় তোরাপ ছিল বিশ্বাসী। নিজেকে সংশোধন করবার একটি সুযোগ সে দিয়েছিল সাহেবকে। কিন্তু নামে ও চরিত্রে যে 'রোগ', সে নিজেকে পরিবর্তিত করবে কী করে? তাই 'ঝ্যামন কুকুর তেম্‌নি মুগুরে'র অভিনয় পরে আমাদের চোখের সামনে দেখতে হল। দাঁতের বদলে দাঁত এবং নাকের বদলে নাক ছিনিয়ে নেওয়ার আদিম তত্ত্বে তোরাপকে শেষবেশ হতে হল অনুপ্রাণিত।—সে এক আশ্চর্য নাটকীয় মুহূর্ত, গোলোকবসুর মৃত্যুর পর 'বসু পরিবারে' নেমে এলো শোকের ছায়া। পঞ্চাশ টাকা সেলামি দিয়ে নিজেদের বাড়ীর পুকুরের জল ব্যবহারের অনুমতি চাইতে গেলেন সাহেবের কাছে নবীনমাধব। কুটিয়াল সাহেব নবীনমাধবকে নিয়ে নির্মম কৌতুক করে বলল, 'যবনের ছেলে চোর ডাকাইতের সঙ্গে তোর পিতার ফাঁস হইয়াছে, তার শ্রাদ্ধে অনেক ষাঁড় কাটিতে হইবে, সেই নিমিত্তে টাকা রাখিয়া দে'।—৮১ না, এই নিষ্ঠুর ব্যঙ্গোক্তিতেও সাহেব ক্ষান্ত হন নি, স-বুট পা এর পরেই নবীনচন্দ্রের হাঁটুতে তুলে দিয়ে বলেছিল, 'তোর বাপের শ্রাদ্ধে ভিক্ষা এই।'—৮২ সহিষ্ণুতারও সীমা আছে। ঐ অপমানে, খুব স্বাভাবিক ভাবেই নবীনমাধবের চোখ হয়ে গিয়েছিল লাল, গা উঠেছিল কেঁপে, অক্রোধ নবীন সংযম হারিয়ে এরপরে সজোরে একটি লাথি বসিয়ে দিয়েছিল সাহেবের বুকে।—কয়েক মুহূর্তমাত্র বিরতি। এলো সাহেবের আক্রমণ। উদ্যত তরবারি উঠল ঝিলিক দিয়ে। নবীনকে বাঁচাবার জন্য বুনো মহিষের মতন ঝাঁপিয়ে পড়ল তোরাপ। ভয়ঙ্কর একটি আঘাত থেকে নবীন বাঁচলেও, বাঁ-হাত কাটা গেল তোরাপের। এরপর সাধুচরণের ভাষায় তোরাপের ক্রিয়া ছিল এইরকম,

'ছোট সাহেব উহার হস্তে তলোয়ার মারিলে পর, লেজ মাড়িয়ে ধরলে বেঁজী যেমন ক্যাচ ক্যাচ করিয়া কামড়ে ধরে, তোরাপ জ্বালায় চোটে বড় সাহেবের নাক্ কামড়ে লইয়ে পালাইয়াছিল।'—৮৩ অর্থাৎ কুঠিয়াল নীলকরদের অত্যাচার-উৎপীড়ন তোরাপের ভেতর থেকে সেই আদিম মানুষটিকে টেনে বার করে দিল, যে আদিম হিংসার সত্যে বিশ্বাসী। তবে 'খোদার জীব'-কে 'পরাণে' মারবার পরিকল্পনা যে ছিল না, তোরাপ তাও কবুল করেছে।

> তোরাপ। নাক্‌টা মুই গাঁটি গুঁজে নেকিচি, বড বাবু বেঁচে উটলি ভাখাবো,
> এই দেখ (ছিন্ন নাসিকা দেখন) বড় বাবু যদি আপনি পলাতি পাত্তেন,
> সমিন্দির কান দুটো মুই ছিঁড়ে আনতাম, খোদার জীব পরাণে মাত্তাম না।'
>
> [পঞ্চম অঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

এই হল তোরাপ। এমন সরল, অনুগত, শক্তিমান, শিশুমনের চরিত্র এবং জীবন্ত চরিত্র কেবল বাঙলা সাহিত্যে কেন, যে-কোনো সাহিত্যে দুর্লভ। সুতরাং এর স্রষ্টা হিসাবে দীনবন্ধুর সব গৌরবই যে পাওনা, তাতে আর সংশয় কী!

এই 'নীলদর্পণে'ই তোরাপের অনুরূপ আরেকটি চরিত্র আছে, সে চরিত্রটি হল রাইচরণ। সাধুচরণের ছোট ভাই হল রাইচরণ। রাই ভাই হলে কী হয়, চারিত্র-গুণে সে সাধুচরণের একবারে বিপরীত। সে মাঠে চাষ করে নিজের হাতে, সুতরাং খাঁটি চাষার আদলেই তাকে চিত্রিত করেছেন নাট্যকার। তার মানবিক দিকগুলি তীক্ষ্ণ, অধিকতর প্রখর। কৃষক হিসাবে জমির ওপর অনুরাগ তার গভীর। 'সাঁপোলতলা'র পাঁচকুড়ো ভুঁইয়ে যখন নীলের দাগ পড়ে, তখন তার বিচলিত অবস্থা দেখবার মতন। আবার ঠিক অনুরূপ অবস্থাই দেখা যায়, যখন ক্ষেত্রমণির কাছে পদীর প্রস্তাবের কথা সে শোনে। নীল ও পদী উভয়ের ওপরেই তার সমান ক্রোধ। ক্রোধে ও সারল্যে সে শিশুর মতনই আবার অসংযত। পদীর প্রসঙ্গে তার সংলাপ হল, 'দাদা না ধল্লিই গোডার মেয়েরে দাম টাসা করেলাম, মেরেতো ফ্যালতাম, ত্যাকন্ না হয় ৬ মাস ফাঁসি যাতাম, শালি'। ৮৪

বর্তমান নাটকে এই রীতির আরো কয়েকটি চরিত্র আছে, তারা হল চারজন 'রায়ত'। এদের কারোর নাম দেননি নাট্যকার। 'প্রথম', 'দ্বিতীয়' এই ভাবেই রেখেছেন। সকলেই গ্রামের মানুষ, ভূমিহীন কৃষক। নামহীন এই মানুষগুলির ওপরেও নেমে এসেছে নীলের অত্যাচার। যদিও এরা খুব অল্প সময়ের জন্য নাটকে এসেছে, একটু খুঁটিয়ে দেখলে অনুভব করা যায়, তাই

বলে এরা কিন্তু স্বাতন্ত্র্য বর্জিত নয়।—প্রতিটি চরিত্র নাট্যকারের চোখে পৃথক। এবং এরা কতখানি পৃথক, একেকটিকে ধরে ধরে বিশ্লেষণ করলেই তা' অনুভব করা যায়। প্রথম রায়ত যে, সে ভীতু। গোলোক বসুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার জন্য তারা নীত হয়েছে যদিও, কিন্তু এই প্রথম ব্যক্তি বোঝে যে এই সাক্ষ্য দেওয়া খুবই নিমকহারামি, কিন্তু নীলকরদের প্রহার-ভয়ে সে ঐ নিমক-হারামিতেও পশ্চাৎপদ নয়। এই লোকটির ভেতর 'হিন্দু গোঁড়ামি'ও খুব প্রবল। যদিও তার হৃদয়ে মমতা-সহানুভূতি ইত্যাদি গুণগুলি একটু বেশিমাত্রায় দেখা যায়, কিন্তু তাই বলে, সে হিন্দুয়ানি বিসর্জন দিয়ে মুসলমান তোরাপকে কাঁধে নিয়ে ঐ সহানুভূতি- মমতা দেখাতে প্রস্তুত নয়। নাট্যকারেব কয়েকটি মাত্র সংলাপের আঁচড়ে এই ব্যক্তিত্ব চিহ্নিত।

দ্বিতীয় রায়ত অপেক্ষাকৃত রসিক, আর বেশ সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন। ফৌজদারিতে অভিযুক্ত হয়ে একদা তাকে অন্তরীন থাকতে হয়েছিল আন্দারবাদে। সে সময় ফৌজদারি আদালতে দুটি মোক্তারের লড়াই দেখে সে যা মজা পেয়েছিল, তার সরল বর্ণনা বর্তমান নাটকে পাওয়া যায়। আর সে যে কতখানি রসিক, ঐ বর্ণনায তার প্রমাণ মেলে। সাহেবদের জুতোর তলায় যে পেরেক থাকে, এ তারই আবিষ্কার।

তৃতীয রায়ত ভূতের ভয় খায়, আবার সে স্ত্রৈণও। ভূতের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য সে যে-কোনোও দেবতা-অপদেবতার শরণ নিতে প্রস্তুত, তা' তিনি রাম-কালী-দুর্গা-গনেশ-অসুর যেই হোন-না-কেন! আর স্ত্রীর কথা এই রাযতটির মুখে মুখে।

চতুর্থ রায়তের চিত্রটি মাত্র স্বল্প কয়েকটি রেখায় আঁকা। ভিন্ন গ্রামের রায়ত সে। স্বরপুরে আসবার পর নবীন বসুর কথা শুনে ঝেড়ে ফেলল নীলের চাষ। আর তারপর থেকেই তার বিপত্তি। কিন্তু ঐ বিপদ সত্ত্বেও নবীনমাধবের ওপর তার বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অগাধ। নবীনের কথা বলতে গিয়ে কেমন যেন সে রোমান্টিক হয়ে যায়, 'আহা, কি দয়ার শরীল, কি চেহারার চটক, কি অবপরবরূপী দেখেলাম, বসে আছেন য্যান গজেন্দ্রগামিনী।' [৮৫]

মোটকথা, 'নীলদর্পণের' বিশ্লেষণান্তে এ সিদ্ধান্তে আশা কঠিন নয় যে, ওপর মহলের চরিত্র-চিত্রণে দীনবন্ধুর সামান্য কিছু ব্যর্থতা থাকলেও, নিচু মহলের চরিত্র অঙ্কনে তিনি আশ্চর্যভাবে সফল। নাটকের স্ত্রী চরিত্র রচনায় নাট্যকারের প্রতিভা সমান সক্রিয় কী না, তাও একবার বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। তবে আগে ভাগে একটি প্রয়োজনীয় কথা স্বীকার করে

নেওয়া ভালো, পুরুষ চরিত্রগুলির মতন ওপর-মহলের স্ত্রী-চরিত্রগুলিও বর্তমান নাটকে নাট্যকারের হাতে ভালোভাবে খেলে নি। সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী ও সরলতা এ জাতীয় চরিত্রের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

সাবিত্রী 'আদর্শ গৃহিণী' হিসাবে চিত্রিত। গত শতকের বাঙালী পরিবারে গিন্নিরা যেমন ছিলেন, সাবিত্রী তাদের থেকে কোনো অংশে কম ছিলেন না। বরং মায়া মমতা, দেবসেবা, অতিথি-সেবা এবং স্নেহপরায়ণতায় সাবিত্রী একটু বেশি রকম বাঙালী ছিলেন। ইনি ছিলেন আদর্শ মা, আদর্শ শাশুড়ী, আবার সেই সঙ্গে আদর্শ গৃহকর্ত্রী। গভীর স্নেহে সকলকে তিনি কাছে টেনে রেখেছিলেন। কেবল স্নেহ নয়, বুদ্ধিবৃত্তিতেও ইনি ছিলেন প্রখর, আর সমসাময়িক কাল সম্পর্কে সজাগ। ক্ষেত্রমণির ওপর সাহেবের নজর পড়েছে শুনে ইনি রেবতীকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, 'মগের মুল্লুক আর কি! ইংরেজের রাজ্যে কেউ নাকি ঘর ভেঙ্গে মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে![৮৬] —কেবল আশ্বাস নয়, আপদে-বিপদে তিনি ছিলেন সকলের আশ্রয়। গোপীনাথের কাছে একজন গোপ যা বলেছে, তা' এইরকম, 'মা ঠাকরুণ যে পিরতমির মধ্যে কারে ভাল না বাসেন, তাও তো দেখ্‌তি পাইনে। আ! মাসী যেন অন্নপুন্নো ?[৮৭] অন্নপূর্ণা যে অভয়দাত্রীও হন, তার প্রমাণ হলেন এই সাবিত্রী। চূড়ান্ত দুঃখের মুহূর্তেও ইনি সাহসে বুক বাঁধতে সক্ষম। গোলোক বসুর মতন সাবিত্রী যে বিপর্যস্ত নন, তা' নবীনের সংলাপেই স্বীকৃত, 'মাতা আমার পিতার ন্যায় ভীতা নন, তাঁহার সাহস আছে, তিনি একেবারে হতাশ হন না।'[৮৯]—এত গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, সুখের অধিকারী তিনি হতে পারলেন না। নীল-উৎপীড়নের সব আঘাতটা তাঁর ওপরেই সব থেকে বেশি করে পড়ল। এবং এত বেশি পরিমাণে পড়ল যে তাঁর চিত্ত-বিকার দেখা দিল। পতি-পুত্র শোকে তাড়িতা সাবিত্রীর উন্মাদিনী অবস্থাটি ভয়ঙ্কর, কখনো কখনো নাটকীয়, তবে বেশির ভাগ সময় অতি-নাটকীয়। ঐ অতি নাটকীয় মুহূর্ত্তগুলিতে নাট্যকার সাবিত্রীর সব রকম ক্রিয়াকর্ম প্রায় মনোবিকলনের সাহায্যেই ঘটিয়েছেন, সুতরাং শিল্পীর সেই নিপুণতাকে স্বীকার করেই নিতে হয়।

গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধায় যে আদর্শ স্থানীয়া, স্বামীর প্রতি ভালোবাসায় যে একান্ত অনুগতা এবং সরলতার প্রতি স্নেহে যে মাতৃসমা, 'নীলদর্পণ' নাটকে চিত্রিত সে চরিত্রটি হল 'বসুপরিবারের' জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ সৈরিন্ধ্রী। 'বসুপরিবারে'র সুখের সংসার কতখানি ভরে ছিল, তা' দেখাবার জন্যই

নাট্যকার সম্ভবতঃ এ জাতীয় চরিত্র এঁকেছেন। স্নেহে-ভালোবাসায়, কর্তব্যে ও দায়িত্বে সৈরিন্ধ্রী কতখানি নিপুণ, তার পরিচিত 'নীলদর্পণে'র নানা জায়গায় আছে ছড়ানো। সৈরিন্ধ্রী যে তার ছেলে বিপিনের মতনই ভালোবাসে সরলতাকে, একথা নাটকে বহু-কথিত। স্বামীর প্রতি তার অনুরাগের কথা প্রশ্নাতীত, সংসারের দুর্দিনে আদর্শ স্ত্রীর মতনই সব স্বর্ণালঙ্কার সে বন্ধন দেবার জন্য তুলে দিয়েছে স্বামীর হাতে।—তবে এত সত্বেও শিল্পের বিশ্লেষণে এ চরিত্রটি শেষপর্যন্ত যে সার্থক হতে পারেনি, তার কারণ চরিত্রটি যথেষ্ট জীবন্ত নয়। চরিত্রটির পিছনের কিছু তথ্য রয়ে গেছে নেপথ্যে। রয়ে গেছে একান্ত গোপন। জীবন্ত না-হওয়ার পক্ষে এটি একটি বিশেষ ত্রুটি। এ ত্রুটি আরো প্রকট হয়ে যায় যখন সৈরিন্ধ্রীর সংলাপে বিদ্যাসাগরীয় সাধুভাষার প্রয়োগ করেন নাট্যকার। তবে কেবল এ-জাতীয় বাহ্যিক ত্রুটি নয়, চরিত্রটির মূল পরিকল্পনাতেও সামান্য অসঙ্গতি চোখে পড়ে। নাটকের শেষে দেখা যায়, পুত্র বিপিনের জন্যই সৈরিন্ধ্রীকে বাঁচতে হল শেষ পর্যন্ত। নতুবা সে যে নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করে নিত, সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। টেনিসনের সেই বিখ্যাত সঙ্গীতটির স্মৃতি মনে পড়ে যেতে পারে, যখন একটি বধূর সামনে তার যোদ্ধা স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে আসা হল। পুত্র বিপিনের জন্যই যে এ বধূকে বাঁচতে হল, আমাদের জিজ্ঞাসা, তার জন্য যথেষ্ট মানসিক প্রস্তুতি কোথায়? অন্ততঃ ঐ রকম নাটকীয় ঘটনা-বিন্যাস, যা সৈরিন্ধ্রীকে এই নীল-কাহিনীর প্রকৃত নায়িকা বলে পরিচিত করাতে পারত।—নাটকের এক-আধটি বিচ্ছিন্ন সংলাপের ভেতর দিয়ে জানা যায় সৈরিন্ধ্রীর পিতৃকুলের মধ্যেও এরকম একটি নীল-যন্ত্রণার ইতিহাস ছিল লুকিয়ে। 'বসু-পরিবারে'র থেকে সে যন্ত্রণা কিছু কম ছিলনা। দুঃখের ব্যাপার এই, নাট্যকার এ যন্ত্রণার কিছুই কাজে লাগাতে পারেন নি। অথচ যোগ্যতার সঙ্গে প্রকাশিত হলে ঐ চরিত্রটির ভেতর অন্যরকম এক জীবনস্পন্দ আমরা পারতাম অনুভব করতে। এইভাবে বিশ্লেষণ করলে অনুভব করা যায় যে অনেক সম্ভাবনা থাকলেও, নাট্যকারের উপেক্ষায়, শেষপর্যন্ত চরিত্রটি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে।

বড় বৌ-এর মতনই ছোটো বৌয়ের অবস্থা। ছোটো বৌয়ের নাম, সরলতা। বাড়ির সকলের সে স্নেহধন্যা। আর সর্বদা'ই সে হাসিখুশিতে ভরা। সৌন্দর্যের ও সুখের সরোবরে প্লবমান সে যেন এক পদ্ম। সাবিত্রী বলেছেন, 'আহা! মার আমার রক্তকমলের মত রং।'[৮৯] সৈরিন্ধ্রী বলেছেন, 'মুখখানি যেন পদ্মফুল, সর্বদাই হাস্যবদন।'[৯০] যাই হোক, সব খবরের খোশ

খবর হল এই, ঐ হাস্যময়ী সরলতা সেকালের তুলনায় বেশ কিছুটা লেখাপড়া জানে। ছিল শিক্ষানুরাগ। এবং ঐ শিক্ষানুরাগের কারণেই বিন্দুমাধবের সঙ্গে হয়েছে তার বিবাহ। এ জন্য পাড়াগাঁয়ের দূরত্ব ও অসুবিধাকে বাধা বলে গণ্য করা হয়নি। এই শিক্ষার ব্যাপারটি গণনীয় না হলে অনায়াসেই বলা যায় যে শহরের আরো ভালো পাত্রে সে হতে পারত সমর্পিতা। একজন গোপ প্রমুখাৎ যা জানা যায়, তা এই রকম: 'ছোটবাবুর শ্বশুর গার মান বড়, গারনাল সাহেব টুপি না খুলে এস্‌তি পারে না। পাড়া গাঁয় ওরা কি মেয়ে দেয়? ছোটবাবুর ন্যাকাপড়া দেখে চাসা গাঁ মানলে না।'[৯১] বলে রাখা ভালো, এই 'চাসা গাঁ'র ব্যাপারে সরলতারও কিন্তু কোনো মান-অভিমান ছিল না। গ্রামের পরিবেশকে মানিয়ে নেবার মতন মানসিক গঠন তার ছিল। সেই গ্রামের লোকেদের কাছেও সে একটি বিস্ময়, 'লোকে বলে সউরে মেয়েগুলো কিছু ঠমক মারা, আর ঘরো বাজারে চেনা যায় না, কিন্তু বসিগার বৌর মত শান্ত মেয়েতো আর চোকি পড়ে না, গোমার মা পত্যই ওনাদের বাড়ী যায়, তা এই পাঁচ বচ্ছোর বে হয়েছে একদিন মুখখান ছাখ্‌তি প্যালে না।'[৯২] ঘোমটার নিচে মুখখানি লুকিয়ে রাখলেও, আমরা যেন বিস্মৃত না হই, উনিশ শতকের 'নবজাগরণের নতুন বাণী সুদূর পল্লীগ্রামে এই জাতীয় তরুণীরাই এনেছিল বহন করে। এরা প্রতীকী চরিত্র। ঘটনামুখর নীল-কাহিনীর দিকে নাট্যকারের লক্ষ্য ছিল বলে, এ জাতীয় চরিত্রগুলি যথেষ্ট জীবন্ত হয়ে উঠতে পারেনি। সেই অর্থে সরলতাকে নাটকে উপেক্ষিতাও বলা যায়।

এই ভাবে বিশ্লেষণ করলে পুরুষ চরিত্রের মতন স্ত্রী-চরিত্রগুলির ব্যাপারেও আমাদের এই উপসংহারে আসা কঠিন নয় যে, ওপরের মহলের চরিত্রের থেকে নিচের মহলের চরিত্রগুলি অপেক্ষাকৃত প্রাণচঞ্চল এবং স্বয়ং নাট্যকারের কৃপাপুষ্ট। অন্ততঃ ক্ষেত্রমণির প্রসঙ্গে একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরেও কৃষকদের অবস্থা যে অনুমাত্র উন্নীত হয় নি, সেকালের এদেশীয় কাগজগুলিতে একথার প্রভূত সমর্থন পাওয়া যায়। এ দেশের জমিদারেরা বেশির ভাগই ছিলেন অত্যাচারী। আর এই অত্যাচার মূলতঃ ছিল কৃষকদের ওপর। এ সময়ের 'তত্ত্ববোধিনী'[৯৩] পত্রিকায় এজাতীয় প্রভূত অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত আছে। এখন এই অত্যাচারের সঙ্গে যুক্ত হল নীলকরদের অত্যাচার। নীলকরেরা স্বভাবে ছিল সামন্ততন্ত্রের এক কাঠি ওপরে। কেবল অর্থ শোষণ করেই এরা ক্ষান্ত রইল না, এরা এদেশীয় মেয়েদের

পবিত্রতা নষ্ট করবার জন্য প্রসারিত করল তাদের লোলুপ হস্ত।—'নীলদর্পণে'র ক্ষেত্রমণি এই লোভী নীলকরদের একটি অসহায় শিকার।

ক্ষেত্রমণি চরিত্র-পরিকল্পনার মূলে যে নদীয়ার কৃষক-কন্যা 'হরিমণি'র বাস্তব অস্তিত্ব জড়িয়ে ছিল, একথা আগেই বলেছি। কৃষক-কন্যা হরিমণির রূপের প্রসঙ্গে জানা যায়, সে ছিল 'ওয়ান অব দি বিউটিজ অব কৃষ্ণনগর।'[৯৪] ক্ষেত্রমণিও তাই। তার রূপে আকৃষ্ট হয়ে আমিন বলে উঠেছে, 'এ ছুঁড়ি তো মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তো লুপে নেবে।'[৯৫] কুট্টনী পদীও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে, 'এমন সোনার হরিণ মা নাকি প্রাণ ধরে বাঘের মুখে দিতে পারে!'[৯৬]

এই লাবণ্যময়ী ও সুন্দরী ক্ষেত্রমণি নিজের রূপ ও সৌন্দর্য সম্পর্কে উদাসীন। অসচেতন। প্রসাধন ও শৌখিনতা তার কাছে নিতান্ত বাহুল্যমাত্র। বিয়ের আগে 'সাপটা কেটে' চুল বাঁধায় তার অনুরাগ ছিল, কিন্তু বিয়ের পর ভাসুরের আপত্তিতে এই বিশেষ প্রসাধনটি পরিত্যাগ করতে তার একমুহূর্তও সময় লাগে নি।—অর্থাৎ অন্তরের সৌন্দর্যেও সে সৌন্দর্যময়ী ছিল বলে বাইরের প্রসাধনকে সে একান্ত বাহ্যিক বলে মনে করতে পেরেছে।

আপাতদৃষ্টিতে এই কৃষককন্যা সহজ, সরল ও নমনীয়। কিন্তু তাই বলে কোনো অন্যায়ের কাছেও সে নত হতে প্রস্তুত, এ ধারণা সর্বৈব মিথ্যা। পাপ-পুণ্য এই দুই ব্যাপারে তার ধারণা কিন্তু স্পষ্ট ও তীক্ষ্ণ।—পাপের প্রতি তার ঘৃণা প্রচণ্ড এবং সেখানে তার মনোভাব ভীষণভাবে অনমনীয়। সত্যের জন্য এই তরুণীকন্যা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। এ ব্যাপারে পদীকে সে যা বলেছে, সে কথাই চরম কথা, অর্থাৎ '… মুই পরাণ দিতি পারবো, ধর্ম দিতি পারবো না, মোরে কেটে কুচি কুচি কর, মোরে পুড়্য়ে ফেল, ভেস্য়ে দাও, পুঁতে রাখ, মুই পরপুরুষ ছুতি পারবো না, মোর ভাতার মনে কি ভাববে?'[৯৬] কুট্টনী পদী এর পরে, প্রলুব্ধ করেছে গোপনীয়তার আশ্বাস দিয়ে।'[৯৭] বলেছে, 'তোর ভাতার কোথায়, তুই কোথায়; কেউ জাস্তে পারবে না—এই রাত্রেই আমি সঙ্গে করে তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসবো।'[৯৮]

না, এই গোপনীয়তার আশ্বাস ক্ষেত্রমণিকে আশ্বস্ত করতে পারে নি, বরং তাকে তার নিষ্ঠায় আরো দৃঢ়-মনা করতে সহায়তা করেছে। লোক-সাহিত্যের নায়িকারা যেমন খল-নায়কদের আহ্বানে কখনো ধরা দেয়নি, বরং ওপরের দেবতার ওপর বিশ্বাস রেখে নিজেকে সত্যের পথে করছে পরিচালিত, ক্ষেত্রমণিও ঐ লোক-সাহিত্যের নায়িকাদের মতনই বলতে পেরেছে, 'ভাতারই

যেন জান্‌তি পারলে না—ওপরের দেবতা তো জান্তি পারবে, দেবতার চকিতো ধুলো দিতি পারবো না! আমার প্রাণের ভিতরতো পাঁজার আগুন জ্বলবে, মোর স্বামী সতী বল্যে মোরে যত ভালবাসবে, তত মোর মনতো পুড়তি থাকবে, জানাই হোক, আর অজানাই হোক, মুই উপপতি কত্তি কখনই পারবো না।'[৯৯]

এই আপোষহীন সত্যনিষ্ঠাই ক্ষেত্রমণির জীবনে এনেছে চূড়ান্ত সঙ্কট। সেই চরম মুহূর্তে যখন পদী তাকে হিংস্র রোগ সাহেবের হাতে সমর্পণ করে দিয়ে চলে গেল, তখন অসহায় কৃষককন্যা ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠেছে, 'ময়রা পিসি যাসনে, ময়রা পিসি যাসনে।'[১০০] তবে এই ক্ষীণ আর্তি খুবই সামান্যক্ষণের জন্য। কেননা, এর পরেই শশক-শাবক তুল্য পদীকে নৃশংস রোগের মুখোমুখি হল দাঁড়াতে। অর্থাৎ ছবিটা এইরকম দাঁড়াল, একদিকে সশঙ্ক শশক শিশু এবং অন্যদিকে আক্রমণে উদ্যত নৃশংস ও হিংস্র একটি জন্তু। একদিকে ফুলের মত কোমল একটি প্রাণ, অন্যদিকে ভয়ঙ্কর নখদন্তধারী একটি পাশব লালসা। নিশ্চিত বিশ্বাসের সারল্যে যে আজন্ম লালিত, জীবনের নির্মম ও কঠোর দিক যে কখনো দেখে নি, নির্বোধ স্নেহে যার হৃদয়-মন আশৈশব প্লাবিত, সে যখন হঠাৎ এই রুক্ষ নিষ্করুণ লোলুপতার মূর্তি দেখতে পেল, তখন বিমূঢ় হওয়া ছাড়া, তার আর উপায় কোথায়? শশক-শাবকেরও নখদন্ত আছে, কিন্তু তা' যে তার প্রাণের মতই কোমল। ফুলের মতনই নরম। তাই ফুল বজ্র হতে পারল না।[১০১] অজগর সাপের মুখে ক্ষীণপ্রাণা পক্ষীমাতা যেমন নিতান্ত নিষ্ফল আর্ত চীৎকার ও অসহায় নখরপাতে সংগ্রাম করে, ক্ষেত্রমণিও তাই করল। কৃষককন্যার আদিম রক্তে যে আরণ্য উত্তেজনার সঞ্চার হল, তা' অভিব্যক্ত হল অসহায় ভর্ৎসনায়, '—ও গুখেকোর বেটা, আটকুড়ির ছেলে, তোর বাডী যোড়া মরা মর্যে, মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি, তোর হাত মুই এঁচড়ে কেমড়ে টুকরো টুকরো করবো, তোর মা, বুন নেই তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে না, দেঁড়্যে রলি ক্যান্, ও ভাই ভাতারীর ভাই, মার্ না, মোর প্রাণ বার কর্যে ফ্যাল না; আর যে মুই সইতে পারি নে।'[১০২]

অজগরের উদ্যত আক্রমণের সামনে ক্ষীণপ্রাণা পক্ষিমাতার এই আর্ত-চিৎকার যে নিতান্তই নিষ্ফল, তা' পুনরুক্ত করা বাহুল্যমাত্র। বঙ্কিম-কথিত 'গ্রাম্য প্রদেশের ইতর লোকের কন্যা' ক্ষেত্রমণির চরম লাঞ্ছনা এর পরেই ঘটল। 'নীলদর্পণ' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক এই ভয়ঙ্কর ঘটনার

শিল্পরূপ হিসাবে যে অসাধারণ মহিমা লাভ করেছে, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এই সব ব্যাপারের মূলে রয়েছে ক্ষেত্রমণি। না, কোনো অন্তর্নিহিত জটিলতার জন্য নয়, ক্ষেত্রমণি অসাধারণ হয়েছে তার গুণে। এমন মানবিক রস-সমৃদ্ধ চরিত্র বাঙ্‌লা-সাহিত্যে কেন, যে-কোনো মহৎ সাহিত্যেও দুর্লভ বলা যায়। মোহিতলাল লিখেছেন, 'আমার মনে হয়, সমগ্র বাঙ্‌লা সাহিত্যে এমন স্বভাবাঙ্কণ কুত্রাপি নাই।'[১০৩]

এই ক্ষেত্রমণির মত ক্ষেত্রমণির জননী 'রেবতী' চরিত্রটিও বর্তমান নাটকে জীবন্ত ও সুচিত্রিত। এবং ক্ষেত্রমণির মতই মানবিক রসে সমৃদ্ধ। এই কৃষক বধূর সংসারটি তারই কল্যাণস্পর্শে লাভ করেছে শ্রী ও সমৃদ্ধি। সংসারে যেদিন নীলের করাল ছায়া দেখা দিয়েছে, সেদিন থেকেই সে উৎকণ্ঠিত। কন্যা ক্ষেত্রমণিকে নিয়ে সে আসন্ন বিপদের কথা জানাতে এসেছে 'বসু-পরিবারে।' দুর্ভাগ্যক্রমে, বিপদে ঠেকানো যায় নি। তবে বিপদে পড়লেও এই কৃষকবধূই শেষ পর্যন্ত বুদ্ধিকে রাখতে পেরেছিল জাগ্রত। কন্যা অপহরণের কথা, আর কাউকে নয়, পৌঁচে দিয়েছিল সে নবীনমাধবকেই। কারণ, সে বুঝেছিল, কেউ যদি ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করতে পারেন, তিনি নবীন-মাধব ছাড়া আর কে? —মৃত্যুশয্যায় শায়িনী কন্যার পাশে উপবিষ্টা এই কৃষক-গৃহিণীর ছবিটি বড়োই করুণ এবং হৃদয় বিদারক। আর কন্যার মৃত্যুর পর তার পাশে বসে সে যে ভাষায় কেঁদেছে, সে ভাষা যে অন্তরের বেদনায় মথিত সন্তানহারা সব মায়ের শোকের ভাষা, তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। এই মা কেঁদে কেঁদে বলেছে, 'মুই সোনার নক্‌কি ভেস্‌য়ে দিতে পারবো না মারে, মুই কনে যাব রে—সাহেবের সঙ্গি থাকা যে মোর ছিল ভাল মারে…।'[১০৪] বলার অপেক্ষা রাখে না, কন্যা ক্ষেত্রমণির মতন এই স্বভাবাঙ্কণ বাঙ্‌লা সাহিত্যে কুত্রাপি নেই।

ঠিক এইরকম মানবিক এবং স্বভাবাঙ্কণ চরিত্র এ নাটকে আরেকটি আছে, সে হল আদুরী। এ জাতীয় চরিত্র বাঙলা সাহিত্যে আর দ্বিতীয় কোনো আছে কী না সন্দেহ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলী সমালোচনা' প্রবন্ধে যে চরিত্র দুটির কথা একাধিকবার উল্লেখ করেছেন, সে চরিত্র দুটি হল আদুরী ও তোরাপ। এর মধ্যে আদুরীর কথা আবার সর্বাধিক পরিমাণে হয়েছে বিবৃত। আদুরীর মত গ্রাম্যা বর্ষীয়সীর[১০৫] কথায় বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও লিখেছেন, 'আদুরীর মত অনেক আদুরী আমি দেখিয়াছি—তাহারা ঠিক আদুরী,[১০৬] আবার

কোথাও লিখেছেন, দীনবন্ধু 'আদুরীর সৃষ্টিকালে আদুরী যে ভাষায় রহস্য করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না',[১০৭] কেননা, 'আদুরীর ভাষা ছাড়িলে আদুরীর তামাসা আর আদুরীর তামাসার মত থাকে না',[১০৮] এবং রুচির কথা তুলে লিখেছেন, 'রুচির মুখ রক্ষা করতে গেলে ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ আমরা পাইতাম।'[১০৯] কেবল এই ক'টি কথাই নয়, দীনবন্ধুর সহানুভূতির কথা তুলে বঙ্কিম লিখেছেন, 'সহানুভূতি আদুরী বা তোরাপের বেলা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ ভাষা পর্যন্ত আনিয়া কবির কলমের আগায় বসাইয়া দিয়াছিল।'[১১০]

বঙ্কিমচন্দ্রের এইসব উক্তির পরিপ্রেক্ষিতে এ অনুমান অসমিচীন নয় যে 'আদুরী' চরিত্রের প্রতি যে-কোনো উদাসীন সমালোচকও এরপর ঘাড় ফেরাতে বাধ্য। আদুরী 'বসু পরিবারে'র ঝি। গত শতকের বাঙ্‌লাদেশে যখন ঝি-চাকরেরা পরিবার-পরিজনের সঙ্গে যেত একাত্ম হয়ে, সেই সময়কার ও সেই সমাজের প্রতীকী ঝি-চরিত্র হল এই আদুরী। আদুরী যে গ্রাম্যা বর্ষিয়সী এবং রহস্য ও তামাসায় যে সে পারঙ্গমা একথা বঙ্কিমচন্দ্রই গেছেন বিবৃত করে।—এদিকে 'নীলদর্পণে'র পরিবেশ কিন্তু রীতিমত গভীর ও গম্ভীর। আসন্ন বর্ষার আকাশের মতন 'নীলদর্পণ' মেঘে ঢাকা। ক্ষণে ক্ষণে অবশ্য অনিবার্য হয়ে উঠেছে অশ্রুবর্ষণ।—যে দীনবন্ধু পরবর্তীকালে সারা বাঙ্‌লাদেশকে হাসিয়ে মাত করে দিয়েছিলেন, 'নীলদর্পণে' সেই হাসির পরিচয় প্রায় অনুপস্থিত বলা চলে। এবং এটুকুও সম্ভব হত না, যদি না আদুরীকে আমরা পেতাম। গাম্ভীর্য সে একাই ভেঙ্গেছে। হাসির বিদ্যুৎঝলা নিয়ে ঘন মেঘের বুকে সেই দেখা দিয়েছে একা। তাই চরিত্রটি, স্বীকার করতেই হয়, এ নাটকের পক্ষে একটি বিশেষ মর্যাদার দাবী রাখে।

সহজ কথাকে সোজাসুজি গ্রহণ না করে তাকে অন্য একটি অর্থে আবিষ্কার করাই হল আদুরীর রহস্য ও তামাসার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়া আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, সব বিষয়েই তার একটি কৌতুককর মতামত প্রকাশ করা। সমকালীন সামাজিক আন্দোলন থেকে শুরু করে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত খুঁটিনাটি ব্যাপার, যা কোন রকমেই আদুরী সম্পর্কিত নয়, সেইসব বিষয়ে নিজস্ব একটি কৌতুককর মতামত প্রকাশ করতে না পারলে আদুরী যেন স্বচ্ছন্দ বোধ করে না। আর নাটকের দর্শক হিসাবে আমরাও তার একটি মতামত না-পেলে খুশি হতে পারি না।—সমকালীন সামাজিক আন্দোলনে আদুরী 'বিধবা বিবাহে'র

বিরোধী। তাই বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তার মন্তব্য অন্যরকম এবং এই আহুরী যে 'রাজাদের দলে' অর্থাৎ বিদ্যাসাগর মশায়ের বিপরীত দলে তা' জানাতেও ভোলে নি,—'সেই সাগর নাড়ের বিয়ে দেয়, ছ্যা—নাকি দুটো দল হয়েছে, মুই আজাদের দলে।'[১১১]—তার স্মৃতি রোমন্থনও রীতিমত উপভোগ্য,—'ছোট হালদার্নি, সে খাদের কথা আর তুলিস নে। মিন্‌সের মুখখান মনে পড়্‌লি আজও মোর পরাণডা ডুক্‌রে কঁ্যাদে ওটে। মোরে বড্‌ডি ভাল বাস্‌তো। মোরে বাউ দিতে চেয়েলো।…মোরে ঘুমুতি দিত না, ঝিমুলি বল্‌তো, 'ও পরাণ ঘুমুলে'।[১১২]—রেবতী যখন এসে রোগসাহেব সম্পর্কিত আসন্ন বিপদের খবর দিল, তখন কুঠিয়াল সাহেবদের কাছে যাওয়ার ব্যাপারে প্রধান বাধা হিসাবে আহুরী যা বলেছিল, তা হল, সাহেবদের দাড়ি ও পেঁয়াজ। অর্থাৎ লজ্জা-সরম বা মান-ইজ্জত ইত্যাদি কোনোটাই যেন বাধা নয়, সাহেব-বিহারে প্রধান বাধা যেন 'প্যাজির গোন্দো', এবং 'দাড়ি'। আহুরীর ভাষায় তা' হল এই রকম: 'মা গো যে দাড়ি! কথা কয় যেন বোকা ছাগলে ফ্যাবা মারে। দাড়ি প্যাজ না ছাড়লি মুই তো কখনুই যাতি পারবো না, থু, থু, থু! গোন্দো, প্যাজির গোন্দো!'[১১৩]

এ জাতীয় কৌতুক এক নয়, অজস্র। 'কুটির বিবি'র সঙ্গে 'মাচেরটক' সাহেবের অবারিত মেলামেশার প্রতি কটাক্ষটিও মনে রাখবার মতন। এদের সম্পর্কে আহুরীর কৌতুককর মন্তব্য হল, 'বিবিরি আমি দেখিছি, লজ্জাও নেই, সরমও নেই—জ্যালার হাকিম মাচেরটক সাহেব,‥এই সাহেবের সঙ্গি ঘোড়া চেপে ব্যারাতি এয়েলো। বউ মান্‌সি ঘোড়া চাপে!—কেশের কাকি ঘরের ভাশুরের সঙ্গি হেঁসে কথা কয়েলো, তাই নোকে কত নজ্জা দেলে, এ তো জ্যালার হাকিম।'[১১৪]—বলার অপেক্ষা রাখে না, আহুরীর এই রহস্য ও তামাসা এদেশীয় মানুষদের কাছে খুবই উপভোগ্য হতে পেরেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই কৌতুকের ধারালো ছুরি তদানিন্তন ম্যাজিষ্ট্রেট ও কুঠিয়াল সাহেবদের অবৈধ আঁতাতটিকে বিদ্ধ করতেও হয়েছিল সমর্থ।

আহুরী প্রসঙ্গে আলোচনার উপসংহারে একটি কথা বলবার অবশ্যই প্রয়োজন আছে, এবং সেই আবশ্যিক কথাটি হল এই যে আহুরী কিন্তু কেবল কথাসর্বস্ব চরিত্র নয়, এই চরিত্রটি যে একান্ত মানবিক, তা' শেষের দিকে উন্মোচিত হয়েছে। 'বসু-পরিবারে' যেদিন অন্ধকার নেমে এলো, একটির পর একটি ঘটতে থাকল মৃত্যু, সেদিন এই 'গ্রাম্যা বর্ষিয়সী' আহুরীর অবস্থা

শোচনীয়। সে যেন আরেকজন।—তাকে যেন আদুরী বলে আর চেনাই যায় না। দেহগত মৃত্যু না ঘটলেও, মনের দিক থেকে বেচারি যে নিহত হল, তা' চোখের ওপর দেখা গেল।

'নীলদর্পণ' নাটকে গৌণ হলেও আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র আছে এবং তাদের ভেতর অন্যতম চরিত্র হল বিগত-যৌবনা কুট্টনী পদী ময়রানী। রোগ সাহেবের একদা রক্ষিতা ছিল এই পদী। পদী ঘৃণ্য জীবন যাপন করলেও, তার নিজের সম্পর্কে এই পদীর ঘৃণা কম নয়। নাট্যকার দীনবন্ধু এই অভিনব আবিষ্কারে যথার্থই আধুনিক। 'আমার কি সাধ, কচি কচি মেয়ে সাহেবেরে ধরে দিই'[১১৫] এই আক্ষেপোক্তি পদীর আন্তরিক, এব ক্ষেত্রমণিকে সাহেবের ঘরে ঠেলে ঢুকিয়ে দেবার সময় তার দ্বিধা এই উপলব্ধিং থেকেই উৎসারিত। নবীন মাধবকে নিজের মুখ দেখানোর জন্য পদীর যে লজ্জা, তাও যে তার ঘৃণিত জীবনের সচেতনতা থেকে এসেছে, এ কথা পুনরুক্ত করা বাহুল্য মাত্র।

বর্তমান নাটকে চিত্রিত কুঠিয়াল রোগ ও উড সাহেবের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা' নিতান্তই বৈশিষ্ট্যবর্জিত এবং অনেকাংশে প্রতীকী। রোগ ও উড, এই নাম দুটি যে প্রতীকী তাতে কোনো সংশয় নেই। উড সাহেব শুষ্ক কাঠের মতনই সবরকম মায়া-মমতা বর্জিত। ঘর জ্বালানো, গ্রাম-লুঠ, ভীতি-মূলক দাদন দেওয়া, গোপন কয়েদ ইত্যাদি সবরকম পীড়নে উড সাহেবের মত ভয়ঙ্কর চরিত্র খুবই দুর্লভ। বিখ্যাত বা কুখ্যাত নীলকর 'লারমুর' সাহেবের আদলে 'উড' চিত্রিত বলে অনুমিত হলেও, লারমুর সাহেব সম্পর্কে যে মানবিক তথ্যাদি কিছু কিছু পাওয়া যায়, সে জাতীয় কোনো মানবিকগুণে নাট্যকার তাঁর উড সাহেব-কে ভূষিত করেন নি। বরং পীড়নের প্রতীক হিসাবেই এই চরিত্রটি অধিকতর পরিকল্পিত। অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি এবং 'শ্যামচাঁদে'র আবিষ্কর্তা হিসাবেই উড সাহেবের যেন সমধিক গৌরব।—রোগ সাহেবকে 'কুলচিকাটা' কুঠির ছোট সাহেব 'আর্কিবল্‌ৎ হিল্‌সে'র সঙ্গে উপমায়িত করা বর্তমান প্রসঙ্গে হয়ত স্বাভাবিক, তবে এই নীলদর্পণ নাটকে তার নারী-ঘটিত দুর্বলতা ছাড়া অন্য কোনো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া কঠিন। অন্ততঃ কোনো মানবিক গুণে নাট্যকার যে এদের অভিষিক্ত করেন নি, তা' নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

তবে এই কুঠিয়ালদের শিবিরে থেকেও আশ্চর্য জীবন্ত চরিত্রের অধিকারী যে হতে পেরেছে, সে হল, দেওয়ান গোপীনাথ। গোপীনাথের মতন মর্মভেদী

বিভীষণের চরিত্র যে নীলকরদের কুঠিতে কুঠিতে ছিল, এই চরিত্রটি তারই ইঙ্গিতবাহী। দেওয়ানী করে সাহেবদের মন যুগিয়ে অঢেল পয়সা রোজগার করবে, এই ছিল গোপীনাথের ধান্দা। সাহেবদের অত্যাচার অতখানি ভয়ঙ্কর হতে পারত না, যদিনা দেওয়ান দেশীয় লোকেদের দুর্বল জায়গাগুলি দেখিয়ে দিত। বলার অপেক্ষা রাখে না যে সেই দুর্বল জায়গাগুলিতে আঘাত করেই নীলকরেরা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধ করতে পেরেছিলেন অনায়াসে। নবীনমাধবের শোচনীয় মৃত্যু এবং 'বসু-পরিবারে'র ভয়ঙ্কর পরিণতি যে তার কুপরামর্শেই ঘটেছিল, একথা বলা বাহুল্য মাত্র। গোলোক বসুকে ফৌজদারিতে অভিযুক্ত করলে যে আশাতিরিক্ত ফল পাওয়া যাবে, এই পরামর্শ কী গোপীনাথের দেওয়া নয়? তবে মজার ব্যাপার এই, খল-নায়কদের শেষ পরিণাম যেমন ঘটে থাকে, গোপীনাথও সেই প্রত্যাশিত পরিণাম এড়িয়ে যেতে পারেন নি। সাহেবরা তাদের স্বার্থসিদ্ধির যন্ত্র হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছিল গোপীনাথকে, আর গোপীনাথও চেয়েছিল অনুরূপভাবে আত্মোন্নতি করতে সাহেবদের ক্রীড়নক হিসাবে ব্যবহার করে। উভয়ের এই খেলায় গোপীনাথই শেষ পর্যন্ত হয়েছে পরাজিত এবং তার বরাতে জুটেছে উড সাহেবের লাথি। এবং এই লাঞ্ছনার পর মাটি থেকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গোপীনাথ কবুল করেছে, 'সাত শত শকুনি মরিয়া একটি নীলকরের দেওয়ান হয়, নচেৎ অগণনীয় মোজা হজম হয় কেমন কর্য্যে? কি পদাঘাতই করিতেছে, বাপ!'[১১৬]—এই স্বীকারোক্তির পিছনে যে আত্মসমীক্ষা রয়েছে, সেই অংশটুকুই হল যথার্থ মানবিক। আর 'বসু-পরিবারে'র শোচনীয় পরিণতিতে তার হৃদয় যে শেষ পর্যন্ত আর্দ্র হয়েছে, তা' এই মানবিক উৎস থেকেই হয়েছে উৎসারিত।—তবে এই চরিত্রটির বিকাশে আগেরও এক ধাপ আছে, গোপীনাথের বেলায় সেই ধাপটি দেখানো হয় নি। এই পর্যায়টি দেখাবার জন্য লেখক অন্য একটি চরিত্র নির্বাচন করেছেন, সেই নির্বাচিত চরিত্রটি হল, আমিন। নীলের আতঙ্ক প্রথম 'নীলদর্পণে' যার দ্বারা সঞ্চারিত হয়েছে, সে হল এই আমিন। জমিতে দাগ দেওয়ার মূলে সে এবং সেই প্রথম ব্যক্তি যে ক্ষেত্রমণির সৌন্দর্যের খবর পৌঁছে দিয়েছে রোগ সাহেবের কাছে। সকল রকমের নষ্টামি যে তাকে দিয়ে সূচিত হয়েছে, পদী ময়রানীর বিখ্যাত উক্তি 'আমিন আঁটকুড়ির বেটাই দেশ মজাচ্ছে'[১১৭] তার প্রমাণ। এরপর ধীরে ধীরে এই আমিন গোপীনাথের 'দেওয়ান' পদের প্রার্থী হয়ে দেখা দিল। অর্থাৎ আমিন কী করে দেওয়ান হয়, এ বৃত্তটাই দেখিয়ে দিলেন নাট্যকার।

শিল্প হিসাবে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকখানি কতখানি উন্নত এবং মানবিক রসে কতখানি সমৃদ্ধ, সে সম্পর্কে আরো কিছু বলা মানেই পুনরুক্ত করা। সুতরাং এহ বাহ্য। তবে 'রেনেসাঁসে'র সঙ্গে 'নীল-আন্দোলন' ছাড়া এর যোগসূত্র কতখানি, তা অবশ্য খতিয়ে দেখবার প্রয়োজন আছে। প্রখ্যাত সমালোচক অধ্যাপক ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্তের লেখা 'দীনবন্ধু মিত্রের স্বদেশ চিন্তা'[১১৮] শীর্ষক একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ এই ব্যাপারে আমাদের অনেকখানি সাহায্য করতে পারে। এই প্রবন্ধটিতে ডঃ দাশগুপ্ত আমাদের দেখিয়ে দিলেন, 'দীবন্ধুই প্রথম বাঙালীকে দেশের কথা ভাবিতে শিখাইলেন। তিনি প্রথম বিদেশী বণিকের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিলেন। তিনিই প্রথম ইংরাজ রাজপুরুষের নিন্দা করিলেন। তিনিই প্রথম ইংরাজ-চালিত সংবাদ পত্রের হীনমন্যতার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিলেন। আবার ইংরাজপুরুষ ও ইংরাজ বণিকের অন্যায় উৎপীড়নের কথা বলিতে যাইয়া তিনিই প্রথম তাহাদের বাঙালী সহায়কদের লোভ ও কাপুরুষতার এক গ্লানিকর চিত্র বাঙালীর সামনে তুলিয়া ধরিলেন। এই নাটকেই প্রথম বাঙালী দেশ সেবক সাহেবের বুকে পদাঘাত করিল।'—বলার অপেক্ষা রাখে না, 'নীলদর্পণ'কে কেন্দ্র করে এই যে 'প্রথম' গৌরবগুলি সংযোজিত হল তার রচয়িতার খ্যাতির ওপর, এর সবক'টিই নবযুগের অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি। অর্থাৎ 'রেনেসাঁসী চিন্তা"ই এ জাতীয় ছবি আঁকতে নাট্যকারকে জুগিয়েছে প্রেবণা। বর্তমান গ্রন্থের 'নবজাগরণ ও মানবিকতাবদের ভূমিকা'য স্বদেশ ভাবনার আলোচনায একথা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে 'স্বদেশপ্রেম ও জাতীযতাবাদ' ঐ 'রেনেসাঁসী'-ভাবনা থেকেই হয়েছে উৎসারিত। না, কেবল আবেগে নয়, দেশের শুভাশুভ সেদিন আমাদের কাছে ধরা দিয়েছিল বুদ্ধির ও বিচার শক্তির ভেতর দিযেও। ফলে, বিদেশীদের শোষণ এবং আমাদের দেশীয মানুষদের গ্লানিকর চরিত্র দুইই একই দর্পণে হয়েছিল প্রতিবিম্বিত। বাহ্যতঃ যদিও এ দর্পণের নাম 'নীলদর্পণ', কিন্তু ভেতরে ভেতরে ঐ 'নীলদর্পণ'কে নতুন এক নামে ডাকা যায়, সেই নতুন নামটি হল, 'দেশপ্রেম'। অস্বীকার করবার উপায় নেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' যা উদ্‌ঘাটিত করতে পারেনি, দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' তা' করতে পেরেছে।[১১৯]—

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের দেশে যে ব্যাপক জাতীয় আন্দোলন দেখা যায়, তার মূল কথা ছিল বিদেশী-দ্রব্য বর্জন করতে জন সাধারণকে আহ্বান। তখনই আমরা এ ব্যাপাবে এগিয়ে এসেছিলাম, যখন আমরা বুঝেছিলাম যে বিদেশী দ্রব্য কিনলে বিদেশীরাই হবে লাভবান,

স্বদেশীয়রা নয়।—এই ভাবটাই ধীরে ধীরে আমাদের সকলের মনে হল সঞ্চারিত এবং শেষ পর্যন্ত রূপ নিল তা' স্বদেশী আন্দোলনে। কিন্তু জেনে রাখা দরকার, এই 'স্বদেশী' ভাবের সূচনা ১৯০৫-এ নয়, এর সূচনা ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে এবং তা' 'নীলদর্পণ'-কে কেন্দ্র করেই। দুই আন্দোলনই একই সুরে ইংরেজ বণিকদের বিরুদ্ধে কী ভাবে উদ্যত হয়েছে, তা' পরের যুগের স্বদেশী-কথার সঙ্গে আগের যুগের কথা মেলালেই বোঝা যাবে, '১৯০৫-এ বাঙালী বলিল বিলাতি কাপড় পরিব না, দেশী কাপড় পরিব। বিলাতি কাপড় পরিলে ইংরাজ পুষ্ট হইবে, আমি অনাহারে মরিব। নীল আন্দোলনে বাঙালী বলিল, নীল বুনিব না, ধান বুনিব। নীল বুনিলে ইংরাজ বণিকের টাকা হইবে, আর আমি অনাহারে মরিব। দুই আন্দোলনই ইংরাজ বণিকের বিরুদ্ধে আন্দোলন।' [১২০]—না, এই অর্থনৈতিক ভাবনা যে আরোপিত নয়, তার প্রমাণ আছে ১৮৭৩-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'মুখার্জিস ম্যাগাজিনে' প্রকাশিত ভোলানাথ চন্দ্রের ভারতীয় অর্থনীতি সম্পর্কিত প্রবন্ধগুলিতে। বলার অপেক্ষা রাখে না, দীনবন্ধু ও ভোলানাথ উভয়েই যে চিন্তা-ভাবনার সমতল ভূমিতে দাঁড়িয়েছিলেন, সে ভূমি ছিল রেনেসাঁসের খাশ-তালুক, সুতরাং তাঁরা যা-কিছু ভাবুন না কেন, সবই এক হতে বাধ্য।

'নীলদর্পণ' যে রেনেসাঁসী ভাবনার একটি আশ্চর্য দলিল, তা' আরো অনেক দিক থেকে দেখিয়ে দেওয়া যায়। তোরাপ-রাইচরণ থেকে গোলোক বসু পর্যন্ত প্রতিটি চরিত্র-পরিকল্পনায় যে আশ্চর্য মানবিক রসের উৎসার দেখা যায়, স্বীকার করে নিতে হয়, এ পরিকল্পনা এমন রূপ পেত না, যদি না তা' রেনেসাঁসের পটভূমিকে পেত। যদিও এই নাটকে 'কালেজ আউট বাবুদের গৌণপরা মাগ' [১২১] সম্পর্কে কটাক্ষ আছে, কিন্তু ভুললে চলবে না কালেজীয় শিক্ষা ও স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারে এমন অনেক সংলাপ আছে, যা সর্বৈব 'নবজাগরণে'র নামাঙ্কিত।—এখানে সুপ্রচুর উৎসাহের সঙ্গেই আধুনিক শিক্ষাকে জানানো হয়েছে অভিনন্দন। সুতরাং ঐ বিষয়ে প্রশ্ন না তোলাই ভালো।

'নীলদর্পণ' সম্পর্কে আরো কয়েকটি তথ্য নিবেদন করে বর্তমান আলোচনার উপসংহার টানা যেতে পারে। এই নাটকটি যে অনেক ব্যাপারে প্রথম, তা' আগেই বলা হয়েছে। কেবল স্বদেশ-ভাবনায় নয়, সাহিত্যের দিক থেকেও এটি যে অনেক প্রাথমিক গৌরবে মণ্ডিত, তাও উল্লেখ করা দরকার। এই নাটকটিই প্রথম গ্রন্থ যা ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে প্রথম পাড়ি দিয়েছিল সাগরের ওপারে। এ তথ্যও অবিদিত নয়, লণ্ডন থেকে 'সিম্‌কিন,

মার্শাল এ্যাণ্ড কোম্পানি' এটিকে দ্বিতীয়বার ছেপে বের করেছিল, সুতরাং সেই হিসাবে বলা যায় বিদেশী প্রকাশকের দ্বারা প্রকাশিত এটাই হল প্রথম আধুনিক বাঙ্‌লা সাহিত্য-গ্রন্থ। এবং এই গ্রন্থই প্রথম গ্রন্থ, যাকে কেন্দ্র করে চার্লস্ ডিকেন্স পরিচালিত 'অল দি ইয়ার রাউণ্ড' পত্রিকায় একটি বিরাট প্রবন্ধ হয়েছিল প্রকাশিত। ঐ আলোচনা, ভালো হোক মন্দ হোক, বিলিতি কাগজে প্রথম বাঙ্‌লা গ্রন্থের এটাই প্রথম আলোচনা।

অভিযুক্ত সাহিত্য হিসাবেও এই 'নীলদর্পণে'র একটি বিশেষ স্থান আছে। এই স্থান কেবল বাঙ্‌লা সাহিত্যে কেন, অন্বেষণ করলে বিশ্ব-সাহিত্যের পটভূমিতেও তাকে একটি বিশেষ স্থান করে দেওয়া যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচকরা যা মত পোষণ করেন, তা' হল, 'আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে কাহারও প্রথম গ্রন্থ লইয়া দেশময় এমন আলোড়ন হয় নাই। প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে গ্রীক নাট্যকার এরিস্টফেনিস্ 'বেবিনোলিয়ান' নামে এক নাটকে এদেশের ম্যাজিস্ট্রেটদের এবং ক্লিয়নের নির্মম সমালোচনা করিয়া বিচারালয়ে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু এরিস্টফেনিসের শাস্তি হইল না। 'নীলদর্পণে'র মামলায় পাদ্রী লং দণ্ডিত হইলেন এবং নাটকটির প্রচারে সহায়তা করিবার অপরাধে সীটনকার সাহেব অপদস্থ হইলেন।'[১২২]—অর্থাৎ ইতিপূর্বে এ জাতীয় সাহিত্য-রচনা করে ঠিক এরকম শাস্তি 'নীলদর্পণ' ছাড়া আর কেউই পায় নি। অন্ততঃ কোনো গবেষকই তেমন নমুনা দেখাতে পারেন নি। তাই এ সব দেখে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়, 'অভিযুক্ত সাহিত্যে'র বিচারে 'নীলদর্পণ' বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসেও অনন্য কী না!

এই বাহ্য, নিপীড়িত মানুষদের যন্ত্রণার দলিল হিসাবে 'নীলদর্পণ' যে চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। এই স্বীকৃতিটাই দীনবন্ধুর সব থেকে বড়ো স্বীকৃতি। এই পাওনাটাই 'নীলদর্পণে'র বড়ো পাওনা। গত শতকের মনস্বী সমালোচক কালীপ্রসন্ন ঘোষ অন্ততঃ এই মহিমার আলোকেই দেখেছেন 'নীলদর্পণ'-কে এবং তাঁর বক্তব্যটি উদ্ধার করে বর্তমান অধ্যায়ের উপসংহার টানা যেতে পারে। ইনি 'আঙ্কল্ টমস্ কেবিন' থেকে 'কুলা' পর্যন্ত সকলকেই 'নীলদর্পণ' আখ্যা দিয়ে লিখেছেন,…'অনেকে মনে করেন যে, নীলদর্পণ কেবল সাময়িক তরঙ্গের উচ্ছাস মাত্র, এই কথাটা কতকদূর সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। নীলদর্পণ যদি সত্য সত্যই একদিন বা দশ দিনের জন্য হইত, যদি নেতৃবর্গের অত্যাচার

কেবল এক দেশেই পর্যাপ্ত হইত, তাহা হইলে এ সংসার সোনার সংসার,...আমেরিকায় যে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাও এরূপ নীলদর্পণের অভিনয়,...মিস্ স্টোয়ে 'আঙ্কল্ টমস্ কেবিন' লিখিয়াছেন, তাহাও নীলদর্পণ, ব্রিটিশ গায়েনার শ্রমজীবী গৃহস্থগণের কষ্ট বর্ণনা করিয়া একজন বিলাতের ব্যারিস্টার 'কুলী' নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাও নীলদর্পণ।'[২৩]

অর্থাৎ 'নীলদর্পণ' যে দেশে দেশে এবং যুগে যুগে নানা লেখকদের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে থাকে, এটাই হল সমালোচকের বক্তব্য। স্বীকার করতেই হয়, এ বক্তব্য নিঃসন্দেহে তাত্ত্বিক। তবে জেনে রাখা ভালো, কেবল তাত্ত্বিক দিক থেকে নয়, এই বাঙলা সাহিত্যে গত শতকের এক সময়ে সব রকম উৎপীড়নের প্রতিবাদে যে সাহিত্য রচিত হয়েছিল, আক্ষরিক অর্থে তার অনেকগুলিই ছিল 'দর্পণ'-নামাঙ্কিত। সুতরাং এই 'দর্পণ' যে বিরাট একটি দর্পণ, তা মেনে-না-নিয়ে আর উপায় কী?—প্রসঙ্গান্তরে এই দর্পণগুলিকে পরিচিত করানো যাবে। এখন দীনবন্ধুরূপী কাঁচা-মিঠা আম গাছের মুকুলের পালা শেষ করে, ফলের দেশে প্রবেশ করা যাক।

॥ সূত্রনির্দেশ ॥

১। বঙ্কিমরচনা সংগ্রহ (প্রবন্ধ খণ্ড শেষ অংশ), পৃ. ১১২০-২১ দ্রষ্টব্য।

২। ঐ. পৃ. ১১২২

৩। ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ 'বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস'-লেখকেরা সকলেই এই উক্তি সমর্থন করেন। ডঃ সেন লিখেছেন, '১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার মৌলিক নাট্যরচনার সূত্রপাত হইল 'কীর্তিবিলাস' ও 'ভদ্রার্জুন' নাটক দুইটির দ্বারা।'—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, পৃ. ৪৪

৪। বর্ধমান সাহিত্যসভা কর্তৃক মুদ্রিত 'কীর্তিবিলাসের' (১৩৬২ সালে মূল ভূমিকা) দ্রষ্টব্য।

৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (পঞ্চম সং. ১৩৭০), সুকুমার সেন, পৃ. ৪৮

৬। ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত 'কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী' (বৈশাখ, ১৩৭০) গ্রন্থের ১৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। আমাদের নাটক সম্পর্কে মধুসূদনের এই মতের সঙ্গে আশ্চর্য মিল দেখা যায় বঙ্কিম চন্দ্রের। মধুসূদন যাকে 'stern realities' বলেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র, সেক্সপীয়ারের নাটকের কথায়, ঐ কথারই প্রতিধ্বনি তুলে তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, 'সাগরবৎ সেক্সপীয়ারের.. নাটক হৃদয়োত্থিত বিলোল তরঙ্গমালায় সংক্ষুব্ধ : দুরন্ত রাগ দ্বেষ ঈর্ষাদি বাত্যায় সন্তাড়িত : ইহার প্রবল বেগ, দুরন্ত কোলাহল, বিলোল উর্মিলীলা,—আবার ইহার মধুর নীলিমা, ইহার অনন্ত আলোকচূর্ণ প্রক্ষেপ, ইহার জ্যোতিঃ, ইহার ছায়া, ইহার রত্নরাজি, ইহার মৃদু গীত—সাহিত্য সংসারে দুর্লভ।'—

৭। বাংলার রেনেসাঁস, (ভাদ্র, ১৩৮১), অন্নদাশংকর রায়, পৃ.৫

৮। ঐ, পৃ. ৬। রামমোহনের স্বকালে ও তাঁর নেতৃত্বে ফরাসী বিপ্লবের অনুরূপ কোনো ঘটনা যে ঘটেনি, তা' সর্বৈব সত্য। কিন্তু পরবর্তী কালে যে নীলকরদের অত্যাচার দেখি, এই অঘটনের কারণ কিন্তু রামমোহনের আমলেই ছিল উপ্ত হয়ে। রামমোহন দীর্ঘজীবী হলে চোখের ওপরেই তিনি এ ঘটনা দেখতে পেতেন। এবং নেতৃত্বেও যে তাঁকে পাওয়া যেত, এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

৯। Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century, (1960), Dr. R. C. Majumder, P. 68.

১০-১১। A History of English Literature, (1963), Arthur Compton-Rickett, P. 89.

১২। নীলের এই ব্যবসা এবং তার প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ আছে। প্রবন্ধটির নাম 'নীলের বাণিজ্য'। এই প্রবন্ধটি ধৃত আছে তাঁর 'প্রবন্ধ মঞ্জরী', (১৩১২)—গ্রন্থে।

১৩। 'Ain-i-Akbari' : Jarret, Vol II, P. 181, 241.

১৪। The Good Old days of Honorable John Company, (1907), Vol II, W. H. Carey, P. 398

১৫। Bernier's Travels (Bangabasi), P. 275

১৬। 'প্রবন্ধমঞ্জরী', (১৩১২), পৃ. ২৫২

১৭। এ প্রসঙ্গে 'The Good Old days of Honorable John Company'-গ্রন্থের 399 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৮। ঐ গ্রন্থের ৩৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৯। 'প্রবন্ধমঞ্জরী' (১৩১২)-গ্রন্থের ২৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই বক্তব্যের সমর্থন মিলবে, তখনকার Calcutta Gazette-এর পাতা খুঁজলে। এই প্রসঙ্গে W. S. Setonkarr সম্পাদিত 'Selection from Calcutta Gazette (1865)—Vol. II-এর পৃষ্ঠা 8-9 দ্রষ্টব্য।

২০। এই পরিসংখ্যান আছে প্রমোদ সেনগুপ্ত লিখিত 'নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ' গ্রন্থে, পৃ. ৬-৭ দ্রষ্টব্য। ভারত ছাড়া এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকেও আরো কিছু নীল যে গিয়েছিল, তা' এই হিসাবে ধরা নেই।

২১। The Good Old days of Honorable John Company, (1907), Vol II, W. H. Carey, P. 401

২২। এই পরিসংখ্যানের জন্য 'Delta : Indigo and its Enemies'-এর পৃ. ৬২ দ্রষ্টব্য।

২৩। Development of Capitalist Enterprise of India—Buchanan, P. 36-37. —এই উক্তির সমর্থন অধ্যাপক হারাণচন্দ্র চাকলাদারের লেখা 'The Dawn and Dawn Society's Magazine'-এর ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই সংখ্যাতেও পাওয়া যায়।

২৪-২৫। Rural Life In Bengal, P. 62

২৬। English Works, P. 284. কেবল নীল নয়, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য

করেছেন, চা, কফি, কুলু উপত্যকার ফলের চাষ প্রভৃতি য়ুরোপীয় কর্ম-প্রচেষ্টারই ফলে সম্ভব হয়েছিল। প্রভাতকুমারের বিখ্যাত গ্রন্থ, 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য' গ্রন্থের ১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২৭। ১৮২৯ সালের ১৫ই ডিসেম্বর প্রদত্ত একটি বক্তৃতার অংশ বিশেষ। এই বক্তৃতাটি ধৃত আছে, 'Asiatic Journal' পত্রিকায়, Vol. II, 'New Series, May-August, 1830.'—

২৮। 'সংবাদ কৌমুদী', ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে, ২৬শে ফেব্রুয়ারি। মূল লেখাটি ইংরেজিতে লেখা।

২৯। 'Reformer' পত্রিকা, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ।

৩০। যশোহর খুলনার ইতিহাস (১৩২৯), সতীশচন্দ্র মিত্র. পৃ. ৭৬১

৩১। 'বঙ্গদূত', ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

৩২। London Asiatic Journal, September, 1831.

৩৩। ১৩০৮ সালের 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত দেবেন্দ্র প্রসাদ ঘোষের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩৪। ললিতচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী (১৩১৪)-র 'পূর্বকথা'র প্রথম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩৫। The Dawn and Dawn Society's Magazine-এ লেখা হারাণচন্দ্র চাকলাদারের 'Fifty years Ago' প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

৩৬। যশোহর খুলনার ইতিহাস, পৃ. ৭৬৩

৩৭-৩৮। 'সংবাদ প্রভাকর', ১২৬৫ সাল, ১লা মাঘ।

৩৯। Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century, (1960), R. C. Majumder, P. 88

৪০। Indigo Disturbance in Bengal, P. 37.

৪১-৪২। Ibid P. 39.

৪৩। এই 'কমিশন' ১৮ই মে থেকে ৪ঠা আগস্ট পর্যন্ত ১৩৪ জন সাক্ষীর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছিল। এই সাক্ষীদের ভেতর ছিলেন বিভিন্ন ধরনের মানুষ। এঁদের বক্তব্যগুলি নীল সম্পর্কে যে নানা তথ্য তুলে ধরে তা এঁদের বক্তব্যগুলির ওপর আজো চোখ বোলালে উপলব্ধি করা যায়।

৪৪-৪৫। 'এগারো আইন' সম্বন্ধে এই মন্তব্যটি আছে 'নীলদর্পণ' নাটকের তৃতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে।—জেনে রাখা দরকার, 'নীলকমিশন' বসবার মূলে এই আইনটিও ছিল অন্যতম কারণ। নির্মল সিংহ সম্পাদিত 'Freedom Movement in Bengal', (1968), গ্রন্থে খুব পরিষ্কার ভাবেই লেখা আছে, 'The same Act led to the appointment of the Indigo Commission under the Presidency of W. S. Seton-karr.' P. 438.

৪৬। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ,' (১৩৬৪), শিবনাথ শাস্ত্রী, পৃ. ২২৪

৪৭। বঙ্কিমরচনাবলী, (সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৬), ২য় খণ্ড, পৃ. ৮৩৪-৩৫

৪৮। Bengal under the Lt. Governors, Vol I, Buckland, P. 196.

৪৯। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে 'মধুস্মৃতির' নগেন্দ্রনাথ প্রমুখ সকল লেখক মধুসূদনকে এই 'নীলদর্পণের' অনুবাদক হিসাবে করেছেন চিহ্নিত। কিন্তু এ ব্যাপারে আমরা একেবারে ভিন্ন তথ্য পেলাম স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্তের লেখা 'Appreciation of Michael Madhusudan and Dinabandhu Mitra' শীর্ষক ৪২ পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থে।

এডওয়ার্ড স্টুয়ার্ট নামে এক পাদরি, শহর ইস্পাহানে মহেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে কলকাতার স্মৃতিচারণ করে জানিয়েছিলেন 'রামচন্দ্র' নামে একজন 'advanced student' ঐ 'নীলদর্পণের' অনুবাদ করেন। মহেন্দ্রনাথ তাঁর উক্ত গ্রন্থের ৩৪-৩৫ পৃষ্ঠায় এ তথ্য নিবেদন করেছেন।—ফলে 'নীলদর্পণের অনুবাদক' নিয়ে এখন বিতর্ক দেখা দিয়েছে। এ ছাড়া 'জাতীয় গ্রন্থাগারে' রাক্ষিত অনুদিত মূল গ্রন্থের যে ইংরেজির সঙ্গে আমাদের পরিচয় হচ্ছে, সেই দুর্বল ইংরেজি মাইকেলের কী না, এ নিয়েও দেখা দিয়েছে গভীর সংশয়।—তাই সাম্প্রতিক কালে অনেকেই মাইকেলকে নীলদর্পণের অনুবাদক হিসাবে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত নন। এ ব্যাপারে প্রকৃত তথ্য কী হতে পারে তা' নিয়ে বর্তমান লেখক 'নীলদর্পণের অনুবাদক' নামে 'দুই মধুসূদন' (১৯৭৪) গ্রন্থে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেছে। অপ্রাসঙ্গিক হবে মনে করে বর্তমান গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচনা অনুপস্থিত থাকল।

৫০। Life of Alexander Duff, Vol II, by George Smith, P. 377

৫১। হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, পৃ. ৬৫

৫২। বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, প্রবন্ধ খণ্ড, শেষ অংশ, (৭ জুন ১৯৭৩), পৃ. ১১২৩

৫৩। মূল তথ্যটি ইংরেজিতে নিবেদিত। আলোচনার সুবিধার জন্য বাংলা করে নেওয়া হয়েছে।

৫৪। 'হরকরা' পত্রিকায় '২৯শে জুন, ১৮৬১' তারিখে এই তথ্য পরিবেষিত হয়েছিল।

৫৫। এ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র খোলাখুলিই লিখেছেন, 'নীলদর্পণে গ্রন্থকারের নাম গোপন করিবার জন্য দীনবন্ধু অন্য কোন প্রকার যত্ন করেন নাই। নীলদর্পণ প্রচারের পরেই বঙ্গদেশের সকল লোকেই কোন-না-কোন প্রকারে জানিয়াছিল যে, দীনবন্ধু ইহার প্রণেতা।' 'বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ', প্রথম খণ্ড শেষ অংশ, (১৯৭৩), পৃ. ১১২২

৫৬। The Bengali Drama: its Origin and Development, 1930, by P. Guhathakurata, P. 109.

৫৭। বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড শেষ অংশ, (৭ জুন, ১৯৭৩), পৃ. ১১৩৫

৫৮। ললিত চন্দ্র মিত্র লিখিত 'Indigo Disturbance in Bengal' গ্রন্থে যে 'Report of the Nil Darpan case' আছে, তার ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৫৯। Masters of the Drama, (1954, Dover Publication), John Gassner, P. 287.

৬০। Ibid, P. 457.

৬১। The Theory of Drama by A. Nicoll, P. 77

৬২। The Civilization of the Renaissance in Italy, (Phaidon Press) P. 82.

৬৩। Ibid, P. 190.—যদিও একথাগুলি বুকহার্ট বলেছেন, কিন্তু এই কথাগুলির পরেই তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, 'Why did Italy produce no Shakespeare?'

৬৪। A History of English literature (1963), Thomas Nelson and Sour Ltd. P. 91.

৬৫। দীনবন্ধু মিত্র (মাঘ, ১৩৫৮), পৃ. ৪৫-৪৬

৬৬। The Theory of Drama, by A. Nicoll, p. 92

৬৭। Bywater, Ingram, tr. Aristotle on The Art of Poetry (1962 Edn.) P. 35

৬৮। The Theory of Drama, by A. Nicoll, P. 147.

৬৯। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণের' ওপর 'সেনেকার' এই প্রভাব অনেকেই হয়ত আরোপিত বলে মনে করবেন। যাঁরা এ রকম মনে করবেন, তাঁদের প্রধান যুক্তি হ'ব এই যে দীনবন্ধু নাটক লেখার জন্য যাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁরা মূলতঃ হলেন 'এলিজাবেথান যুগে'র নাট্যকার। আর সেক্সপিয়ার হলেন এঁদের ভেতর সর্বাধিক প্রভাবশালী প্রতিভা। সুতরাং প্রভাব যদি দীনবন্ধুর ওপর কারো থেকে থাকে তিনি হলেন সেক্সপিয়ার এবং সর্বতোভাবে 'এলিজাবেথান যুগ'। এখানে 'সেনেকার' স্থান কোথায়?—স্বীকার করতেই হয়, এ কথা যাঁরা বলবেন তাঁদের যুক্তি জোরালো। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একথাও আমরা যেন বিস্মৃত না হই, এলিজাবেথান যুগে' 'সেনেকার' প্রভাব উপেক্ষনীয় ছিল না। বরং ছিল কোনো কোনো ক্ষেত্রে একটু বেশি। এই এলিজাবেথানদের মাধ্যমেই সচেতন বা অচেতনভাবে দীনবন্ধু যে প্রভাবিত হয়েছিল, এ সত্য স্বীকার করে নিতে অসুবিধা কোথায়? আর এলিজাবেথান ট্রাজেডিতে 'সেনেকার' প্রভাব কতখানি ছিল, তা বিস্তৃতভাবে জানতে গেলে F.L. Lucas লিখিত 'Seneca and Elizabethan Tragedy' গ্রন্থটি যে বিশেষ সহায়ক হবে, তা এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত থাকা ভালো।

৭০। 'নীলদর্পণ', ১ম অঙ্ক, ১ম দৃশ্য। দৃশ্যের সমাপ্তিতে এই কথাগুলি বলেছেন গোলোক বসু।

৭১। ঐ, চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক। ইন্দ্রাবাদের ফৌজদারী কাছারিতে এই সংলাপ শোনা গেছে।

৭১। ঐ, দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৭৩। ঐ, পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৭৪-৭৫। ঐ, প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

৭৬-৭৭। ঐ, চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৭৮-৭৯। ঐ, দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

৮০। ঐ, তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

৮১-৮৩। ঐ, পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৮৪। ঐ, দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

৮৫। ঐ, দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

৮৬। ঐ, প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

৮৭। ঐ, পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

৮৮। ঐ, দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

৮৯-৯০। ঐ, প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

৯১-৯২। ঐ, পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

৯৩। পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন, 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা, বৈশাখ ১৭৭২ শক, ৮১ সংখ্যা।

৯৪। 'Indeed Khetramoni of the drama was none but *Harimoni*, a peasant girl of Nadia, in flesh and blood known as one of the Beauties, of Krishnagar

who was carried of to the Kulchinkatta factory in charge of Archibald Hills, the chota Saheb, where the girl was kept in his bed-room till late of night' etc.—*The Indian Stage, Vol II, (1956), P. 92*

৯৫। 'নীলদর্পণ', প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৯৬। ঐ, দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

৯৭-১০০। ঐ, তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

১০১। এ ভাষা মোহিতলাল মজুমদারের। মোহিতলাল তাঁর 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে' দীনবন্ধুর আঁকা এই ক্ষেত্রমণির প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর শব্দ ব্যবহার করেছেন। সেই শব্দগুলি এবং তাঁর করা প্রায় সমগ্র বিশ্লেষণই ক্ষেত্রমণির আলোচনায় ব্যবহৃত হল। প্রসঙ্গতঃ উক্ত গ্রন্থের ১১৯-২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১০২। 'নীলদর্পণ', তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

১০৩। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', মোহিতলাল মজুমদার পৃ. ১১৮

১০৪। 'নীলদর্পণ', পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

১০৫-০৬। বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, (প্রবন্ধ খণ্ড, শেষ অংশ), ৭ জুন, ১৯৭৩, পৃ. ১১৩১

১০৭-০৯। ঐ, পৃ ১১৩৩

১১০। ঐ, পৃ. ১১৩৪

১১১-১৪। 'নীলদর্পণ', প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

১১৫। ঐ, দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

১১৬। ঐ, পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

১১৭। ঐ, দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

১১৮। 'দেশ' পত্রিকা, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭০, পৃ. ২১৫। ডঃ দাশগুপ্তের এই লেখাটি সংক্ষিপ্ত হলেও, দীনবন্ধু সম্পর্কে তিনি আমাদের নতুন করে ভাবাতে পেরেছেন। ইতিপূর্বে দীনবন্ধু সম্পর্কে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁদের ভেতর বঙ্কিমচন্দ্র থেকে মোহিতলাল-সুশীলকুমার প্রমুখ মনীষী-সমালোচকরা থাকলেও, এঁরা কেউই ইতিহাসের চোখ দিয়ে দীনবন্ধুকে বিশ্লেষণ করতে এগিয়ে আসেন নি। ডঃ দাশগুপ্ত কিন্তু তা' করেছেন। কেবল এটুকুই নয়, পরবর্তী কালের 'বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে'র সঙ্গে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' চিত্রিত আন্দোলনের একটি আত্মিকযোগও খুঁজে পেয়েছেন, বলা বাহুল্য, যা একালের কোনো সমালোচকই দেখাতে সমর্থ হন নি।

১১৯। 'নীলদর্পণ' অত্যাচারের কাহিনী, বিদ্রোহের কাহিনী নয়। 'আনন্দমঠ' বাঙালীর গৌরবের কথা, 'নীলদর্পণ' বাঙালীর অসহায়তার কথা। গৌরবের কথায় আদর্শের উন্মাদনা আছে। অসহায়তার কথায় এক কঠিন বাস্তবমুখিতা আছে।'—ডঃ রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, 'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭০, পৃ. ২১৫

১২০। 'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭০, ডঃ দাশগুপ্তের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১২১। 'নীলদর্পণ', পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

১২২। 'দেশ', সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৭০, ডঃ দাশগুপ্তের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১২৩। বান্ধব, ১২৮৩।

চার

।। আপন মনের মাধুরী মিশায়ে ।।

আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে সব সাহিত্যিকই তাঁর সাহিত্য রচনা করে থাকেন যদিও, কিন্তু 'রোমান্টিক' সাহিত্য রচনার বেলায় একথা যেমন খাটে, তেমনটি বোধ হয় আর কোথাও খাটে না। আর একথা বলা বাহুল্য মাত্র যে রোমান্টিকতা রেনেসাঁসের যুগের সাহিত্যিকদের বড়ো প্রিয়। মনের খুশিতে অবাধ সঞ্চরণের ক্ষেত্র আর কোথায় এমন করে পাওয়া যাবে? মাইকেল মধুসূদন দত্তের মত অত বড়ো ক্লাসিক কবিও হঠাৎ একদিন বলে বসেছিলেন, মহাকাব্যে এই ইস্তফা দিলাম, কারণ—। কারণ হিসাবে এই মহাকবি যা কবুল করলেন, তা' হল, 'দেয়ার ইজ্ দি ওয়াইড ফীল্ড অফ রোমান্টিক অ্যাণ্ড লিরিক পোয়েট্রী বিফোর মি।'[১] অর্থাৎ রোমান্টিক ও লিরিক কবিতার অবারিত মাঠ আমার সামনে পড়ে রয়েছে, সুতরাং মেঘনাদের পর শৌর্যমূলক কাব্যে ইস্তফা দেওয়া ছাড়া আর উপায় কী?—কাব্যের ব্যাপারে মধুসূদন এ স্বীকারোক্তি অনেক পরে লিপিবদ্ধ করলেও, নাটকের ক্ষেত্রে রোমান্টিক নাটক লিখেই কিন্তু তাঁর বাঙ্‌লা সাহিত্যে প্রথম আবির্ভাব। এবং বলে রাখা ভালো, তা' 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হবার অন্ততঃ এক বছর দশমাস আগেকার ঘটনা। তাই 'নীলদর্পণ' লেখার পর হঠাৎ যদি রোমান্টিক নাটক লেখায় আমাদের আলোচ্য নাট্যকার বৃত হন, আশা করি, তা যুগধর্ম বলেই স্বীকৃত হবে। ডাঃ সুশীলকুমার দে এই যুগধর্ম স্বীকার করে নিয়েই দীনবন্ধুর প্রসঙ্গে লিখেছেন, '...নূতন রোমান্টিক সাহিত্যের প্রভাবে রোমান্সের দিকে একটি কৃত্রিম ঝোঁক সে যুগের অনেক লেখকের মত দীনবন্ধুর মনও অধিকার করিয়াছিল।'[২]

দীনবন্ধু মিত্রের ঐ রোমান্স-প্রিয়তার ফল হল, তিনটি নাটক—'নবীন তপস্বিনী', 'লীলাবতী' এবং 'কমলে কামিনী'। আবেগের দিক থেকে তিনটি এক সূত্রে গ্রথিত হলেও ভাবের দিক থেকে তিনটি তিন রকমের। প্রথমটি কাব্যধর্মী, রূপকথার আদলে গড়া। দ্বিতীয়টি সামাজিক পটভূমিতে একটি কাল্পনিক চিত্র। তৃতীয়টি ইতিহাস-আশ্রিত রোমান্স। প্রথমটির প্রসঙ্গে সমালোচকদের বক্তব্য হল, 'বিজয় কাহিনীর হঠাৎ দর্শন, রূপানুরাগ,

দ্রুত প্রেমসঞ্চার, অঙ্গুরীয় বিনিময়, ও কাব্যের সুরে প্রবল উচ্ছ্বাস প্রভৃতি সবই দীনবন্ধুর রোমান্সপ্রিয়তার ফল।'[৩] দ্বিতীয় নাটক 'লীলাবতীর' প্রসঙ্গে বঙ্কিমের বক্তব্য হল, 'যাহার আদর্শ সমাজে নাই, তিনি তাহাই গড়িতে বসিয়াছিলেন।'[৪] আর তৃতীয়টি সম্পর্কে সমালোচকের অভিমত হল, 'কাছাড়ের ইতিহাসের কয়েকটি নামমাত্র আশ্রয় করিয়া এই রোমানটিক নাটকের আখ্যানবস্তু পরিকল্পিত হইয়াছে।'[৫]

রেনেসাঁসের পরিবেশ ও আবহাওয়ায় মানুষ হয়েও দীনবন্ধু মিত্র যে যুগ ও কাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র আরেক ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেন, এ জাতীয় অনুমান নিতান্তই অমূলক। রোমান্টিক সাহিত্য যে-কোনো সময়ে, যে-কোনো লেখকের দ্বারা রচিত হতে পারে। তার জন্য রেনেসাঁসের প্রভাব যে অনিবার্য, তা' কখনোই বলা যায় না। সেই হিসাবে দীনবন্ধুকে যে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না, তা' নয়, তবে দীনবন্ধুর বেলায় তা' অসম্ভব। কেননা, দীনবন্ধু পুরোপুরি ভাবে যুগ-প্রকাশক। রেনেসাঁসের সবরকম ভালো-মন্দ, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও সবরকমের লক্ষণ তাঁর সাহিত্যে ধরা দিয়েছে, সুতরাং রোমান্টিক স্বপ্নচিন্তা যদি রেনেসাঁসের লক্ষণ হয়, তা' থেকে তিনি মুক্ত হবেন কী করে?—এ পৃথিবীতে যে বিপুল ঐশ্বর্য রয়েছে তার রং, গন্ধ, ধ্বনি, স্বাদ নবযুগের এই নতুন মানুষরা চান সম্ভোগ করতে। দুর্গম গিরিচূড়া, গহন অরণ্য, অজানা নদীর উৎস, তুষারাবৃত মেরু প্রদেশ বা তপ্ত বালুকায় ঢাকা মরুভূমি, সবই মানুষ চায় তার অধিকারে আনতে। ইউরোপের 'নবজাগরণের' ইতিহাসে একথা যে কী ভয়ঙ্কর ভাবে সত্য, তা একটু খোঁজ নিলেই উপলব্ধি করা যায়। সেদিন ইটালিতে নতুন করে মানচিত্র আঁকবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। প্রয়োজন হয়েছিল ভূগোল-কে নতুন করে জানবার। আর এরজন্য সাহায্য করতে যিনি এগিয়ে এসেছিলেন, তিনি অন্য কেউ নন, তিনি হলেন একজন কবি, এ কবির, নাম পেত্রার্ক। সনেট ও ভৌগোলিক বিদ্যা, ঐ দুইই ছিল তাঁর প্রিয় ও অধিগত। তবে বুকহার্ট সাহেব প্রথম মানচিত্র অঙ্কনের প্রথম গৌরব তাঁকেই দিয়েছিলেন, এবং এঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'Petrarch was not only a distinguished geographer—the first map of Italy is said to have been drawn by direction—and not only a reproducer of the saying of the ancients, but felt himself -the influence of natural beauty.'[৬]

ভূগোলের মানচিত্র কোন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সম্ভোগের জন্ম যে ব্যবহৃত হয় না, তা' কলম্বাস ও ভাস্কো-ডা-গামা প্রমুখ দুঃসাহসী অভিযাত্রীরা আমাদের দেখিয়ে দিয়েছেন। আবার এ অভিযান যে সর্বতো বাহ্য নয়, একথা বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকায় আলোচনা করা গেছে। —আমাদের দেশের রেনেসাঁসের ইতিহাসে অনুরূপ দুঃসাহসী অভিযাত্রীদের আমরা দেখা পাই না। কিন্তু তাই বলে কী আমাদের ভেতরের অভিযাত্রী মন বসে থাকবে হাত গুটিয়ে?—না, এ মন বসে থাকে না। এবং বসে থাকে না বলেই যেমন রোমানটিক জগতের আশ্রয় নেয়। দীনবন্ধুও তাই নিলেন। তবে তিনি কেবল আবেগপূর্ণ রোমানটিকতাকে নিলেন না, তিনি একই সঙ্গে নবযুগের আরেকটি হাতিয়ার সঙ্গে নিলেন। সে হাতিয়ারটি হল,—'হাস্যরসিকতা'। বুকহার্ট সাহেবের ভাষায় বলা যায়, 'রিডিকিউল আণ্ড উইট।'[৭] —দীনবন্ধুর ঐ দ্বিতীয় ধারাটি সম্পর্কে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যেতে পারে, কিন্তু বর্তমান আলোচনায় ঐ হাসির জগতের চরিত্রগুলি যে বারবার উঁকি দেবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এহ বাহ্য। দীনবন্ধুর রোমানটিক বৈশিষ্ট্য বিচারে এবার আমাদের দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।—

নবীন তপস্বিনী

স্বনামে প্রকাশিত দীনবন্ধু মিত্রের এটাই হল প্রথম নাটক। প্রকাশকাল ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দ। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই যে নাটকটি অভিনন্দিত হয়েছিল, তার প্রমাণ আছে। ঐ বছরের 'সোমপ্রকাশে'র ৭ই সেপ্টেম্বর সংখ্যায় 'নবীন তপস্বিনী' সম্পর্কে অজস্র প্রশংসা-বাণী লিখিত হয়েছিল :

'নীলদর্পণ' লিখে দীনবন্ধুর যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল, জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে হয়, সেই তিক্ততা এড়াবার জন্যই কী দীনবন্ধুর এই নির্বিরোধ রোমানটিকতায় পদার্পণ?—অর্থাৎ এটি তাঁর পলায়নী প্রয়াস কী না, তা' একবার খতিয়ে দেখতে ইচ্ছা হয়! বলার অপেক্ষা রাখে না যে এ অনুমান নিতান্তই অমূলক। অন্ততঃ পরবর্তী কাল তার সাক্ষী, তা' ছাড়া 'কালেজীয় কবিতা' যুদ্ধের নায়ক হঠাৎ যদি কাব্যধর্মী এক রোমানটিক নাটক লিখে বসেন, সেটা কী খুবই অসঙ্গত? আর এ ছাড়া, নবজাগরণের রোমানটিক ভাবগত প্রেরণা ত আছেই। সুতরাং এই উপসংহারেই শেষ পর্যন্ত আসতে হয় যে, দীনবন্ধুর এই প্রয়াস আর যা হোক-না-কেন, তা' কখনোই পলায়নী প্রয়াস হতে পারে না।

নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র তাঁর এই 'নবীন তপস্বিনী' রচনায় নানা রকমের অভিজ্ঞতাকে যে কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছেন, তা' এর পাঠক বা দর্শক, কারো কাছে অবিদিত নয়। বাস্তব অভিজ্ঞতা, প্রাচীন উপকথা, ইংরেজি গল্প, খোস গল্প—না, কিছুই বাদ দেন নি। এ ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য হল, 'নবীন তপস্বিনীর বড় রাণী ছোট রাণীর বৃত্তান্ত প্রকৃত।...প্রকৃত ঘটনা, জীবিত ব্যক্তির চরিত্র, প্রাচীন উপন্যাস, ইংরেজি গ্রন্থ এবং 'প্রচলিত খোস-গল্প' হইতে সার দান করিয়া দীনবন্ধু তাঁহার অপূর্ব চিত্তরঞ্জক নাটকসমূহের সৃষ্টি করিতেন। নবীন তপস্বিনীতে ইহার উত্তম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। রাজা রমণীমোহনের বৃত্তান্ত কতক প্রকৃত। হোঁদল কুঁৎকুঁতের ব্যাপার প্রাচীন উপন্যাসমূলক; 'জলধর', 'জগদম্বা', 'Merry Wives of Windsor' হইতে নীত।'[৮]

এখন বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশিত নাটকের কাহিনী-উৎস যাচাই করার আগে, নাটকে বর্ণিত কাহিনীটি কী, তা' একবার যাচাই করে দেখা যেতে পারে।—কাহিনীটি দ্বিধা-বিভক্ত। একভাগে রোমান্স্ কল্পনায় রঞ্জিত বিজয়-কামিনীর প্রেমের আখ্যান, অন্যভাগে হাস্যরসে আপ্লুত জলধর-জগদম্বা ও মালতী-মল্লিকার মধুর ইতিবৃত্ত। রোমান্স্ ও হাস্যরসে দীনবন্ধুর লেখনী সমানভাবে হয়েছে চালিত। 'নীলদর্পণে' নাট্যকার যে সুযোগ পাননি, এখানে তার চূড়ান্ত ব্যবহার করে নিয়েছেন। দুটি উপকাহিনীকে নাট্যকার শেষ পর্যন্ত সমর্থ হয়েছেন একটি উপসংহারে মিলিয়ে দিতে।—যাই হোক, গোটা নাটকীয় আখ্যানটিই কাল্পনিক। রাজা-মন্ত্রিপরিষদ-বিদূষক সবই আছে, তবে তা' সংস্কৃত নাটকের অনুকরণে পরিকল্পিত নয়, এমন কী ইতিহাসের দিকে চোখ রেখেও তা' গড়ে ওঠেনি। রূপ-কথার মতন?—না, তাও নয়। আসলে নাট্যকার তাঁর সামাজিক অভিজ্ঞতাকে গোপন করতে পারেননি। তিনি তাঁর পরিচিত জগতকেই একটু রঙ্ মাখিয়ে সর্বজন সমক্ষে নিয়ে এসেছেন। মাঝে মাঝে রঙ্ গেছে ফিকে হয়ে, সেখানে বাস্তবতা বেরিয়ে এসেছে পর্দা ঠেলে। মল্লিকা-মালতী যত দূরেই থাকুক না কেন, যতই তারা রাজ-পারিষদবর্গের সঙ্গে মাখামাখি করুক, তারা যে আমাদের বাড়ির ও প্রতিবেশির মেয়ে, এটুকু চিনে নিতে কষ্ট হয় না। না, কেবল এরা নয়, শূন্যগর্ভ পণ্ডিতদের চিনে নিতেও আমাদের কষ্ট হয় না। এদের দেখলেই উনিশ শতকের সেই মেকি পণ্ডিতদের কথা আমাদের মনে পড়ে যায়, যাদের ওপর হুতোমের তীব্র রসিকতা একদা চরম নিষ্ঠুরতার মত বর্ষিত হয়েছিল।

পরিকল্পনার দিক থেকে নাটকটি যে নিখুঁত, তা' কোনো রকমেই বলা যায় না। প্রথম যৌবনে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে' দীনবন্ধু মিত্র 'বিজয় কাহিনী' নামে যে ক্ষুদ্র উপাখ্যান কাব্যটি লিখেছিলেন, বর্তমান নাটকের একভাগের কাহিনী এই রকম। এই নাটকীয় আখ্যানেও নায়কের নাম ছিল বিজয়, নায়িকার নাম কামিনী। বঙ্কিমচন্দ্র এই তথ্য নিবেদন করে মন্তব্য করেছেন, 'চরিত্রগত, উপাখ্যান কাব্য ও নাটকের নায়ক-নায়িকার মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই।'[৯]

বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছেন, মোটামুটি ভাবে তা' যথার্থ। তবে নাটকের কাহিনী ও উপাখ্যান কাব্যের কাহিনী পরিবেষণে যে পার্থক্য থাকে, এখানে সেইটুকু পার্থক্যই লক্ষিত হয়। কাব্যিক আখ্যানের সঙ্গে আরো কিছু যোগ করে দীনবন্ধু গড়ে তুলেছেন তাঁর নাটকের কাহিনী। ঐ কাহিনীর একটি 'থিম্'ও আছে, সেই 'থিম্'টি হল নিরুদ্দেশ ও পুনর্মিলন। রাজা রমণী মোহন প্রতীক্ষা করে বসে আছেন, তাঁর বড়ো রাণীর প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায়। বড়ো রাণী শাশুড়ীর ও সপত্নীর যন্ত্রণায় দীর্ঘকাল নিরুদ্দিষ্টা, আর বড়ো রাণী যখন নিরুদ্দিষ্টা হন, তখন সন্তানবতী ছিলেন।—এর পরে গড়িয়ে গেছে প্রায় ষোলো-সতর বছর। শাশুড়ী ও সপত্নী দুই-ই মারা গেলেন। সপত্নী ছিলেন নিঃসন্তানা। সুতরাং রাজার সংসারে মন বসে কই?—ইতিমধ্যে জনশ্রুতি ছড়িয়ে পড়ল, রাজা পুনরায় দার-পরিগ্রহে উদ্যত। কিন্তু রাজা যে কী চান, তা' কী কেউ জানে?

পার্শ্ব-কাহিনীর নায়ক রাজার মন্ত্রী জলধর স্বয়ং। এই জলধরকে নিয়ে ঐ রাজ্যের উচ্ছলা রমণীকুল মালতী-মল্লিকা যে কৌতুকের আসর বিছিয়েছে, তা' সত্যি সত্যিই উপভোগ্য। জলধরের পরস্ত্রীলোলুপতাকে লাঞ্ছিত করবার পর এবং বড়োরানীর স-সন্তান প্রত্যাবর্তনে নাটকের শুভান্ত পরিণতি।

স্বীকার না করে উপায় নেই, মূল কাহিনীর তুলনায় পার্শ্বকাহিনী অধিকতর প্রাণচঞ্চল, মানবিক এবং উপভোগ্য। মন্ত্রী জলধরের চলা-ফেরা, কৌতুকপ্রিয়তা, জগদম্বার সঙ্গে মল্লিকা-মালতীর সংলাপ কেলিগৃহে সাক্ষাৎকারের সময় নির্ধারণ, জগদম্বার কাছে গোপনতত্ত্ব ফাঁস, যথাকালে মালতীর বেশে জগদম্বার উপস্থিতি, জলধরের হোঁদল কুঁৎকুঁৎ রূপ ধারণ—সবটাই নাটকীয় উৎকণ্ঠায় ভরা এবং হাস্যরূপে উচ্ছল। পক্ষান্তরে মূল কাহিনীটি একঘেয়ে, ঘটনাবর্জ্জিত, বর্ণনাধর্মী এবং আবেগে প্রবমান। বিজয় কামিনীর প্রেমালাপ, রাজসভার পণ্ডিতচিত্র, রাজা রমণীমোহনের সকরুণ আক্ষেপোক্তি

বা ঘটককুলের চরিত্র-চিত্র কোনো রকমেই নাট্যোৎকণ্ঠা নির্মাণে সমর্থ হয়নি। মোটকথা, এই অংশটি সর্বৈব ব্যর্থ।—বর্তমান আলোচনায় তাই এ প্রসঙ্গ বর্জন করাই বিধেয়, যদিও রোমান্টিক আবেগপূর্ণ প্রেমের প্রসঙ্গে বিজয়-কামিনীকে হয়ত আবার আলোচনা করা যেতে পারে।

'নবীনতপস্বিনী' নাটকে সর্বাধিক উপভোগ্য চরিত্র হল জলধর। কেবল উপভোগ্য নয়, জীবন্ত চরিত্র। এই চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে যে রসের উৎসার, সেই রসই দীনবন্ধুর প্রতিভার যে উপযোগী, তা' ব্যাখ্যা করে বলবার অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং আলোচনাটি এই কাহিনী-কেন্দ্রিক হওয়াই শ্রেয়।

জলধর চরিত্রটির পরিকল্পনার মূলে ঠিক কী কী প্রভাব উপস্থিত ছিল, আজ তা' সুনিশ্চিত করে নির্ণয় করা কঠিন। তবে সেক্সপীয়ার-চিত্রিত 'মেরী ওয়াইভ্‌সের' ফলস্টাফ সে এই চরিত্র পরিকল্পনায় অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। উল্লেখ না থাকলেও আরেকটি চরিত্রের কথা এখানে নিবেদন করা যেতে পারে, সে চরিত্রটি হল টেকচাঁদ চিত্রিত 'আগড়ভম সেন'। এই আগড়ভমের পরিকল্পনায় ফলস্টাফের প্রভাব ছিল কী না জানি না, কিন্তু সাদৃশ্য যে বর্তমান, তা' দেখিয়ে দেবার অপেক্ষা রাখে না। আর 'আগড়ভম'যে বাঙ্‌লা-সাহিত্যে জলধরের অগ্রজ, তারিখ-সনের কষ্টিপাথরে যাচাই করে অতি দ্রুত এ সিদ্ধান্ত দেওয়া যায়।

জলধরের আকৃতি বর্ণনায় নাট্যকার জানিয়েছেন 'পেট এমন বেড়েছে, লাই চুলকোবার যো নেই, হাত ততদূর যায় না; বর্ণটিতো তেলকালি, তাতে আবার এক একখানি দাদ হয়েচে, চেগারার চটক দেখে কে? ঠোঁট দুখানি যেমন কালো, তেমনি মোটা, কসের কাছাটি শাদা, আর অল্প অল্প লাল। চক্ষুদুটি যেমন ছোট তেমনি খোল্লো, তাতে আবার আড় নয়নে চাওয়া হয়।[১০] —পক্ষিরাজ আগড়ভম সেন এই জলধরের থেকে জমকালো। টেকচাঁদের কলম থেকে তার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা' এই রকম 'আগড়ভম সেন লাউসেনের পৌত্র—তাহার শরীর প্রকাণ্ড—পেটটি একটি ঢাকাই জালা—নাকটি চেপ্টা—চোখ দুটি মৃদঙ্গের তালা হাঁটা বোড়া সাপের মত—দন্তগুলি মিসি ও পানের ছিবড়ের তবকে চিক্ চিক্ করিতেছে। গোঁফ জোড়াটি খ্যাঙ্গরার মুড়া ও চুলগুলি ঝোটন করিয়া কালা ফিতা দিয়া বান্ধা, নানা প্রকার নেশা করিয়া থাকেন—কোন নেশাই বাকি নাই—প্রাতঃকালাবধি তিন চারিটি বেলা পর্যন্ত নিদ্রিত থাকেন, তাহার পর গাত্রোত্থান করিয়া স্নান

আহার করেন, পরে পক্ষীদলের পক্ষিরাজ হইয়া সমুদায় রজনী 'সজনী সজনী' বলিয়া চীৎকার পুরঃসর সখি-সংবাদ, বিরহ লাহড়, খেউর, টপ্পা, নক্কা, জঙ্গলা, গজল ও রেক্তা গাহিয়া পল্লীকে কম্পিত করেন;'[১১]—সুন্দরী রমণীদের মোহিনী মায়ায় ভুলে এই আগড়ভম একবার ভীষণ ভাবে লাঞ্ছিত হন। ভুবন মোহিনীর সহচরী নন্দন বাগানের টোলের কাছে নিয়ে গিয়ে বেচারি আগড়ভমকে কী ভাবেই না লাঞ্ছনা করল! এবং সেই ঘটনাটি এই রকম: 'সহচরী বলিল, আপনি স্থির হইয়া ঐ জানালার নীচে বসুন, আমি সেই স্থির বিদ্যুল্লতাকে আনিয়া দেখাই।' এই বলিয়া রত্নমালা প্রস্থান করিল। এদিকে পাক্ষরাজ শয্যা কণ্টকীর ন্যায় অস্থিরচিত্তে বসিয়া রহিলেন। ক্রমে একঘণ্টা, দুই ঘণ্টা, তিন ঘণ্টা গত হইল, কাহারো দেখা নাই—যাবতীয় অপরিষ্কার স্থানের মশা ও ডাঁস গায়ে বসিতেছে··· ইত্যবসরে জানালার উপর দিয়া টিকা গোলা, আলকাতরা, কালি, চুণ তাঁহার মস্তকে ছর্ ছর্ করিয়া পড়িল। পক্ষিরাজ অমনি ধড়পড়িয়া উঠিয়া একি একি বলিয়া উপরে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না—তাঁহার সমস্ত অঙ্গ বিবর্ণ হইয়া গেল ও গা মাথা আলকাতরায় চট্‌চট্‌ করিতে লাগিল।··· ইতিমধ্যে এক ধামা শিমূল তুলা ও চাউলের কুঁড়া মাথায় গায়ে পড়িয়া আলকাতরার সহিত একেবারে লিপ্ত হইয়া গেল, তখন আগড়ভম ভোম হইয়া স্বীয় শরীর ও জানালার প্রতি একবার দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু এক প্রাণীও দৃষ্টিগোচর হইল না, কোন দূর থেকে খিল্ খিল্ হাসির শব্দ হইতেছিল।[১২]

'নবীন তপস্বিনী'র জলধরকে নিয়ে এ ঘটনাই ঘটেছে। নায়িকা মালতীর সংলাপ উদ্ধৃত করে বলা যায়। 'গুড় আলকাতরায় অভিষেক হয়েচে, মুখে মুখস দেওয়া হয়েচে, এইবার তুলো-শোণ আর আবির দেওয়া হবে, তার-পরেই হোঁদল কুৎকুঁৎ ধরা পড়বে।'[১৩]

এই 'হোদল' বেশী জলধর বাঙলা সাহিত্যে আগড়ভম সেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হলেও, নাটকে সে হোঁদল-বংশের প্রতিষ্ঠাতা বলা যায়। পরস্ত্রী-লোলুপতা তাকে টেনে নিয়ে গেছে শেষ পর্যন্ত চরম দুর্ভোগের গভীরে। অভিষিক্ত হয়েছে সে গুড়-আলকাতরায়, পরতে হয়েছে মুখে হোঁদলের মুখোশ, আর তুলো শণে আবৃত হয়ে, আবিরে প্রসাধিত হয়ে হতে হয়েছে পুরোপুরি হোঁদল কুৎকুঁৎ। স্বীকার করতেই হয়, বাঙ্‌লা নাটকে এ জাতীয় উপভোগ্য চরিত্র সেদিন দ্বিতীয় কোনো ছিল না।

এই অভিনব চরিত্রের ওপর, বঙ্কিম-প্রমুখ সকল সমালোচকই দেখিয়েছেন,

সেক্সপীয়ায়ের লেখা 'উইণ্ডসারের' উচ্ছল রমণীযুগলের দ্বারা লাঞ্ছিত ফলস্টাফ চরিত্রের আশ্চর্য প্রভাব বিদ্যমান। ফলস্টাফ-কে এইরকম করে আঁকবার প্রেরণা সেক্সপীয়ার কোথা থেকে পেয়েছিলেন, সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা উদ্যত হতে পারে। তবে প্রাসঙ্গিক ভাবে এটুকু জেনে রাখা দরকার, যুগধর্মকে সেক্সপীয়ার সেদিন অতিক্রম করতে পারেন নি। 'রেনেসাঁসী' প্রভাব এখানেও ভেতরে ভেতরে তাঁকে করেছে প্রভাবিত। রাজা, রাজকর্মচারী বা অর্থবান বণিককুলও নয়, সাধারণ 'মধ্যবিত্ত' সমাজের একটি ছবি খুব ফিকে হয়ে তাঁর এই নাটকে পড়েছে বলে অনেকে অনুমান করেন। সমালোচকদের এ প্রসঙ্গে বক্তব্য হল, 'The *Merry wives* depicts accurately middle class Provincial life.' [১৪]—অর্থাৎ 'মধ্যবিত্ত'দের প্রাদেশিক পর্যায়ের জীবনের ছবি একটু চড়া রঙে রাঙিয়ে একটু উচ্ছলভাবে, উক্ত নাটকে উপস্থাপিত করেছেন সেক্সপীয়ার। বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের আলোচ্য নাট্যকার দীনবন্ধুও, তাঁর জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে, যেভাবেই হোক-না-কেন, আমাদের 'মধ্যবিত্ত' জীবনের ছবি এখানে এঁকে বসেছেন। আমাদের সমাজে 'মধ্যবিত্ত'-শ্রেণীর আবির্ভাব গত শতকের মাঝামাঝি সময়ের কিছু আগে থেকেই যে ঘটেছে, একথা নতুন করে বলবার অপেক্ষা রাখে না। এই চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত সমাজ ছিল 'রেনেসাঁসী' চিন্তা-ভাবনার ধারক ও বাহক। সুতরাং সাহিত্যে ও সমাজে তাদের অনুপ্রবেশ নিঃসন্দেহে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা।

না আমাদের এই অনুমান নিছক কল্পনা-বিলাস নয়। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত 'লর্ড রিপনের উৎসবের জমা-খরচ'[১৫] শীর্ষক একটি প্রবন্ধের কথা প্রাসঙ্গিক ভাবে আমাদের মনে পড়ে যেতে পারে। ইংরেজ শাসনে আমাদের দেশের কতখানি লাভ হয়েছে, তা' খতিয়ে দেখতে গিয়ে 'চতুর্থলাভ' হিসাবে এটি পেয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এবং বঙ্কিমের ভাষায় এই বিবর্তনটি এভাবে বিবৃত হয়েছে, '…আমাদের চতুর্থ লাভ—এটুকু কেবল বাংলার লাভ—সমাজের কর্তৃত্ব ভূম্যধিকারীদের হাত হইতে এই প্রথম মধ্যবিত্ত লোকের হাতে গেল। অর্থাৎ কর্তৃত্ব, ধনের হাত হইতে বুদ্ধি-বিদ্যার হাতে গেল। এখন হইতে বাঙ্গালার ধনবানেরা আর কেহই নহেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ই কর্তা। ইহা সমাজের পক্ষে বিশেষ মঙ্গলকর, উন্নতির লক্ষণ উন্নতির সোপান।'— 'মধ্যবিত্ত'দের সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এই ঢালাও প্রশংসা-বাণী বর্ষণ ঠিক হয়েছিল কী না, তা' নিয়ে হয়ত কেউ কেউ কূট তর্ক উত্থাপন করতে পারেন,

কিন্তু আমাদের পক্ষে নির্দ্বিধায় যা বলা যায় তা' হল বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ লেখা প্রকাশিত হবার অন্ততঃ তিন দশক আগে ঐ 'মধ্যবিত্ত' শ্রেণীর জন্ম হয়ে গিয়েছে এবং দুই দশক আগে সাহিত্যে তাদের চরিত্রও চিত্রিত হতে আরম্ভ হয়েছে। আর এই চিত্রীদের মধ্যে যাঁদের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করা যায়, তিনি হলেন দীনবন্ধু মিত্র: এবং তাঁর লেখা 'নবীন তপস্বিনী' থেকেই এ জাতীয় রচনার যে সূচনা, তা' আগে ভাগেই বলে রাখা ভালো।

এই কথাগুলি মনে রেখেই আমাদের নাটকের চরিত্রগুলির বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য বিচার করা দরকার। জলধর-জগদম্বা থেকে মল্লিকা-মালতী সকলের ক্ষেত্রেই আমাদের ঐ কথাগুলি মনে রাখতে হবে।

জলধর চরিত্রের উৎস যে 'ফলস্টাফ', একথা আগেই বলা হইয়াছে। তবে কোন্ জাতীয় 'ফলস্টাফ', এই নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে পারে এবং একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে 'মিডিয়াভাল ভাইস' ঐ দু'ধরনের বা দুরকম এর চরিত্র পরিকল্পনার মূলে রয়েছে। কবে ও কখন সেক্সপীয়ার 'মেরী ওয়াইভ্‌সের' বর্তমান পাঠ রচনা করেছিলেন, এ নিয়ে আজো গবেষণা চলছে, তবে একথা মোটামুটিভাবে স্বীকৃত যে রাজপ্রাসাদ থেকে আসা একটি অনু-রোধে ফলস্টাফকে এরকম উপভোগ্য প্রেমিক সাজানো হয়েছিল। প্যারট সাহেবের ভাষায় বলা যায়, এ নাটকটি 'was written in haste to gratify the royal whim.'[১৬]—পাঠকদের অনুরোধে একদা যেমন শার্লক হোম্‌সকে-কে উঠতে হয়েছিল বেঁচে, ঠিক অনুরূপভাবে, তবে অনেককাল আগে, 'পঞ্চম হেনরী' নাটকে একদা-মৃত ফলস্টাফকে পূর্ণজীবন লাভ করতে হয়েছিল এবং বহাল তবিয়তে সরস বসন্তে দেখা গিয়েছিল উইণ্ডসরে।—এই হল জলধর সদৃশ ফলস্টাফের প্রাথমিক আবির্ভাবের ইতিহাস।

তবে সেক্সপীয়ারও যে এই অভিনব চরিত্রটিকে যে নিজের কল্পনা দিয়ে বানিয়েছিলেন, এ কথাও সমর্থিত নয়। বরং তিনিও যে প্রচলিত খোশগল্পের থেকে এটিকে সংগ্রহ করেছিলেন, সে প্রমাণই বেশী।—'মেরী ওয়াইভ্‌সের' শেষের দিকে ফলস্টাফ নিজেই কবুল করেছে, 'I do begin to perceive that I am made an ass.'[১৭]—এই যে 'গাধা' হওয়ার মত উপলব্ধি, ঠিক এরকম একটি 'গাধা' গল্পের উৎস থেকেই ঐ চরিত্রটির যে সৃষ্টি, তার সুনিশ্চিত প্রমাণ রয়েছে। Giovanni Fiorentine লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'It pecorone' এর কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। আর Straporola লিখিত Piaccevoli Notti র ভেতরেও 'It Pecorone' শীর্ষক একটি গল্পকে

অনেকে ফলস্টাফের উৎস বলে মনে করেছেন। এখানে বলে রাখা দরকার, 'পেকোরোন' কথাটির অর্থ হল 'গাধা'। অর্থাৎ 'গাধা' গল্প থেকে গাধা ফলস্টাফের যে জন্ম, এ তারই ইঙ্গিত। এ ছাড়া আরো একটি তথ্য মনে রাখবার মত। ইংল্যাণ্ডে ১৫৯০খ্রীষ্টাব্দে একটি গল্পগুচ্ছ প্রকাশিত হয়েছিল, তার নাম ছিল, 'টার্লটন্‌স নিউজ আউট অব পার্গেটরি'। ঐ গল্প সংকলনে 'দি টু লাভার্স অব পিসা' নামে যে গল্পটি ছিল, তার সঙ্গে এই 'মেরি ওয়াইভ্‌সে'র কাহিনীর আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখা যায়। এই কাহিনীতে এক বিবাহিতা রমণী তার ঈর্ষাপরায়ণ স্বামীর হাত থেকে তার প্রেমিককে নিজের বুদ্ধির চাতুর্যে তিন তিনবার বাঁচিয়েছিল। প্রথমবার ঐ প্রেমিককে সে লুকিয়ে রেখেছিল একটি 'ড্রাইভ্যাটে', দ্বিতীয়বার দু'টি 'সিলিং'-এর মাঝে এবং শেষবার 'in a chest supposedly full of valuable papers.'—বলার অপেক্ষা রাখে না, ফলস্টাফও অনুরূপভাবে তিন তিনবার মাত্রারিক্ত ভাবে লাঞ্ছিত হয়ে একবারে শেষে পরীর পোশাক-পরা একরাশ বালকের দ্বারা কী খোঁচাই না খেয়েছে!—'He howls with pain and they dance about, singing and pinching him.'[১৮]—বালকদের দ্বারা এই ভাবে চিম্‌টি খেয়ে দেখা দিল 'complete collapse of falstaff's morale.'[১৯]—অর্থাৎ ঐ ভাবে নিপীড়ন সহ্য করবার পর বেচারি ফলস্টাফের বুকের বল একবার ভেঙ্গে পড়ল। বেচারি হয়ে পড়ল একবারে অসহায়।

সকলে হয়ত স্বীকার নাও করতে পারেন, কিন্তু ঐ ভেঙ্গে-নড়া ফলস্টাফকে অনায়াসেই ভেঙ্গে-পড়া 'মধ্যবিত্ত' চরিত্রের সঙ্গে সমন্বিত করা যায়। কেবল-মাত্র 'মিডল্‌ ক্লাশ প্রভিন্‌সিয়াল লাইফ' নয়, 'মিডল্‌ ক্লাশ' নার্ভও যে এই নাটকে কয়েকটি চরিত্রের মাধ্যমে অনুভব করা যায়, একথা কা অস্বীকার করবার উপায় আছে?—আর যদি-বা এই স্নায়বিক দুর্বলতা 'মেরী ওয়াইভ্‌সে' অস্বীকার করলেও করা যায়, কিন্তু এর বঙ্গসংস্করণ 'জলধরে' তা করা বোধ হয় দুঃসাধ্য। কেননা জলধর বিদেশী আদেশে চিত্রিত হলেও, এদেশের মাটিতে তার মত সাদৃশ্যযুক্ত কিছু মানুষকে আমরা দেখেছি। অন্ততঃ অমরচরিত্র ভাঁড়ুদত্ত ও মুরারি শীলকে আমাদের পক্ষে বিস্মৃত হওয়া শক্ত।—তবে একথাও বলে রাখা দরকার 'জলধর" চরিত্রটিকে তাই বলে কিন্তু কোনো 'ভিলেন' হিসাবে আঁকা হয় নি। সে যে সত্যিকারের একজন খল-নায়ক, একাধারে হিংস্র এবং নির্মম, এমন কথা কোনোরকমেই বলা যায় না। মল্লিকা-মালতীর প্রতি তার আকর্ষণ যদিও সুস্থতার পর্যায় অতিক্রম

করেছে, কিন্তু তাই বলে তাকে 'ভিলেন' আখ্যা দিয়ে ঐ পটভূমিতে তার চরিত্র-বিশ্লেষণ করা, নিছক বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কিছু নয়। আপাত দৃষ্টিতে জলধরকে কোনো কোনো সময় ভাঁড় বলে মনে হতে পারে। মনে হতে পারে সে বুঝি নিজের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন নয়, বা সামাজিক গৃহবধূদের সম্পর্কে বুঝি তার কোনো জ্ঞানই নেই। বলে রাখা ভালো, একথাও ঠিক নয়। নিজের সম্পর্কে সে যে কারো চেয়ে কম ওয়াকিবহাল নয়, তা' তার একাধিক স্বগত সংলাপে প্রমাণিত। এক জায়গায় সে বলেছে, "যেমন দেবা তেমনি দেবী, যেমন জগন্নাথ, তেমনি সুভদ্রা, যেমন জলধর তেমনি জগদম্বা।'[২০] বৃদ্ধের বিবাহে কি বিড়ম্বনা ঘটতে পারে, ঐ আত্ম-সমীক্ষা ছাড়াও, তার একটি চমকপ্রদ বিবরণ এই জলধরের মুখ থেকেই শোনা যেতে পারে এবং সেই আশ্চর্য বিবরণটি হল এই রকম: ...'শিরোমণি মহাশয় যে বারে তৃতীয় পক্ষে বিবাহ করেন, তাতে কি বিপদ না ঘটেছিল; ছাঁন্নাতলায় শাশুড়ীমাগী চীৎকার ধ্বনি করতে লাগলো, বরকে কনে বাবা বলে ডাকতে লাগলো, তারপর তিনশত টাকা বয়স অধিকের জরিমানা দিলে বিবাহ' হলো, বরের বাঁ পায়ে একখান দাদ ছিল বলে তার জন্য পঁচিশ টাকা নিলে।'[২১]—যে এই গল্প বলতে পারে এবং যে বয়স্ক মানুষটি নিজের রূপ সম্পর্কে সচেতন, সে কী করে তরুণী বধূদের ছলনায় আত্মবিস্মৃত হয় এবং তাদের মোহিনী আকর্ষণে ধরা দেয়, সেটাই হল সর্বাধিক দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়তা। অবশ্য মেয়েদের চরিত্র সম্পর্কে তার আরেকটি স্বতন্ত্র ধারণা আছে, এবং সে ধারণা তার নিজস্ব। সম্ভবতঃ সেই ধারণাই তাকে বিপরীত পথে করেছে চালিত। এই ধারণাটি হল, 'মেয়েমানুষ বশীভূত হওয়ার চিহ্ন ঠাট্টা আর গালাগালি, যে বেটী বাপান্ত করলো সে মুঠোর ভেতর এলো।'[২২]

এত বিচক্ষণতা সত্ত্বেও বেচারি জলধরকে দু'-দু'বার ভোগ করতে হয়েছে দারুণ দুর্ভোগ। প্রথমবার স্ত্রী জগদম্বার হাতে এবং দ্বিতীয়বার মেরি ওয়াইভস মল্লিকা-মালতীর হাতে। মিসেস্ ফোর্ড ও মিসেস্ পেজ ফলস্টাফ-কে যেমন জব্দ করেছিলেন, মল্লিকা-মালতীও ঠিক তাই করেছে। জলধরকে খাঁচায় পুরে সভায় উপস্থিত করার কল্পনা দীনবন্ধুর মৌলিক—রঙ্গের মাত্রা এখানে সেক্স-পীয়ারকেও অতিক্রম করে গেছে।

স্বীকার না-করে উপায় নেই, মল্লিকা-মালতীর দিকে এমন যার বেগবান গতি, সে জীবন্ত না-হয়ে যায় কোথায়?—তা' ছাড়া নাটকের ভেতর এই একটিই মাত্র চরিত্র যে প্রতিটি ঘটনায় নিজেকে প্রকৃত নাটকীয় করে তুলতে

পেরেছে। এবং ঘটনার সঙ্গে নিজেকেও উপভোগ্য করে তুলেছে সরস ও সহজ রসিকতায়। এমন কী চরম দুর্ভোগের মুহূর্তেও, সে নিজের রসিকতাকে বিসর্জন দিতে পারে নি। একবারে শেষ পর্যায়ে যখন সে ধরা পড়তে চলেছে, সমস্ত পরিস্থিতি জেনেও, মল্লিকার কথায় জলধর কৌতুক করে বলেছে—

'অজগর ভয় সাপ বেরিয়ে কাঁদায়
ডুবিযাছে প্রেম-ভেল হৃদয় ডোবায়।
ভেক যদি মাতা তোলে জলের উপর,
কপ করে দেবে সাপ পেটের ভিতর।'[২৩]

এ প্রসঙ্গে এই নায়ক জলধরের একটি গান আছে, খেমটা গান, সে-গানেও এই রসিকতা সঞ্চারিক। ভাষার সঙ্গে ভাবের এমন পার্বতী-পরমেশ্বর তুল্য মিল ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়। গানটি এই,—

মালতীর মালা, গামছা হারায়ে এলেম ঘাটে।
তেলের বাটী গামছা হাতে গিয়েছিলাম নাইতে,
পা পিছলে পড়ে গেলেম বঁধোর পানে চাইতে।[২৪]

আলকাতরা-তুলো-শণ-আবিরে আবৃত হয়ে এবং মুখে মুখোশ পরে বেচারি যখন খাঁচার ভেতর ঢুকেছে, তখনও রসিকতায় সে প্রগল্‌ভ—

'প্রেম পুতলেন পাঁকের ভিতর ; পালাই কেমন করে,
হাড় গোড় ভাঙ্গা জটি হবো, তাড়্‌কে যদি ধরে।'[২৫]

শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছে হোঁদল[২৬] কুঁৎকুঁৎ। খাঁচায় ভরে তাকে নিযে আসা হয়েছে জনসমক্ষে। সকলে মজা পেয়েছে। আর মজাই যখন সকলে পেয়েছে, তখন যথার্থ হেঁদিল হতে জলধরেরই বা আপত্তি হবে কেন? বাহক-দের খোঁচা খাবার পর সে নিজেও নিজের সঙ্গে কৌতুক করে বলে উঠল 'উক্‌-কুউ, উক্‌-কুউ, কুউ-উকু ; কুউ-কুউ-খাবো, মানুষ খাবো, চারটে বেহারা খাবো, হা করে চারটে বেহারা খাবো, মাথা চিব্‌য়ে খাবো।'—[২৭] রাজা-মাধব-রতিকান্ত সকলে এসেছেন হোঁদল দেখতে। মাধবের জিজ্ঞাসা ছিল, এ অবস্থা হল কেন? জলধরের এ রূপ কেন? জলধর এ জিজ্ঞাসার জবাব দিয়েছে, 'আমি ধরিনি, ধর্‌য়েচে। এইবার আমার রসিকতা বের‌য়ে গিয়েচে, মালতীর সহিত প্রেম কত্তে গিয়ে মা বলে চলে এসিচি—বাবা সদাগর আমাকে ছেড়ে দাও আমি গা ধুয়ে বাঁচি।'[২৮]—এই হল জলধর-চরিত্র। সেক্সপীয়ারের 'মেরী ওয়াইভ্‌স্‌' সম্পর্কে যেমন বলা হয়ে থাকে, 'ইট্‌স সাকসেস্‌ ইজ্‌ মেন্‌লি ডিউ টু দি কমিক ক্যারেক্টার্‌ অব ফলষ্টাফ।'[২৯]

এই 'নবীন তপস্বিনী' সম্পর্কেও ঠিক ঐ কথাই প্রযোজ্য। জলধর চরিত্রটি না-থাকলে দীনবন্ধুর এই দ্বিতীয় নাটকটি কী সার্থক হতে পারত?

'জলধরে'র পরেই এ নাটকে সর্বাধিক উপভোগ্য চরিত্র হল, তার সহধর্মিণী জগদম্বা। রূপে যদিও সে স্বামীরই সমতুল্যা, কিন্তু গুণের ব্যাপারে তার পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। আর যাই হোক, স্বামীর মত সে নীতিজ্ঞান বর্জিতা নয়। আর স্ত্রীকে নিয়ে জলধরের কেনো গৌরব না থাকতে পারে, কিন্তু স্বামী জলধরকে নিয়ে স্ত্রী জগদম্বার যা দেমাক, তা' বড়ো-ঠাকুরেদের গৃহিণীদের কথা মনে করিয়ে দেয়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে না-বলে পরোক্ষভাবে মধ্যবিত্ত সমাজের ছবি দীনবন্ধু এখানে এঁকেছেন। স্বামী সম্পর্কে জগদম্বার যে গর্ব এবং তজ্জনিত যে দম্ভোক্তি, যে উক্তি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় একটি দেমাকী মধ্যবিত্ত মহিলার কণ্ঠস্বরই আমরা শ্রুত হচ্ছি। প্রতিবেশী বধূদের সম্পর্কে জগদম্বার যে তিরস্কার তা'হল এই,—'পাড়ার পোড়াকপালীরে, পাড়ার সর্বনাশীরে, পাড়ার সাতগতরখাগীরে, পাড়ার গস্তানীরে, পাঁড়ার পাড়া-কুঁদুলীরে, এক ভাতারে মন ওঠে না, সাত ভাতার কত্তে যায়, ঘাট মানে না, পথ মানে না, মাঠ মানে না, বড় লোক দেখলে ডেকে কথা কয়; ওমা, কোথায় যাব, কি লজ্জা, কলিকালে হলো কি, যেমন দিইচিস্ তেমনি পেইচিস্, জল দিয়ে আসতিস্, মন্ত্রীর মাগ হতে পেতিস্।'[৩০] ঝগড়াটে মেয়েদের কলহ-কোঁদলের ভাষা ঠিক কী রকম হওয়া উচিত, এবং তার একটি আদর্শ নমুনা হিসাবে এ ভাষাকে যে গ্রহণ করা যেতে পারে, সে বিষয়ে সম্ভবতঃ কারো দ্বিমত হবে না। আর সর্বাধিক লক্ষণীয়, এই আদর্শ ভাষা আর যারই সংলাপের ভাষা হোক, অন্ততঃ রোমান্টিক নাটকে 'মন্ত্রীর মাগে'র সংলাপ এটি হতে পারে না।—কিন্তু এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছে, এ ভাষা ঐ মন্ত্রীর স্ত্রীর কণ্ঠেই শোনা গেছে। আর যেহেতু একটি মধ্যবিত্ত মনোভাব এর ভেতর দিয়ে প্রকাশিত, চরিত্রেও তা' প্রতিফলিত হতে দেখা গেল।—'মালতীর' ছদ্মবেশে থেকে নিজের স্বামীর কণ্ঠে নিজের নিন্দা শোনবার সঙ্গে সঙ্গে তার 'মন্ত্রীর মাগ' হওয়ার গর্বটুকু ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে। তখন তার সবরকম অভিমান ও গর্ব রূপান্তরিত হয়েছে ক্রোধে। এই ক্রোধে সে স্বামীকে বেপরোয়া ঝাঁটা পেটা করে সখেদে বলছে, গোল্লায় যাও, গোল্লায় যাও, এমন পোড়া কপাল করেছিলাম, এমন পোড়ার দশা আমার, আমায় কেন নুন খাইয়ে মারেনি—আমার আপনার ভাতারের মুখে এমন ব্যাখ্যানা, আমি আজ গলায় দড়ি দিয়ে মরবো, আমি জলে ঝাঁপ দেবো, তোর সংসার নিয়ে তুই

যাক—'[৩১] সংক্ষেপে চিত্রিত হলেও, এই হল জগদম্বার জীবনের ট্র্যাজেডি। জগদম্বার সমস্ত কুশ্রীতার ভেতরেও এইখানেই লেখক একটি নাটকীয় সৌন্দর্যের আলোকপাত করেছেন।

উছলা রমণী যুগল মল্লিকা-মালতীর নাম একসঙ্গে উচ্চারিত হলেও, এবং একই লক্ষ্যে তারা নিবদ্ধা থাকলেও, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য দু'জনে পৃথক পৃথক সত্তার মানবী।—মল্লিকা একটু চটুল, মালতী গভীর। জলধরের সঙ্গে ব্যবহারে এই পার্থক্য খুব সহজেই চোখে পড়ে। মালতী যে গভীর, তা' তাঁর অভিনয়ে ব্যর্থতা দেখেই বোঝা যায়। জলধরের সঙ্গে প্রেমাভিনয়, এঁদের কাছে একটি কৌতুকের খেলা। এই খেলা কিন্তু সব সময় মালতীর কাছে ঠিক খেলা থাকে না। বেচারি মালতীর মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যায়। জলধর যখন মালতীর কাছে প্রেম নিবেদন করছে, মালতী খেলা ভুলে হঠাৎ বলে উঠেছে, 'মন্ত্রি মহাশয়, আপনি রাজমন্ত্রী, রাজার অধিকারে যত মেয়ে আছে, তাদের সতীত্ব রক্ষা করবেন, আপনার পরনারীর প্রতি দৃষ্টি দেওয়া উচিত নয়। আপনি যদি ঘাটের পথে আমাদের এরূপ বিরক্ত করেন, আমরা রাজবাটীতে জানাব।'[৩২]—কৌতুকের খেলায় যাঁরা মেতেছেন, তাঁদের পক্ষে এ জাতীয় অভিযোগ কেবল বেসুরো নয়, নাটকের পক্ষেও অনুপযুক্ত। আর ঐ প্রেমের ভাষা যদি সত্যি-সত্যিই মালতীর কাছে অচ্ছ্যুৎ হয়, তবে, স্বাভাবিক ভাবেই, প্রশ্ন উঠবে এ কৌতুকজনক খেলায় তার লিপ্ত হওয়া কেন?

মল্লিকা এদিক থেকে সার্থক। মালতীর একেবারে বিপরীত। জলধরকে কেন্দ্র করে সে সত্যিসত্যিই কৌতুকের হাট বসিয়েছে। আর জলধরকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করে সে যে আনন্দ পায়, তার বোধকরি তুলনা হয় না। সেক্সপীয়ারের 'মেরী ওয়াইভ্‌সে' মিসেস্ ফোর্ডের সঙ্গে এই মল্লিকার অনেকখানি মিল আছে। ফলস্টাফ-কে কী ভাবে নেওয়া যেতে পারে, তার প্রসঙ্গ তুলে মিসেস্ পেজ-কে শ্রীমতী ফোর্ড বলেছিলেন, 'How shall be revenged on him? I think the best way to entertain him with hope, till the wicked fire of lust melted him in his own grease.'—[৩৩] ঠিক এই ভাষাতে তার অভিপ্রায়ের কথা মল্লিকা বর্তমান নাটকে ব্যক্ত করেনি বটে, কিন্তু কার্যতঃ প্রমাণ পাওয়া গেছে তারই পরিকল্পনায় 'উইকেড ফায়ার অব লাস্ট' কী ভাবে বেচারি জলধরকে করেছে বিপর্যস্ত এবং পরিশেষে বিধ্বস্ত। মালতীকে অধিকারে আনবার জন্য মল্লিকার কাছে

আত্মসমর্পণ করে জলধর বলেছ, 'মল্লিকে, তোমার কথাগুলিন যেন আকের টিকলি, আমার হয়ে মালতীকে দুটো কথা বলো, মালতীর জন্তে আমি সর্বত্যাগী হয়েছি।'[৩৪] 'আকের টিকলি' যার সংলাপ, সেই নাটকীয় চরিত্রটি যে শক্ত কথার অন্তরালে মিষ্টিরসের স্বাদ লুকিয়ে রাখবে, এ অনুমান অসঙ্গত নয়। কেবল শব্দে নয়, বাক্যেও ধাঁধাঁ স্বষ্টি করেছে এই উচ্ছলা মল্লিকা। আর ঐ ধাঁধায় পড়ে বেচারি জলধর বিপর্যস্ত হলেও, পার্শ্বচরিত্র হিসাবে সদাগর রতিকান্তও একবার কম বিড়ম্বিত হয় নি। সন্দিগ্ধমনা রতিকান্ত জলধরের কেলিগৃহে জগদম্বাকে মালতীভ্রমে যে লাঠি তুলেছিল, তার মূলে ছিল এই মল্লিকারই কৌতুক। পরিশেষে রতিকান্ত কবুল করতে বাধ্য হয়েছিল, 'মল্লিকে আমায় যথার্থই খেপায়'—।[৩৫] আর জলধরকে হোঁদল সাজিয়ে খাঁচায় ভরার মূলে সব কৃতিত্ব যার, সে হল এই মল্লিকা।

তবে এই মালতী-মল্লিকা চরিত্র দুটি, এতখানি গাঢ় রঙে চিত্রিত হলেও এবং নাটকে এদের এতখানি ভূমিকা থাকলেও, এরা শেষ পর্যন্ত টাইপধর্মী। ফুলের মত এরা কেবল বিকিরণ করে গেছে মাধুর্য, জীবনের বিচিত্র অনুভূতিতে এরা কোনো সময়েই তেমন স্পন্দিত হয়নি। কিন্তু একটি কথা খুব অকপট ভাবেই বলা যায়, সে কথাটি হল দু'টি বিদেশী রমণীর আদলে এদের অঙ্কিত করা হলেও, দীনবন্ধুর হাতে এরা কিন্তু পুরোপুরি হতে পেরেছে বাঙালী। এবং শেষপর্যন্ত মধ্যবিত্ত বাঙালী বধূ।

'নবীন তপস্বিনী' নাটকে আর আর যে চরিত্র আছে, তারা কী শিল্পধর্মে কী মানবিক রস সম্পদে, সব দিক থেকেই ব্যর্থ। সুতরাং তাদের নিয়ে অকারণ আলোচনা বাড়িয়ে লাভ কী! ঔদরিক মাধব, রাজার শ্বশুর হবার জন্য উদ্যোগী বিদ্যাভূষণ, এঁর স্ত্রী সুরমা, উচ্ছলা রমণীদের স্বামী বিনায়ক ও রতিকান্ত, ছদ্মবেশী তপস্বিনী, এমন কী বিজয়-কামিনী প্রমুখ সব চরিত্রই এ নাটকে একান্তভাবে বিশেষত্ব বর্জিত। সুতরাং বর্তমান আলোচনায় তাদের কথা বর্জন করাই বিধেয়।

তবে এই নাটকের উপসংহারেকয়েক চরিত্র-চিত্র উল্লিখিতথাকা প্রয়োজন। রোমান্টিকতার আবরণ সরিয়ে দিলে যে যুগধর্মী চরিত্রগুলি আমাদের গোচরীভূত হয়, তারাই এই চরিত্র। পাঁচটি মেয়েকে নিয়ে একটি বিদ্যালয়ের চিত্র আছে, জিজ্ঞাসা করা যায়, এই বিদ্যালয়ের ভেতর দিয়ে সে যুগের কোনো বাসনা দীনবন্ধুর লেখনীতে ছায়াপাত করেছে কী? অনুরূপ ভাবে কয়েকজন ঘটক এবং কয়েকজন পণ্ডিত উনিশ শতকী যুগধর্ম নিয়ে দেখা দিয়েছে এই

'নবীন তপস্বিনী' নাটকে। যদিও দীনবন্ধু পণ্ডিতদের আত্মম্ভরিতা ও ঘটক-দের অন্তঃসারশূন্যতা হুতোমের মতই তুলে ধরেছেন তাঁর নাটকে, কিন্তু জেনে রাখা দরকার, এ ব্যাপারে তিনি কখনোও হুতোমের অনুকারী নন, এমন কী আলালেরও না। আসলে নতুন যুগ নতুন দৃষ্টিতে যাকে সত্য বলে উপলব্ধি করেছে, তাকেই নাটকে উপস্থাপিত করেছেন আমাদের আলোচ্য নাট্যকার। এখানে তাঁর ভূমিকা খুব স্পষ্ট,—তিনি যুগস্রষ্টা নন, তিনি হলেন যুগ-প্রকাশক। 'নীলদর্পণে' তিনি সে কথা বলবার অবকাশ পান নি, সে রকম কিছু-কিছু কথা এখানে বলতে পেরেছেন, 'নবীন তপস্বিনী' সেই অর্থে দীনবন্ধুকে অনেকখানি ধরতে পেরেছে। নতুবা নিছক শিল্প হিসাবে বিচার করলে দেখা যায়, নাটকটি নিতান্তই সাদা-মাটা, আর কোনো অর্থেই তাকে অসাধারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। এমন কী সার্থক বললেও তা' অতিশয়োক্তি হয়ে যায়। সুতরাং সীমানা ছাড়িয়ে অন্য কোনো বৃত্তে না গিয়ে, নিজের 'স্বরাজ্যে' থাকাই শ্রেয়ঃ।

লীলাবতী

সংখ্যার বিচারে দীনবন্ধুর পঞ্চম নাটক হল, ঐ 'লীলাবতী' নাটক। যদিও নাটকের পটভূমি সামাজিক, কিন্তু চরিত্রগত ভাবে এটি হল রোমান্টিক নাটক। এই রচনাটির সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য হল, 'লীলাবতী' বিশেষ যত্নের সহিত রচিত এবং দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকাপেক্ষা ইহাতে দোষ অল্প। এই সময়কে দীনবন্ধুর কবিত্ব সূর্যের মধ্যাহ্নকাল বলা যাইতে পারে। ইহার পর হইতে কিঞ্চিৎ তেজঃক্ষতি দেখা যায়।'[৩৬]

'লীলাবতী' নাটকের প্রকাশ তারিখ অনুমিত হয় ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর। 'বেঙ্গল লাইব্রেরী' সঙ্কলিত মুদ্রিত-পুস্তকাদির তালিকায় এই তারিখ হতে দেখা যায়, সুতরাং এটিকেই প্রকাশ তারিখ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। 'নবীন তপস্বিনী' প্রকাশের পরে এবং 'লীলাবতী' প্রকাশের আগে দীনবন্ধুর আরো দুটি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। এই রচনা দুটি নাটক নয়, প্রহসন। তদানীন্তন সমাজে যে ক্লেদ ও গ্লানি হয়েছিল সঞ্চিত, সেগুলিকে উদ্‌ঘাটন করবার জন্যই এই প্রহসন দুটি তিনি লিখতে প্রেরণা লাভ করে ছিলেন। অর্থাৎ এখানে দীনবন্ধু তাঁর যুগের তাড়াকে অস্বীকার করতে পারেন নি। একদা যে যুগ-প্রয়োজনে লিখিত হয়েছিল 'নীলদর্পণ' এখানে তারই তাগাদায় রচিত হল প্রহসন দুটি। অর্থাৎ 'নবীন তপস্বিনী' লেখার

পর ঐ যুগের দাবিতেই তাঁকে রোমান্স্ থেকে সরে এসে প্রহসন অবলম্বন করতে হল। কিন্তু মজার ব্যাপার এই, আমাদের আলোচ্য নাট্যকারের ছিল একটি কবি-মন, আর সেই কবি-মনে রোমান্স্ বরাবর স্বপ্ন-সুষমায় ছিল প্রতিষ্ঠিত। 'নবীন তপস্বিনী'তে যে সেই স্বপ্ন-সুষমার প্রথম প্রকাশ, তা আগেই বলা হয়েছে, আর এই উপলক্ষে তিনি যে দুটি জিনিসের অভিজ্ঞতা লাভ করলেন, তার পূর্ণ ব্যবহার দেখা গেল পরের নাটকগুলিতে। অভিজ্ঞতা দুটির প্রথমটি হল, হাস্যরসের ব্যাপারে তাঁর অধিকার যে সহজাত, দীনবন্ধু তা' আবিষ্কারে সমর্থ হলেন। দ্বিতীয় অভিজ্ঞতায় দীনবন্ধু দেখলেন, রমণীমোহন সম্পর্কিত বৃত্তান্তের ব্যর্থতা। আরো যা বুঝলেন, তা' হল, রূপকথার রোমান্টিক জগৎ তাঁর প্রতিভার উপযোগী নয়। রাজা-মহারাজা বা মন্ত্রী-সওদাগরকে বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে রূপ দেওয়া কঠিন। সুতরাং রোমান্টিক নাটক লিখতে হলে তাকে আরো মাটির কাছাকাছি আনতে হবে নামিয়ে এবং একবারে বাস্তবের মধ্যে তাদের প্রতিষ্ঠা করতে পারলেই সব চাইতে ভালো হয়।—গ্রন্থারম্ভে নিবেদন করা হয়েছে যে 'নীলদর্পণ' থেকে কাল গণনায় দীনবন্ধুর সাহিত্যিক-আয়ু মোটামুটি চৌদ্দ বছরের। এই হিসাবে 'লীলাবতী' রচনার কালকে 'কবিত্ব সূর্য্যের মধ্যাহ্নকাল' বলা মোটেই অসঙ্গত বলা যায় না, বরং যথার্থই বলতে হয়। আর প্রতিভার বিচারে এ কথা যে আরো তাৎপর্যমণ্ডিত, তা' বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই দিয়েছেন দেখিয়ে, সুতরাং 'লীলাবতী'র প্রসঙ্গে আমাদের আশা অনেক। বঙ্কিমের উক্তি আমাদের পথ-প্রদর্শন এবং সেই পথেই আমাদের এগিয়ে যাওয়া বিধেয়। অর্থাৎ দীনবন্ধুর প্রতিভাকে স্বীকার করে নিয়েই 'লীলাবতী'র আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারে।

নাটকটির কেন্দ্রীয় চরিত্র হল লীলাবতী। লীলাবতীর বাবা হরবিলাসের জটিল একটি পারিবারিক অবস্থার কথা উপস্থাপিত করাই যে নাট্যকারের উদ্দেশ্য, তা' এর পাঠক মাত্রেই উপলব্ধি করেন। হরবিলাসের পরিবারে যে জটিল সঙ্কটের সৃষ্টি হয়েছিল, সেই সঙ্কট মুক্ত করে, পরিশেষে জটিলতা কাটিয়ে, একটি সুখ-সমাপ্তি এনে দিয়েছেন নাট্যকার। হরবিলাসের নিরুদ্দেশ পুত্র এবং অপহৃতা কন্যাকে ফিরিয়ে দিয়ে ও পালিত পুত্র ললিতের সঙ্গে কন্যা 'লীলাবতী'র বিয়ে দিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জনে লেখক কোনো ত্রুটি করেন নি। হরবিলাসের কেন্দ্রীয় কাহিনীর পাশে যে উপকাহিনীটি আছে, তা' ভোলানাথ চৌধুরীর ভাগিনেয়দের নিয়ে। বিপত্নীক নদেরচাঁদের

নায়কতা, হেমচাঁদ ও তার স্ত্রী শারদার উপাখ্যান, সিদ্ধেশ্বর ও তার স্ত্রীর কাহিনী এবং স্পষ্টবক্তা শ্রীনাথের চরিত্র-চিত্র এই বৃত্তের সঙ্গে যুক্ত। তবে কেন্দ্রীয় কাহিনীর সঙ্গে এর যা যোগ, তা' হল অতি ক্ষীণ।—এই নাটকে মূলকাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে এমন অনেক চরিত্র রয়েছে, যে চরিত্রগুলি নিজেরাই এককেটি স্বতন্ত্র কাহিনীর নির্মাতা। যেমন, ভোলানাথ চৌধুরীর পূর্ব-ইতিহাসের কথা প্রাসঙ্গিক ভাবে উত্থাপন করা যায়। যদিও ভোলানাথ চৌধুরীর সাম্প্রতিক জীবন নিরুত্তাপে ও একঘেয়েমিতে ভরা, অতীতে কিন্তু তা' ছিল না। বরং যা ছিল, তা' কিন্তু একবারে বিপরীত। ভাগিনেয় যুগলের থেকে তিনি সেদিন একরতি কম ছিলেন না। মহীপৎ সিং নামে যে ব্যক্তি তীর্থপর্যটন কালে কাশীধামে দেহরক্ষা করেন, তার রূপসী ও অনাথিনী কন্যা অহল্যার পাণিগ্রহণের অছিলায় একদা কানপুরে গিয়ে উঠেছিলেন ভোলানাথ। ভোলানাথের উদ্দেশ্য যে মোটেই ভালো ছিল না, তা' যোগানন্দের পরবর্তী হস্তক্ষেপ প্রমাণ করে দিযেছিল। পরে ঐ ক্ষত্রিয় কন্যাকে ভোলানাথ বিবাহে বাধ্য হযেছিলেন।—এ জাতীয় ছোট ছোট অতীত কাহিনীতে 'লীলাবতী' ঠাসা। ভোলানাথের মত হরবিলাসের অতীত জীবনও খুব পবিত্র ছিল না।—অন্ততঃ একটি রক্ষিতা যে ছিল, তা নাটকেই কথিত। সেই রক্ষিতার গর্ভে হরবিলাসের একটি কন্যাও যে জন্মগ্রহণ করেছিল, তারও প্রমাণ রয়েছে। সেই মেয়েটি চাপা। আর সেই চাঁপাই কখনো যোগানন্দ এবং কখনো 'জাল অরবিন্দ' সেজে যে-ভাবে অতি-নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে এবং যে-ভাবে শেষ পর্যন্ত উপসংহারও এনে দিযেছে, তা' সর্বতোভাবে শিল্পসম্মত হয়েছে, একথা কোনোরকমেই বলা যায় না। আসলে এ-সব ঘটনার দৃষ্টিতে নাট্যকার আমাদের মনকে প্রস্তুত করেন নি।

অকারণ রহস্যময়তা এই নাটকের আরেকটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। অন্ততঃ হরবিলাসের পুত্র অরবিন্দ কেন নিরুদ্দিষ্ট এবং কন্যা তারা কেন আত্মগোপন করেছে, তার যথেষ্ট যৌক্তিকতা নাট্যকার তাঁর নাটকে উপস্থাপিত করেন নি। অথচ গোয়েন্দা কাহিনীর মত চিঠি এসে পৌঁচেছে হরবিলাসের কাছে এবং তাতে লিখিত আছে, 'আপনার জ্যেষ্ঠা কন্যা তারাসুন্দরী জীবিতা আছেন। ·· আপনি ব্যস্ত হইবেন না। পোষ্যপুত্র লওয়া রহিত করুন, ত্বরায় পুত্র, কন্যা উভয়কে প্রাপ্ত হইবেন'—[৩৭] ইত্যাদি। কেবল এই চিঠি নয়। চিঠির আশ্বাস শেষ পর্যন্ত যে রক্ষিত হয়েছে, তার প্রমাণও পাওয়া গেল। শেষে দেখা গেল 'যোগানন্দে'র খোলোস থেকে বেরিয়ে এলো চাঁপা, এবং নাটকের সকল

চরিত্রের উপস্থিতে তারাকে সে পরিচিত করিয়ে দিল হরবিলাসের কাছে, এবং বলল : 'তোমার কাছে আমি স্বীকৃত ছিলেম তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়ে দেব—হরবিলাস চট্টোপাধ্যায় তোমার পিতা, অরবিন্দ বাবু তোমার ভ্রাতা, তোমার নাম তারা,'—স্বীকার করতেই হয়, গোয়েন্দা গল্পের মতই এ উপসংহার। তবে কার্য-কারণে এর আখ্যান ভাগ গোয়েন্দা কাহিনীর মত নিবদ্ধ নয়। চাঁপা কেন কাজ করল, কেনই বা সে ছিল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ' ইত্যাদি জিজ্ঞাসার জবাব অন্তত: বর্তমান নাটকে নেই। সেকালের 'জাল প্রতাপচাঁদ' জাতীয় সামাজিক সত্যঘটনার আদলে একটি রহস্যঘন নাটকীয় কাহিনী গঠন করাই সম্ভবতঃ নাট্যকারের উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু তাঁর প্রতিভা যে এ ব্যাপারে সর্বৈব অনুপযোগী, সে সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন না। তাই তাঁর নাটক কাহিনীভাবে ভারাক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতাকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। তবে 'মানবিকতাবাদে'র আলোকে এর যে একটি স্বতন্ত্রমূল্য আছে, তা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। ব্রাহ্মধর্ম, আধুনিক শিক্ষা, মেয়েদের লেখাপড়া, কৌলীন্যপ্রথা, আধুনিক কোর্টশিপ, পোষ্যপুত্র গ্রহণ ইত্যাদি নানা বিষয় আছে, যার মধ্য দিয়ে 'নবজাগরণ' এবং সেই সঙ্গে অনেক যুগ-যন্ত্রণা হয়েছে অভিব্যক্ত। তাই কাহিনীগত ব্যাপারে ত্রুটি থাকলেও, যুগ-জিজ্ঞাসা এবং অনুরূপ কতকগুলি সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে 'লীলবতী' অন্যতর অর্থে সার্থক হয়ে উঠেছে।

চরিত্র-বিচারের বেলাতেও আমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলিরই বারবার মুখোমুখি হবো। এবং অন্য কারো নয়, প্রধান চরিত্র হরবিলাস-কে দিয়েই তা' অতি সহজে প্রমাণ করা যায়। হরবিলাসের যৌবন নাটকে বর্ণিত নয়, যা বর্ণিত রয়েছে তা' হল প্রৌঢ়ত্ব এবং সভার দিক থেকে অভিভাবকত্ব। দুই কন্যা এবং এক পুত্রের ইনি পিতা। আর পিতা মানেই অভিভাবক। একমাত্র পুত্র অরবিন্দ এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা তারসুন্দরী নাটকের প্রথম পর্বে নিরুদ্দিষ্টা। তারা-সুন্দরী যে নিরুদ্দিষ্টা, তার কারণ সে অপহৃতা। আর পুত্র অরবিন্দ বিবাহের পরেই হয়েছে গৃহত্যাগী, সুতরাং তার সম্পর্কে নানারকম কুৎসা।—বলার অপেক্ষা রাখে না, এই পরিবেশে কোনো বাবাই সুখী হতে পারেন না। সুতরাং হরবিলাসও সুখী হতে পারেন নি। 'নবীন তপস্বিনী' নাটকের রাজা রমণীমোহনের মতনই তিনি প্রতীক্ষার প্রহর গণনা করছেন, কবে পুত্র-কন্যারা তাঁর কাছে ফিরে আসবে! তবে হরবিলাসের সংসার একবারে ফাঁকা নয়। কন্যা লীলাবতী ও পালিতপুত্র ললিত-কে নিয়ে তাঁর সংসার-যাত্রা নির্বাহ

হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে 'লীলাবতী'র বিবাহকে কেন্দ্র করে। হরবিলাস আধুনিকতা ও প্রাচীন মূল্যবোধের ফাঁদে পড়েছেন। একদিকে কৌলীন্যবোধ এবং অপরদিকে নবযুগের যুক্তিবাদ, এর ভেতর কোন্‌টিকে গ্রহণ করবেন, তা' ঠিক করতে পারছেন না। হরবিলাস হতাশ হয়ে কবুল করে ফেলেছেন, 'নবীন সম্প্রদায়ের অনুরোধে অনেক করিচি—মেয়ে অনেককাল পর্যন্ত আইবুড়ো রেখেচি, পণ্ডিত রেখে লেখাপড়া শেখাচ্চি—ঢের হয়েচে, আর পারি নে'—।[৩৮] এই 'আর পারি নে' বলে হরবিলাস কিন্তু থেমে থাকেন নি, বরং যা করতে এগোলেন তা' আধুনিক যুগের একবারে বিপরীত। অর্থাৎ নদেরচাঁদের হাতে লীলাবতীকে সমর্পণ করতে এগিয়ে গেলেন, আর ললিতকে পোষ্যপুত্র নেবার জন্য হলেন উদ্যত। বললেন, 'আমি কারো সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই না, আমি যা ভাল বুঝবো, তাই করবো।'[৩৯]—বলা বাহুল্য, এই চারিত্রিক দৃঢ়তা, অন্ততঃ কঠিন সঙ্কল্প নেবার মত মানসিক বল, হরবিলাসের ছিল না। 'পবিত্রা ব্রাহ্মিণা' শারদার সংলাপ থেকে আমরা জানতে পারি, 'তাঁর স্নেহের পরিসীমা নাই, কিন্তু কুলীনের নাম শুনলে তিনি সব ভুলে যান। নদের চাঁদ বড় কুলীন, তাই তিনি পাত্রের দোষ বিবেচনা কচ্চেন না।'[৪০]—যাই হোক, অনেক ওলটপালট খাবার পর শেষ পর্যন্ত স্নেহই জয়ী হল হরবিলাসের অন্তরে। অসুস্থ 'লীলাবতী'কে দেখে তিনি তাঁর ভ্রম বুঝতে পারলেন এবং গভীর আক্ষেপের সঙ্গে বলতে শোনা গেল: 'আহা! জননী আমার এত মলিন, তবু বিছানা আলো করে রয়েছেন—আমি অতি নিষ্ঠুর, নচেৎ এমন স্বর্ণলতা সেই স্যাওড়া গাছে তুলে দিতে চাই'।[৪১]—নাটকের শেষে হরবিলাসের সিদ্ধান্তের বদল হল। যদিও প্রাচীন মূল্যবোধের প্রেরণায় হরবিলাস অনেক সময় কৌলীন্য প্রথা ইত্যাদির সমর্থন করেছেন, কিন্তু একটু লক্ষ্য রাখলেই দেখা যায়, তাঁর বিরাট স্নেহপূর্ণ হৃদয় অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থেকে অনেক বড়ো বড়ো সংস্কারকে অনায়াসে গেছে লঙ্ঘন করে। এবং তা' যদি না যেত, তা' হলে তাঁর রক্ষিতা-কন্যা চাঁপাকে তিনি 'চাঁপা তুমি আমার লক্ষ্মী'[৪] ইত্যাদি সম্বোধনে কাছে টেনে নিতেন না। এইসব বিবেচনা করবার পর, স্বীকার করতেই হয়, হরবিলাস একটি জীবন্ত চরিত্র এবং সর্বতোভাবে মানবিক রসে সমুজ্জ্বল।

তবে যুগলক্ষণ নিয়ে এ নাটকে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য যে চরিত্র দুটি আমাদের চোখে পড়ে, তারা হল নদের চাঁদ ও হেমচাঁদ। এঁরা উভয়েই ভোলানাথ চৌধুরীর ভাগিনেয়। এদের চরিত্রগত যে

খ্যাতি, সে খ্যাতি সম্পর্কে এঁরা সবিশেষ সচেতন এবং নদেরচাঁদের আত্ম-সমীক্ষায় যা দাঁড়ায় তা' হল, 'আমাদের যে নাম বেরিয়েছে, আমাদের দেখে বেশ্যারাও ঘোমটা দেয়। মাগ মরে অবধি গৃহস্থের মেয়ের মুখ দেখিনি, কি ঝিউড়ি, কি বউ।'[৪৩] এই নদেরচাঁদের অনেক গুণ। সে বেশ্যাখোড়, মূর্খ, দুশ্চরিত্র ও আচারহীন হলেও একটি তার সহজাত গৌরব আছে। সে গৌরব হল কৌলীন্য গৌরব। নদেরচাঁদের দম্ভোক্তি হল, 'আমি দম্ভ করে বলতে পারি শ্রীরামপুরে আমার কাছে এক ব্যাটাও বামন নয়। আমাদের বাঁধা ঘর, আমরা আসল কুলীনের ছেলে।'[৪৪] এই 'আসল কুলীনে'র ছেলেব চরিত্রটি আগাগোড়া কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করে নাট্যকার আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। বেনেদের বউ নিয়ে সে অতি সম্প্রতি যে 'ঢলাঢলি' করেছে, সে কথা নাটকে বিবৃত আছে, যদিও সংঘাতের ভেতর দিয়ে তা দেখানো হয় নি। এবং এই নদের চাঁদ ও তার সহযোগী হেমচাঁদ সম্পর্কে বঙ্কিমের বক্তব্য হল, 'নদেরচাঁদ হেমচাঁদের মত 'উনপাঁজুরে বরাখুরে' হাপ্ পাড়াগেঁয়ে হাপ্ সহুরে বয়াটে ছেলে'র[৪৫] নাড়ীনক্ষত্র দীনবন্ধু বিলক্ষণ জানতেন। স্বীকার করতেই হয়, দীনবন্ধুর ঐ চরিত্র সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা এবং তার রূপায়ণেব ভেতর কোনো ফাঁক ছিল না। মূর্খতায় এরা 'হাপ্ পাড়া-গেঁয়ে', কিন্তু হাবভাব চলাফেরা বা রসিকতায় এরা 'হাপ্ সহুরে'। 'নবীন তপস্বিনী'র জলধর দেখতে যেমন কুৎসিত, ততোধিক কুৎসিত সে পরস্ত্রীর প্রতি লোলুপতায়। তবে তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এই, সে নিজের সম্পর্কে সচেতন। কিন্তু নদেরচাঁদ তা' নয়। তার মধ্যেও রসিকতা আছে, কিন্তু সে রসিকতা অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতারই নামান্তর। নদের চাঁদকে নিয়ে আমরা যে কৌতুক বোধ করি, তার কারণ তার মূর্খতা এবং একজনের মূর্খতাকে নিয়ে যে আশ্চর্য কৌতুক-সাহিত্য রচনা করা যায়, তা' নদেরচাঁদকে না দেখলে আমাদের বিশ্বাস করা কঠিন। নদেরচাঁদের এই মূর্খতা নানা জায়গায় নানাভাবে রয়েছে ছড়ানো। অন্ততঃ দুটি চরম কৌতুকের নমুনা সংগ্রহ করা যেতে পারে, একটি তার বক্তৃতায় এবং অপরটি 'লীলাবতী'কে দেখতে গিয়ে বিদ্যা পরীক্ষার প্রসঙ্গে কয়েকটি সংলাপে। লীলাবতীকে কী ভাবে সম্ভাষণ করতে হবে তা' নিয়ে হেমচাঁদ তালিম দিয়েছিলেন নদেরচাঁদকে। কিন্তু নদেরচাঁদ তা' ভুলে গেল এবং তারপর যে ভাষায় সম্বোধন করল, তা' রীতিমত হাস্যোদ্দীপক। আর নদের চাঁদের এই অপকীর্তিতে বেচারি হেমচাঁদ ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিবাদ করতে গিয়ে যে ভাবে মূর্খ

দেখতে।'[৪৮] মোদ্দা কথা, এই হল নদের চাঁদ। শিল্পীর চোখে সে যে টাইপধর্মী, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এ টাইপ বাঙলা সাহিত্যে সে একটাই।

নদের চাঁদের পরেই উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল, তারই সহযোগী হেমচাঁদ। হেমচাঁদ নামের সাদৃশ্যে এবং প্রায় সমোচ্চারিত শব্দে নদের চাঁদের কাছাকাছি হলেও, চরিত্রধর্মে দু'জনের পার্থক্য অনেকখানি। যদিও দু'জনেই নেশাখোর, তাদের নেশায় মদ-গাঁজা-ভাঙ্-চরস কিছুই বাদ পড়ে না, এবং যদিও তাদের চরিত্রখ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত, তবু জেনে রাখা দরকার ঐ দু'জনের ভেতর সহজাত একটি পার্থক্য আছে। হেমের বিদ্যা নদেরচাঁদের থেকে একটু বেশি এবং তার রুচিও অনেকখানি উন্নত। নদেরচাঁদের বিদ্যা ও রুচি 'বিদ্যাসুন্দর' পর্যন্ত, সেখানে হেমচাঁদ পড়েছে 'পদ্যাবলী' এবং 'তিলোত্তমাসম্ভাবনা (?)' প্রমুখ আধুনিক পত্রিকা ও গ্রন্থ। এ ছাড়া দু'জনের অবস্থা ও জীবনযাত্রারও একটি পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। নদেরচাঁদ মৃতদার, সুতরাং বেপরোয়া হবার মতন সুযোগ তার অনেকখানি। পক্ষান্তরে হেমচাঁদের স্ত্রী কেবল জীবিতা নন, ইনি স্বামীকে সুপথে আনবার জন্য তীব্রবেগে করছেন আকর্ষণ। তাই হেমচাদের পক্ষে বেপরোয়া হওয়া কেবল কঠিন নয়, একরকম দুঃসাধ্যই বলা যায়। স্ত্রী শারদার সুকঠিন নিষ্ঠাই শেষ পর্যন্ত হেমচাঁদের চারিত্রিক পরিবর্তনের সহায়তা করেছে। হেমচাদও প্রথম থেকে অনুভব করেছে এই ভালোবাসার টান, এবং এ ব্যাপারে তার বক্তব্য হল, 'ওর দুঃখ দেখে আমার কান্না আসচে, মিষ্টি কথায় মন ভিজে গেল, যেন গঙ্গার জল বেড়ে বাঁদাঘাটের পাথরের পঁইটে ভিজে যাচ্চে। সাধে বাবা বলেন, 'এইটি বাড়ীর মধ্যে লক্ষ্মী বউ'—বউ ভালো কিন্তু ইযার বদ।'[৪৮ক]—বলার অপেক্ষা রাখে না, 'ইয়ার' হিসাবে সত্যিসত্যিই শারদা হেমচাঁদের মনোমত কখনও ছিল না। তবে এ ব্যাপারে নদেরচাঁদের কটাক্ষের ভয়ও হেমের কাছে কম ছিল কী? ঐ কটাক্ষের ভয় যদি কম না হত, তবে কী হেমচাঁদের মুখে আমরা শুনতে পেতাম, 'নদেরচাঁদ যে বলে 'হেমাকে হেমার মাগই খারাপ কল্যে'—তা বড় মিছে কথা নয়'[৪৯]—ইত্যাদি?—যাই হোক, এই নাটকে শেষ পর্যন্ত পরিবর্তিত হতে দেখা গেল হেমচাঁদকে। ললিত-সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে সেও ব্রাহ্মসমাজের সুরুচি ও সুনীতি সম্মত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হতে হল সচেষ্ট। স্বামীর জন্য শারদার কার্পেটের জুতো বোনা এবং সে জুতোয় ফুল তুলে দেওয়া ইত্যাদি কয়েকটি সূক্ষ্ম কর্মের ভেতর দিয়ে একটি গভীর পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গেল। এবং শারদার

মুখেও শোনা গেল, '…এত ভালো করে এ জুতা জোড়াটি বুনচি—আমায় বল্যেন সিদ্ধেশ্বরের স্ত্রী যেমন ফুল তুলেচে তেমনি ফুল তুলে দিতে—বা হয়েচে এই দেখে কত আমোদ করেচে—উনি যে এসকল বিষয় নিয়ে আমোদ করবেন তা' স্বপ্নেও জানতেম না। সৎসঙ্গে কাশীবাস, নদেরচাঁদকে ছেড়ে সিদ্ধেশ্বরের সঙ্গে যেই মিশেচেন, এমনি সব পরিবর্তন হয়েচে—প্রথম থেকে স্বভাব ভাল, কেবল নদে পোড়াকপালে এতদিন মজ্‌য়েছিল।'[৫০]—শারদার এই বিশ্লেষণই যে হেমচাঁদের বিষয়ে চূড়ান্ত বিশ্লেষণ, আশাকরি তা' আর বুঝিয়ে বলবার অপেক্ষা রাখে না।

'লীলাবতী' নাটকে এরপর যে চরিত্রগুলি পড়ে থাকে, সেগুলিকে কোনো ক্রমেই আলোচনার যোগ্য বলা যায় না। ললিত-লীলাবতীর কথা পরে আলোচনা করা যাবে, কিন্তু তার আগে উল্লেখযোগ্য চরিত্র হিসাবে যাদের কথা প্রথমেই মনে আসে তারা হল, শ্রীনাথ ও সিদ্ধেশ্বর। বর্তমান নাটকে উভয়েরই একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা আছে, যদিও তারা 'টাইপধর্মী' চরিত্র। 'নবীন তপস্বিনী'তে মাধব যে-জাতীয় ভূমিকায় অবতীর্ণ, শ্রীনাথের ভূমিকা বর্তমান নাটকে অনেকটা সেই রকম। রূঢ় ভাষণ ও সত্যভাষণই হল হরবিলাসের শ্যালক শ্রীনাথের প্রধানতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কৌলীন্য গর্বে স্ফীত হয়ে নদেরচাঁদ যখন বলেছে, 'আজো পেচ্ছাপ করলে বামন বেরোয়'[৫১] প্রমুখ অশালীন কথা, তখন স্পষ্টবাদী শ্রীনাথ সকৌতুকে মুখের মতন জবাব দিয়েছে, 'গোঁদোলপাড়ার ওষুদ খেতে হয়—ঢেঁকিরাম, অমন কথা কি বলতে আছে? ব্রাহ্মণ, দেবশরীর যজ্ঞপবিত গলায়, বিপ্রচরণেভ্যো নমঃ, তাঁকে ওরূপে কি বার কত্তে আছে, পইতেয় যে চোণা লাগবে।'[৫২]—শ্রীনাথের এই কথাটিতে হয়ত অশ্লীলতার আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু এই ভাষা সাহিত্য হয় নি, এমন কথা বোধহয় নিতান্তই ধৃষ্টতা।

সিদ্ধেশ্বর সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যা বলতে হয়, তা হল নায়ক ললিতমোহনের সঙ্গে এর আশ্চর্য সাদৃশ্য। কোনো এক 'তৃতীয় প্রতিবেশী'র সংলাপ থেকে আমরা শুনেছি, 'ললিত এবং সিদ্ধেশ্বর আজকাল কালেজের চূড়া স্বরূপ।'[৫৩]—অর্থাৎ 'কালেজীয় শিক্ষা'র প্রভাবে সেকালে যে সব উন্নত চরিত্রের মানুষ দেখা গিয়েছিল, সেইসব মানুষদের প্রতিনিধি হলেন এই ললিত এবং সিদ্ধেশ্বর। কালধর্মে এঁরা ছিলেন ব্রাহ্ম। মধ্য উনিশ শতকে শিক্ষিত বাঙালীদের কাছে ব্রাহ্ম-সমাজ ও ব্রাহ্ম-ধর্ম যে আদর্শ তুলে ধরেছিল, ললিত ও সিদ্ধেশ্বর সেই আদর্শে ছিলেন বিশ্বাসী। এঁরা ছিলেন স্ত্রীশিক্ষাতেও অনুরাগী।

বাল্যবিবাহ, কৌলীন্য প্রথা ইত্যাদি মধ্যযুগীয় সামাজিক আচরণকে এঁরা তাই সমর্থন করতে পারেন নি। এমন কী ছোটো ছোটো আচার-আচরণগত ব্যাপারেও এঁদের দৃষ্টি ছিল সজাগ। ব্রাহ্মণ্যের বাহাদুরীতে দীক্ষা দেওয়া, এঁটো-কাঁটা বা ছুঁৎমার্গের বাড়াবাড়ি, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের ধূমপানের জন্য আলাদা হুঁকোর ব্যবস্থা—এঁরা ঐ সব কিছুই মানতেন না। আর কাউকে মানতে দিতেনও না। আলোচ্য নাটকের হরবিলাস সখেদে বলেছেন, '·· ললিতের অনুরোধে কত ধর্ম বিরুদ্ধ কাজ করিছি, গ্রামের ভিতর দীক্ষা হওয়া উঠ্‌য়ে দিইচি, এঁটোর বাচবিচার তাদৃশ করি নে, ব্রাহ্মণ-শূদ্রে এক হুঁকায় তামাক খায় দেখেও দেখি নে'।[৫৪]—এই সংলাপের আলোকে দেখলে বোঝা যায়, বর্তমান নাটকে ললিত-সিদ্ধেশ্বরের যথার্থ ভূমিকা কী! নদেরচাঁদকে যেমন যথাসম্ভব কালোরঙে আঁকবার চেষ্টা করা হয়েছে. ললিত-সিদ্ধেশ্বর প্রমুখ চরিত্র গুলিকে সবতোভাবে অনুরূপ প্রেরণাতে আঁকবার চেষ্টা করা হয়েছে উজ্জ্বল রঙে চিত্রিত করে। না, কেবল উজ্জ্বল রঙ নয়, ললিতকে আবার রোমাণ্টিক ও কাব্যধর্মী এক নায়কের ভূমিকায় স্থাপিত করতে চেষ্টা করেছেন দীনবন্ধু। ফলে চরিত্রটি হয়ে উঠেছে আবেগ-সর্বস্ব, হৃদয়-তাপের ভাপে-ভরা ফানুস। স্বাভাবিক ও সুস্থ হবার সুযোগ না পেয়ে বেশির ভাগ সময়েই ললিত-সিদ্ধেশ্বর হয়ে গেছে কৃত্রিম। আর এই কৃত্রিমতা ও আদর্শপ্রাণতা অনিবার্যভাবে তাদের নির্বাসিত করেছে শিল্পের জগৎ থেকে।

গৌণ পুরুষ চরিত্রগুলির ভেতর উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল, ভোলানাথ চৌধুরী, অরবিন্দ, যজ্ঞেশ্বর ইত্যাদি। ভাগিনেয়দের মামা হিসাবেই অবশ্য ভোলানাথের বর্তমান নাটকে পরিচিতি। কিন্তু নাটকীয় আখ্যানের ভেতর ভোলানাথকে না আনলেও বোধহয় নাটকের খুব একটা ক্ষতি হত না। আর যে ক'টি দৃশ্যে আনা হয়েছে, তার সমন্বয়ে ভোলানাথের একটি যথার্থ চরিত্র-চিত্র পরিস্ফুট হওয়া শক্ত। ভাগিনেযদের সঙ্গে একসঙ্গে মদ খাওয়া, ললিতকে কন্যাদানে প্রস্তুত হয়ে আবার নদেরচাঁদের পক্ষ নিয়ে হরবিলাসের সঙ্গে কলহ করতে আসা তাকে কেমন যেন অসংলগ্ন করে তুলেছে। তবে অপরাপর চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে তার ওপর যে-সব দোষগুণ চাপান হয়েছে, সেগুলিকে বিবৃতিধর্মী না করে যদি সংঘাতের ভেতর দিয়ে দেখানো হত, তা' হলে চরিত্রটি যে একটি সার্থক নাটকীয় চরিত্র হতে পারত, সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই।

অরবিন্দের চরিত্র পরিকল্পনাতেও এই রহস্যময় অসামঞ্জস্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে। অরবিন্দের অজ্ঞাতবাসের কারণ এই নাটকে যথেষ্ট পরিস্ফুট

নয়। আর অজ্ঞাতবাস থেকে বাইরে এসে দেখা দেবার পরেই নিজের স্ত্রীর চরিত্রের প্রতি যে ভাবে সে সংশয় প্রকাশ করেছে, তা' একটু বাড়াবাড়ি বলেই মনে হয়। ভগাতাঁতীর চক্রান্তকে সমর্থন করে সে নিঃসংশয়ে বলেছে, '…এই নরাধম লম্পট তাঁতী যে আমার সর্বনাশ করেছে, আমার স্ত্রীর ধর্ম নষ্ট করেছে, ত'তে কোন সন্দেহ নাই।'[৫৫] বারো বছরেরও বেশি যে ব্যক্তি নিরুদ্দিষ্ট, নাটকে দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি সে একথা বলে, তা' হলে চরিত্রটিকে একটু বেশি 'ড্রামাটিক' মনে হয় না কী?—না হয়, ধরে নেওয়া গেল যে চরিত্রটি 'সন্দিগ্ধমনা', এই জাতীয় 'সন্দিগ্ধমনা' ব্যক্তিরা সাধাবণত প্রাণদাতাকেও সন্দেহ করে থাকেন।—এই অববিন্দ কী সেই প্রবণতা বজায় রাখতে পেরেছে?—না, তাও সে পারে নি। ভগাতাঁতীর পরিবর্তে যখন সে যোগানন্দকে দেখল, তখন তার মন-পরিবর্তনে অল্পমাত্র দেরি হল না। অর্থাৎ রহস্যময় অসামঞ্জস্যতায় এই চরিত্রটি বিশেষভাবে চিহ্নিত; সুতবাং শিল্পের বিচারেও সে সর্বৈব ব্যর্থ।

স্বল্প পরিসরে সন্ন্যাসী যজ্ঞেশ্বর এবং ওড়িয়া ভৃত্য রঘুয়া মোটামুটিভাবে সুচিত্রিত। সংলাপ হিসাবে সন্ধিসমাস সমকীর্ণ সংস্কৃতভাষা যে গাঁটি ওড়িয়ার মতনই অনুপযোগী, এই চরিত্রদুটি তার প্রমাণ।

যোগজীবন বাহ্যতঃ পুরুষ হলেও তার ভেতর লুকিয়ে আছে একটি নারী-চরিত্র। সেক্সপীযারের 'পোর্শিযা'র দ্বারা দীনবন্ধু অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কী না জানা যায় না, কিন্তু এরকমেব 'মুস্কিল আসান' পরিকল্পনা তাঁর মাথায় যে ছিল, তা' মনে করবার মত যথেষ্ট সঙ্গত কারণ রয়েছে। এই 'মুস্কিল আসান' চরিত্রটি হরবিলাসের রক্ষিতাকন্যা চাঁপা। চাঁপা আগাগোড়া মেলো-ড্রামাটিক। কখনো কখনো সে গোয়েন্দার মত। কখনো জাদুকর। নাটকের শেষে যে-ভাবে সে সকলের পরিচয় উদ্ধার করেছে, তাতে তাকে একজন বাজীকর বলে ভ্রম হওয়াও কিছু কঠিন নয়। দুঃখ সুখে উদ্বেলিত সাধারণ মানুষের পর্যায়ে সে যে কোনোরকমেই পড়ে না, একথা নিঃসংশযে বলা যায়।—এর তুলনায় 'যজ্ঞেশ্বর' চরিত্রটি জীবন্ত। এবং স্বাভাবিক।

নারীচরিত্রগুলির ভেতর উল্লেখযোগ্য হল, লীলাবতী ও শারদা। লীলাবতী বর্তমান নাটকের নায়িকা এবং তার নামেই নাটকের নামকরণ। সুতরাং আশা করা অসঙ্গত নয় যে এই চরিত্রটির ভেতর দিয়ে আমরা সার্থক নায়িকার সবরকম গুণই পাবো; কিন্তু লেখকের অভিজ্ঞতা এ ব্যাপারে আমাদের হতাশ করেছে। দীনবন্ধুর প্রতিভা বিশ্লেষণের ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র যে কথাগুলি

বলেছেন, এখানে সেগুলিকে স্মরণ করা যায়। বঙ্কিমের বক্তব্য হল, 'লীলাবতী বা কামিনী শ্রেণীর নায়িকা সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ছিল না, কেন না, কোন লীলাবতী বা কামিনী বাঙ্‌লা সমাজে ছিল না বা নাই। হিন্দুর ঘরে ধেড়ে মেয়ে, কোর্টশিপের পাত্রী হইয়া যিনি কোর্ট করিতেছেন তাঁহাকে প্রাণমন সমর্পণ করিয়া আছে, এমনমেয়ে বাঙ্গালী সমাজে ছিল না'[৫৬]—। যে চরিত্রের অস্তিত্ব সেদিন সমাজে ছিল না, তাকে শরীরী ও সামাজিক করে তোলা যে-কোনো বড়ো শিল্পীর পক্ষেও কঠিন। আর নাটকের মধ্যে এ জাতীয় চরিত্রসৃষ্টি কঠিনতর। কেননা, কাব্য ও উপন্যাসের থেকে নাটক অনেক বাস্তবঘেঁষা। সুতরাং জিজ্ঞাসা আমাদের থেকে যায়, কোন্ অলঙ্ঘ্য অনুপ্রেরণার দ্বারা তাড়িত হয়ে দীনবন্ধু এই ভ্রমে পড়লেন?—বলাবাহুল্য, এ সম্পর্কেও বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বক্তব্য আছে। এবং সে বক্তব্য হল, 'দীনবন্ধু ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটক নভেল ইত্যাদি পড়িয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন যে, বাঙ্গালা কাব্যে বাঙ্গালার সমাজস্থিত নায়ক নায়িকাকেও সেই ছাঁচে ঢালা চাই। কাজেই যাহা নাই, যাহার আদর্শ সমাজে নাই, তিনি তাই গড়িতে বসিয়াছিলেন।'[৫৭]—অর্থাৎ লীলাবতী হল সেই চরিত্র যা আমাদের সমাজে ছিল না। শুধু তাই নয়, এই চরিত্র পরিকল্পনার পিছনে ছিল নাট্যকারের ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটকে পড়া রোমান্টিক নায়িকাদের স্বপ্ন। তাই নায়িকা লীলাবতী শেষপর্যন্ত অকারণ কৃত্রিমতার ভারে হয়ে উঠেছে ভারাক্রান্ত। বর্তমান নাটকে লীলাবতীর শিক্ষার কথা বারবার উচ্চারণ করা হলেও, শিক্ষার ফলে সংস্কারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের মনোভাব দেখা দেয়, তা' এখানে অনুপস্থিত। অভিভাবকের হাতে সে কলের পুতুলের মতই নড়াচড়া করেছে, এমন কী নদেরচাঁদের কাছে পাত্রী হয়ে দেখা দেবার সময়েও তাকে বিদ্রোহী হতে দেখা গেল না। মোটকথা, সংঘাতের ভেতর দিয়ে এমন কোনো ছবি তার আঁকা হয়নি, যাতে তাকে আমরা প্রাণচঞ্চল নবযুগের নায়িকা[৫৮] বলে চিহ্নিত করতে পারি। কেবল কৃত্রিমতা নয়, অকারণ কাব্যিকতাও এই চরিত্র-পরিকল্পনার আরেক ত্রুটি। 'লীলাবতী' নাটকটি যখন অভিনীত হয়, সেই অভিনয়ের খবর যখন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে, তখন তাঁদের একটি বক্তব্যই ছিল ঐ অকারণ কাব্যিকতার বিরুদ্ধে। এঁরা নিজেরাই সে বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং দর্শকদের মনোভাব বিশ্লেষণ করে তার জবাবও দিয়েছেন,'…লীলাবতীর নাটকের উৎকৃষ্ট অংশ ললিত ও লীলাবতীর প্রেমালাপ, সেই সময় শ্রোতৃবর্গ বিরক্তি প্রকাশ করে কেন?

আমরা ইহার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করি। একখানি পাঠ্যোপযোগী নাটক সাধারণতঃ অভিনয়োপযোগী হয় না।·· পাঠকালীন যাহাই হউক, অভিনয়ের সময় দুই ব্যক্তির পদ্যে কথোপকথন এদেশীয়দের রুচিবিরুদ্ধ ও বিরক্তিজনক, এইজন্য সেদিন ললিত ও লীলাবতীর প্রেমালাপের সময় অনেকে ইংরাজিতে প্রেমিকেরা 'প্রেমালাপে ক্ষান্ত হউন' বলিয়া বারম্বার চীৎকার করিয়াছিলেন। লীলাবতী রোগ বা বিরহ শয্যায় অচেতন হইয়া আছেন, তাঁহার মুখ দিয়া তখন কবিতাস্রোত বাহির হওয়া অস্বাভাবিক।'[৫৯]—এই অস্বাভাবিকতা কেবল লীলাবতীর অভিনযোপযোগিতাকেই আঘাত করে নি, নায়িকাকে জীবন্ত করবার পক্ষেও হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধান বাধা। 'নবীন তপস্বিনী' নাটকে কামিনীর চরিত্র পরিকল্পনায় অন্তরে-বাইরে কোনো বিরোধ ছিল না, কিন্তু দুঃখ এই, লীলাবতীর ভেতর এই বিরোধের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সে জীবন্ত হতে পারে নি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে শারদা চরিত্রটি অনেকখানি সুচিত্রিত। একদিকে স্বামীর অপরিচ্ছন্ন জীবনযাত্রা, অপরদিকে তার নিজস্ব পরিচ্ছন্ন ব্রাহ্মরুচি—এই দুয়ের বিপরীত সংঘাতে শারদা উদ্বেলিত। জীবনবোধের এই দুই প্রান্তকে তার পক্ষে মেলান কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর মাঝে আছে সিদ্ধেশ্বর-রাজলক্ষ্মীর দাম্পত্য-জীবনের মাধুর্যমণ্ডিত আদর্শ। এই আদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সে স্বামী হেম-চাঁদের স্বভাব পরিবর্তনের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। প্রথম পর্যায়ে স্বামীর কাছে এজন্য সে কম উপেক্ষা বা লাঞ্ছনা ভোগ করে নি! শারদার কথোপকথনে বা সংলাপে মার্জিত ভাষার ব্যবহার, বা তৎসম শব্দের প্রয়োগ, হেমচাঁদের কাছে হয়ে উঠেছে পরিহাসের সামগ্রী এবং এ উক্তিও শোনা গেছে, 'পুরুষ জ্যাটা সওয়া যায়, মেয়ে জ্যাটা বড় বালাই।'[৬০] যাই হোক, এ পরিহাস ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপ সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত শারদার সাধনা জয়ী হয়েছে। হেমচাঁদের দুষ্যার আকর্ষণ ছিন্ন করে শারদা তার স্বামীকে পরিচ্ছন্ন একটি জীবনপথে নিয়ে আসতে হয়েছে সমর্থ। হয়ত ঠিক এ জাতীয় নারীও আমাদের সমাজে ছিল না, কিন্তু থাকলে কী হতে পারত, এ যেন তারই ইঙ্গিত। শারদা কাব্যিক নয়, অবাস্তবও নয়। উনিশশতকের কঠিন এক বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল সে। কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের ভেতর দিয়ে সে নিজের ভাগ্য নিজেই করে নিয়েছে জয়। দীনবন্ধুর সমগ্র নাট্যসাহিত্যে তার মতন চরিত্র বিরল। অন্ততঃ এ জাতীয় সংগ্রামে আর কাউকে লিপ্ত হতে দেখা যায় নি।

'লীলাবতী'র আলোচনা এবার শেষ করা যায়। 'অন্যান্য নাটকাপেক্ষা

ইহাতে দোষ অল্প'[৬১] এজাতীয় কোনো বঙ্কিমী মন্তব্যে না যাওয়াই শ্রেয়। তবে এটি যে বিশেষ যত্নের সঙ্গে লিখিত, তা' সহজেই বোঝা যায়, কেননা নাট্যকার নানারকম ঘটনা ও চরিত্রের সমাবেশে এটিকে চেয়েছেন সমৃদ্ধ করতে। এবং সমসাময়িক যুগকে একটি রোমানটিক্ আখ্যানে চেয়েছেন বেঁধে রাখতে। যেখানে স্বপ্ন, সেখানে তিনি ব্যর্থ হতে পারেন। কিন্তু যেখানে বাস্তবতা, সেখানে তাঁর সফলতাকে আটকায় কে? নিজেব গণ্ডীতে দীনবন্ধু যে কতখানি সার্থক, 'লীলাবতী'র সফল অংশটি তার প্রমাণ। আর স্বপ্ন দেখবার ব্যাপার, যা পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে, সেটি যদি যুগধর্ম হয়, তবে দীনবন্ধুর এই ব্যর্থতাও প্রমাণ করে যে তিনি একজন সার্থক যুগ-প্রকাশক কেবল স্বপ্ন বিলাসিনী নন।

কমলে কামিনী

'কমলে কামিনী' দীনবন্ধু মিত্রের লেখা শেষ নাটক। রোমান্টিক নাট্যধারাতেও এটি তাঁর তৃতীয় ও শেষ রচনা। প্রকাশকাল, ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ।

দীনবন্ধু মিত্রেব তিনটি রোমান্টিক নাটক তিনটি পৃথক পটভূমিতে লিখিত। 'নবীন তপস্বিনী' যে রোমান্সধর্মী এক রূপকথার পরিবেশে লেখা, একথা নতুন করে বলবার অপেক্ষা রাখে না। রাজা-রাজসভা-মন্ত্রী-বিদূষক সবই আছে ঐ নাটকে, আব আছে একটি রোমান্টিক প্রেমের উপাখ্যান। দ্বিতীয়টির আলোচনা সবে আমরা শেষ করেছি। কালেজীয় শিক্ষা, ব্রাহ্মসমাজ, কৌলীন্যপ্রথা ও সামাজিক কুসংস্কারের মধ্য দিয়ে উনিশ-শতকের বাঙ্লাদেশ কী ভাবে 'লীলাবতী'র উপজীব্য হয়েছে, তাও আমরা দেখলাম। 'লীলাবতী'র রোমান্টিক প্রেম যে 'নবীনতপস্বিনীর' কামিনীব কথা মনে করিয়ে দেয়, একথাও বলা হয়েছে বারবাব। সুতরাং কৌতূহল হতে পারে, তৃতীয় নাটক 'কমলে কামিনী'তে নতুন কী পটভূমি ও কী জাতীয় রোমান্টিকতা নিয়ে দীনবন্ধু আবার দেখা দিলেন?

বলে রাখা ভালো, বর্তমান নাটকের পরিবেশ রচনায় দীনবন্ধুর চাকুরী জীবনের একটি অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে। অন্ততঃ বাহ্যত তাই। তাঁর লুশাই অবস্থানের অভিজ্ঞতা থেকে 'কমলে কামিনী'র যে সৃষ্টি, এ রকম মনে করবার একমাত্র কারণ হল, এই নাটকের পটভূমি হিসাবে আমরা পাই কাছাড় ও মণিপুর। লুশাই পাহাড়ে যাবার সূত্রে এই দুই দেশের সঙ্গে দীনবন্ধুর যোগাযোগ হয়। সেটুকু মনে রেখেই আমাদের এগোতে হবে।

সরকারী নথিপত্র থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, '···In the summer of 1871, the Government of India sanctioned the despatch of an expedition into the Lushai Country in the cold weather ot 1871-72, to prevent the recurrence of outrages lately commited on British territory.'[৬২]

এই লুশাই যুদ্ধে ডাকের ব্যবস্থা করতে যেতে হল দীনবন্ধুকে। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, '১৮৭১ সালে দীনবন্ধু লুসাই যুদ্ধের ডাকের বন্দোবস্ত করিবার জন্য কাছাড় গমন করেন।'[৬৩]—১৩০৫ সালের 'ভাদ্র'সংখ্যায় 'প্রদীপ' পত্রিকায় দীনবন্ধুর যে জীবনী প্রকাশিত হয়, তাতেও লিখিত আছে, '১৮৭১ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট 'লুসাইযুদ্ধে'র অনুষ্ঠান করেন। ডাকের সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য দীনবন্ধুবাবুকে যুদ্ধমুখে গমন করিতে হইয়াছিল। অনেক সাহেব বাঙালীর নিন্দা করিয়া বলেন যে, তাঁহাদিগকে বিপদসঙ্কুল কার্য্যে প্রেরণ করিলে তাঁহারা সহজে গমনোন্মুখ হন না, কিন্তু দীনবন্ধুবাবু যেরূপ তৎপরতার সহিত ও নির্ভীক চিত্তে যুদ্ধযাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন, তা সচরাচর দেখা যায় না।'

যাই হোক, এই লুশাই-যুদ্ধে ডাকের ব্যবস্থা করতে গিয়েই দীনবন্ধু পরিচিত হলেন কাছাড়, মণিপুর ও ব্রহ্মদেশের ইতিহাসের সঙ্গে। এবং ইতিহাসের কয়েকটি নাম নিয়ে পরে সাহিত্য রচনায় বিস্তার করলেন নিজের কল্পনা। কল্পিত কাহিনীটি এই রকম: মহারাজ গোবিন্দসিংহের বংশ রাজত্ব করছিল কাছাড়ে। কালক্রমে সে বংশ নিঃসন্তান হল। সিংহাসনের উত্তরাধিকার তখন গিযে বর্তালো মণিপুর রাজ্যের ওপর। মণিপুরের রাজা এই 'রাজা' মনোনয়নের ভার ছেড়ে দিলেন কাছাড়ের প্রজাদের ওপর। জমিদার-তালুকদার-সদাগর-কৃষক থেকে রাজকর্মচারীরাও প্রজাদের সঙ্গে যে নামটি সমর্থন করল, সেই 'শিখণ্ডীবাহনে'র নাম অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হল প্রতিবেশী রাজা ব্রহ্মদেশাধিপতির কাছে। ব্রহ্মদেশাধিপতি এ নাম প্রত্যাখ্যান করলেন এবং ঘোষণা করলেন যুদ্ধ। এই যুদ্ধের পরিবেশে ব্রহ্মরাজ কন্যা রণকল্যাণীর সঙ্গে মণিপুরের সহকারী সেনাপতি শিখণ্ডীবাহনের রোমান্টিক প্রেমের কাহিনী চিত্রিত করেছেন নাট্যকার।

আগেই নিবেদন করা হয়েছে যে এখানে ইতিহাসের সূত্র খুবই ক্ষীণ। কাছাড়ের রাজবংশের ইতিহাসে 'গোবিন্দসিংহে'র নামটি পাওয়া যায়। মণিপুরের রাজা 'গম্ভীরসিংহে'র নামটিও ঐতিহাসিক। কাছাড়ের ইতিহাস থেকে এই গোবিন্দসিংহ সম্পর্কে যা জানা যায়, তা' হল এই রকম:

'The reigning family were converted to Hinduism in 1790, and a few years later the last prince Gobind chand, was driven from the throne by Marjit Singh of Manipur. This man establised himself on the thorne of Manipur by the aid of the Burmans, but when he endeavoured to assert his independence they drove him from the state into Surma Valley.'[৬৪]—এবং এর পরের ইতিহাস হলো, ব্রহ্মদেশীয়রা কাছাড়কে চাইল নিজেদের রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত করতে। কিন্তু তা' হল না। ইংরেজরা বাধা দিল। গোবিন্দচাঁদকে ফিরিয়ে দেওয়া হল কাছাড়। এই গোবিন্দ ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে নিঃসন্তান হয়ে মারা গেলেন। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তি অনুসারে এরপর ইংরেজ সরকার এই রাজ্যের মালিক হয়ে গেলেন।

এই হল কাছাড় ও গোবিন্দ চাঁদ সম্পর্কিত কাহিনী। মণিপুরের ও গম্ভীর সিংহ সম্পর্কে যা জানা যায়, তা' হল প্রথম 'ব্রহ্মযুদ্ধ'-কে কেন্দ্র করে। সে ইতিহাস এই রকম: 'On the outbreak of the first Burmese war in 1824, the Burmans invaded Cachar and Assam, as well as Manipur; and the Gambhir Singh of Manipur asked for British aid, which was granted.'[৬৫]—এই যুদ্ধে শত্রুমুক্ত হয়েছিলেন গম্ভীর সিংহ। তিনি এর দশ বছর পরে ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। যখন মারা যান, তখন শিশুপুত্র 'চন্দ্রকৃত্তি সিংহে'র বয়স মাত্র একবছর। খুল্লতাত নরসিংহের অভিভাবকতায় এই পিতৃহীন শিশুটি মানুষ হয় এবং আঠারো বছর বয়সে সাবালক হবার পর ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

এই ইতিহাসের ফাঁকে গোবিন্দ সিংহের উত্তরাধিকার নিয়ে লড়াই করবার সুযোগ কতখানি আছে, তা' বলা মুশকিল। ইতিহাসের তথ্য থেকে দেখা যায়, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দ মারা যান। আর এক বছর পরে মণিপুরের রাজা গম্ভীরসিংহ দেহ রক্ষা করেন। সুতরাং বিবাদটি আঠারোশ' তেত্রিশ খ্রীষ্টাব্দে হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তা' হয়নি। কেননা, কোম্পানির সরকার এ অবকাশ যে কাউকে দেয়নি, তা পূর্বেই বিবৃত করা হয়েছে। তাই যুদ্ধটি সর্বৈব কাল্পনিক। আর গম্ভীরসিংহের পুত্র হিসাবে শিখণ্ডীবাহন ও মকরকেতনকে যে দেখানো হয়েছে, এটি আরো কাল্পনিক। কারণ ইতিহাস 'চন্দ্রকৃত্তি' ছাড়া আর কোনো পুত্রের কথা গম্ভীরসিংহের বেলায়

স্বীকার করে না। তাই কাহিনীটিকে আগাগোড়া কাল্পনিক জেনেই আমাদের আলোচনা আরম্ভ করা ভালো।

ইতিহাস নয়, এমন কী কোনো রাজা-রাজড়াও নন, একটু অনুধাবন করলেই উপলব্ধি করা যায়, যুদ্ধক্ষেত্রের অসি-ঝনঝনানি, মুহুঃর্মুহু তোপধ্বনি, এবং অবিরাম আর্তনাদের অন্তরালে বীর্যবান এক পুরুষের হৃদয়ে কোনো এক ইন্দীবরাক্ষীর অভ্যাগমই হল নাটকের মূল বক্তব্য। শিখণ্ডীবাহন হলেন এই বীর্যবান পুরুষ, এবং ব্রহ্মরাজ-দুহিতা রণকল্যাণী হলেন ঐ ইন্দীবরাক্ষী রমণী। শিখণ্ডীবাহনের জন্ম বৃত্তান্ত 'নবীন তপস্বিনী'র বিজয়ের পরিচয়ের মতনই রহস্যাবৃত। দু'জনেই রাজপুত্র, কিন্তু পরে তাদের এ পরিচয় পাওয়া গেছে, আগে নয়। আর বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলা যায়, 'কোর্টশিপে'র পর নবদম্পতি সিংহাসনে বসবার অধিকার অর্জন করেছে। এখানেও ছোটরাণীর চক্রান্ত এবং বড়োরাণীর লাঞ্ছনা। আর হাস্যরসিক বকেশ্বর যেন জলধরেরই যৌবন। মোটকথা, যুদ্ধচিত্র বাদে বর্তমান নাটকে দীনবন্ধু নতুন কিছু দিতে যে সমর্থ হন নি, তা' নিংসশয়ে বলা যায়।

তবে একটি ব্যাপারে দীনবন্ধু অপর দুটি নাটক থেকে 'কমলে কাহিনী'-কে পৃথক করতে পেরেছেন। এই পৃথকীকরণকে শিখণ্ডীবাহন-রণকল্যানী প্রেমমুখ্যতা বলে চিহ্নিত করা যায়। অর্থাৎ এখানে রোমান্টিক প্রেমই মুখ্য। অন্য কোন বিষয় নয়। 'নবীন তপস্বিনী' বা 'লীলাবতীতে' নায়ক-নায়িকার ঐ রোমান্টিক প্রেম হয়ে পড়েছিল একপেশে, তাকে প্রধান করবার সাহস তখনো নাট্যকার অর্জন করেন নি। বর্তমান নাটকে কিন্তু তা' হয়নি, এখানে ভালোবাসাই মুখ্য, আর সব কিছু গৌণ। ফলে যা হবার তাই হয়েছে, নায়ক-নায়িকার ওপরেই নাট্যকারের ঝোঁক হয়েছে প্রবলতর।

'কমলে কামিনী'র প্রাধান চরিত্র হল, শিখণ্ডীবাহন। যদিও সহকারী সেনাপতি হিসাবে বর্তমান নাটকে তার পরিচিতি, কিন্তু একটু অন্বেষণ করলেই দেখা যায়, তার জীবনের একটি অংশ ফাঁকা রয়ে গেছে। সে ছিল পিতৃপরিচয়হীন বালক। সেনাপতি সমরকেতুর কাছে সে জন্ম থেকে মানুষ। নিজের শৌর্যে ও পরাক্রমে সে মণিপুর -সৈন্যবাহিনীতে সহকারী সেনাপতির মর্যাদা অধিকার করে নিয়েছে। তার দম্ভোক্তি যে প্রভাতের মেঘগর্জন নয়, একথা আর সকলের মতন রাজাও জানেন। আর একথাও সকলের জানা যে সে একান্তভাবে নির্মল চরিত্রের মানুষ এবং চরিত্রহীনতাকে সে একবারেই সহ্য করতে পারে না। যুবরাজ মকরকেতনকে সে খুবই

ভালোবাসে, কিন্তু তার লম্পটতাকে সে একবারেই সহ্য করতে পারে না, এবং এ ব্যাপারে তার সাফ্ কথা হল, 'তোমার সব ভাল, কেবল একটি দোষ—তোমার উদার চরিত্র, তোমার বদান্যতা, তোমার দেশহিতৈষিতা দেখলে তোমাকে পূজা করতে ইচ্ছা হয়, আর তোমার লম্পটতা দেখলে তোমার সঙ্গে এক বিছানায় বসতে ঘৃণা করে।'—৬৬ শিখণ্ডীবাহন এইরকম এক সুকঠিন নির্মল আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু তাই বলে সে প্রেম-ভালোবাসা বর্জিত এক দৈত্য বিশেষ নয়। বরং একবারে বিপরীত। তার লৌহকঠিন ব্যক্তিত্বের অন্তরালে, তার হৃদয়ের নিভৃতে লুকিয়েছিল সুন্দরের জন্য তৃষ্ণা। অজানা ও অধীরা এক সুন্দরী রমণীর জন্য ছিল তার অজস্র ভালোবাসা। মকরকেতনের ভাষায় বলা যায়, 'দাদা কাব্যেতে ইন্দীবর নয়নার বর্ণনা পড়েছেন, উনি সংসারে তাই চান। দাদার হৃদয়ে বোধহয় পরিণয় কুসুমের সৃষ্টি হয় নি।'৬৭ যাইহোক, এ সংশয়ের শেষ পর্যন্ত নিরসন হল, বিপক্ষদলের সেনাপতিকে পরাস্ত করে শিখণ্ডীবাহন যে মুহূর্তে যুদ্ধে জিতলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে। ঠিক সেই মুহূর্তেই রণকল্যাণীর হাতের পদ্মের মালা শিখণ্ডী-বাহনের গলায় গিয়ে পড়ল। ওদিকে রণকল্যাণীর পায়ের কাছে পড়েছে তার মাথায় পাগড়ি। সুতরাং এটি নায়কের আত্মসমর্পণ ছাড়া আর কী! এর পর মণিপুরী ছাঁদে উভয়ের প্রেমচিত্র এঁকেছেন নাট্যকার। পূর্বরাগের পর্যায় থেকে মিলন পর্যন্ত সবটাই রসিয়ে রসিয়ে আঁকা। সুরবালার দৌত্য, শিখণ্ডীর 'গীতগোবিন্দ' প্রেরণ, রাসমণ্ডপে উভয়ের সাক্ষাৎকার ও হৃদয় বিনিময়,—কিছুই বাদ দেন নি নাট্যকার। শেষকালে শিখণ্ডীবানের পরিচয় উদ্ধার করে এদের বিয়েও দিয়েছেন।—তবে এত পরিশ্রম ও যত্ন থাকা সত্ত্বেও যা চূড়ান্তভাবে এই নাট্যকার সম্পর্কে বলা যায়, তা'হল, এখানেও তিনি তাঁর নায়ককে প্রকৃত নাটকীয় চরিত্র করে গড়ে তুলতে পারেন নি। চরিত্রটি নাটকের থেকে কাব্যের পক্ষে অধিকতর উপযোগী। অর্থাৎ কাব্যিক।

কেবল নায়ক কেন, নায়িকার ওপরেও এই কথাগুলি সমানভাবে প্রযোজ্য। এ পর্যন্ত আমরা যাদের দেখেছি, তাদের দেখে দীনবন্ধুর নায়িকাদের সম্পর্কে একটি মতামত আমাদের মনে ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে দীনবন্ধুর নায়িকারা বৈশিষ্ট্যবর্জিত, বৈচিত্র্যহীন। তার ওপর এরা এক ঘেয়ে, নিষ্প্রাণ। অন্ততঃ কামিনী ও লীলাবতীর বেলায় এখানে ব্যবহৃত সব শব্দগুলিই আরোপ করা যায়। রণকল্যানী এদের থেকে কিন্তু আশ্চর্য ব্যতিক্রম: এদের তুলনায় অনেক সে প্রাণচঞ্চল, অনেক। এবং প্রকৃত

অর্থে যুবতী। সখী সুরবালা বলেছিল, 'যৌবন যে যায়/ তাকে আটকে রাখা দায়। / সোনার শেকল লোহার খাঁচা, / এর বেলাটি বিষম কাঁচা।'[৬৮] প্রত্যুত্তরে যৌবনচঞ্চলা রণকল্যাণী শুনিয়ে দিয়েছে, 'মনে যৌবন যার, / ভাবনা কোথা তার? / মাথায় পাকা চুল, / খোঁপায় ঘেরা ফুল।'[৬৯]—রণকল্যাণীর কাছে যৌবন যে চিরকাল বাধা, ঐ কবিতাই তার প্রমাণ। এবং রণকল্যানীর কাছে যৌবনের আরেক অর্থ হল সংঘাত। অর্থাৎ যুদ্ধ। এই যুবতী নায়িকার কাছে যুদ্ধ বড়ো প্রিয়। বহু সংলাপের ভেতর দিয়ে তার এই যুদ্ধ-প্রিয়তার উল্লেখ আছে। তবে এই নায়িকার যৌবন আক্ষরিক অর্থেই রানীর মহিমায় অভিষেক লাভ করেছে ভালোবাসা ও প্রেমে চরিতার্থ হয়ে। রণকল্যাণী সেদিন দেখা দিয়েছে 'কমলিনী' হযে কমল-সৌন্দর্যে। রাজার সংলাপ উদ্ধৃত করে বলা যায়, 'বাছার কবরীচক্রে কমলমালা, গলদেশে কমলমালা, করকমলে কমলমালা কমলাসনে উপবেশন; আমার বোধহয় রাই কমলিনী কমলেকামিনী।'[৭০]—অর্থাৎ রণকল্যাণী থেকে এই যুবতী রমণীর কী ভাবে 'কমলেকামিনীতে' উত্তরণ ঘটল, নাট্যকার তাই দেখাতে চেয়েছেন। দীনবন্ধু যে এ ব্যাপারে একবারে ব্যর্থ হয়েছেন, তা' বলা যায় না, বরং আগের নাটকগুলির তুলনায় অনেকখানি সার্থকই বলা যায়। কিন্তু লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, দীনবন্ধুর মধ্যে এখানে নাটকীয়তা থেকে কাব্যের ভাবই প্রবল। রোমান্টিকতার ক্ষেত্রে এই কাব্যকে তিনি যে কখনও অতিক্রম করতে পারেন নি এ তারই উদাহরণ।

এই নাটকে অপরাপর যে চরিত্রগুলি আছে, তার 'টাইপ'গুলি প্রায় সবই আমাদের কাছে পরিচিত। তাই বিস্তৃত আলোচনার মধ্যে না গিয়ে, সংক্ষেপে তাদের ব্যাপারগুলি আমাদের সেরে নেওয়া ভালো। যদিও এরা সকলেই রাজা-রাজড়ার পোশাক পরে আমাদের কাছে দেখা দিয়েছে, এবং এদের আড়াল করে একটি রঙিন রোমান্টিক পর্দার রয়েছে আবরণ, কিন্তু যেন ভুলে না যাই, ঐ পর্দাটুকু সরিয়ে দিলেই আমরা যে মানুষগুলিকে আবিষ্কার করি, তারা সবই আমাদের মতন বাস্তব জগতেরই অধিবাসী। এরা আমাদের এতই কাছের যে রাজা-রাজড়ার পোশাকগুলিও তাদের প্রকৃত পরিচয়কে কোনো রকমেই আড়াল করতে পারে না। যুবরাজ মকরকেতন সেকালের জমিদারদের নিষ্কর্মা ছেলেরই প্রতিরূপ। তার গণিকাসক্তির কারণ হিসাবে সে বলেছে, 'আমি কি তার রূপে মোহিত হইচি? আমি তার বিদ্যায় মোহিত হইচি, তার বানান শুদ্ধ লেখায় মোহিত হইচি, তার কবিত্ব

শক্তিতে মোহিত হইচি।'[৭১] বলার অপেক্ষা রাখে না, গণিকার এই গুণগুলি একটু অভিনব। ওদিকে গণিকা শৈবলিনীর কণ্ঠে শোনা গেল শরৎচন্দ্রের নায়িকাদেরই কণ্ঠস্বর,—'আমি লোকাচারে বারবিলাসিনী, বস্তুতঃ বার-বিলাসিনী নই।[৭২]—এই নাটকে বিদূষকের ভূমিকায় একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র আছে, এবং সে চরিত্রটি হল বকেশ্বর। পরস্ত্রী লোলুপতাকে বাদ দিলে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বকেশ্বর হল জলধরের যৌবন সংস্করণ। সংস্কৃতনাটকের বিদূষকদের মতন সে ঔদরিক। যুদ্ধের বেলায় ভীষণ তার আতঙ্ক। অশ্বারোহণের জন্য অশ্বপৃষ্ঠে 'গোঁজ' সৃষ্টি করা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে পুরস্ত্রীদের শিবির রক্ষা করার দায়িত্ব নেবার পরিকল্পনার ভেতর দিয়ে সে সহজেই একটি হাস্যরসের সুন্দর পরিবেশ গঠনে সমর্থ হয়েছে। তার মুখে কতকগুলি আপ্তবাক্যও শোনা গেছে, এবং এই আপ্তবাক্যগুলি বিশেষ ভাবে মনে রাখবার মতন। যেমন,—'আম শুক্‌য়ে আম্‌সি, জল শুকিয়ে পাঁক, / বৃদ্ধ বেশ্যা তপস্বিনী, আগুন মরে থাক্।'[৭৩]—কেবল বৃদ্ধ বেশ্যাদের সম্পর্কে নয়, গণিকাশক্তির সম্পর্কেও সুন্দর স্বগতোক্তি আছে, যথা—'সঙ্গ দোষে ভাই, / বেশ্যাবাড়ী যাই, / গোটমজলে জিজির মজে, সন্দেহ তার নাই'।[৭৪]

না, আলোচনা আর বাড়িয়ে লাভ নেই। উনিশশতকী সমাজের অনেক চরিত্ররূপই যে এখানে ধরা পড়েছে, তা' একটির পর একটি উদাহরণ সহযোগে সর্বসমক্ষে তুলে ধরা কিছু কঠিন নয়। রাণী গান্ধারীর মাধ্যমে উনিশ-শতকী সমাজে বহুবিবাহ জনিত সমস্যা ও সপত্নী পীড়নের ছবি দেখানো যায়, গনিকাসক্ত পুরুষদের স্ত্রীরা কী ধরণের মর্ম যন্ত্রণা ভোগ করত, তার স্বাদ পেতে হলে আমাদের তাকাতে হবে রাজবধূ সুশীলার দিকে। সুরবালা-নীরদকেশীর মাধ্যমে উচ্ছলা সখীদের প্রাণপ্রাচুর্য অনুভব করা যায়। আর বীরভূষণের ভেতর দিয়ে স্ত্রৈণ স্বামীর প্রতীকী চরিত্র যে ভাবে ফুটে উঠেছে, তা' মনে রাখবার মতন। মোটকথা, দীনবন্ধু যা নিয়ে কারবার করেন, সেই মনুষ্য-চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্য উন্মোচনে 'কমলে কামিনী' যে নাট্যকারের একটি হাতিয়ার, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। আর পরিবেশটা রোমান্টিক বলে, ভাবাতিশয্যে তিনি কাহিনী ও চরিত্রকে যে শ্লথ হতে দিয়েছেন, তাও নয়। বরং এদের সহজ ও উপভোগ্য করে তুলেছেন হাস্যরসে অভিষেক করে। ফলতঃ পটভূমি কাল্পনিক হলেও নাটকটি কোনো রকমেই বাস্তব বর্জিত হতে দেননি।—'কমলে কামিনী'র পক্ষে এটাই হল গৌরবের কথা।

বিত্তবান রোমান্টিক কল্পনার ভেতর দিয়ে মধ্যবিত্ত মানুষদের মন কদাচ প্রতিফলিত হয় কী না, এ নিয়ে একটি জিজ্ঞাসা বর্তমান আলোচনার উপসংহারে দেখা দিতে পারে। অন্য কোথাও নয়, 'মেরী ওয়াইভসে'র ভেতর দিয়ে সমকালীন 'মিডল ক্লাশ প্রভিনশিয়াল লাইফ' আত্মপ্রকাশ করেছে বলে কোনো কোনো সমালোচক যে মনে করে থাকেন, তা' ইতিপূর্বে নিবেদন করা হয়েছে। এখন আমাদেরো একটু খতিয়ে দেখা দরকার,—দীনবন্ধুর রোমান্টিক নাটকগুলিতেও তেমন কোনো অঘটন ঘটেছে কী না! রোমান্টিক ভাবনা সাধারণতঃ ও সর্বত্র যে ঐশ্বর্যবান হয়ে থাকে, তা' উল্লেখ করবার অপেক্ষা রাখে না। যাঁরা কল্পনাবিলাসী, তাঁদের অতৃপ্ত কামনা বাসনা সর্বদাই কল্পনার আকাশে পাখা মেলে উড়ে বেড়ায়। রূপকথার পক্ষিরাজ ঘোড়ার মতনই অনেক সম্ভব-অসম্ভবের বেড়া টপকে এঁদের কল্পনা চলে উড়ে। এই অবাধ সঞ্চরণের জন্যই শিল্পী ও সাহিত্যিকদের কাছে এ জগৎটি বড়ো প্রিয় এবং বড়ো আকর্ষণের। এখানে মধ্যবিত্তের খর্বজীবন প্রতিফলিত হতে যাওয়া নিতান্তই বিড়ম্বনা মাত্র। আর যদিবা প্রতিফলিত হয়, বর্ণহীন সুষমাহীন দরিদ্র মধ্যবিত্ত মন কেমন করে ঐ ঐশ্বর্যবান রোমান্টিকতার রাজ্যে ঠাঁই করে নেবে, সে এক সুগভীর রহস্য এবং ততোধিক সুকঠিন এক জিজ্ঞাসা।—স্বীকার করতেই হয়, তবু অঘটন ঘটে। অন্ততঃ দীনবন্ধুর বেলাতে 'মেরী ওয়াইভসে'র মত একটি অঘটন ঘটেছে।

'নবজাগরণে'র সঙ্গে জন্মসূত্রেই একটি সম্প্রদায়ের উদ্ভব যে ঘটেছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের একটি লেখা উদ্ধার করে তা' আমরা দেখিয়েছি। ঐ নবোদ্ভূত সম্প্রদায় হল, মধ্যবিত্ত সমাজ। এর জন্মলগ্নে শাঁখ বাজেনি। পরে সাবালক হয়ে এই সম্প্রদায় যখন বিত্তবান জমিদারদের হাত থেকে সমাজের কর্তৃত্ব গ্রহণ করল, তখনো হাঁক-ডাক কিছু শোনা যায় নি। মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা যখন এই কর্তৃত্ব গ্রহণ করে, তা' যথেষ্ট নীরবতার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হলেও, একজনের অন্ততঃ চোখ এড়ায় নি। সেই একজন হলেন বঙ্কিমচন্দ্র।—এই পরিবর্তনকে চোখের ওপর দেখে বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন, 'কর্তৃত্ব ধনের হাত হইতে বুদ্ধি বিদ্যার হাতে গেল। এখন হইতে বাঙ্গালার ধনবানেরা আর কেহই নহেন, শিক্ষিত সম্প্রদায়ই কর্তা।'[৭৫]

এই কর্তৃত্বের বিস্তৃত পরিচয় সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল থাকতে পারে, তবে বর্তমান প্রসঙ্গে তা' অপ্রয়োজনীয়। আমাদের কৌতূহল, জীবনযাত্রার

খুঁটি-নাটি বিষয়ে। এঁদের চলাফেরা, পোশাক-আশাক, আমোদ-প্রমোদ, অবকাশ যাপন এবং পরিশীলিত রুচি কী ভাবে এঁদের মনকে মেলে ধরেছে, তা' নানাভাবে খুঁজে বের করাই আমাদের লক্ষ্য।—এই অন্বেষণে কয়েকটি চমকপ্রদ তথ্য আমাদের চোখে সহজেই যে ধরা দেবে, তা' নিশ্চিতভাবে বলা যায়। এ ব্যাপারে সামাজিকের সঙ্গে রোমানটিক নাটক যেন চলেছে পাল্লা দিয়ে। যদিও দু'জনের পালনীয় ভূমিকা এক নয়।

না, অন্যকোনো তথ্য নয়, কেবল 'শনিবার' সম্বল করেই আমাদের এ পথে এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে। শনিবারের অর্ধদিবস এবং রবিবারের ছুটি নিয়েই মধ্যবিত্ত চাকুরে বাবুদের 'উইক্এণ্ড'। আর এই 'শনিবার' কেন্দ্রিক উইকএণ্ড দিয়েই মধ্যবিত্ত বাবুদের পরিচিতি। কেননা, যখন অবকাশ ছিল সুপ্রচুর, তখন এই 'শনিবারে'র কথা ওঠেনি; আবার যাঁরা আরামে-আমোদে জীবনভোর অবকাশ উপভোগ করেন, সেই উচ্চবিত্ত মানুষদের কাছে 'শনিবারে'র মাধুর্য কোথায়? সুতরাং বলার অপেক্ষা রাখে না, 'শনিবার' দেখলেই বোঝা যাবে মধ্যবিত্ত মানুষদের উপস্থিতি।—এই শনিবারে কে কী করতেন, তা' দীনবন্ধুর সাহিত্য থেকে কিছু কিছু সংগ্রহ করা যেতে পারে। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' নাটকে রাজীবকে সান্ত্বনা দিয়ে ঘটক বলেছেন, 'আপনি শনিবারের সন্ধ্যার পর আমার সঙ্গে যাবেন, রবিবারের প্রাতে গৃহিণী লয়ে গৃহে প্রবেশ করবেন।'[৭৬]—'কমলে কামিনী' নাটকেও এই 'শনিবারে'র নিঃশব্দ অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এখানে ব্যস্ততার কথা বলতে গিয়ে সুরবালা বলেছে, 'শনিবারের জামাইয়ের মত ব্যস্ত হল যে!'[৭৭] এই শনিবারের কথা 'সধবার একাদশী'তে অবশ্য একটু অন্যভাবে প্রকাশিত। ওখানে কুমুদিনী তার ননদিনীকে জানিয়েছে, 'ঠাকুরজামাই এক শনিবার না এলে তোমার মনটি কেমন হয়।'[৭৮] এই মন-কেমন-করা প্রতীক্ষার ভাবটি 'নবীন তপস্বিনী'তেও দেখা যায়। হোঁদল প্রেয়সী তার প্রিয় হোঁদলকে 'শনিবারে' সন্ধ্যার রোমান্সে প্রলুব্ধ করে লিখেছে,

শনিবার সন্ধ্যা পরে দেবে দরশন,
নহিলে ত্যজিব আনি জীবনে জীবন।[৭৯]

এখানে একটি জিনিস লক্ষণীয়, সামাজিক নাটকের মধ্যে ব্যবহৃত 'শনিবারে'র সঙ্গে রোমান্টিক নাটকের 'শনিবার'-কে লেখক এক করে দিয়েছেন। না কোনো পার্থক্যই রাখেন নি।

কেবল এই ব্যাপারে নয়, ঘর সাজানোর রুচিতেও একটি মধ্যবিত্ত মনকে

নাট্যকার তাঁর নাটকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। 'কাশীপুরে' লীলাবতীর পড়ার ঘর দেখে হেমচাঁদ যা বলেছে, তাতে এই মধ্যবিত্ত মনের শৌখীনতার দিকটি প্রকাশিত। হেমচাঁদ বলেছে, 'ঘরটি বেশ সাজিয়েছেত—মেজেটিতে মাদুর মোড়া, দ্বারের কাছে পা-পোষ পাতা, মেহগিনি কাঠের সেজটি, আর বুটো কাটা মেজের চাদর, ক্লিওপ্যাট্রা কোচ, চেয়ার ক'খানি মন্দ নয়।'[৮০] বলার অপেক্ষা রাখে না, গৃহসজ্জার প্রতি এ জাতীয় প্রশংসাসূচক মনোভাব মধ্যবিত্ত রুচি থেকেই উৎসারিত।

আরো লক্ষণীয়, জলধর-বিনায়ক থেকে সমরকেতু-শিখণ্ডিবাহন প্রমুখ সব প্রধান চরিত্রই চাকুরে। বাইরে এঁদের যতই চাকচিক্য থাকুক না কেন, ঝলমলে পোশাকের অন্তরালে এঁরা নিতান্তই সাদামাটা মানুষ। বেচারি জলধরেরতো বর্ণ 'তেলকালি, তাতে আবার এক একখানি দাদ হয়েচে, চেহারার চটক দেখে কে?'[৮১]—আর মল্লিকার চোখে বিনায়ক হলেন এই-রকম: 'যখন কাছে থাকেন, তখন স্বর্গে তোলেন, বলতে কি তখন ভাই বোধহয় মিন্‌সে বুঝি আমায় বই আর জানে না, আমি মলে মিন্‌সে বুঝি সমরং যাবে।'[৮২] আর মালতি-মল্লিকা যতই রোমান্টিক মহিলা হোন্‌-না-কেন পাড়াগাঁয়ে মেয়েদের মত ঘাটে যেতে না পারলে, তাঁদের যেন স্নান সারা হ না। এবং তাদের অভিযোগ হল, 'হোঁদল কুঁৎকুঁতের উপদ্রবে পাড়ার মেয়েরা ঘাটে যেতে পারে না।'[৮৩] এই ঘাটে যাওয়া ও স্বামী-সোহাগের কাহিনী যে মধ্যবিত্ত জীবনের থেকে নেওয়া, তা' আশা করি দেখিয়ে দেবার অপেক্ষা রাখে না। ঠিক এইভাবে, এঁদের কথায় কান পাতলে, চাকুরে স্বামীদের স্বাস্থ্যভঙ্গের কথাও শোনা যেতে পারে। বিনায়কের প্রতি সোহাগে মল্লিকাকে আক্ষেপ করতে শোনা গেল, 'ভাই রাত্রিদিন পরিশ্রম করলে কি শরীর থাকে, আজ বিকালে এসে ভাত খেয়েচে।[৮৪]—

এহ বাহ্য। এ জাতীয় উদাহরণ প্রচুর। সেদিনের মধ্যবিত্তের জীবনে যা যা প্রয়োজন হত, তার সবই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে রোমান্টিক নাটকে ব্যবহার করেছেন দীনবন্ধু। ব্রাহ্মসভা, স্কুল, ডিস্‌পেনসারি, বাঈজির নাচ, এসিয়াটিক মিউজিয়াম, ফরজারি, কুকসাহেবের আড়গড়া থেকে ব্রহ্মদেশের টাট্টু ঘোড়া—কিছুই অনুপস্থিত থাকেনি দীনবন্ধুর নাটকে। নদেরচাঁদের মুখে যেমন শোনা গেছে, 'বেঁচে থাকুক বিদ্যাসাগর চিরজীবে হয়ে',[৮৫] তেমনি গ্রন্থ হিসাবে আমরা পেয়েছি মধ্যবিত্ত-পাঠ্যগ্রন্থ—যথা, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, কাদম্বরী, মেঘনাদবধ, ধর্ম্মনীতি, সুশীলার উপখ্যান ইত্যাদি।[৮৬]

অর্থাৎ লেখাপড়ার দিকেও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের অভ্যুদয় চিত্র দীনবন্ধু তাঁর নাটকে পেরেছেন ধরে রাখতে। এবং এ সংবাদও অবিদিত নয় যে হেমচাঁদ নদেরচাঁদের মত পাঠককুলের কাছে 'গুড়গুড়ের' খ্যাতি ছিল সমধিক। আর পাঁচালিকার 'দাশরথি'র কথাও এই খ্যাতির প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

'কাঁচলি'-পরা সাধারণ মধ্যবিত্ত সমাজের মেয়েদের পক্ষে সেদিন নিন্দনীয়হলেও, লীলাবতীর মত শিক্ষিতা মেয়েরা যে 'কাঁচলি' পরিধান চালু করেন, তা' দীন- বন্ধুই প্রথম দেখিয়েছেন। আর পোশাকেও বিপ্লব আনেন এই মেয়েরা। শারদার একটি সংলাপ থেকে জানা যায়, সেকালের লেখাপড়া-জানা মেয়েরা শুধু কাঁচলি নয়, পরন্ত পায়ে মোজা এবং অঙ্গে সাটিনের চোস্ত কুর্ত্তি ইত্যাদি। লীলাবতীর পোশাকের বর্ণনায় শারদার পুরো সংলাপটি ছিল এই রকম: 'তার পায় কালো রেশমি মোজা ছিল, একটি সাটিনের চোস্ত কুর্ত্তি ছিল, তার উপরে বারাণসী শাড়ী পরা ছিল।'[৮৭]

না, এই ভাবে আলোচনা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। কেননা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে গেলে এই পরিচিতির জন্য পরিসর কেবল বেড়ে যেতেই থাকবে। তাই উপসংহারে শুধু এইটুকুই বলে নেওয়া ভালো যে দীনবন্ধুর রোমানটিক নাটকে আমরা যে মানুষগুলির মুখোমুখি হই, তারা কেউই তেমন রোমান্টিক নন, এঁরা সে যুগেরই মধ্যবিত্ত মানুষ, সবরকম মধ্যবিত্ত সংস্কার নিয়েই এঁরা দেখা দিয়েছেন নাটকে। অর্থাৎ দীনবন্ধুর অন্তরে মানবিকতা-বাদের ও নবজাগরণের সংস্কার এতই প্রবল ছিল যে তিনি তাঁর সমকালকে ফেলে রেখে এক পাও পারেন নি এগিয়ে যেতে। দীনবন্ধুর পাঠকদের কাছে অনেক খবরের ভেতর এইটাই হল 'খোশ'খবর। বর্তমান প্রসঙ্গের এখানেই ইতি টানা যাক।

রোমান্টিকতার পালা শেষ করে এবার সামাজিক প্রহসনের দিকে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে।

॥ সূত্র নির্দেশ ॥

১। ডাঃ ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত 'কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী', পৃ. ১৪৯

২। দীনবন্ধু মিত্র, (১৩৫৮), পৃ. ৫৫

৩। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, (বৈশাখ, ১৩৬২), আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ. ১৮৭

· বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, প্রবন্ধখণ্ড/শেষ অংশ, (৭ই জুন, ১৯৭৩), পৃ. ১১৩৪

৫। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, (১৩৫০), পৃ. ১০৫

৬। The Civilization of the Renaissance in Italy (6th printing of this edition MCMLX), by Jacob Burckhardt, P. 180.

৭। Ibid, P. 93,—বুকহার্ট সাহেব তাঁর গ্রন্থের একটি বিস্তৃত অংশের নাম দিয়েছেন 'রিডিকিউল অ্যাণ্ড উইট'। এখানে রেনেসাঁসী পটভূমিতে সব রকম হাস্তরসের কথাই তিনি করেছেন লিপিবদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর একাধিক প্রবন্ধে, অন্ততঃ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও দীনবন্ধু সম্পর্কীত আলোচনায়, উনিশ শতকের নতুন রীতির হাস্তরসের কথা প্রাচীন যুগের সঙ্গে তুলনা করে ব্যাখ্যা করেছেন।

৮। বঙ্কিমরচনা সংগ্রহ, প্রবন্ধ খণ্ড/শেষ অংশ, (৭ই জুন, ১৯৭৩), পৃ. ১১২৫

৯। ঐ, পৃ. ১১২১

১০। 'নবীন তপস্বিনী', প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

১১-১২। 'বসুমতী সংস্করণে'র টেকচাঁদের যে গ্রন্থাবলী আছে, ঐ গ্রন্থের 'মদ খাওয়া বড় দায় ও জাত থাকার কি উপায়' শীর্ষক রচনায় এই 'আগড়ভম সেনের কাহিনী আছে।

১৩। 'নবীন তপস্বিনী', চতুর্থ অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

১৪। A History of English Literature, (1963), Thomas Nelson Edition, by Arthur Compton-Rickett, P. 134.

১৫। 'প্রচার' পত্রিকা, ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ।

১৬। Shakesperian Comedy, by Parrot, P. 253

১৭। The Merry Wives of Windsor, Act V. Sc. V.

১৮। Shakesperian Comedy, by Parrot, P. 254

১৯। Ibid, P. 260.

২০। 'নবীন তপস্বিনী' নাটকের প্রথম অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে 'রাজার উদ্যানে' যখন জলধর প্রথম দেখা দিলেন, সেই প্রথম দেখা-দেওয়ার প্রথম সংলাপেই একথা বিবৃত। সংলাপটি সুদীর্ঘ। ঐ সুদীর্ঘ সংলাপে আত্মসমীক্ষার সঙ্গে নিজের স্ত্রী জগদম্বারও তুলনামূলক আলোচনা রয়েছে। এই আলোচনাটি পাঠ করলে বোঝা যায় যে জলধর মোটেই কিন্তু নির্বোধ নয়, বরং সে অতিশয় বুদ্ধিমান। সচেতন ভাবেই সে কৌতুকের খেলায় নিজেকে সমর্পণ করেছে।

২১। 'নবীন তপস্বিনী' নাটকের প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

২২। ঐ, তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

২৩-২৫। ঐ, চতুর্থ অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

২৬। 'হোঁদল' শব্দটি সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল হয়। এই কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এবং জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের শরণ নেওয়া যেতে পারে। বিদ্যানিধি মশাই লিখেছেন—'হোঁদল কুৎকুত্যে ৵০ (হোঁদড় কিংবা ভোঁদড় হইতে। হোঁদল জন্তু তুল্য কুচ্‌কুচিয়া দীপ্তি যার। বা° তে হোঁদল পৃথক শব্দ নাই। ভোঁদড়ের (বনমার্জার বিশেষ) লোম কর্কশ। বোধ হয়, উপহাসে (বিপরীতার্থে)। স্থূল কৃষ্ণ বর্ণ দেহ।'—বাঙ্গালা ভাষা, দ্বিতীয় ভাগ। 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' (প্রথম খণ্ড), পৃ. ৯৭৮।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস লিখেছেন, 'হোঁদল (ল্) [ভুড়িয়াল (হি-ভোঁদল)-ভুঁরল-ভোঁদল-হোঁদল বিদ্রূপে] বিণ, স্থূলোদর। হোঁদল কুৎকুৎ—কদাকার ভাবে স্থূল মাংসপিণ্ডবৎ দেহ এবং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ জন্তু। (২) বিদ্রূপার্থে তৎসদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি।—'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান,' পৃ. ১৪৬৭

২৭। 'নবীন তপস্বিনী', পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

২৮। ঐ, পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

২৯। Shakesperian Comedy, Parrot, P. 261

৩০। 'নবীন তপস্বিনী', প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৩১। ঐ, দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

৩২। ঐ, প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৩৩। The Merry Wives of Windsor, Act II, Sc I.

৩৪। 'নবীন তপস্বিনী', প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৩৫। ঐ, দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

৩৬। বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, (১৯৭৩) প্রবন্ধ খণ্ড শেষ অংশ, পৃ. ১১২৬

৩৭। 'লীলাবতী', দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৩৭ ক। ঐ, পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

৩৮। ঐ, প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

৩৯। ঐ দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৪০। ঐ, প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

৪১। সংস্কারের থেকে স্নেহ যে অনেক বলবান এবং তার প্রভাব যে অনেক দুর্বার, হরবিলাসের এই সংলাপটি তার প্রমাণ। হরবিলাসের এই উক্তি তাকে যথার্থ মানবিক করে তুলতে সমর্থ হয়েছে। বিস্তৃত সংলাপটির জন্য চতুর্থ অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য দ্রষ্টব্য।

৪২। 'লীলাবতী' নাটকের পঞ্চম অঙ্ক. তৃতীয় দৃশ্য দ্রষ্টব্য।

৪৩-৪৪। ঐ, প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য।

৪৫। বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ, (১৯৭৩), প্রবন্ধ খণ্ড শেষ অংশ পৃ ১১৩১

৪৬। মূর্খতাও যে কৌতুকরসে উপভোগ্য হতে পারে, তার উদাহরণ হল এই ছড়াটি। নদেরচাঁদ এই জাতীয় সংলাপের জন্য নাটকে সর্বাধিক উপভোগ্য। 'লীলাবতী' নাটকের চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য থেকে এটি উদাহৃত হল।

৪৭। 'লীলাবতী', পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য।

৪৮। ঐ, দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য।

৪৮ ক। ঐ, প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য।

৪৯। হেম চাঁদের ওপর নদেরচাঁদের প্রভাব কী দুর্বার, বর্তমান সংলাপটি তার উদাহরণ। প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য দ্রষ্টব্য।

৫০। 'লীলাবতী' পঞ্চম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য।

৫১-৫২। ঐ, প্রথম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য।

৫৩। 'কলেজীয় শিক্ষা'র প্রতি সাধারণ মানুষরাও যে কতখানি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, এই জাতীয় কথোপকথন থেকে তা' অবগত হওয়া যায়। 'নবজাগরণ ও নিউলার্নিং' প্রসঙ্গে এই উক্তিটি মনে রাখবার মতন। বর্তমান নাটকে এ জাতীয় উদাহরণ দুর্লভ নয়। আলোচ্য সংলাপটি দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে উদাহৃত।

৫৪। 'লীলাবতী', চতুর্থ অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

৫৫। ঐ, পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

৫৬-৫৭। বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ (১৯৭৩), প্রবন্ধখণ্ড শেষ অংশ, পৃ. ১১৩৪

৫৮। নব যুগের নায়িকা বলতে ইউরোপীয় ভাবধারায় প্রভাবিত ও উদ্দীপিত নায়িকাদের কথাই বলতে চেয়েছি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'মেঘনাদে'র প্রমীলা এই জাতীয়া চরিত্র।

৫৯। 'অমৃত বাজার পত্রিকা', ১১ই জানুয়ারী, ১৮৭৩ খ্রীঃ।

৬০। লীলাবতী, প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৬১। এই উক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের। 'লীলাবতী' সম্পর্কে বঙ্কিমের একটু দুর্বলতা ছিল, তিনি এই নাটকটির সম্পর্কে যা বলেছেন, তা' হল, 'লীলাবতী' বিশেষ যত্নের সহিত রচিত এবং দীনবন্ধুর অন্যান্য নাটকাপেক্ষা ইহাতে দোষ অল্প।'—বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ, (১৯৭৩), প্রবন্ধখণ্ড শেষ অংশ পৃ. ১১২৬

৬২। Bengal Under the Lieutenant Governors, Vol. I, (1901), P.499

৬৩। বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ, (১৯৭৩), প্রবন্ধখণ্ড শেষ অংশ, পৃ. ১১২৪

৬৪। The Imperial Gazetteer of India, Vol IX, (1908), P. 251

৬৫। Ibid, Vol XVII, (1908). P. 186.

৬৬। 'কমলে কামিনী', (সা. প. সং ১৩৫৯), পৃ. ১৯

৬৭। ঐ, পৃ. ২৩

৬৮-৬৯। ঐ, পৃ. ২৩

৭০। ঐ, পৃ. ৮২

৭১। ঐ, পৃ. ২১

৭২। 'কমলে কামিনী' নাটকে প্রত্যক্ষভাবে 'শৈবলিনী' নামে কোনো চরিত্র নেই। এই চরিত্রটি আছে নেপথ্যে এবং রাজকুমার মকরকেতকের মনে। দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কের একটি চিঠিতে সে একথা বলেছে।

৭৩। ঐ, পৃ. ৫৩

৭৪। ঐ, পৃ. ৫৪

৭৫। 'রাজভক্তি', 'জাতীয় ঐক্য', 'রাজকীয় শক্তি'র পর চতুর্থলাভ হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র এই 'মধ্যবিত্ত' সমাজের অভ্যুদয়কে চিত্রিত করেছেন। এই প্রসঙ্গে 'বঙ্কিম রচনাসংগ্রহের (১৯৭৩), প্রবন্ধখণ্ড শেষ অংশের ১২১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। রচনাটির নাম, 'লর্ড রিপনের উৎসবের জমা খরচ।'

৭৬। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৭৭। 'কমলে কামিনী', তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৭৮। 'সধবার একাদশী,' দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

৭৯। 'নবীন তপস্বিনী', তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

৮০। 'লীলাবতী', দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৮১-৮২। 'নবীন তপস্বিনী', প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

৮৩। ঐ, দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

৮৪। ঐ, চতুর্থ অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

৮৫-৮৬। 'লীলাবতী', দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৮৭। ঐ, প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পাঁচ

॥ হাস্যরসিকের চোখে সমকাল ॥

'বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক কে এ সম্বন্ধে চট্ করিয়া একটা মন্তব্য করা সহজ নহে; কিন্তু দীনবন্ধু মিত্রকে এ সম্মান দিলে বোধহয় অসঙ্গত হইবে না। তাঁহার ন্যায় হাসাইতে কেহ পারেন নাই এবং শরৎচন্দ্র ব্যতীত সম্ভবত তাঁহার ন্যায় কাঁদাইতেও আর কেহ পারেন নাই।'[১]—

অকপটে এই কথাগুলি কবুল করেছেন যিনি, তিনি সেকালের কেউ নন, ইনি বরং একালেরই একজন সমালোচক। আমাদের হাস্যরসের ধারায় দীনবন্ধুর যে স্থায়ী একটি আসন আছে, এ হল তারই স্বীকৃতি। অন্ততঃ একালের লোকেরাও যে আমাদের আলোচ্য নাট্যকারকে শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক হিসাবেই দেখে থাকেন, এ তারই দলিল।

মজার ব্যাপার এই যে, এত বড়ো গৌরব যাঁর ওপর আরোপ করা হল, ইনি মাত্র তিনখানি প্রহসনের স্রষ্টা। সেই তিনখানি প্রহসন হল, 'বিয়েপাগলা বুড়ো', 'সধবার একাদশী' এবং 'জামাইবারিক'। কুল্যে তিনখানি নাটক লিখে, এতখানি সম্মান পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে আর কেউ কখনো পেয়েছেন কী না, আমাদের জানা নেই। আর আকারে অবয়বেও এরা যে বিপুল, তাও নয়। বরং অপরাপর সাহিত্যকর্মের তুলনায় এদের নিতান্তই শীর্ণ ই বলা যায়। যাই হোক, ঐ শীর্ণ তিনটি গ্রন্থ নিয়ে যিনি আমাদের সাহিত্যে হাস্যরসের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক হিসাবে বন্দিত, সেই লেখক 'হাস্যরসে তিনি প্রকৃত ঐন্দ্রজালিক ছিলেন'[২] —এই অভিধাতেও স্বীকৃত। তিনি সত্যি সত্যিই যে বড়ো শিল্পী ছিলেন, আশকার, ব্যাপারে কোনো সংশয় নেই। ঐন্দ্রজালিক না হলে এরকম অঘটন ঘটে কী ?

হাস্যরসের পক্ষে 'রেনেসাঁসে'র কাল যে সবিশেষ অনুকূল ছিল, তা' একাধিক বার বলা হয়েছে। পশ্চিমের ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে আমাদের ভারতীয় সভ্যতার যখন পরিচয় ঘটল, তখন এ পরিচয় যে সর্বত্র পারস্পরিক মিলনের মধ্য দিয়ে প্রীতি ও রোমান্সের রসে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, এ অনুমান যথার্থ নয়, বরং এ মিলন হাস্যরসকেই অনিবার্যভাবে উৎসারিত করেছে বলেই ধরে ধরে নেওয়া হয়। যাঁরা 'রেনেসাঁসে'র বাণী নিয়ে

সত্যান্বেষণে বৃত ছিলেন, তাঁদের প্রতিভার পক্ষে এই হাস্যরসিকতা ছিল অনুকূল। তাই দীনবন্ধুর প্রতিভা সহজেই হতে পেরেছিল এ রসের উপযোগী।

আর কতখানি উপযোগী, তা' গত শতকের সামাজিক অসঙ্গতির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। এবং এই অসঙ্গতিটা হল এই রকম: 'ইংরাজের সহিত পরিচয়ের ফলে দীর্ঘকাল ধরিয়া অকর্ষিত, উষর ভূমিতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের প্রথম প্রয়োগে হাস্যরসের নির্ঝর বহিয়া গেল। ...ইংরেজের বিলাস-ব্যসন ও জীবন যাত্রা প্রণালীর অনুকরণের আতিশয্যে যে উদ্ভট, হাস্যরস প্রধান পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল, তাহাতে ব্যঙ্গাত্মক রচনায় প্রথম বীজ অঙ্কুরিত হইল। বিদেশী শাসক বর্গের পৃষ্ঠ পোষকতায় ও সমর্থনে এই অনাচারীর দল সমাজ শাসনকে সহজেই উপেক্ষা করিতে পারিল বলিয়াই ব্যঙ্গ অনুসরণের অবসর মিলিল। এই যুদ্ধে ভীমের গদা প্রয়োগ করা চলিল না। বলিয়াই অর্জ্জুনের তীক্ষ্ণ শরক্ষেপের প্রয়োজন অনুভূত হইল। সামাজিক শাসনের শৈথিল্যের রন্ধ্রপথেই টিটকারীর নল স্থাপিত হইয়া কর্দ্দম বৃষ্টির হোলিখেলা শুরু করিয়া দিল।'[৩]

টিটকিরির নল লাগিয়ে তার মাধ্যমে কর্দ্দম বৃষ্টির হোলিখেলা কী রকম হতে পারে, তার পরিচয় বাঙ্‌লা সাহিত্যের ঐ যুগের অজস্র লেখায় আছে। দীনবন্ধু ঠিক এদের দলে পড়েন না, যদিও তিনি এদের সমকালের লোক। আর তা' ছাড়া ভীমের গদা ও অর্জুনের তীক্ষ্ণ শরক্ষেপের ভেতর কোন্‌টি দীনবন্ধুর প্রতিভার উপযোগী ছিল, তাও বিশেষভাবে আলোচনা সাপেক্ষ। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অভিন্নহৃদয় সুহৃদের সাহিত্য ব্যাখ্যার ব্যাপারে এই সরু-মোটার ব্যাপারটি তুলেছিলেন। তবে তিনি গদা বা তীক্ষ্ণ শরক্ষেপের কথা তোলেন নি, তাঁর দেওয়া উপমাটি ছিল একটু আলাদা রকমের। তিনি মোটার উপমায় 'লাঠির' কথা এনেছেন, আর 'সরুর' সূক্ষ্মতা বোঝানোর জন্য অবতারণা করেছেন ডাক্তারদের ব্যবহৃত 'লানসেটের'। পরিশেষে দীনবন্ধুর হাতে লাঠি তুলে দিয়ে লিখেছেন, 'এখন ইংরাজ শাসিত সমাজে ডাক্তারের শ্রীবৃদ্ধি—লাঠিয়ালের বড় দুরবস্থা। সাহিত্য সমাজে লাঠিয়াল আর নাই, লাঠির ভারে কাতর, শিক্ষা নাই, কোথায় মারিতে কোথায় মারে। হাসায় বটে কিন্তু হাস্যের পাত্র তাহারা স্বয়ং। ঈশ্বরগুপ্ত বা দীনবন্ধু এ জাতীয় লাঠিয়াল ছিলেন না। তাঁহাদের হাতে পাকা বাঁশের মোটা লাঠি, বাহুতে অমিত বল, শিক্ষাও বিচিত্র। দীনবন্ধুর লাঠির আঘাতে অনেক জলধর ও রাজীব মুখোপাধ্যায় জলধর বা রাজীব জীবন পরিত্যাগ করিয়াছে।'[৪]

জলধর ও রাজীবের নায়কতায় দীনবন্ধুর নাটকে যে হাস্যরসের উৎসার দেখি, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে আমরাও একমত যে ঐ হাস্যরস একটু মোটা। আর এই মোটা ভাবটা এমনই স্পষ্ট যে কখনো তা' ভাঁড়ামি বলে ভ্রম হওয়াও কিছু আশ্চর্যের নয়। এই সঙ্গে আরো একটি তত্ত্ব জেনে রাখা প্রয়োজন যে ঐ ভাঁড়ামির সঙ্গে তথাকথিত অশ্লীলতাও এসে যোগ দিয়েছে। ফলে সব মিলিয়ে এমন একটি শিল্পরূপ দীনবন্ধুর হাত থেকে বেরিয়ে এসেছে যা স্বাদে মনোরম হলেও, বিতর্কের সুযোগ করে দিয়েছে অবারিত। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' থেকে 'জামাইবারিক' পর্যন্ত তিনটি নাটকের বেলাতেই একথা বলা যায়। একদিকে অজস্র প্রশংসা, আবার অপরদিকে ততোধিক নিন্দা—দুইই একসঙ্গে সম্বর্ধনা জানিয়েছে আমাদের জীবন-শিল্পীকে। 'রেনেসাঁসে'র লেখকদের কপালে সাধারণত যা ঘটে থাকে, নির্বিরোধ ও বন্ধুবৎসল হওয়া সত্বেও, দীনবন্ধুর জীবনে ঠিক অনুরূপ ঘটনা ঘটে গেছে।

এখন এই কথাগুলি মনে রেখেই তাঁর নাটক-বিচারে আমাদের এগোতে হবে। সমকালের সবরকম সামাজিক দ্বন্দ্বকে আত্মস্থ করেই দীনবন্ধু তাঁর প্রহসনগুলিকে নিজের মনোমত করে গড়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর এই প্রয়াস কতখানি সার্থক, 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' থেকেই তা' আমরা বিচার করে দেখতে পারি।

বিযে পাগলা বুড়ো

আঠারো শ ছেষট্টি খ্রীষ্টাব্দের একুশে জুলাই 'দি বেঙ্গলী' পত্রিকায় বর্তমান গ্রন্থটির যে 'রিভিউ' প্রকাশিত হয়, তা' থেকে জানা যায় যে এই গ্রন্থটি এই ছেষট্টি সালের গোড়ার দিকে ছাপা হয়ে বেরোয়। প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে নানা মহল থেকে গ্রন্থটি সম্পর্কে শোনা যায় নানা কথা। মনস্বী রাজেন্দ্র-লাল মিত্র এ বইটি পড়ে 'রহস্য সন্দর্ভ' পত্রিকায় তাঁর একটি সুচিন্তিত মতামত লিপিবদ্ধ করেন। চারদিকে যখন অশ্লীলতার বাড়াবাড়ি, সেই সময় এই নির্দোষ প্রহসনটি আশ্চর্য সংযম রক্ষা করে প্রকৃত হাস্যরস সৃষ্টিতে এগিয়ে আসতে কী ভাবে সক্ষম হয়েছে, তার বিশ্লেষণ করে রাজেন্দ্রলাল লিখেছিলেন, 'ঐশী শক্তি না থাকিলে যে প্রকার কবি হওয়া অসাধ্য, বিশেষ ও অসাধারণ কল্পনা শক্তি ও রসবোধ ও প্রত্যুৎপন্নমতিতা না থাকিলে সেইরূপ উৎকৃষ্ট প্রহসন রচনা করাও দুস্কর।...ইহা পরম আহ্লাদের বিষয় যে, মিত্র বাবু এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান। তেঁহ অশ্লীল কাব্যে হাস্য জন্মাইবার চেষ্টা

একবার মাত্রও করেন নাই, অথচ রচনা বিশিষ্ট হাস্যদ্যোতক হইয়াছে, সন্দেহ নাই'।[৫]

না ব্যাপারটি একতরফা থাকল না। খ্যাতির পাশাপাশি অখ্যাতির অপযশও দেখা দিল চূড়ান্ত রকম। অখ্যাতির ব্যাপারে দীনবন্ধুর সম্পর্কে লিখিত হল, 'The Babu is regarded as a comical genius. We confess, however, that his attempts at comicality oftener provoke our anger than our mirth. There is no refinement, no delicacy in our auther's wit, it is of the coarsest and broadest sort. It may excite the laughter of women, of children, of uncultivated boors, but a man of culture often turns away from it with disgust.'[৬]—অর্থাৎ দীনবন্ধু যে সর্বতোভাবে ব্যর্থ, বর্তমান উদ্ধৃতিটি তারই নমুনা। তাঁর লেখা মেয়েদের ও শিশুদের হাসাবার পক্ষে যথেষ্ট হলেও, সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষদের মনে এটি বিরক্তি ছাড়া আর কিছুই উৎপন্ন করে না। সুতরাং বাবু দীনবন্ধু আমাদের দেশে 'কমিক্যাল জিনিয়াস' বলে অভিহিত হলেও তা' নিতান্তই ভুল করে বলা হয়ে থাকে।—মোটকথা, এই হল একদিককার মত।

এখন তাঁর প্রতিভার প্রকৃত মূল্যায়ণ করতে হলে সাহিত্যের ভেতরেই প্রবেশ করা দরকার। আর সাহিত্যে প্রবেশ করতে গেলে অন্ততঃ দুটি কথা স্মরণে রেখে আমাদের এগোতে হবে। এই দুটি কথার প্রথম কথা হল, প্রকৃত সামাজিক নাটকের অভাব সেদিন আমাদের ছিল সাংঘাতিক। আর দ্বিতীয় কথা হল, দীনবন্ধুর এই 'বিয়েপাগলা বুড়ো'র আগেই মাইকেল মধুসূদনের প্রহসন দুটি আমাদের হাতে এসে পৌচেছিল। মাইকেলের অন্যান্য নাটকগুলি নিয়ে নানারকম সংশয় থাকলেও, প্রহসন দুটিতে যে তা' নেই, একথা নিঃসংশয়ে বলা যায়। তা' ছাড়া এ অনুমানও সম্ভবতঃ অসঙ্গত নয় যে দীনবন্ধুর ওপর এই দুটি প্রহসনের প্রভাব ছিল অনেকখানি। অন্ততঃ 'বিয়েপাগলা বুড়ো'তে মধুসূদনের বিখ্যাত প্রহসন 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ'র প্রভাব যে রয়েছে, বাহুত একথা স্বীকার করতে হয়।

যদিও দুটি নাটকেই দুটি বুড়োকে চিত্রিত করা দুই নাট্যকারের উদ্দেশ্য, কিন্তু একটু গভীরে ঢুকলে দেখা যায়, দুই বুড়ো ঠিক একজাতের নয়। বুড়ো ভক্তপ্রসাদের সঙ্গে বুড়ো রাজীবের যে চরিত্রগত ব্যবধান, এই ব্যবধানকে মৌলিক বলে চিহ্নিত করাই সঙ্গত। 'বুড়ো সালিকের' বৃদ্ধ ভক্ত

প্রসাদ যেমন কৃপণ, তেমনি চতুর। বাইরে ইনি আবার আচার-নিষ্ঠ গোঁড়া ব্রাহ্মণ, ভেতরে ভেতরে কিন্তু একবারে বিপরীত, লম্পটের চূড়ামণি। এ বুড়োকে ঠিক বুঝতে হলে কুট্টিনী পুঁটির স্বগতোক্তির আলোকে দেখতে হয়। বুড়ো ভক্তপ্রসাদের সম্পর্কে কুট্টিনী পুঁটির স্বগতোক্তিটি এই রকম : 'এত যে বুড়ো তবু আজও যেন রস উৎলে পড়ে। আজ না হবে তো ত্রিশ বছর কম্ম কাচ্য, এতে যে কত কুলের বউ, কত রাঁড় কত মেয়ের পরকাল খেয়েছি তার কিছু ঠিকানা নাই! (সহাস্য বদনে) বাবু এদিকে পরম বৈষ্ণব, মালা ঠক্ ঠাকয়ে বেড়ান, ফি সোমবারে হবিষ্যি করেন—আ কি নিষ্ঠে গো!'[৭]—এই হল 'বুড়ো সালিক' ভক্তপ্রসাদ। এঁর নজর শেষ পর্যন্ত গিয়ে পড়ল 'হানিফ নেড়ে'র বৌ ফতিমার ওপর। আর এবারেই সে ভীষণ ভাবে জব্দ হল, যা সে জীবনে কখনো হযনি। নাটকের শেষে বেচারি তার অপরাধ স্বীকার করে নিতে রাধ্য হল। এবং নিজের চরিত্র পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিল। মোটামুটি ভাবে নাটকের ঘটনাটিকে সংক্ষেপে বিবৃত করতে গেলে যা দাঁড়ায়, তা' এই রকম :

বাইরে ছিল সাধুর আকার,
মনটা কিন্তু ধর্ম্ম ধোয়া।
পুণ্যখাতায় জমাশূন্য,
ভণ্ডামীতে চারটি পোয়া॥
শিক্ষা দিলে কিলের চোটে,
হাড় গুঁড়িয়ে খোয়ের মোয়া।
যেমন কর্ম্ম ফললো ধর্ম্ম,
'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রেঁাযা।'[৮]

অনেক সমালোচক মনে করে থাকেন যে 'মলিয়্যারে'র লেখা 'তারতুফে'র সঙ্গে মধুসূদনের এই নাটকটির আশ্চর্য মিল আছে। কেবল মিল নয়, এঁরা এ ব্যাপারে মধুসূদনের ওপর 'মলিয়্যারে'র প্রভাবও আবিষ্কার করে থাকেন। ধর্মের ভণ্ডামি করে 'তারতুফ' একদা হানিফের মত অর্গ নামে একটি সরল প্রাণ লোকের সংসারে ঢুকে তার বৌকে নিয়ে পালিয়ে যাবার ধান্ধায় ছিল। কাহিনীগত উভয়ের এই সাদৃশ্য অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হয়।—'মলিয়্যার' যখন এ নাটক লেখেন, তখনও তাঁর সমকালে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর ফ্রান্সে তারতুফের মত শয়তানের অভাব ছিল না। বরং একটু বাড়াবাড়িই ছিল বলা যায়। এ ব্যাপারে লিটন স্ট্র্যাচীর মন্তব্যটি উদ্ধার করা যেতে পারে। এঁর বক্তব্য হল, 'Tartufe, the hypocrite, the swindler, the

seducer, of his benefactor's wife, looms out on us with the kind of horrible greatnes that Mitton's Satan might have had if he had come to live with a bourgeois family in seventeenth century France.'[৯]

'তারতুফে'র স্রষ্টা যে সপ্তদশ শতাব্দীর ফরাসীদেশ, এই হল লিটন স্ট্র্যাচীর বক্তব্য। বলার অপেক্ষা রাখে না, আমাদের উনিশশতকও ছিল এ জাতীয় চরিত্রসৃষ্টির পক্ষে খুবই অনুকূল।—উনিশশতকের বাঙ্‌লা দেশে যে ভক্ত-প্রসাদের মত বুড়ো 'সালিক'দের অভাব ছিল না, তা' নিঃসংশয়ে বলা যায়। আর এঁদের প্রভাব প্রতিপত্তিও যে কম ছিল না, তা' এই মধুসূদনের থেকে বেশি আর কে বুঝবেন? কেননা, মধুসূদনের প্রহসনগুলি অভিনয় না হ'তে দেওয়ার মূলে যে এঁরা, এ প্রমাণ সেদিনই পাওয়া গিয়েছিল।

তবে আমাদের আলোচ্য নাটকের সঙ্গে মধুসূদনের ঐ নাটকের প্রকৃতিগত পার্থক্যের জন্যই সম্ভবতঃ দীনবন্ধুকে অতটা মনোকষ্ট পেতে হয় নি। দীনবন্ধুর বিয়েপাগলা রাজীব বেচারি বড়োই শান্তশিষ্ট। একবারে সাদামাটা। এ বুড়ো কৃপণ বটে, কিন্তু লম্পট নয়। উগ্র বিবাহাকাঙ্ক্ষাই এ বৃদ্ধের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য।—'বুড়োসালিকে'র বুড়ো যদি শয়তান হয়, বিয়েপাগলার রাজীবকে তা' হলে বলতে হয় পাগল। শুধু পাগল নয়, কখনো কখনো সে শিশুর মতন নির্বোধ। যেখানে চাতুরী করতে গেছে, সেখানে সে ধরা পড়েগেছে শিশুর মতনই। তাই দীনবন্ধুর নাটকটির সাহিত্যগত সাদৃশ্য যদি কোথাও খুঁজতে হয়, তা' 'বুড়োসালিকে'র ঘাড়ে রোঁ'তে পাওয়া যাবে না। এ সাদৃশ্য একমাত্র পাওয়া যাবে মলিয়্যারের 'লাভার'-এ, 'ল বুর্জোয়া জঁাতিয়মে' অথবা 'মারিয়াজ ফোর্সে'।

তাই সাহিত্য নয়, দীনবন্ধুর এই নাটক সৃষ্টির প্রেরণার উৎস যদি কোথাও খুঁজতে হয়, তবে তা' খুঁজতে হবে লেখকের সমকালীন সমাজে। আজো আমাদের সমাজে বিবাহ-পাগল বৃদ্ধের সংখ্যা কিছু কম নয়, আর সেকালে কৌলিন্যপ্রথা ইত্যাদির কল্যাণে এই পাগলরা যে একটু বেশি রকম থাকবে, তাতে আর সন্দেহ কী? সুতরাং একটু বেপরোয়া হতেও সেদিন তাঁদের কোনো অসুবিধা ছিল না। তবে নব্যশিক্ষিতদের অভ্যুদয়ের পর থেকে এই বিবাহ পাগলদের নিপীড়ণও কম হয় নি। বেচারিরা বিয়ে করতে গিয়ে কী ভাবে নিগৃহীত হত, তার বিবরণ সেদিন মাঝে মাঝে কাগজেও আবার ফলাও করে বের হত। দীনবন্ধুর জন্মের আগে এ জাতীয় দু-একটি ঘটনার খবর তৎকালীন

সাময়িক পত্র থেকে সংগ্রহ করে তা' দিয়ে দেখানো যেতে পারে যে তাঁর রাজীব-চরিত্রের উৎস কোথায়! ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুন তারিখে প্রকাশিত একটি খবর থেকে এক বিয়ে পাগলার সম্পর্কে জানা যায় যে বেচারি স্ত্রী-বিয়োগের পর ঘটকদের কাছে কী ভাবেই না ধরণা দিয়েছিল! বেচারির এই অবস্থা দেখে ঘটকরাও কম সুযোগ নেয় নি। এবং পরের ঘটনা এই রকম:

'......ঘটকেরা তাঁহাকে আশ্বাসরূপ ঘোটকারোহণ করাইলেক ও কহিলেক যে, এ কোন্ আশ্চর্য্য! মহাশয়ের বয়ঃক্রম যত হইবেক? তিনি কহিলেন যে, প্রায় সত্তরি বৎসর। কোষ্ঠী রাখি না, ঠিক বলতে পারি না। ছেহাত্তরের মন্বন্তরের সময়ে আমার বয়স বৎসর পঁচিশ ছাব্বিশ হইবেক। আর এই যে দেখিতেছ দন্তগুলা পড়িয়াছে, সে শুদ্ধ জলদোষের কারণ। আর বেয়ে ধাতুপ্রযুক্ত চুল পাকিয়াছে, কিন্তু শক্তি এমত, অদ্যাপি বিশ পঁচিশ দণ্ড কাজও করি।'[১০]

বলার অপেক্ষাও রাখে না যে এখানে উল্লিখিত বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ে-পাগলা রাজীবের মিল অনেক। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বা পলাশীর যুদ্ধ সেকালের একটি স্মরণীয় ঘটনা। সাময়িকপত্রের বৃদ্ধটি যেমন নিজের বয়সের কথায় উল্লেখ করেছে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের তারিখ, রাজীবও তেমনি পলাশীর যুদ্ধের উল্লেখ করতে ভুল করেন নি। নিজের বয়সের হিসাব দিতে গিয়ে রাজীব বলেছে, 'সে কি আজকের কথা তা আমি তোমায় ঠিক করে বলবো, আমার বিবাহের দিন পলাশীর যুদ্ধ হয়।'[১১]—দাঁত পড়ার যুক্তি দেখাতে গিয়ে বলেছে, 'আমি বড় বাঁশি বাজাতাম, তাই অল্পবয়সে গুটিকতক দাঁত পড়ে গিয়েছে।'[১২] —বৃদ্ধের তারুণ্য চর্চায় রাজীবের স্বগতোক্তিটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, এ সংলাপে সে বলেছে—'আগার কলোপ, কালাপেড়ে ধুতি, কৌশল সব বৃথা হলো,·· ···মন! প্রকৃত অবস্থা বিস্মৃত হও, বিবেচনা কর আমি বিশ বৎসরের নবীন পুরুষ, আমি ছোলাভাজা কড় মড় করে চিবিয়ে খেতে পারি, আমি দৌড়ে বেড়াতে পারি, আমি সাঁতার দিয়ে নদী পার হতে পারি, আমি ষোড়শী প্রেয়সীকে অনায়াসে কোলে তুলে নতে পারি।'[১৩]

সেকালের খবরের কাগজে পাওয়া এই বিবাহ পাগল চরিত্রটির সঙ্গে বিয়ে পাগলা রাজীবের মিল যে কতখানি, তা' ব্যাখ্যা করে এখন আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আর রাজীবের উপসংহারের সঙ্গে সেকালের আর একটি সংবাদের সাদৃশ্য যে কত গভীর, তা' ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগস্ট পাওয়া

একটি খবর থেকে প্রমাণ করা যেতে পারে। এই সংবাদটির শিরোনাম ছিল, 'আশ্চর্য বিবাহ'। এর শেষ অংশটি এই রকম: "বরযাত্রেরা ঐ পুরুষকন্যা দেখিয়া পরস্পর কানাকানি করিতে লাগিল যে ভাই বিবাহ করিবে তো এমনি বিবাহ করিবেন। দিব্য কন্যা উপযুক্ত বটে। যা হউক, অমুকের ভাগ্য ভাল। বরও কোনক্রমে ঐ কন্যা দর্শন্ করিয়া কত মনোরাজ্য ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সংপ্রদানের পরে বাসর ঘরে সহবাসে সে সকল বিপরীত হইল।[১৪]—দীনবন্ধুর 'বিয়েপাগলা বুড়ো'তেঐ রাজীবেরও ঠিক এমনি বিবাহ হ'ল। বাসর ঘরে সে কন্যাবেশী রতাকে চিনতে পারে নি। আর চিনতে যখন পারল, তখন দেখা গেল, পরের দিন সকাল। দেখা গেল, তার বিবাহ খবরের কাগজে বর্ণিত আশ্চর্য বিবাহের অনুরূপ।—এখন এইসব তথ্যগুলি পরীক্ষা করবার পর, এই উপসংহারে আসা আমাদের কঠিন নয় যে দীনবন্ধুর এই প্রহসন রচনার উৎস কোনো গ্রন্থ বা গ্রন্থকার নন, সামাজিক অভিজ্ঞতাই তাঁকে এই ধরণের গ্রন্থ লিখতে করেছে উদ্বুদ্ধ। আর একথা অপ্রকাশিত নয় যে বাস্তবে যা ঘটে তার সামান্যই কাগজে প্রতিফলিত হয়। সুতরাং এ অনুমানও অসঙ্গত বলা যায় না যে বাস্তবে এ জাতীয় ঘটনা প্রচুর[১৫] ঘটত বলেই সাহিত্যে তার প্রতিরূপ আমরা এই ভাবেই পেলাম।

মাত্র দুটি অঙ্কে নাটকটি পরিকল্পিত। উভয় অঙ্কেই তিনটি করে গর্ভাঙ্ক। এই স্বল্প পরিসরের ভেতর কাহিনীটিকে গ্রথিত করেছেন নাট্যকার। সূচনায ছেলের দলের রাজীবকে নিয়ে কৌতুক করবার পরিকল্পনা এবং সেই সূত্রে রাজীব-চরিত্রের পরোক্ষ আলোচনা। পরে রাজীবের তরুনায়ণ, ঘটকের আগমন, রাজীবকে সর্পদংশন ইত্যাদি। প্রথম অঙ্কের শেষে বাপের বিবাহ সংবাদে কন্যা রামমণির ও গৌরমণির খেদ এবং এই সঙ্গে পেঁচোর মার চরিত্রের সঙ্গে দর্শকদের পরিচয় করিয়া দিয়েছেন নাট্যকার। দ্বিতীয় অঙ্কের সূচনায় দেখা গেল বিবাহার্থে এলো রাজীব, দেখা গেল বাসর ঘর এবং একবারে শেষে রাজীবকে প্রতারিত হতেও দেখা গেল।—না, কোনো জায়গাতেই একটুকু বাহুল্য নেই। পরিণতির দিকে কাহিনীটি আগিয়ে গেছে অতি দ্রুত। —কোনো দৃশ্য, কোনো ঘটনা, কোনো চরিত্রই এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়। সমালোচকের চোখ দিয়ে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় বিচার করে বলা যায় যে 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র পরিকল্পনা একবারে নিখুঁত।

চরিত্র-বিচারের ব্যাপারে এগোলে দেখা যায় যে এখানে রেনেসাঁসী মনোভাব এবং শিল্পী মনোভাব, দুইই একসঙ্গে সচেতনভাবে সক্রিয়। 'মাথার

ওপর শকুনি উড়ছে, তবু দলাদলি কত্তে ছাড়ে না'[১৬] যে, সেই রাজীব বর্তমান নাটকের নায়ক। বিবাহেচ্ছার দুর্বার আবেগই চরিত্রটির প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। এবং ঐ প্রবৃত্তিটি তার সর্বাধিক দুর্বলতার কারণ। তরুণ ছেলেরা এই সুযোগ নিয়েছে এবং তারা একটি খেলনা হিসাবেই ব্যবহার করতে চেয়েছে রাজীবকে। তাদের ভাষা উদ্ধৃত করে বলা যায়, 'কলিকাতায় ছাত্রেরা পরীক্ষার পর বিলবর্টের বাজি দেয়, আমরা পরীক্ষার পর রাজীব মুখুজ্যের বাজি দেব।'[১৭]

রাজীব চরিত্রের অনেক ত্রুটি। সে আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থসর্বস্ব এবং স্বভাবে মধ্যযুগীয়। কুটিলতা এবং চাতুর্য হল তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। গ্রাম্য দলাদলিতে সে সকলের চেয়ে দক্ষ, সুতরাং আধুনিক শিক্ষার সে ঘোরতর বিরোধী, সামাজিক মঙ্গলের জন্য বা স্কুল প্রভৃতির উন্নয়নের জন্য দান করতে গেলে দেখা যায় যে সে ঘোর কৃপণ, আবার নীতি-জ্ঞানের ব্যাপারেও দেখা যায় সে সর্বৈব ভ্রষ্ট। ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য নিজের মেয়ের পিতৃত্বকে অস্বীকার করতে তার এতটুকুও বাধে না। এমন কী মৃতা স্ত্রীর ওপর কলঙ্ক আরোপ করতেও আটকায় না তার রুচিতে। বিধবা কন্যাকে বার-ব্রত করবার জন্য দুটি টাকা দিতেও রাজীব কুণ্ঠিত, কিন্তু বিয়ের নামে এই মানুষটিকেই দেখা যায় অকুণ্ঠভাবে টাকা খরচ করতে। —এইভাবে বিশ্লেষণ করলে এ সিদ্ধান্তে আসা কঠিন নয় যে চরিত্রটি সর্বৈব কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত। এবং তার পরেই জিজ্ঞাসা দেখা দেয়, শিল্পী দীনবন্ধু তবে কী একে 'ভিলেন' করেই চিত্রিত করেছেন?

না, 'ভিলেন' যে এ চরিত্রটি নয়, তার কথা'ও দীনবন্ধু আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। বাইরে এইরকম একটি কঠিন মোড়ক থাকলেও, গভীরে ইনি যে একটি বৃদ্ধ-শিশু, এ খবর নাট্যকার পৌঁছে দিয়েছেন সকল দর্শক ও পাঠকদের কাছে। রাজীবের স্বার্থপরতা ছেলে মানুষের মতন। বেচারি নিজেকে গোপন করতে গিয়ে বার বার যে ধরা পড়ে গেছে, তা' তার ছেলে মানুষীকেই করেছে উদ্ঘাটিত। আর 'পেঁচোর মা'য়ের প্রতি তার যে আতঙ্ক, সেও নিতান্ত শিশুসুলভ। রাজীব যে সত্যিসত্যিই শিশুর মতন অসহায়, এ চিত্র ধরা পড়েছে নাটকের শেষের দিকে। যদিও সে কন্যা রামমণির ওপর ব্যবহারে যথেষ্ট সদয় নয়, তবু এই বিপদের সময় রামমণিকেই সে স্মরণ করেছে। ছেলে যেমন অসহায় হয়ে মায়ের শরণ নেয়, অনেকটা সেইরকম। বাসর ঘরের অত্যাচারে অসহায় হয়ে রাজীব শিশুর মতই চীৎকার করে

রামমণিকে স্মরণ করেছে, 'উঃ বাবা।—লাগে মা—মলেম গিচি—মেরে ফেললে—দম আটকালো, হাঁপিয়েচি মা, ও রামমণি।'[১৮]—স্বীকার করতেই হয়, এই একটি মাত্র উক্তি রাজীবকে করে তুলেছে মানবিক। হাসি-কান্না একই সঙ্গে হয়ে উঠেছে উদ্বেলিত। ডঃ সুশীলকুমার দে রাজীবের এই সংলাপটির সুন্দর একটি ব্যাখ্যা দিয়ে লিখেছেন, 'তাহার অবস্থার কৌতুকাবহ অথচ করুণ ভাবটি এই অল্পকথায় অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই জাতীয় রসসৃষ্টিতে করুণ ও হাস্য অঙ্গাঙ্গিভাবে তুল্য মূল্য।'[১৯]

এ নাটকে রাজীবের পরেই যাদের চোখে পড়ে, তারা হল, 'ছেলের দল'। নসিরাম, রতন বা রতা, ভুবনমোহন, গোপাল, কেশব হল ঐ সব ছেলের দলের প্রধান। যদিও 'বালক' বলে নাট্যকার এদের অভিহিত করেছেন, চিহ্নিত করেছেন 'স্কুলের' ছাত্র হিসাবে, কিন্তু চলাফেরা কথাবার্তায় এদের ভেতর বালকোচিত কিছু নেই বললেই চলে। রতা যে ভাবে 'ভারতচন্দ্রী'য় রীতিতে প্রেমের কবিতা আবৃত্তি করেছে, তা' যে-কোনো বালক বা ছাত্রের পক্ষে অভাবিত। যাইহোক এটুকু স্বীকার করে নিলে বাকি ব্যাপারটিকে খুব একটা অস্বাভাবিক বলে মনে হবে না।

তবে একথা আগেভাগে বলে রাখা দরকার, এতগুলি নাম থাকলেও প্রতিটি চরিত্রের ভেতর পৃথক পৃথক স্বাতন্ত্র্য দেখানো কঠিন। অন্ততঃ নাট্যকার সচেতন ভাবে এই পার্থক্য তৈরি করেন নি। রাজীবকে পীড়নের ব্যাপারে অবশ্য সর্বাধিক যার নাম প্রচারিত, সে হল ছেলের দলের প্রধান 'রতন' বা 'রতা'। বুড়োর গায়ে 'কাকের ডিমের শাঁস' ফেলা, 'পাঁচির মা'র নাম করে বেচারিকে উত্তেজিত করা বা কৃত্রিম সাপ দিয়ে বুড়োকে দংশন করানোর মত কাজে রতার জুড়ি মেলা ভার। এসব ব্যাপার দেখে রাজীবও 'রতা'র ওপরেই সব থেকে বেশি উত্তেজিত। ক্রুদ্ধ হয়ে রাজীব এই রতার সম্পর্কে ঘটককে বলেছে, 'আমার কোন চিন্তা নাই, আপনি যদি রতা ব্যাটাকে কন্যা বলে সম্প্রদান করেন, আমি তাও গ্রহণ করবো—পাজী ব্যাটা, নচ্ছার ব্যাটা, ছোটলোকের ছেলের কখন লেখাপড়া হয়?'[২০]—বেচারি রাজীবের জীবনের এমনি 'আয়রণি' যে এই রতার সঙ্গেই তার 'আশ্চর্য বিবাহ' হল।—তবে অনেক বিসদৃশ ঘটনা ঘটালেও, রতাকে দিয়ে কোনো তিক্ততার সৃষ্টি নাট্যকার বর্তমান নাটকে করেন নি। বরং খেলা ফুরিয়ে যাবার পর যে মনোভাব দেখানো উচিত, রতার ভেতর সেই মনোভাব পরিস্ফুট। নাটকের শেষে রাজীবের দেওয়া পঞ্চাশটি টাকা এবং সিন্দুকের চাবি

রামমণিকে ফেরৎ দিয়ে সে বলেছে, 'ওগো বাছা, তোমাকে তোমার বাপ একটি পয়সা দেয় না যে ব্রত নিয়ম কর, এই পঞ্চাশটি টাকা তোমরা দুই বনে নাও, আর চাবিটি তোমার বাবাকে দিও। তিনি কাল রেতে আহ্লাদে চাবি দিয়ে ফেলেছিলেন।'[২১]

নসিরাম ও ভুবন রতার ছায়া মাত্র। তবে রাজীবের ওপর ভুবনের যে রাগ, তা' ব্যক্তিগত। কেননা, রাজীব একদা ভুবনের মামাদের বিনাদোষে এক বছরের জন্য রেখেছিল একঘরে করে। ঝাড়ফুঁকের সময় রতা তাকে চড়চাপড় মেরে প্রতিশোধ নেবার সুযোগ দিয়েছে। নসিরামও অনুরূপ একটি কারণে উত্তেজিত, তাই বুড়োকে 'নরামৃত' খাওয়াবার জন্য তার উৎসাহ অপরিসীম। পরে বাসর ঘরে রসিকতা করে সে এই জ্বালা মিটিয়েছে।—ছেলের দলে কেশবই একমাত্র 'কালেজে' পড়ুয়া। তাই অন্য সকলের কাছে সে 'বাবু'। এবং সকলের চোখে, 'কেশববাবুকে সকলেই ভাল বলে, কেবল বুড়ো ব্যাটা গালাগালি দেয়। বলে কলেজে পড়ে যখন জলপানি পেয়েচে, তখন ওর আর জাত কি!'[২২]—তা' কেশব কিন্তু বুড়োর এই কথায় ক্ষিপ্ত নয়, বাসরঘরে তার ভূমিকা ঠাকুরঝির, সুতরাং রসিকতায় সে অম্লান।—গোপাল চরিত্রটি বিশেষত্ব বর্জিত।

উনিশ শতকের নাটকে ঘটক একটি অনিবার্য চরিত্র। সেই হিসাবে বর্তমান নাটকে এই চরিত্রটির একটি বিশেষ মূল্য থাকা উচিত। স্কুলের পণ্ডিতির জন্য উমেদারি করতে এসেছিল একটি ছেলে, চাকুরিপ্রার্থী, তাকে দিয়ে এই ঘটকের ভূমিকায় অভিনয় করানো হয়েছে। অভিনয় যে উৎকৃষ্ট হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, তবে তার মুখ দিয়ে কন্যার রূপবর্ণনার ছলে যে দেহ-বর্ণনা শোনা গেছে, তা' অবশ্যই আপত্তিকর। অন্ততঃ ছেলের দলের সংলাপে আপত্তিকর।

পুরুষ-চরিত্রের ভেতর আরেকটি চরিত্র বর্তমানে উল্লেখযোগ্য। সে চরিত্রটি হল. সুশীল। নামের মতই চরিত্রটি নির্মল। উনিশ শতকের 'কালেজীয় শিক্ষা'য় শিক্ষিত যুবকদের ভেতর যে ন্যায় পরায়ণতা এবং নির্মল চরিত্রের বিকাশ ঘটেছিল, সুশীল হল সেই শ্রেণীর চরিত্র। শিল্পধর্মে এদের বিচার না করে যুগধর্মে এদের যাচাই করাই শ্রেয়।

নারী চরিত্রগুলির ভেতর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল, রামমণি ও গৌরমণি। বৃদ্ধ রাজীবের এই দুই কন্যাই বিধবা। এরা সহোদরা। বাহ্যত. দু'জনকে এক বলে মনে হলেও বয়সের ব্যবধানে দু'জনে একবারে দু'রকমের।

রামমণির ভেতর মাতৃত্ব একটু বেশী, অনেক লাঞ্ছনা সত্ত্বেও বাবা রাজীবকে সে সন্তান স্নেহে আগলে রেখে দিয়েছে।—গৌরমণির মধ্যে যুবতীধর্ম প্রবল, প্রেম-ভালোবাসা-স্বামী-সংসার ইত্যাদির আকাঙ্ক্ষা তার ভেতর প্রবলতর। গৌরমণির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার সংলাপের ভেতর দিয়েই তুলে ধরা যাক। এ সংলাপে গৌরমণি বলেছে, 'আমার এই নবীন বয়স, পূর্ণ যৌবন, কত আশা কত বাসনা মনের ভিতর উদয় হচ্চে, তা' গুণে সংখ্যা করা যায় না—কখন ইচ্ছা হয় জীবনাধিক প্রাণপতির সঙ্গে উপবেশন করে প্রণয়গর্ভ কথোপকথনে কাল যাপন করি; কখন ইচ্ছা হয়, পতির প্রীতিজনক বসন ভূষণে বিভূষিত হয়ে স্বামীর কাছে বসে তাঁকে ভাত খাওয়াই; কখন ইচ্ছা হয় এক বয়সী প্রতি-বাসিনীদের সঙ্গে ঘাটে গিয়ে নিজ নিজ প্রাণকান্তের কৌতুক কথা বলতে বলতে স্নান করি; কখন ইচ্ছা হয় আনন্দময় কচি খোকা কোলে করে স্তন পান করাই'[২৩]—। প্রথম জীবনে যে লেখক একদা বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে কলম ধরে 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা লিখেছিলেন, তিনি যে বৈধব্যের রিক্ততা এবং সেই সঙ্গে তাঁদের আশা-আকাঙ্ক্ষার এমনি একটি চিত্র আঁকবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী?

কৌতুকের ভেতর দিয়ে মাঝে মাঝে গম্ভীর কথাও যে দীনবন্ধু আমাদের শুনিয়ে দেন, তার প্রমাণ হল, 'পাঁচির' মা বা 'পেঁচার' মার সংলাপ কৌতুক রসের জন্যই এ চরিত্রের অবতারণা করেছেন নাট্যকার। কিন্তু এই চরিত্রটির সংলাপে 'সাম্য' সম্পর্কিত এমন অনেক কথা নাট্যকার কৌতুকের ছলে বসিয়েছেন, যা একালের নাট্যকারদেরও ভাবাতে পারে। পেঁচোর মার যা প্রশ্ন, তা' রীতিমত আধুনিক এবং তার বক্তব্য হল, 'ড়ুমণি বাম্‌ণিতি তপাতটা কি? তোমরাও প্যাট জ্বলে উট্‌লি খাতি চাও, মোরাও প্যাট্ জ্বলে উঠ্‌লি খাতি চাই; তোমরাও গালাগালি দিলি আগ্ কর, মোরাও গালাগালি দিলি আগ্ করি; তোমার বাবা মরিলেও বুকি বাঁশ, মুই মলিও বুকি বাঁশ; তানারও দাঁত পড়েচে, মোরও দাঁত পড়েচে, তবে মুই কোম্ হলাম কিসি?[২৪] —এ জিজ্ঞাসার জবাব অবশ্য নাট্যকার দেন নি; কিন্তু এ জিজ্ঞাসা যে নিরর্থক নয়, পরবর্তীকালের 'সাম্য' ভাবনা তার প্রমাণ।

এইভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় দীনবন্ধুর এই নাটকটিতে যুগচিন্তা ও যুগভাবনা 'রেনেসাঁসী' লেখকদের মতনই স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত। মানুষই তাঁর কাছে একান্তভাবে উপজীব্য। তবে এই মানুষকে দীনবন্ধু আবিষ্কার করেছেন বিশেষ একটি দৃষ্টিতে। আর সেই দৃষ্টি হল হাস্যরসিকের দৃষ্টি। 'বিয়ে

পাগলা বুড়ো' নাটকটি সে দিক থেকে স্রষ্টাকে বিশেষ একটি ভূমিকায় পরিচিত করবার দাবি রাখে। সমালোচক মোহিতলালও এই দৃষ্টিতে এই নাটকটিকে দেখেছিলেন, এবং তাঁর সমীক্ষা দিয়ে যদি বর্তমান আলোচনার উপসংহার টানা হয়, বোধকরি, তা' উপযুক্তই হবে। এ ব্যাপারে মোহিতলালের সমীক্ষা হল, 'দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' প্রহসন আজিও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আছে।······এইরূপ হাস্যরসের দৃষ্টান্ত কি আর কোথাও মিলিবে? দীনবন্ধুর প্রতিভার এই অনন্যসাধারণতা যে উপলব্ধি না করিল, বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রসাস্বাদ হইতে সে বঞ্চিত হইয়া আছে।'[২৫]

মোহিতলালের এই উক্তির পর ঐ নাটকটি সম্পর্কে সম্ভবতঃ আর কোনো প্রশংসাসূচক শব্দ যোগ করা মানে অতিকথনের প্রশ্রয় দেওয়া। সুতরাং এ বিষয়ে আর না অগ্রসর হওয়াই ভালো।

সধবার একাদশী

শোনাযায়, সেকালের আরব দেশে না কী একটি প্রথা ছিল।—ভারি মজার প্রথা। কোন মহৎ কাব্যের জন্ম হলে সারাদেশে করা হত উৎসব। আমাদের দেশে এটিকে যে অভিনব ব্যাপার বলে মনে হবে তাতে কোনো সংশয় নেই। তবে এর বিপরীত রীতি প্রয়োগ করে আমাদের দেশে যে কাজ করা হয়, তার অজস্র প্রমাণ আছে। নিন্দাবাদের ঘোলা জল ছিটিয়ে আমরা যে-সব গ্রন্থকে এপর্যন্ত অভিনন্দন জানিয়েছি, তাদের মধ্যে প্রধান হল দীনবন্ধুর এই 'সধবার একাদশী'।

এই নাটকটির কপালে যে পরিমাণ নিন্দবাদ জুটেছে, তা' আর কারো ভাগ্যে কখনো জুটেছে বলে জানা যায় না। রক্ষণশীল সমালোচক-সমাজ এ গ্রন্থটিকে কোনা রকমেই পারেননি হজম করতে। কোনো রকমেই নয়। কেউ এটিকে 'ট্র্যাশ' বলে আখ্যাদিয়ে সোনাগাছিতে অভিনেতব্য, এমন মন্তব্য করেছেন, কেউ এটিকে উড়িয়ে দিয়েছেন, স্রেফ 'বথামি' বলে আবার কেউ কেউ এটিকে রুচি বিকারের নমুনা হিসাবে চেয়েছেন সকলের কাছে দাখিল করতে। মোটকথা, এঁদের মন্তব্য পড়ে মনে হয়েছে যে এমন কুৎসিত গ্রন্থ বুঝি আর কখনো লিখিত হয়নি। তবে এর বিপরীত কথাও শোনা গেছে। 'সধবার একাদশী' পড়বার পর রবীন্দ্রনাথের একান্ত বন্ধু লোকেন্দ্র পালিত একদা বিমুগ্ধ-চিত্তে বলেছিলেন, 'আটটি ভাষায় নাটক শ্রেণীর বহুতর গ্রন্থ আমি পাঠ করিয়াছি, কিন্তু সধবার একাদশীর তুলনা কোথাও দেখিতে পাই

নাই।'[২৬]—না, লোকেন্দ্রনাথ এখানেই থামেন নি, তিনি সবরকম মুখর নিন্দা ভাষণকে স্তব্ধ করে দিয়ে লিখেছেন, "সধবার একাদশী' কয়জন বুঝে? সংযমের অভাবে বিফলীকৃত শিক্ষার অপূর্ব চিত্র গেটে তাঁহার ফাউস্টে দেখাইয়াছেন। কলিকাতার ফাউস্টেও আমরা সেই চিত্র দেখিতে পাই, তবে মেফিস্টোফেলিস অশরীরী হইয়া এখানে মদের বোতলে প্রবেশ করিয়াছিলেন।'[২৭]

অর্থাৎ মদের বোতল যে দার্শনিকতায় 'মেফিস্‌টোফেলিসে' রূপান্তরিত হতে পারে, সেই অভিনব তাত্ত্বিকতা ও ঐ শিল্পের স্রষ্টা হলেন দীনবন্ধু মিত্র। সেকালে মদের এই প্রতাপের জন্য প্যারীচরণ সরকারের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'টেম্‌পারেনস্‌ সোসাইটি'। অর্থাৎ মদ্যপান নিরোধক সভা। এই সভা কতখানি মদ্যপান নিরোধ করতে পেরেছিল, তা' নিয়ে অবশ্যই তর্কের অবকাশ আছে। কিন্তু ফাউস্ট-মেফিস্‌টোফেলিসের এই জীবন্ত ছবি পানাশক্তিকে যে আঘাত হেনেছিল, তা' সর্বৈব স্বীকৃত, এবং তার ক্রিয়া সম্পর্কে তর্কের কোনো সুযোগই নেই। 'টেম্‌পারেন্‌স সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা প্যারীচরণ এই নাটকটি হাতে পেয়ে নাট্যকার দীনবন্ধুকে অভিনন্দিত করে জানিয়েছিলেন, 'আপনার যে বহি বাহির হয়েছে, এখন আমাদের সোসাইটি উঠাইয়া দিলেও চলিতে পারে।'[২৮]—যাইহোক, গ্রন্থটি বিতর্কিত বলেই সম্ভবতঃ বিক্রীত হয়েছিল প্রচুর এবং নাট্যকারের জীবদ্দশাতেই এই বইটির সংস্করণ হয়েছিল যে একাধিক, তার প্রমাণও রয়েছে।

তবে নিরঙ্কুশ প্রশংসা যার ভাগ্যে জোটেনি, তার পক্ষে এগিয়ে চলা একটু কঠিন, এই বইটি পরবর্তীকালে অন্ততঃ তা' দেখিয়ে দিয়েছে। নানা সময়ে নানা আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছে তাকে। বঙ্গীয় সন তেরোর শতকের প্রথম দিকে এই নাটকটিকে আবার বিশেষ এক সমাজের রোষাগ্নিতে পড়তে হয়েছিল। নানা অভিযোগে বইটি চলেছিল নিষিদ্ধ হতে। অবশ্য শেষ পর্যন্ত তা' হয় নি। নাট্যকারের পুত্র ললিতচন্দ্রের সম্পাদনায় বই খানিকে নতুন আকারে ১৩২৬ সনের ফাল্গুনে দেখা গেল বাজারে। ভূমিকা লিখলেন আরেক বিতর্কিত লেখক। লেখকের নাম, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। গ্রন্থটির চিরায়ত মূল্যের কথা স্বীকার করে নিয়ে অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র লিখলেন, 'এই সুপরিচিত গ্রন্থখানির ভূমিকা লিখতে যাওয়াই একটা বাড়াবাড়ি। ...যে বইয়ের দোষগুণ আজ অর্ধ শতাব্দীকাল ধরিয়া যাচাই হইতেছে—বিশেষত যে মারাত্মক উৎপাত কাটাইয়া সম্প্রতি উহা খাড়া

হইয়া উঠিল, তাহাতে মূল্য লইয়া আর দরদস্তুর করা সাজে না। বাঙ্‌লা সাহিত্যের ভাণ্ডারে এ একখানি জাতীয় সম্পত্তি—এ সত্য মানিয়া লওয়াই ভালো।'[২৯]

এহ বাহ্য। আমাদের সাহিত্য ভাণ্ডারের জাতীয় সম্পত্তিটিকে একবার করে নাড়াচাড়া দেখা যেতে পারে। যদিও আমাদের এই আলোচ্য গ্রন্থে সত্যিকারের কোনো কাহিনী নেই, তবু বিষয়ের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য গ্রন্থে বর্ণিত গল্পাংশকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করা যেতে পারে।—উকিল নকুলেশ্বরের বাগান বাড়িতে যে মদের আড্ডা, সেখান থেকেই আরম্ভ করা যায় কাহিনী-কথন। ঐ আড্ডার শিরোমণি হল নিমচাঁদ। তখন সবে স্থাপিত হয়েছে 'সুরাপান নিবারনী সভা'। অনেকেরই বিশ্বাস ঐ সভা পানাসক্তিকে আটকাতে সমর্থ হবে।—মাতাল নিমচাঁদ কিন্তু এ সভার ঘোরতর বিরোধী। তার বিরোধিতা দিয়েই নাটকীয় কাহিনীর সূচনা। নিমচাঁদের মতে মদ সংস্কার থেকে মানুষকে করে মুক্ত। সুতরাং সংস্কার মুক্তির উপায় হিসাবে মদ খাওয়া সকলের প্রয়োজন।

মদ খাওয়া দোষের?—নিমচাঁদ বলেছে, মদ খাওয়া যদি দোষের হয়ে থাকে, তবে বিয়ে করাও দোষের। কেননা, মদ খেলে যেমন অসুখ হয়, বিবাহও তেমনি নানা সময় জীবনকে করে অসুখী। তাই বলে বিয়ে করা থেকে কেউ কী কখনো নিবৃত্ত থেকেছে? নিমচাঁদের সোচ্চার সমর্থন তাই মদ্য পানে,—'দেখ দেখি বাবা, আস্পর্ধার কথা দেখ দেখি, মদ খেয়ে পীড়া হয় বলে মদ ত্যাগ কত্তে হবে?—পীড়া হয়, প্রতিকার কর' মেডিকল সায়ান্স হয়েছে কি জন্যে? পীড়া, আরাম করে আবার খা। বিচ্ছেদ মিলনের সুখ পাবি।'[৩০]—সুতরাং এই মদকে কী ছাড়া যায়?

নিমচাঁদের নতুন শিকার হল অটল বিহারী। বড়োলোকের বাড়ির একটি মাত্র ছেলে সে। নিমচাঁদের প্রেরণায় বেচারি একটু একটু করে উড়তে শিখল। মদ ও গণিকা উভয়কে করল সাথী। গণিকা কাঞ্চন ও মদের কল্যাণে সে অল্প সময়ের ভেতর উড়িয়ে দিল তিরিশ হাজার টাকা। এদিকে নাটকের গতিও দ্রুত থেকে হল দ্রুততর।

বাবা জীবনচন্দ্র এবং খুড় শ্বশুর গোকুলচন্দ্র চেয়েছিলেন অটলকে সৎপথে ফেরাতে। না, অটল এ ব্যাপারে সাড়া দেয়নি। ওদিকে অটলের অন্তঃপুরের অবস্থা খুবই খারাপ। অটলের স্ত্রী কুমুদিনী তার ননদিনী সৌদামিনীর কাছে বলেছে, 'এর চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল—আমি ভাই আর সইতে

পারি নে, গলায় দড়ি দে মরবো।'[৩১]—এইভাবে কুমুদিনীর চিত্তে যখন বৈধব্যের জ্বালা দেখা দিচ্ছে, কাঁশারিপাড়ার অটলের বৈঠকখানায় তখন মদের আড্ডা হয়ে উঠছে সরগরম ইয়ারদের হৈ-হুল্লোরে। সেখানে দেখা যাচ্ছে অটলের বয়স্য ভোলাচাঁদকে, দেখা যাচ্ছে 'বাঙাল' রামমাণিক্যের উপস্থিতি এবং পানাসক্তি। নিপাতগঞ্জের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট স-আরদালি কেনারাম ডেপুটিকেও দেখা গেল আঙ্গুল ডুবিয়ে মদ খেতে।

মোটকথা, সামাজিক বৃক্ষে সমারূঢ় সব বানরকটিকেই দীনবন্ধু এখানে লেজ সমেত এঁকেছেন। কাঞ্চনের নষ্টামি শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত অবস্থায় গিয়ে পৌছুল। অটলকে সে পরিত্যাগ করল।—এদিকে অটলও বেপরোয়া। ক্ষিপ্ত হয়ে সে খুড়শ্বশুর গোকুলের স্ত্রীকে বের করে আনবার পরিকল্পনা করল। নিমচাদ কিন্তু এ পরিকল্পনরবিরোধী, এখানে সে ঘোরতব আপত্তি করেছে, পরে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানও কবেছে সে তীব্র ঘৃণার সঙ্গে। কিন্তু অটল কী তখন ওসব কথা শোনে?—আর শোনে নি বলেই পরিণামে তার ভাগ্যে জুটল প্রহার ও লাঞ্ছনা।—এই হল 'সধবার একাদশী'। থ্যাকারে যেমন বলেছিলেন, 'Yes, this is Vanity Fair!'[৩২]—আমরাও অনুরূপ কণ্ঠে ও রীতিতে বলতে পারি, হ্যা, এই হল, 'সধবার একাদশী'।

'ভ্যানিটি ফেয়ারে'র লেখক গ্রন্থারম্ভে 'বিফোর দি কার্টেনে' লিখেছিলেন, ' There is a great quantity of eating and drinking, making love and jilting, laughing and the contrary, smoking, cheating, fighting, dancing and fiddling·· ' ইত্যাদি, 'সধবার একাদশীর' ব্যাপারেও এই রকম ঠিক বলা যায। মদ্যপান, গণিকাচর্চা, সমকালীন জীবন সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক, মাতলামি, ভাঁড়ামি, পুরনারীদের মর্মযন্ত্রণা, ডেপুটিদের আত্মম্ভারিতা ইত্যাদি নানা চিত্র উদ্ঘাটন করে নাট্যকার বর্তমান নাটকটিকে একটি চরিত্র-চিত্রশালায় পরিণত করেছেন। 'ভ্যানিটি ফেয়ার' যদি মধ্য উনবিংশ শতকের লণ্ডনের ছবি হয়, 'সধবার একাদশী'ও তা'হলে ঐ সময়ের কলকাতার নেটিব-সমাজের ছবি। কেবল সাহিত্য হিসাবে নয়, ইতিহাস হিসাবেও আর একটি আলাদা মূল্য আছে।

এখন একটি প্রশ্ন আমাদের মনে দেখা দিতে পারে, 'সধবার একাদশী' তা'হলে কোন্ শ্রেণীর নাটক? এখানে সমকালীন সমাজের নানাশ্রেণীর মানুষ যে ভিড় করেছে, সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। কখনো খুব হাল্কা ভাবে, কখনো বুদ্ধিদীপ্ত বাক্চাতুর্যে, আবার কখনো বা রঙ্গ-রসিকতার ভেতর দিয়ে জীবনের

গভীর ও গম্ভীর কথা যে বিভিন্ন রীতিতে আলোচিত হয়েছে, তা' এর কোনো পাঠকই আশাকরি অস্বীকার করতে পারবেন না। এমন কী 'মরালিটি', যা উনিশ শতকের আরেকটি বৈশিষ্ট্য, তাও যে বর্তমান নাটকের আলোচনায় অনুপস্থিত থাকেনি, আশাকরি, এটুকু আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় না এই সব লক্ষণ দেখে কী এটিকে আমরা 'কমেডি অব ম্যানার্স' বলে চিহ্নিত করব?

'কমেডি অব ম্যানার্স' সম্পর্কে সমালোচকদের সতর্কতা হল, '...the comedy of manners is essentially intellectual, it permits of the introduction and expression of practically no emotion whatsoever. It therefore does not play upon our feelings in any way, but appeals primarily and always to our reason. Its wit is purely intellectual ; and the appreciation of it comes from minds, not from the hearts'[৩৩]—'সধবার একাদশী'র ব্যাপারে এই কথাগুলি কতখানি অক্ষরে অক্ষরে সত্য, আশাকরি, তা' বুঝিয়ে বলবার অপেক্ষা রাখে না। 'সধবার একাদশী' অবশ্যই 'ইনটেলেক্‌-চুয়াল', যুক্তির উপর নির্ভরশীল এবং এই গ্রন্থের আবেদন অন্যকোথাও নয়, অন্ততঃ হৃদয়েত নয়ই। এর প্রকৃত আবেদন মনে। যে মন মস্তিষ্কের ওপর নির্ভরশীল, অবশ্য সেই মনে।

'সধবার একাদশীর' ঘটনা ও চরিত্রগুলিকে এরপরে একে একে বিশ্লেষণ করলে এর মর্মার্থ আরো গভীর ভাবে উপলব্ধি করা যেতে পারে। সুতরাং চরিত্রালোচনার দিকেই এবার এগোন যাক। একদা 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশিত 'সধবার একাদশীর' প্রসঙ্গে একটি আলোচনায় ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য নামে একজন সমালোচক লিখেছিলেন, 'সধবার একাদশীর' মধ্যে যদিও অটলবিহারী নায়ক, তথাপি নিমেদত্ত অন্যসকল পাত্রগণের মধ্যে প্রাধান্য পাইয়াছে। অতএব অন্যসকল পাত্রগণকে ছাড়িয়া আমরা নিমেদত্তের প্রকৃতি পর্যলোচনা করিব।'[৩৪]—আমরাও এই পথে নিমেদত্তকে দিয়েই আলোচনা আরম্ভ করতে পারি।

নিমেদত্ত যে দীনবন্ধুর এক অসাধারণ সৃষ্টি, একথা মনে রেখেই তাঁর চরিত্র বিচারে আমাদের অগ্রসর হওয়া দরকার। বঙ্কিমচন্দ্র 'সধবার একাদশী' প্রচারে নিষেধ করেছিলেন রুচির মুখ চেয়ে। কিন্তু তাঁর অনুরোধ রক্ষিত হয় নি। পরে বঙ্কিমচন্দ্র কবুল করেছেন, 'অনেকে বলেন, এ অনুরোধ রক্ষা করা হয় নাই, ভালই হইয়াছে, আমরা নিমচাঁদকে পাইয়াছি।'[৩৫]—অর্থাৎ

নিমচাঁদকে না-পেলে আমাদের যে ভীষণ একটি ক্ষতি হত, এ তারই স্বীকৃতি। সুতরাং এই চরিত্রটি যে কী, তার পরিচয় সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক।—এক সময়ে অনেকের ধারণা ছিল, এই চরিত্রটির বাস্তব উৎস হল, মাইকেল মধুসূদন দত্ত স্বয়ং। আর এ সম্পর্কে সেকালের সচেতন এক লেখক লিখেছেন, 'Hail holy light! the off-spring of Heaven first born. Of the eternal co-eternal beam. ইত্যাদি শুনিয়াছি এ সকল মাইকেল চরিত্রের ঐতিহাসিক ঘটনা, 'দত্ত কারো ভৃত্য নয়, That's moral courage, (বুকে হাত দিয়া) আমি সেই moral courage এর ছেলে বাবা!' ইত্যাদি অনেক কথাই মাইকেলের।'[৩৬]—কেবল মাইকেল কেন, 'নরকাগ্নি' বেষ্টিত নিমচাঁদের ভেতর রামগোপাল-হরিশ্চন্দ্রকে আবিষ্কার করা কী কঠিন?—সেকালের সমালোচকরাই এ জিজ্ঞাসা তুলে ধরেছিলেন। এঁদের বক্তব্য হল, 'নিমচাঁদের প্রয়োজন ছিল কোনা এক নরকাগ্নি। এ স্বর্গভ্রষ্ট সমাজে তাহার অভাব কোথায়? যে নরকাগ্নি হরিশ্চন্দ্রকে অকালে অতলে লইয়া গেল, যে অগ্নিতে রামগোপাল একদিন দগ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা অনুসন্ধান করিতে অটলের টেবিলে, গোকুলের উপবনে কাঞ্চনের ভবনে নিমচাঁদকে পাঠান কেন?'[৩৭]—মোটকথা বিরাট এক প্রতিভা কী ভাবে সভ্যতার নরকাগ্নিতে পুড়ে নিঃশেষিত হয়ে গেল, সেই ইতিহাসের প্রতিনিধি-চরিত্র হল এই নিমচাঁদ।

মেফিস্টোফেলিসের সব পরিচিতি জেনেও ফাউস্ট যেমন তার কাছে নিজেকে বিক্রয় করে দিয়েছিল, আলোচ্য নায়ক নিমচাঁদও মদের ভয়াবহ পরিচিতি জেনেও অনুরূপ ভাবেই নিজেকে সমর্পণ করেছে তার হাতে। নিমচাঁদ চরিত্রে প্রবেশের এই হল চাবি কাঠি। ১২৮৩ সালের 'বান্ধব' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিখ্যাত প্রবন্ধে মনীষী সমালোচক কালীপ্রসন্ন ঘোষ নিমচাঁদ চরিত্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ঐ কথাগুলিই একটু অন্যভাবে উপস্থাপিত করে লিখেছিলেন: 'নিমেদত্ত স্বর্গভ্রষ্ট শয়তান, তাহার সম্মুখে কাচপাত্রে নরকাগ্নি; নিমচাঁদ, এখন আর স্বর্গে অধিকার নাই বলিয়া স্বর্গের উপর রাগ করিয়া, অবাধে সেই নরকাগ্নি দিবারাত্রি গলাধঃকরণ করিতেছে।'[৩৮]

আমাদের জিজ্ঞাসা, নিমেদত্তের এই অভিমান কার ওপর ও কেন? আপাতদৃষ্টিতে নিমেদত্তকে এই নাটকে নিস্পৃহ ও অনাসক্ত বলেই মনে হয়। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সে যে উদাসীন, এ ব্যাপারে কোন সংশয় নেই।

তার আসক্তি ও আগ্রহ একমাত্র মদ্যপানে। এই মদ্যপান ছাড়া তার জীবনে আর কোনো আগ্রহ আছে বলে বর্তমান নাটক অন্ততঃ জানায় নি। কিন্তু একটি মানুষের পরিচয় কী এ রকম খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন হতে পারে? নিমেদত্তের পড়াশোনা, সাহিত্য সম্পর্কে তার মতামত, প্রাসঙ্গিক কবিতা আবৃত্তিতে তার স্মৃতিশক্তির অসাধারণতা, এমন কী উচ্চ চরিত্রগত সহজাত সম্ভ্রমবোধ ইত্যাদি দেখে মধুসূদনের তুল্য প্রতিভার অধিকারী বলে তাকে মনে করা কিছু অহেতুক নয়। সেকালের বড়ো চাকুরে বা বড়ো সাহিত্যিকদের থেকেও সে যে অনেক বড়ো, তা' নিসংশয়ে বলা যায়। কিন্তু এতগুণ থাকা সত্ত্বেও সে আলোর বিপরীত দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে কেন?—এ কী অভিমান?

'সভ্যতার সহিত বিদ্যাভাবের উদ্বাহ হলেই বিড়ম্বনার জন্ম হয়',[৩৯]—এ কৈফিয়ৎ নিমচাঁদেরই দেওয়া। তবে কী নিমচাঁদ এই 'বিড়ম্বনা' শিকার? পরোক্ষ প্রমাণগুলি অন্ততঃ সেই সিদ্ধান্তেই পৌছে দেয়। কেনারামের মত অযোগ্য ব্যক্তিদের সামাজিক প্রতিষ্ঠা, সমাজে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির বাড়াবাড়ি ইত্যাদি দেখে নিমচাঁদ যেন সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। স্বর্গের গৌরব ঘৃণাভরে পরিত্যাগ করে নরকের রাজত্বেই সে থাকতে চায় সমাসীন। অর্থাৎ সে হতে চায় স্বরাজ্যে স্বরাট। যোগ্যতা আছে বলেই কেনারামকে সে সদম্ভে বলতে পারে, 'বাবা, সুকতলার জোরে ঘটিরাম হয়েছো, বিদ্যার জোরে হওনি,—তোমাদের কলেজের একটাকে দেখাও দেখি আমার মত ইংরিজি জানে'[৪০]—।

যদিও নিমচাঁদ চরিত্রটি বিচ্ছিন্ন, খণ্ডিত এবং সাংসারিক পরিধির বাইরে অবস্থিত, কিন্তু পরোক্ষ প্রমাণ থেকে দেখা যায় এই নিমেদত্তের ঘরেও একটি বিবাহিতা সুন্দরী স্ত্রী রয়েছে। আর অটলের ভাষায় বলা যায়, 'সে খুব সুন্দরী, তা ভাই ওর কেমন উইকনেস্, তারে রেখে বাজারে ঘুরে বেড়ায়।'[৪১] —এর পিছনে কী তা'হলে তার কোনো জ্বালা বা অভিমান প্রচ্ছন্ন রয়েছে? স্ত্রীর কাছে ফিরে যাবার কথায় অটলকে সে একবার বলেছিল, 'Thou stickest adagger in me.' অটল কি গালালালই দিলি?'[৪২]—অবশ্য নিমচাঁদের কণ্ঠে এ স্বীকারোক্তিও আছে যে তার কপালে ঠিক যোগ্য স্ত্রী জোটে নি। গোকুলের স্ত্রীর প্রসঙ্গে সে বলেছে, 'গোকলো ব্যাটা ভারি মাগ কপালে, কিন্তু ছুঁড়ি ভাতার কপালে নয় বাবা—এ রত্ন আমার হাতে পড়লে রাইট ম্যান ইন্ দি রাইট্ প্লেগ হতো।'[৪৩]

না, অকারণ আলোচনা বাড়িয়ে লাভ নেই। নিমেদত্ত যে নিছক একটি

তাত্ত্বিক উচ্ছ্বাস নয়, সে যে ঘোরতর মানবিক, রক্তমাংসের শরীরী চরিত্র, তা' প্রমাণ করবার জন্তই এত কথা বলতে হল তবে দুঃখ এই এগুলি সবই বিবৃত মাত্র, সংঘাতের দ্বারা চিত্রিত নয়। তবে সংঘাতের ভেতর দিয়ে যা পরিস্ফুট, তা' থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এই চরিত্রটি একাধারে দেবতা ও শয়তানের সমন্বিত রূপ। বা সমালোচকের ভাষায় ঘুরিয়ে বলা যায়, 'নিমচাঁদ স্বর্গভ্রষ্ট শয়তান। যদিও নিমচাঁদ অধঃপতনের নিম্নস্তরে উপনীত হইতেছেন, তিনি তখনও বুঝিতেছেন যে, এটা তাঁহার পক্ষে উচিত হইতেছে না; কিন্তু সামালাইতে পারিতেছেন না। যদিও তিনি পশুতে পরিণত হইতেছেন, কিন্তু তাঁহার মনুষ্যত্ব একবারে তিরোহিত হয় নাই। তাই তিনি অটলের কুপ্রস্তাবে ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন, I dare do all that becomes a man who dares do more is none.'[৪৪]

নিমেদত্তের চরিত্র-চিত্র এতখানি উজ্জ্বল হওয়ার মূলে কিন্তু আরেকটি কারণ আছে। সে কারণটি হল তার বাগ্‌বিভূতি। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী এই বাগ্‌বৈভবের মায়াকে নিমেদত্তের ব্যক্তিত্বের একটি আকর্ষণীয় ও অপরিহার্য গুণ হিসাবেই দেখছেন। চমকপ্রদ বিদগ্ধ বাক্যের ফুলঝুড়ি ছাড়া নিমচাঁদ চরিত্র যে ব্যর্থ, এ বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। এবং এ বিষয়ে অধ্যাপক বিশীর সমীক্ষাটি মনে রাখবার মতন; তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, 'নিমেদত্তের আকর্ষণ কাটানো সহজ নয়, সে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে witty মাতাল, আর প্রকৃতিস্থের মধ্যে ও কি সাহিত্য-জগতে কি বাস্তব-জগতে তার মত বাগ্‌-বাণিজ্যের রথচাইল্ড একান্ত দুর্লভ। অটলবিহারী মদের মায়া কাটাইতে পারে নাই, কাঞ্চনের মায়া কাটাইতে পারে নাই। এ সবের মূল বোধ করি নিমেদত্তের বাগ্‌ বৈভবের মায়া।'[৪৫]

মোটকথা, এই সব রকম মায়ার সমন্বয়েই নিমচাঁদ নির্মিত। রেনেসাঁসের ব্যর্থতা ও যন্ত্রণা যেমন তার মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি সম্ভাবনার দিগন্তও আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছে এই চরিত্রটিই। 'প্রিন্স অব ডেনমার্ক'কে ছাড়া যেমন ভাবা যায় না 'হ্যামলেট' নাটকের কথা, তেমনি এই চরিত্রটিকে বাদ দিয়ে 'সধবার একাদশীর অস্তিত্বও অনুরূপ অকল্পনীয়।

প্রাসঙ্গিক ভাবেই এবার গৌণ চরিত্রের কথা উঠবে। তবে এ প্রসঙ্গে গোড়াতেই বলে নেওয়া ভালো যে যুগযন্ত্রণার পরিচয় নিমচাঁদে থাকলেও, গৌণ চরিত্রগুলিতে তা' একান্ত ভাবেই অনুপস্থিত। অটলবিহারী থেকে ভোলা-রামমাণিক্য-কেনারাম ইত্যাদি সকল চরিত্রই প্রতীকী চরিত্র।

বড়োলোকের বখে যাওয়া ছেলের প্রতীক এই হল অটলবিহারী। পানাসক্তি ও গণিকাচর্চা এই দুটি ডানায় ভর দিয়ে অটলবিহারীর গগণ-বিহার। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকে অঢেল বিত্ত ও ততোধিক শৌখীনতা নিয়ে যে বাবুর দলের অভ্যুদয় হয়েছিল, অটলবিহারী তাদেরই একজন। এই বাবুদের কোনো বিবেক ছিল না, যন্ত্রণা ছিল না, সুতরাং অটলেরও তা' নেই।—অবশ্য নোঙ্‌রামি আছে, যা তাঁদের ছিল। সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি উপেক্ষা, খুড় শ্বাশুরীকে বের করে আনবার মতলব ইত্যাদি কুকর্মে ঐ বাবুরা যে দক্ষ ছিলেন, অটল তার প্রমাণ। অটল মুর্খ, কিন্তু তাই বলে দা বিয়ে বেড়াতে তার অসুবিধা হয় না। একমাত্র একটি জায়গায় সে অসহায়, আর সে জায়গাটির নাম হল, নিমচাঁদ।—চরিত্রটি আগাগোড়া 'টাইপ্‌'ধর্মী, এবং বৈশিষ্টবর্জিত বলেই শিল্পীর চোখে মূল্যহীন।

মুক্তেশ্বরবাবুর জামাই হিসাবে একটি চরিত্রের সঙ্গে বর্তমান নাটকে আমাদের পরিচয় হয়, সে হল ভোলামাতাল। এই ভোলা চরিত্রটির উৎস কোথায এবং কোন্ অভিজ্ঞতা প্রসূত, তা' প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করা হযেছে। শ্বশুর বাড়ির থেকে কাঁশারিপাড়াব অটল বিহারীর বৈঠকখানা যে তার বেশি পছন্দ, একথা সে নানাভাবেই জানিয়ে দিয়েছে। মাতাল ভোলার পোশাক-আশাক যেমন অভিনব, তার ইংরেজি বলবার চেষ্টা তার থেকে কম অভিনব নয়।—অযোগ্য লোকের ইংরেজি কথোপকথন কী ভয়ঙ্কর হতে পারে, এই ভোলা তার প্রমাণ।

ভোলা চরিত্রের মতনই সভ্যতার আলোক-পিপাসী আরেকটি চরিত্র হল, 'বাঙ্গাল' রামমাণিক্য। বেচারি রামমাণিক্য তার 'বাঙ্গালত্ব' নিয়ে বড়োই বিপন্ন। অনেক চেষ্টা করেও বেচারি যে শেষ পর্যন্ত কলকাতার মতন সভ্য হতে পারছে না, এইটুকুই তার জীবনের চরম দুঃখ। গণিকাগমন, মদ্যপান, সাহেবদের বাড়ির বিস্কুট খাওয়া, নিজের স্ত্রীকে চিকণ ধুতি পরান—সবই করেছে সে, তবুও সে যে কেন কলকাতার মতন হতে পারছে না, এটাই হল তার জিজ্ঞাসা। সখেদে তাই সে বলতে বাধ্য হয়েছে, 'পুঙ্গির বাই বাঙ্গাল বাঙ্গাল কর‍্যা মস্তক গুরাই দিচে—বাঙ্গাল কউস্ ক্যান্—এতো অখাদ্য খাইচি তবু কলকত্তার মত হবার পারচি না? কলকত্তার মত না করচি কি? মাগীবাড়ী গেচি, মাগুরি চিকোন ধুতি পরাইচি, গোরার বাড়ীর বিস্‌কাট বক্কোন করচি, বাণ্ডিল খাইচি—এত কর‍্যাও কলকত্তার মত হবার পারল্যাম না'[৪৬]—। উনিশ শতকে শহর কলকাতাতে সভ্যতার নামে যে

অসভ্যতা চলেছিল, তার আকর্ষণ কী দুর্বার ছিল, এই সংলাপটি তার একটি দলিল। এবং এ দলিল পাঠে এ তত্ত্বও জ্ঞাত হওয়া গেল যে সাধারণ মানুষেরা কী ভয়ঙ্কর ভাবেই না এই অসভ্যদের শিকারে পরিণত হত।

এ জাতের আরেকটি-আশ্চর্য নমুনা হলেন কেনারাম ডেপুটি স্বয়ং। রামমাণিক্য হল অশিক্ষিত এবং দূর 'বাঙ্গালদেশের' মানুষ, তাই তার চরিত্র একটু অন্যভাবে চিত্রিত। কেনারাম কিন্তু তা' নয়, সুতরাং তার চরিত্র আরো অন্যভাবে আঁকা। তবে শিল্পীর উপজীব্য এক, এবং তা' হল উভয়ের নির্বুদ্ধিতা। কেনারামের অনেক গুণ, যদিও সে ইংরেজি ভালো জানে না, কিন্তু তাই বলে তার ইংরেজি জানার অভিমান কিছু কম নয়। ব্রাহ্মধর্মের তত্ত্ব না বুঝেও সে আধুনিকতার জন্য সেজেছে ব্রাহ্ম। স-আরদলি সে গণিকালয়ে যায়। সুরাপানের সে ঘোরতর বিরোধী, কিন্তু তাই বলে আঙুলে ডুবিয়ে মদ খেতে সে কোনো দোষ খুঁজে পায় না। মদের ব্যাপারে তার মত হল, 'আমি কি এমনি কুলাঙ্গার, মদ খেয়ে চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ করবো? বিশেষ মদ খেলে কর্তারা দুঃখিত হবেন, তাঁহাদের মনে কি দুঃখ দেওয়া সভ্যতার কাজ?'[৪৭] না, মদ-প্রসঙ্গ এখানেই সমাপ্ত নয়, মদ না-খাওয়ার তার আরেক যুক্তি হল, 'আমি মহাশয়, ঐ ভয়েতে মদের কাছে যাই না, মদ খেয়ে যদি অল্প বয়সে মরে যাই, তা বলে প্রোমোসানও পাব না, মানুষ মানবেত্তাও কত্তে পারতো না, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দু' টাকা দিতেও পারবো না।'[৪৮] সুতরাং কেনারামের পক্ষে মদ খাওয়া সম্ভব নয়—। আরো পরিচয় তার আছে ইংরেজি জানার অভিমানে সে বাঙ্‌লা ভুলে গেছে, তাই ফরিয়াদী 'মুচিরাম'কে সে 'ঘটিরাম' পড়েছে। অবশ্য এ কারণে সে 'ঘটিরাম' উপাধিও পেয়েছে।—মোটকথা, এ-জাতীয় চরিত্রের তুলনা মেলা ভার। কেনারাম নিজেই নিজের উদাহরণ। যদিও থ্যাকারের 'ভ্যানিটি ফেয়ারে'র কালেক্টার অব বগ্‌লিওয়ালার কথা প্রাসঙ্গিক ভাবে নিমচাঁদ একবার তুলেছিল, কিন্তু চরিত্রধর্ম উভয়ের বৈশিষ্ট্য ঠিক একরকম নয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সিভিল-সার্ভিসে নিযুক্ত জোসেফ সেড্‌লি একদা 'বাঙ্‌লা' পরগণায় অবস্থিত 'বগ্‌লিওয়ালা'য় গিয়েছিল কালেক্টার হয়ে। ব্যাপারটি অনেকটা কেনারামের নিপাতগঞ্জে যাওয়ার মতই। নিপাতগঞ্জে গিয়ে কেনারাম হয়ে গেল 'ঘটিরাম', অনুরূপভাবে সিভিল সার্ভিসের জোসেফ হয়ে গেলেন নাম হারিয়ে 'বগলিওয়ালা'র কালেক্টার।

'ভ্যানিটি ফেয়ারে' সেও হয়ে গেল একটি দ্রষ্টব্য চরিত্র।—যাইহোক, এই উভয় চরিত্রে 'স্নবারি'র মিল থাকতে পারে, কিন্তু নিঃসন্দেহে যা বলা যায়, তা' হল, দীনবন্ধু কিন্তু ঐ 'বগলিওয়ালা'র আদলে নিপাতগঞ্জের ডেপুটি ঘটিরামকে আঁকেন নি। ডেপুটিদের সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ও মনোভাব কী রকম ছিল তা' প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করা হয়েছে। একথা বলবার অপেক্ষা রাখে না যে, বাস্তব অভিজ্ঞতাই এই চরিত্র-সৃষ্টির পিছনে কার্যকর। ডেপুটিবাবুদের আত্মম্ভরিতা এবং মূর্খামি থেকেই দীনবন্ধুর হাস্যরসের উৎসার। 'নবীন তপস্বিনী' নাটকে জলধরকে যেমন খাঁচায় পুরে লাঞ্ছিত করা হয়েছে, এখানেও তেমনি একটিপরিকল্পনা নাট্যকারের মনে খেলেছে। এবং এ বিষয়ে নাটকের ভেতর কোনো ঘটনা ঘটাতে না পেরে কেবল প্রস্তাবাকারেই তা' উপস্থাপিত করেছেন:

নিম। গড়ের মাঠে, মনুমেণ্টের কাছে একখানি ঘর তৈয়োরী করি, তার ভিতরে ডেপুটি বাবুকে রেখে দিই, তারপর ছাপিয়ে দিই, মপোস্বাল হতে শামলা মাথায় দেওয়া এক আশ্চর্য জানোয়ার এসেচে, গড়ের মাটে অবস্থিতি—বুড়োরা এক টাকা, ছেলেরা আট আনা, মেয়েরা ওম্‌নি—

অট। মেয়েরা ওম্‌নি কেন?

নিম। তারা কি ও পোড়ার মুখ কড়ি দিয়ে দেখ্‌তে আসবে?

[দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

আশাকরি, মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। ডেপুটিদের নিয়ে এমন কৌতুক বোধহয বাঙ্‌লা-সাহিত্যে আর কেউ করেননি।—অপেক্ষাকৃত গৌণচরিত্রেব ভেতর আরেকটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হল, চাকর দামা। এই দামার চরিত্র ও সংলাপের ভেতর দিযে বাবুচরিত্রের বিপরীত দিকটি দেখা যেতে পাবে। শেরিডানের নাটকে 'ভৃত্যরাজক-তন্ত্রে'র যেমন একটি আশ্চর্য ছবি দেখতে পাওয়া যায, দীনবন্ধুর আঁকা দামার মাধ্যমেও এমনি একটি রহস্যময় জগতের আভাস মেলে। প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্কটি কেমন ছিল, তা' বোঝাবার জন্য, ভৃত্য দামার একটি সংলাপ পুরো উদ্ধার করে দেওয়া যেতে পারে।—

দামা। (মেজ ঝাড়িতে ঝাড়িতে) বোকাবাবুর কাছে নইলে চাকরি পোষায়? কত জিনিস ভাংচি, কত জিনিস চুরি কচ্চি, বাবুর হিসেবও নেই, নিকেসও নেই। এক এক বেটা বাবু আছে এমনি কঞ্জুস, বাজারের পরতাল দেয়—যেমন কাপ্‌টে বাবু তেমনি কসাই চাকরও আছে।

নবীনবাবু দুদিন অন্তর একটি করে পয়সা দেন সুপারি আনতে, বাবুর খানসামা সেটি মাল করে ক'সো পেয়ারা শুক্‌য়ে কেটে সুপারি করে দেয়, বাবুর মন্দ বল্‌বের যো নাই, তা' হলে খানসামা ওম্‌নি বল্‌বে, এক পয়সার ভাল সুপারি একদিন বই হয় না।—আমার ভাবনা কি, বাবু যে মদ ধরেছেন, কোটা বালাখানা করে ফেল্‌বো।

[দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

ভৃত্যকুলের মনোভাব সম্পর্কে বিস্তৃত করে আর কিছু বলবার প্রয়োজন বোধ হয় নেই। কেননা, উদ্ধৃতিটি সব কথাই বলে দিয়েছে।

'সধবার একাদশী' নাটকে যে তিনটি অভিভাবক শ্রেণীর চরিত্র আছে, তাঁরা হলেন, অটলের বাবা জীবনচন্দ্র, অটলের খুড়-শ্বশুর গোকুল এবং অটলের পিতৃব্য রামধন রায়। প্রহারের প্রয়োজনেই রামধনকে আমরা নাটকে দেখেছি, নতুবা তার চরিত্রে উল্লেখযোগ্য আর কিছু নেই। জীবনচন্দ্রের ভূমিকা অসহায় অভিভাবকের। স্ত্রী-পুত্রের ভয়েই তিনি ভীত। পুত্রের ব্যাপারে এঁর স্বীকারোক্তি হল, 'কি করে শাসন করি একটি বই ছেলে নাই—টাকা না দিলে জলে ঝাঁপ দিতে যায়, চিলের ছাদ থেকে হাত পা ছেড়ে দেয়।'[৪৯] আর পত্নীর দৌরাত্ম্যে যে ইনি 'ভেকো' হয়ে রয়েছেন, তা' অন্য একটি সংলাপে তিনি কবুল করেছেন।

খুড় শ্বশুর গোকুলচন্দ্র অপেক্ষাকৃত আধুনিক। চরিত্রের দিক থেকেও অনেক ঘনিষ্ঠ। একসময় পানাসক্ত ছিলেন, কিন্তু মনে জোর আছে বলেই তিনি পানাসক্তি ত্যাগ করতে সমর্থ হয়েছেন। আর ধর্মের দিক থেকেও তিনি আধুনিক। তিনি ব্রাহ্ম। জীবনচন্দ্রের একটি উক্তি এঁর পরিচয় উদ্‌ঘাটনে বিশেষ সহায়ক। জীবনচন্দ্র এঁকে সাদরে বরণ করে জানিয়েছেন, 'এখন দেখ্‌চি তোমরা মাতার মণি, তোমাদের মধ্যে মদও চলে না, বেশ্যাও চলে না, আর তোমারা একত্র হয়ে পরোপকার, স্কুল, ডিস্‌পেন্‌সারি করবার সুযোগ কর।'[৫০]—যাই হোক, এই হল গোকুলচন্দ্র। সেকালে যাঁরা প্রকৃত অর্থে দেশোন্নয়নের ব্রতে বৃত ছিলেন, ইনি যে সেই জাতীয় চরিত্রের প্রতিনিধি হয়ে দেখা দিয়েছেন, তা' এই গ্রন্থপাঠেই উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং ইনি যে জামাতা অটলকে উদ্বোধিত করতে সচেষ্ট হবেন, তাও অনুমেয়। তিনি করেছেনও তাই। অটলকে বলেছেন, 'তুমি ধর্ম্ম কর্ম্ম করবে, এডুকেশন কমিটির মেম্বার হবে, অনরেরি ম্যাজিষ্ট্রেট হবে, লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্নরের কাউন্সিলের মেম্বর হবে, দেশোন্নতির চেষ্টা করবে, দুঃখীদের

প্রতিপালন করবে, তোমার কি উচিত, বেশ্যালয়ে পড়ে মদ খাওয়া?'[৫১] দুঃখের ব্যাপার হল, এই উক্তির দ্বারা উদ্‌বোধিত হওয়া দূরে যাক, অটল এমন কাজ করেছে যা গোকুলকে শেষ পর্যন্ত করেছে কালিমা-লিপ্ত।

নারী চরিত্রের ভেতর প্রথমেই যে-চরিত্র আমাদের চোখে পড়ে সে হল গণিকা কাঞ্চন। বুকহার্ট সাহেব ১৪৯০ খ্রীষ্টাব্দের পরিসংখ্যান তুলে রোম। শহরের গণিকাদের পরিচিত করতে গিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, 'Scarcely a single women seems to have been remarkable for any higher gifts.'[৫২] কাঞ্চন সম্পর্কে কিছু লিখতে গিয়ে, ঐ কথাটিই প্রথমে আমাদের মনে আসে। নিমচাঁদের সম্ভাষণ-স্তোত্রটিই কাঞ্চন চরিত্রের প্রকৃত ও যথার্থ পরিচিতি। অটলবিহারীকে সাবধান করে দিয়ে নিমচাঁদ একবার বলেছিল, 'বাবা, তুমি বোকারাম অকালকুষ্মাণ্ড, তুমি বেশ্যার বজ্জাতির অন্ত পাবে?''[৫৩]—এই উক্তির যাথার্থ্য প্রমাণের জন্যই যেন কাঞ্চন চরিত্রটি পরিকল্পিত। যাই হোক এই গণিকা চরিত্রটির ক্রমবিকাশ অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে দেখিয়েছেন নাট্যকার। বাগান বাড়ীতে তার আবির্ভাব থেকে অটলের প্রতি অনুরাগসঞ্চার, প্রেমাভিনয় ইত্যাদি সব খুঁটিনাটি চিত্র নাট্যকার এঁকেছেন। অটলের আগে অন্যবাবুর প্রতি তার যে আসক্তি ছিল এবং কবে থেকে সে রক্ষিতা ছিল, সেসব কোনো তথ্যই গোপন করেনি কাঞ্চন। রক্ষিতা হিসাবে নিয়োগের পর তার পিছনে অটল যখন অজস্র টাকা ওড়াচ্ছে, সেই মুহূর্তে কাঞ্চনের উচ্ছলতার ছবি আঁকতেও নাট্যকার ভোলেন নি। আবার শেষকালে যখন কাঞ্চন অটলকে পরিত্যাগ করে যাচ্ছে, সেই দৃশ্য আঁকতেও নাট্যকার কোনো ত্রুটি করেন নি। মোটকথা স্বীকার করতেই হয়, উনিশ শতকের গণিকাকুলের প্রতিনিধি হিসাবে নাট্যকার এই চরিত্রটিকে আঁকতে সমর্থ হয়েছেন।

অটলবিহারীর মায়ের চরিত্রটি স্নেহান্ধ মায়ের প্রতীকী চরিত্র হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। মায়ের অন্ধ স্নেহের জন্যই যে শেষপর্যন্ত অটলের এতখানি পতন, তা' নাটকে নানা ঘটনায় নানাভাবে বিবৃত। পুত্রের জন্য স্নেহান্ধ মা যখন কাঞ্চনকে অনুনয়-বিনয় করছে, সেই মুহূর্তটি বড়োই করুণ। একটি গণিকার কাছে বাড়ীর গৃহিনী গিয়ে আকুতি-মিনতি করে বলেছেন, 'যাস্‌নে ও কাঞ্চন যাসনে। · আমার মাতা খাস্ মা, যাসনে, তোমায় না দেখলে গোপাল আমার আবার গলায় দড়ি দেবে।'[৫৪] মাতৃত্ব যে কতখানি অন্ধ হতে পারে, তার নমুনা হিসাবে এই সংলাপটি সম্ভবতঃ তুলনারহিত।

সৌদামিনী ও কুমুদিনী এই নাটকের আরো দুটি জীবন্ত চরিত্র হিসাবে আলোচনার দাবী রাখে। কুমুদিনী হল স্ত্রী, সৌদামিনী ভগিনী। একজন স্বামীসুখে বঞ্চিতা, অন্যজন স্বামীর সোহাগে উচ্ছল। ননদ-ভাজের রসিকতায় দু'জনের সংলাপ যদিও খুবই উপভোগ্য, কিন্তু একটু কান পাতলেই কুমুদিনীর কণ্ঠে বিষণ্ণতার সুর ধ্বনিত হতে শোনা যায়। গভীর দুঃখে উদ্বেলিত হয়ে সে মাঝে মাঝে বলে উঠেছে, 'এর চেয়ে বিধবা হয়ে থাকা ভাল, আমি ভাই আর সইতে পারি নে, আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরবো।'[৫৫] 'সধবার একাদশী'র নাম করণের তাৎপর্য এই সংলাপের গভীরেই রয়েছে প্রচ্ছন্ন হয়ে। চরিত্রটি সচেতন সমালোচনায় মুখর, কিন্তু লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, বিদ্রোহের কোনো বীজ এর মধ্যে নেই। অথচ তা' যদি থাকত, খুব একটা অস্বাভাবিক তাকে কিন্তু মনে হত না। সেদিকে সৌদামিনী চরিত্র হিসাবে উপভোগ্য হলেও, বৈশিষ্ট্য-বর্জিত।

'সধবার একাদশী'র প্রসঙ্গে এবার উপসংহার টানা যেতে পারে। তবে তার আগে আরো দু'একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। এই দু'একটি কথা হল, এর মত সমাজ সচেতন নাটক বাঙ্‌লা-সাহিত্যে দ্বিতীয় নেই। এই সমাজ-মনস্কতার জন্যই এই নাটকটি পেয়েছে অজস্র অভিনন্দন, আবার নিন্দাও কম জোটেনি। রেনেসাসের সামাজিক সংঘর্ষের ছবি এখানে যে ভাবে ঠাই পেয়েছে, তা' অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। গণিকচর্চা, পানাসক্তি, নব্যশিক্ষা ব্যবস্থা, সামাজিক প্রসঙ্গ, ধর্মজিজ্ঞাসা থেকে স্বদেশ-ভাবনা কিছুই এখানে অনুপস্থিত নেই। যেখানে ভণ্ডামি ও 'ন্নবারি' সেখানেই দীনবন্ধুর ব্যঙ্গবাণ হয়েছে বর্ষিত। এমন কী তথাকথিত সংস্কার-পন্থীরাও এ নাটকে কম উপহসিত হন নি। 'ফিমেল এমানসিপেসন'[৫৬] সম্পর্কেও বক্রোক্তি নেই যে তা' নয়, প্রাসঙ্গিক ভাবে রামমাণিক্যের 'কলকাত্বাই মাগে'র[৫৭] কথা বা জীবনচন্দ্রের কৌতুক কথা, 'একেলে ব্যানেরা লেখাপড়া শিখেছেন, গাউন পরেচেন, বাগানে যাচ্চেন, এঁদের ছেলেতে সন্দ হবে'[৫৮] ইত্যাদি স্মরণযোগ্য।—খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে এই গ্রন্থের প্রতিটি সংলাপের ভেতরেই সে যুগের নানা বিতর্কের ছাপ আবিষ্কার করা যায়। সেই হিসাবে এ বইটির মুল্য অপরিসীম। মানবিকতা-বাদ ও নবজাগরণের পটভূমিতে রচিত এটি একটি অসামান্য মানবিক দলিল।

ওদিকে শিল্পের দিকেও তাই। নিমচাঁদ চরিত্রের নিস্পৃহতা ও অনাসক্তি

যেন তার দ্রষ্টার মনকেও করেছে প্রভাবিত। এ ব্যাপারে দীনবন্ধুর প্রতিভা সেক্সপীয়ারের সঙ্গে তুলনীয় হয়ে উঠেছে। একজন প্রখ্যাত সমালোচক ঠিক এই কথাই বলতে চেয়েছেন; তাঁর উক্তি দিয়েই বর্তমান প্রসঙ্গের সমাপ্তি টানা যেতে পারে। ঐ সমালোচকের বক্তব্য হল, 'দীনবন্ধু এই নাটকটিতে স্বীয় ক্ষমতার চরম প্রকাশ দেখাইয়াছেন। মনুষ্য চরিত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতা প্রসূত নির্লিপ্ততা বা detachment এই ক্ষুদ্র নাটকটিকে প্রায় সেক্সপীরীয় করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ সকল দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিলে বাংলা ভাষায় একমাত্র 'সধবার একাদশীকেই খাঁটি নাটক আখ্যা দেওয়া যায়।'[৫৯] সমালোচকের এই উক্তিতে দ্বি-মত হবার অবকাশ যে নেই, তা' নিঃসন্দেহে বলা যায়।

জামাই বারিক

দীনবন্ধু মিত্র মহাশয়ের 'জামাই বারিক' প্রহসন যখন বাহির হইয়াছিল, তখন সে বই পড়িবার বয়স আমাদের হয় নাই। আমার কোনো একজন দূর সম্পর্কীয়া আত্মীয়া সেই বইখানি পড়িতেছিলেন। অনেক অনুনয় করিয়াও তাঁহার কাছ হইতে উহা আদায় করিতে পারিলাম না। সে বই তিনি বাক্সে চাবি বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিষেধের বাধায় আমার উৎসাহ আরও বাড়িয়া উঠিল আমি তাঁহাকে শাসাইলাম, এ বই আমি পড়িবই।'[৬০] এই কথাগুলি যিনি লিখেছেন, তিনি আমার কেউ নন, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। কবি তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে অনেক স্মৃতির ভেতর এই গ্রন্থপাঠের স্মৃতিও রেখেছেন অক্ষয় করে। 'নীলদর্পণ' রচনার এক বছর পরে যার জন্ম, সেই শিশুকে তার প্রথম কৈশোরে আমাদের আলোচ্য নাট্যকার তুলে দিলেন তাঁর শেষ নাটক 'জামাই বারিক।' অর্থাৎ কালের হিসাবে দীনবন্ধুর সাহিত্যচর্চার এক যুগ হল অতিক্রান্ত।

যাইহোক, কিশোর রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই নাটকটি শেষ পর্যন্ত পড়তে সমর্থ হলেন। গ্রাবু খেলবার সময় ঐ আত্মীয়ার চাবি চুরি গেল। এরপর যা ঘটল, তা' রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যাক। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'চাবি চুরি গেল এবং চোর ধরা পড়িল না। বই পড়া হইল। তাহার পরে চাবি এবং বই স্বত্বাধিকারীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া চৌর্যাপরাধের আইনের অধিকার হইতে আপনাকে রক্ষা করিলাম। আমার আত্মীয়া ভৎর্সনা করিবার

চেষ্টা করিলেন কিন্তু তাহা যথোচিত কঠোর হইল না, তিনি মনে মনে হাসিতে ছিলেন—আমারও সেই দশা।'—৬১

রবীন্দ্রনাথের এই লেখাটি পড়বার পর 'জামাইবারিক' সম্পর্কে আমাদের যে ধারণা হয়, তা' হল, এটি একটি মিষ্টি নাটক। রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র যাকে উজ্জ্বল শুভ্র হাস্যরস বলেছেন, সেইরকম হাস্যরসে সিক্ত এটি একটি সুন্দর নাটক, একথাই বলতে ইচ্ছে হয়। তবে এ হাস্যরস কতখানি নির্দোষ, তা' নিয়ে অবশ্য তর্কের অবকাশ আছে, কেননা বঙ্কিম-কথিত ভোঁতারাম ভাট—বর্তমান কাহিনীর অন্তর্গত। এখন এটি যদি দীনবন্ধুর কলঙ্কের ব্যাপার হয় তা'হলে এই গ্রন্থেই তিনি হয়েছেন কলঙ্কিত। সুতরাং অন্য গ্রন্থের ব্যাপারে যা বলা যায়, ঠিক এই কথা বলে 'ভোঁতারাম ভাট'-কে কী উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব, না উচিত?—যাইহোক, প্রাসঙ্গিক ভাবে এটুকু উল্লেখ থাকা দরকার।

পরিকল্পনার দিক থেকে 'জামাইবারিক' শুধু অভিনব নয়, এক অর্থে আজগুবিও বলা যায়। যদিও গত শতকের ধনী পরিবারগুলিতে 'ঘর জামাই' রাখবার প্রথা ছিল, অনেক পরিবারে রাখাও হত ঘরজামাই, কিন্তু ঐরকম 'ব্যারাক' নির্মাণ করে রাখা যে হত না, তা' নিঃসংশয়ে বলা যায়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভালো যে 'ঘরজামাই' সম্পর্কে আমাদের বাঙলা দেশের মনোভাব কোনো দিনই অনুকূল ছিল না। বরং প্রতিকূলই বলা যায়। বাঙলা প্রবাদ-প্রবচনে, লোক-কাহিনীতে, এমন কী রূপকথার গল্পেও ঘর-জামাই উপহাসিত এবং এদের নিয়ে নানা কৌতুকের উৎসার। দীনবন্ধুও তাঁর পূর্ববর্তী রচনাগুলিতে এই মনোভাবই প্রকাশ করেছেন।—এখন এই শেষ নাটকটিতে এসে এই উনিশ-শতকীয় সমস্যাটিকে প্রবল হাস্যরোলের মধ্যে তাকে ধিক্কার জানালেন। বাঙলা সাহিত্যে এটি অভিনব। আর অভিনব বলেই অভিনন্দনের যোগ্য।

তবে 'জামাইবারিকে'র সমস্যা একটি নয়, দুটি। একদিকে রয়েছে ঘর-জামাই প্রথার কৌতুকরস, অপরদিকে উৎসারিত রয়েছে বহুবিবাহ ও সপত্নী সমস্যার কৌতুক।—এক বৃত্তে রয়েছে পদ্মলোচন-বগলা-বিন্দুবাসিনী, অপর-দিকে অভয়কুমার-কামিনী এবং 'জামাইবারিক'। দুটি বৃত্তেই যারা সমস্যা সৃষ্টি করেছে, তারা হল গরবিনী স্ত্রী ও কলহপরায়ণা স্ত্রী। এ জাতীয় স্ত্রীরা সংসার জীবনের পক্ষে কী যে ভয়ঙ্কর হতে পারে, কী অভিশাপ বহন করে আনতে পারে, লেখক তা' যত্নের সঙ্গে উদ্ঘাটন করেছেন। তবে এই নাটকটির লক্ষনীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এদের চারিত্রিক পরিবর্তন লেখক দেখাতে সমর্থ

হয়েছেন। অবশ্য সর্বত্র সংঘাতের ভেতর দিয়ে এ চিত্র যে তুলে ধরা হয়েছে, তা' নয়, কখনো কখনো 'ন্যারেশানে'র ভেতর দিয়েও এই পরিবর্তন হয়েছে সূচিত। এবং সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয়, এই সুখ-সমাপ্ত কাহিনীটি কোথাও আতিশয্য দোষে দুষ্ট নয়। একদিকে কাব্যিক আতিশয্য একটু অধিক হলেও, অপরদিকের রূঢ় বাস্তবতা তা' পাল্লায় দিয়েছে সমান করে।

চরিত্র-বিচারের দিকে এগোলে প্রথমেই যার দিকে আমাদের চোখ পড়ে, সে হল পদ্মলোচন। এই পদ্মলোচন এবং রোমান্টিক কাহিনীর নায়ক অভয়কুমার—উভয়েই হলেন এক গ্রামের অধিবাসী। এঁরা উভয়েই পরস্পরের প্রতিবেশী। আত্মীয় বান্ধবহীন অভয়কুমারকে 'জামাইবারিকে' এই পদ্মলোচনই নিয়ে এসে জামাই হিসাবে দিয়েছে ঠাঁই করে। পদ্মলোচনের রসবোধ প্রখর, স্পষ্ট-ভাষণেও সে নিপুণ। কেশবপুরে জমিদার বিজয়বল্লভের বৈঠকখানায় তার সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ। সেই সাক্ষাৎকারে তার সম্পর্কে আমাদের মনে যে ছাপ পড়ে, তা' পাঠকের অন্তরে শেষ পর্যন্ত থেকে যায়। প্রথম সাক্ষাতে তাকে একজন তেজস্বী পুরুষ হিসাবেই ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। কিন্তু দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই তার ঐ ব্যক্তিত্বকে অবলুণ্ঠিত হতে দেখে মন ভেঙ্গে যায়। পদ্মলোচন এ সময় বলেছে, 'ঘর জামায়ের এক বাঘিনী, আমার দু'টি।'[৬৪]—এই দুটি বাঘের আক্রমণে বেচারি কী ভাবে বিপর্যস্ত, তা' একটির পর একটি ঘটনার ভেতর দিয়ে উন্মোচিত। বেচারিকে এইভাবে নাকাল হতে দেখে আমাদের মনে জাগে সহানুভূতি।—না, এই অবস্থায় বেশিদিন থাকতে পারে নি পদ্মলোচন। কোনো উপায় খুঁজে না পেয়ে স্ত্রীযুগলের পীড়নের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সে হয়েছে দেশত্যাগী। আশ্রয় নিয়েছে গিয়ে বৃন্দাবনে। কিন্তু মজার ব্যাপার এই, ঐ বৃন্দাবনে আশ্রয় নিয়েও যুযুধান স্ত্রী-যুগলের কথা একমুহূর্তের জন্যেও সে পারে নি ভুলতে। অর্থাৎ তার চরিত্রের গভীরে স্ত্রীদের জন্য তার যে ভালোবাসা রয়েছে, এ তারই প্রমাণ। মোটকথা, তার হৃদয় স্নেহশূন্য নয়। তাই চিঠিতে যখন সে নিজের স্ত্রীদের খবর পেয়েছে, তখনই তার মনে দেখা দিয়েছে চঞ্চলতা। দেখা দিয়েছে ব্যাকুলতা। এবং তার মুখে শোনা গেছে, 'চিঠি পড়ে মনটা খারাপ হয়েছে, আর না গিয়ে থাকতে পারিনে।'[৬৫]—স্বীকার করতেই হয়, এ পরিবর্তন স্নেহমমতায় মেশান মানুষের মতই স্বাভাবিক।

দাম্ভিকতা ও ধনৈশ্বর্যের গর্ব যার চলাফেরায়, যার আচারে-ব্যবহারে সর্বদা প্রকাশিত হচ্ছে অহঙ্কার, সেই চরিত্রটি হল, জমিদার বিজয়বল্লভ।

'জামাইবারিকে'র স্রষ্টা বা প্রতিষ্ঠাতাও হলেন এই বিজয়বল্লভ। মেয়েদের বিবাহ দিয়ে শ্বশুর-বাড়ি না পাঠানোর গৌরবে ইনি নিজেকে মনে করেন গৌরবান্বিত। ইনি পরিষদদের নিয়ে মজলিশ করতে ভালোবাসেন, কিন্তু পরিষদদের থেকে ইনি যে অনেক বড়ো, তা' প্রমাণ করবার জন্য বসেন উঁচু গদিতে।—তবে এই মানুষটিরও পরিবর্তন হয়েছে। পদ্মলোচনের ক্ষুরধার ব্যঙ্গবিদ্রূপ এঁকে নীচে নামিয়ে পরিষদদের সামিল করেছে। আর নাটকের ঘটনাচক্র শেষ পর্যন্ত তাঁর দম্ভ ও অহংকারের কঠিন বর্ম ভেঙ্গে স্বাভাবিক মানুষকে বের করে আনতে হয়েছে সমর্থ। হয়ত এই পরিবর্তন ঘটনা-বিন্যাসের পরিপ্রেক্ষিতে একটু আকস্মিক এবং সামঞ্জস্যহীন, কিন্তু তাই বলে এই মানবিক পরিবর্তনটি উপেক্ষনীয় নয়।

আখ্যানের নায়ক অভয়কুমারও সর্বতোভাবে এই নাটকে সুচিত্রিত নয়। যদিও সে 'জামাইবারিকে' থাকে, তাই বলে তাকে 'জামাইবারিকের জাম্বুবান' বলে কোনোক্রমেই অভিহিত করা যায় না। অন্ততঃ যা আর পাঁচজন জামায়ের বলা যায়, তা' অভয়কুমারের বেলায় প্রযোজ্য নয়। অহঙ্কারী ও গরবিনী কামিনীর সঙ্গে তার যে সংঘাত, তা' হল তাদের ব্যক্তিত্বের সংঘাত। অভয়কুমার সম্পর্কে কামিনীর বক্তব্য হল, 'বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই, কুলোপানা চক্কোর, কথায় কথায় তেঁজ, ঘর জামায়ে তেঁজী হয় কে কোথায় দেখেছে ?'[৬৬]—এই কটুভাষণ যে আত্মমর্যাদার পক্ষে হানিকর, তা' বুঝতে অভয়কুমারের দেরি হয়নি। অভয়কুমারকে তাই পত্নীদ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে, হতে হয়েছে পলাতক। আশ্রয় নিতে হয়েছে বৃন্দাবনে। সেখানে কিছুদিন থাকবার পর এক বৈষ্ণবকন্যার প্রতি তার অনুরাগও সঞ্চারিত হচ্ছিল, কিন্তু ঘটনা-বিন্যাসের চমৎকারিত্বে শেষ পর্যন্ত কামিনীর সঙ্গেই তার মিলন হয়ে গেল। ব্যাপারটি একটু মেলো-ড্রামাটিক, কিন্তু নাটকের সুখ-সমাপ্তির পক্ষে এটুকু সহ্য করা যায়।

'জামাই বারিকে'র জামাইদের সম্পর্কেও দু' চার কথা এখানে বলা দরকার। 'ব্যারাকে' থাকা সৈনিক বা পুলিশদের মত নিয়ন্ত্রিত জীবন যাপনে যে এই জামাইকুল অভ্যস্ত নয়, তা' আগে থেকেই বলে দেওয়া দরকার। নিষ্কর্মা ও ভবঘুরেদের জীবন যেমন হয়ে থাকে, এরাও অনেকটা সেই ছাঁদে ঢালা। 'উনপাঁজুরে বরাখুরে' নদেরচাঁদ ও হেমচাঁদের সঙ্গে এদের চারিত্রিক সাদৃশ্য সবিশেষ লক্ষণীয়। খাওয়া থাকার ভাবনা যখন নেই, অবকাশ যখন সুপ্রচুর, তখন বখামি করতে আপত্তি কোথায় ? কখনো 'মাণিকপিরের' গান গেয়ে,

আবার কখনো বা রামায়ণের অভিনব ভাষ্য রচনা করে, নানা কথকতা করে, এরা যে নিজেকে প্রকাশিত করতে থাকবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। তবে নিজেদের হীন জীবন যাপন সম্পর্কেও এরা সচেতন। 'পিরেরগানে'র একটি যুগল পঙ্‌ক্তিতে এই লজ্জিত জীবনের কথা নিজেরাই দিয়েছে প্রকাশ করে। সেই পঙ্‌ক্তিদুটি এই রকম:

'পাহাড়ের প্রকাণ্ড হাতি, শিকলি বাঁধা পায়,
আর ঘর জামায়ে শ্বশুর বাড়ী মেগের নাতি খায়।'[৬৭]

বলার অপেক্ষা রাখে না, ঘর জামাইদের মর্মবেদনা এই কবিতাটুকুতে কী নির্মমভাবেই না ধরা দিয়েছে—এই নাটকে এই জাতীয় দল বাঁধা চরিত্র আরেকটি রয়েছে, সে হল পারিষদদের চরিত্র। এই পারিষদরা উমেদারদেরই মত। সুতরাং ধনী লোকদের উমেদারদের চরিত্র যে ভাবে অঙ্কিত হয়, এটি সেভাবেই আঁকা। এ ছাড়া এ নাটকে আছে ঘটক চরিত্র-চিত্র এবং একটি চোরের ছবি। স্বল্প কথায় চিত্রিত হলেও এরা সবিশেষ উপভোগ্য।

এ নাটকে রোমান্টিক নায়িকা হিসাবে যে সহজেই চোখে পড়ে, সে হল কামিনী। কেবল ধনীকন্যা বলে নয়, বা রূপসী বলেই নয়, সে স্বভাবধর্মেই গরবিনী। সে যৌবন-মদে মত্তা। সুতরাং 'জামাই বারিকে'র জাম্বুবানকে তার পছন্দ হবে কী করে? মনে মনে তাই সে বিদ্রোহিনী—

একি বাবার বিবেচনা,
দেশে কি বর মেলে না,
স্যাওড়া গাছে কেলে সোনা,
গাঁজায় খবর ষোলো আনা,
তারি হাতে এই ললনা![৬৮]

প্রসাধনে-অনুরাগিনী কামিনীর সুন্দর একটি রোমান্টিক ছবি এঁকেছেন নাট্যকার। কেশে পুষ্পভার, অলকে মুক্তোর মালা, পায়ে অলক্তরাগ, কটিতটে চন্দ্রহার, পয়োধর-চুম্বিত সুবর্ণহার, ওষ্ঠে তাম্বুলরাগ—না, কোন প্রসাধনই বাদ দেন নি এই যৌবনবতী নায়িকা! কিন্তু এ যুবতী আত্মসমর্পণ করবে কার কাছে? —অপরিচ্ছন্ন রুচি চাষাড়ে এক জামাইয়ের কাছে?—নায়িকা কামিনীর এই হল সমস্যা। এই হল তার দ্বন্দ্ব। মোট কথা, রুচি, পরিচ্ছন্নতা ও সংস্কারের দ্বন্দ্ব। —এই দ্বন্দ্বের জন্য সংঘর্ষও হয়ে উঠল অনিবার্য। এক রাতে, প্রবেশের অনুমতি পেয়ে, অভয়কুমার যখন এসে কামিনীর শয়ন ঘরে এসে দাঁড়াল, কামিনী বলে উঠল, 'টেবিলের উপর এক বোতল গোলাপজল আছে, ওটা সব তোমার

গায়ে ঢেলে দাও, আতর ল্যাভেণ্ডার মুখে রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে মাখ, তারপর আমার কাছে এস।'[৬৯]—কামিনীর এই কথায় অভিমান হল অভয়কুমারের। পরে ঘটনা আরো গড়াল। শেষে ছিঁড়েও গেল। বেচারি অভয়কুমার পালিয়ে গেল।—কামিনী এবার নিজের ভুল বুঝতে পারল। উপেক্ষায় যাকে দূরে সরিয়ে দিল, সে যে হৃদয়ের ভেতরে এসে বসে আছে, এটা নতুন করে আবিষ্কার করল কামিনী। তাই স্বামীকে ফিরে পাওয়ার জন্য চলল তার সাধনা। কামিনীর সংলাপ উদ্ধার করেই বলা যায়, সে রাত্রি আমার কাল রাত্রি; স্বামী হারা হলেম—সে রাত্রি আমার শুভরাত্রি; স্বামীর মর্ম জানলেম।'[৭০] —এই স্বামীর মর্ম জানবার পর স্বামীকে ফিরে পেতে সে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনে বৃত হয়েছে। বাইরের আত্মম্ভরিতা ও প্রসাধনের মোটা প্রলেপ ভেদ করে শেষ পর্যন্ত নাট্যকার এই চরিত্রটির অন্তরে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছেন। শিল্পীর সহানুভূতি না থাকলে এ সৃষ্টি সম্ভব হত কী? ঘটনার আড়ম্বরে, সর্বতোভাবে যত্নবান না হলেও লেখকের সহানুভূতি থেকে এ নায়িকা যে বঞ্চিত নয়, তা' সুপরিস্ফুট। দীনবন্ধুর রোমান্টিক নায়িকারা সাধারণতঃ ব্যর্থ হয়ে থাকে। কিছু ত্রুটি থাকলেও, নায়িকা কামিনী যে ব্যর্থ নয়, তা' নিঃসংশয়ে বলা যায়। জামাইবারিকের জাম্বুবান নয়, সে শেষ পর্যন্ত মনোমত স্বামীলাভে সমর্থ হয়েছে।

নারীচরিত্রগুলির ভেতর বর্তমান নাটকে আরো দুটি চরিত্র সর্বাধিক উল্লেখ-যোগ্য, তারা হল বগলা ও বিন্দুবাসিনী। এই সপত্নীযুগলের কলহচিত্র বর্তমান নাটকে সবিশেষ উপভোগ্য। আপাতদৃষ্টিতে দুজনকে এক বলে মনে হলেও এরা ঠিক এক নয়। এবং এ অনৈক্য কেবল বয়সগতও নয়, চরিত্রগত বলাই অধিকতর সঙ্গত। বগলা বর্ষিয়সী, একটু বেশী ঝগড়াটে। বিন্দুবাসিনীর বয়স কম, ঝগড়ায় সে বগলাকে প্রাণপণে অনুকরণ করতে চেষ্টা করে। যদিও স্বামী পদ্মলোচন সমদর্শী হবার জন্য সচেষ্ট, কিন্তু তার পক্ষপাত যে ছোট বৌ বিন্দুর ওপর, তা' মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়ে যায়। বিন্দুর বাবা আবার অর্থবান, সুতরাং বগলার কাছে এটা পরাজয়ের অন্যতম কারণ। এই সপত্নী যুগলের কলহ নাটকে উপভোগ্য হলেও সর্বত্র রুচিসম্মত নয়। একটি চোরকে নিয়ে স্বামীভ্রমে যখন তারা মারামারি করেছে, তখন এই কলহ চূড়ান্ত অবস্থায় গিয়ে পৌঁচেছে। সপত্নী দ্বন্দ্বের এটাই 'ক্লাইম্যাক্স' বলা যায়।—যাই হোক, নাটকে এদেরও চারিত্রিক পরিবর্তনের কথা বিবৃত আছে।

সামাজিক সমস্যার ভিতর দিয়ে মানবিকতাবাদকে উন্মোচিত করা যদি

শিল্পী দীনবন্ধু মিত্রের লক্ষ্য হয়ে থাকে, স্বীকার করতেই হয়, দীনবন্ধু সে লক্ষ্য-ভেদে সমর্থ হয়েছেন। গতানুগতিক পথে নয়, এমন কী সোজাসুজিও নয়, সমস্যাকে বিপরীত দিক থেকে দেখলে কেমন দেখতে লাগে, তা' হাসি-অশ্রুতে মিশিয়ে ইনি দিয়েছেন দেখিয়ে। সমালোচকেরাও এটি দেখিয়ে দিয়ে লিখেছেন, 'বহুবিবাহের যে একটা বিপরীত দিক আছে, অর্থাৎ কুলীন পুরুষদের কপালে দুর্গতি আছে, তাহার একটি হাস্যকর অথচ করুণচিত্র পদ্মলোচন ও তাহার দুই বিবদমান স্ত্রীর আখ্যায়িকায় দেখানো হইয়াছে।'[৭১]

ঘরজামাইদের চিত্রও অনুরূপ হাস্যকর, এবং ততোধিক করুণ। হাসি-অশ্রুর কারবারী দীনবন্ধু এটিকে আশ্চর্য দক্ষতায় প্রায় সব লেখাতে সমর্থ হয়েছেন দেখাতে। বর্তমান নাটক 'জামাইবারিক'ও লেখকের ঐ অসামান্য বৈশিষ্ট্য থেকে বঞ্চিত নয়।

কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ

ছোট্ট একটি নাটিকা হল এই 'কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ'। লিখিত হওয়ার সুদীর্ঘকাল পরে এটি ছাপা হয়ে বের হয়। যে ঘটনা উপলক্ষে লেখা এবং যাঁদের ব্যঙ্গ করে এই নাটিকাটি রচিত, প্রকাশের সময়, সেই ঘটনার কোনো প্রভাব ছিল না, ব্যঙ্গে-বিদ্ধ ব্যক্তিরাও সেদিন মৃত। সুতরাং যে সাময়িক প্রয়োজনে জীবন-শিল্পী দীনবন্ধু এটি লিখেছিলেন, সে প্রয়োজন এ নাটিকাটি মেটাতে পারে নি। তাই এক অর্থে এটিকে ব্যর্থই বলা যায়। তবে এর ভেতর দিয়ে নাট্যকারের যে মনোভাবটি প্রকাশিত হয়েছিল, তা' আলোচনার অপেক্ষা রাখে।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে কুখ্যাত বিচারক ওয়েল্‌স সাহেব-কে নেটিবদের পক্ষ থেকে যে বিদায়-সম্বর্ধনা দেওয়া হয়, বর্তমান নাটিকাটির উপজীব্য হল সেই ঘটনা।[৭২]—

নীল-আন্দোলনের সময় নয়, 'নীলদর্পণের' বিচারকালে ওয়েল্‌স সাহেবের নামের সঙ্গে আমাদের এমন পরিচয় হয়। ওয়েল্‌স সাহেব যে 'নীলদর্পণ'কে 'লাইবেল' ঘোষণা করেন এবং ভারত-বন্ধু রেভারেণ্ড জেম্‌স লঙ্‌কে কারাবাস ও জরিমানার আদেশ করেন, এ তথ্য কারো অবিদিত নয়। যাইহোক, এ ঘটনার জন্য এদেশে এবং সুদূর সাগরপারে তিনি ভীষণ ভাবে আলোচিত হতে থাকেন। অখ্যাতিরও তাঁর চূড়ান্ত হয়। এমন কী তিনি তাঁর স্বদেশেও থাকেন নিন্দিত হতে। 'ডেইলিনিউজ', 'স্পেক্‌টেটর', 'স্যাটার ডে রিভ্যু', 'লণ্ডন রিভ্যু', 'হোম নিউজ' প্রমুখ পত্রিকায় তিনি যে তীব্র ভাবে নিন্দিত ও

সমালোচিত হয়েছিলেন, তার প্রমাণ আজো মহাফেজখানায় সন্ধান করলে পাওয়া যায়। ভারতে কৃষকদের অবস্থা এবং ভারতের বিচার ব্যবস্থার যে সবিশেষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন এরকম একটি মতামত প্রকাশ করেছিল 'লণ্ডন রিভ্যু'। এহ বাহ্য। 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া'র লণ্ডন প্রতিনিধিও এ বিষয়ে লিখেছিলেন একটি সুদীর্ঘ আলোচনা।—মোটকথা, 'নীলদর্পণের' বিচারের পরে ঐ ওয়েল্‌স সাহেবের মত নিন্দিত চরিত্র আমাদের দেশে আর কেউ ছিল না।

ওয়েলস্ সাহেবের আর একটি বদরোগ ছিল। সে রোগটা হল, এদেশের লোকদের অবিরাম গালি দেওয়া। এর ফলে, নেটিব-সমাজও সেদিন উত্তেজিত হল। ফলে এঁকে ধিক্কার জানানোর জন্য শহর কলকাতার বুকে একটি সভাও আহ্বান করা হয়। এই সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট। সভার স্থান ছিল রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের ভবন। সেকালের যাঁরা বিশিষ্ট বাঙালী, তাঁরা সকলেই ছিলেন সে সভায় উপস্থিত। রাজা কালীকৃষ্ণদেব, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল, রমানাথ ঠাকুর থেকে নবাব আসগর আলী খাঁ বাহাদুর বা 'হুতোম'-বেশী কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রমুখ মনীষীকুলের সকলেই ছিলেন উপস্থিত। এই সভার উল্লেখ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'তেও আছে। নকশায় হুতোম লিখেছেন, 'বাঙ্গালীদের যে কথঞ্চিৎ সাহস জন্মেছে, এই সভাতে তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গেল। কেবল সুপারিশওয়ালা বাবুরা ও সহরের সোনার বেণে বড় মানুষেরা এই সভায় আসেন নাই;—সুপারিশওয়ালাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেল। বেণে বাবুরা কোন কাজেই মেশেন না, সুতরাং তাঁদের কথাই নাই! ওয়েলস্ হুজুকের অনেক অংশ শেষ হলো, দশলক্ষ লোক সই করে এক দরখাস্ত কাষ্ঠসাহেবের কাছে প্রদান কল্লেন।'[৭৩]

এখানে উল্লিখিত 'কাষ্ঠ' সাহেব হলেন তদানীন্তন ভারতবর্ষের 'সেক্রেটারী অব স্টেট' স্যার চার্লস্ উড। এই উড সাহেব ছিলেন দক্ষ শাসক, এবং ততোধিক সুবিবেচক মানুষ। বাঙ্‌লাদেশ থেকে প্রেরিত এই অভিযোগের তিনি মর্যাদা দিয়েছিলেন। সুতরাং সাহেব ওয়েল্‌স জব্দ হয়েছিলেন।

এর পরে গড়িয়ে গেল দু'বছর। বাঙালীর স্মৃতিশক্তি ও মর্যাদাবোধ যে কত ক্ষীণ, তার প্রমাণ পাওয়া গেল ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় থেকে। শোনা গেল, বিচারক ওয়েল্‌স সাহেব কর্মাবসানে ফিরে চলেছেন

স্বদেশে। 'বেঙ্গলী' পত্রিকার ২২শে জুলাই তারিখের সম্পাদকীয় নিবন্ধ থেকে জানা গেল, '...the leading members of the native community of Calcutta, with singular unanimity, have resolved to present an address to Sir Mordant Wells on the occasion of his reported retirement from the High Court.'[৭৪]

ইতিহাসের নাটকীয়তা এইখানে। নেটিব কমিউনিটি এই সেদিন স্যার মর্ডানট্ ওয়েল্‌সকে ধিক্কার জানাল, এখন তারাই এগিয়ে আসছে সেই ধিক্কৃত মানুষটিকে সম্বর্ধনা জানাতে?—কালের কী কুটিল গতি! অন্যে পরে কা কথা, সাহেবদের কাগজ 'হরকরা' পর্যন্ত টিপ্পনী কেটে লিখল, 'Only a few months ago there was no Englishman in this country more unpopular than that learned Judge, and had he then purpose to retire from the Bench, the announcement would have been hailed with exultation and delight.'[৭৫]

সেদিন যাঁরা বিবেকবান বাঙালী ছিলেন, তাঁদের সকলের মনেই এই বাঙালী-চরিত্রের অসঙ্গতি বড়ো পীড়া দিয়েছিল। নাট্যকার দীনবন্ধুও যে এতে পীড়িত হবেন, তাতে আর আশ্চর্যের কী?—তবে দীনবন্ধুর বিস্ময় আরো গভীর, আরো জ্বালাময়। 'জ্বালাময়' এই কারণে যে তিনি চোখের সামনে এ ব্যাপারে যাদের উদ্যোগী দেখছিলেন, তাঁদের ভেতর রাধাকান্তদেব ও কালীপ্রসন্নসিংহের মত একদা ওয়েল্‌স-বিদ্বেষীরাও ছিলেন বলে। যাই হোক, এই ব্যাপারটিকে প্রতিবাদ করা দরকার বলে তাঁর মনে হল। আর যেহেতু এ যুদ্ধে ভীমের গদা চলল না, তাই অর্জ্জুনের তীক্ষ্ণ শরক্ষেপের প্রয়োজনীয়তার কথা অনুভূত হল তাঁর মনে। তিনি তুলে নিলেন কলম, লিখিত হল তাঁর এই ক্ষুদ্র নাটিকাটি, 'কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ।'

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে 'হার ম্যাজেস্টিজ হাইকোর্টে'র গ্র্যাণ্ড জুরি হলে নেটিব কমিউনিটির পক্ষ থেকে স্যার মরডানট্ ওয়েল্‌সের সম্বর্ধনায় বিছিয়ে দেওয়া হল লাল কার্পেট। একটি সুন্দর রৌপ্যাধারে মানপত্রটি সাজিয়ে তুলে দেওয়া হল সাহেবের করকমলে। মানপত্রটিতে ছিল তিন হাজার জনের স্বাক্ষর। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েসনে'র

সভাপতি রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর পাঠ করলেন বিদায়-অভিনন্দন পত্রটি। মরডানট্‌ ওয়েস্‌স্‌ সাহেবও সুন্দর একটি ভাষণে সকলকে করলেন সন্তুষ্ট। পরিশেষে একটি ছবিও তোলা হয়েছিল।[৭৬]—নেটিব কমিউনিটির যে বিশিষ্ট ব্যক্তিরা সেদিন উপস্থিত ছিলেন. তাঁদের অনেকেরই নাম পাওয়া যাচ্ছে। বাবু হরচন্দ্র ঘোষ উপস্থিত দেশীয় ব্যক্তিদের ভেতর ছিলেন প্রধান। এ ছাড়া আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা হলেন, বাবু হীরানাথ শীল, প্রথম দেশীয় ভাষাবিদ্‌ শ্যামাচরণ সরকার, বিখ্যাত উকিল রমানাথ লাহা, বাবু গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষানুরাগী হরেকৃষ্ণ আঢ্য প্রমুখ ব্যক্তি। রাজা রাধাকান্ত দেব উপস্থিত থাকতে পারেননি অসুস্থতার জন্য। কালীপ্রসন্ন সিংহ-অভিনন্দন পত্রে সই করেছিলেন বটে, কিন্তু কেন কে জানে, অনুষ্ঠানে যোগদান করেন নি।

নাটিকা 'কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ' দুটি দৃশ্যে বিভক্ত। প্রথম দৃশ্যে পাই 'কলিকাতার বোকা রাজার পোড়ো বাড়ী।' এখানে যাদের সাক্ষাৎ পাই, তারা হল ভোঁদা, গোমো, গ্যাটাগোটা, স্বার্থকদাস, সাতহাটের কাণাকড়ি এবং হুতোম প্যাচা। দ্বিতীয় দৃশ্য 'বিচার মন্দির'। অর্থাৎ 'হার ম্যাজেস্টিজ হাইকোর্ট। এখানে বিচারপতি বলদ পঞ্চাননের কাছে রয়েছে ভোঁদা, গোমো, ও গ্যাঁটাগোঁটা। স্বার্থকদাস ও হুতোম অনুপস্থিত।

এখানে চিত্রিত দু'একটি চরিত্রকে চিনে নিতে বোধহয় আমাদের অসুবিধা হবে না।

বিচারপতি বলদপঞ্চানন যে বিচারক ওয়েল্‌স্‌, এ অনুমানে বোধ করি সংশয়ের অবকাশ কম। 'হুতোম প্যাঁচা' সম্ভবতঃ কালীপ্রসন্ন সিংহ। পত্রিকা-সম্পাদক 'গ্যাটা গোঁটা' সম্ভবতঃ 'বেঙ্গলী' পত্রিকার প্রখ্যাত সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ। বোকারাজার পোড়ো বাড়িতে অভিনন্দনে উৎসাহী যে ভোঁদাকে পাই, এ ভোঁদা বোধ করি আর কেউ নন, 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েসনে'র সহ-সভাপতি রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর। স্বার্থক দাস, গোমো, সাতহাটের কানাকড়ি প্রমুখ চরিত্রগুলিকে সরাসরি চেনা-না গেলেও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে এদের অন্তরালে তখনকার দিনের বিখ্যাত ব্যক্তিরাই আছেন লুকিয়ে।

ঘটনা ও চরিত্র কী পরিমাণে সমকালীন, তা' দু একটি সংলাপ আলোচনা করলেই বোঝা যায়। যেমন হুতোমের সংলাপ,—'হুতোম প্যাঁচপোঁচ বোঝে না, সহি কত্তে বল্লেন কল্লেন, এতে ভাল হলো কি মন্দ

হলো, তা' যদি আমার বুঝবের ক্ষমতা থাকতো, তা' হলে আমি পূর্ব্বে যা কিছু করেছি, তা জেনে আপনারা কখনো আমার স্বাক্ষর আনতে যেতেন না।'[৭৭] —একটি সোজা মানুষের মুখ দিয়ে শোনা গেল সরল একটি স্বীকারোক্তি। যে একদিন ওয়েল্সকে ধিক্কার জানিয়েছে, সে কী করে আবার দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাবে? তাই অভিনন্দন সভায় উপস্থিত থাকা তার পক্ষে হয়ে ওঠে নি। এ বিষয়ে তার সাফ জবাব হলো,—'আমি যেতে পারবো না, বলদ পঞ্চাননের মুখ দেখলে আমার সাবেক কথা সব মনে পড়বে, আর অম্নি বলে ফেলবো, আমার স্বাক্ষর হাতের, মনের নয়।'[৭৮]

বিচারপতি ওয়েলস্ চরিত্রটিও সুচিত্রিত। ভোঁদার স্বগতোক্তিতে চরিত্রটি সুন্দরভাবে পরিস্ফুট।—ভোঁদা যা বলেছে, তা' এইরকম: '...আপনি আমাদের চোর বলেছেন, ডাকাত বলেছেন, জাল সাজা বলেছেন, মিথ্যাবাদী বলেছেন, আপনি কালো চামড়ার এক সাজা দিয়েছেন, সাদা চামড়ার আর এক সাজা দিয়েছেন, আপনি আমাদিগকে নীচ জাতি বলিয়া গণ্য করেছেন, আপনি পথ ভুলেও একদিন কোন পাঠশালা দেখিতে যান নাই, কিন্তু এত করেও আপনি মধুর বচনে সকলের প্রিয়পাত্র হয়েছেন।[৭৯]—যাই হোক, এই বিচারককে 'বাঙ্গালীর নামে অগ্নিশর্মা বলদ পঞ্চানন বিচারপতি / শ্রী উরোতেষু'[৮০]বলে জানান হল বিদায়-অভিনন্দন। আর বিচারপতি মশাইও অভিনন্দনের জবাবে ছড়া কাটলেন,

> উন পাজুরে লক্ষ্মীছাড়া বরা খুরের দল।
> যাবার বেলা খাবার মাচ মানস সফল ॥
> গাল দিলেম যশ পেলেম মন্দ মজা নয়।
> কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ পেলেম পরিচয় ॥[৮১]

দীনবন্ধুর এই নাটিকাটি খুবই ছোট। কিন্তু তার আলোচনা তার আকারের থেকে হয়ে গেল অনেক বড়ো। অবশ্য এর কারণ আর কিছু না, নাটিকাটি ঠিক কোন্ পটভূমিতে লিখিত, এ নিয়ে নাট্যকারের পুত্রের একটি ভুল ব্যাখ্যা আছে। দুঃখের ব্যাপার এই, সেই ভুল ব্যাখ্যাটি আজো চলে আসছে, একে নিরস্ত করবার জন্যই এত কথা বলবার দরকার হল।

তবে একবারে উপসংহারে নাটিকাটির সম্পর্কে নাট্যকারের মনোভাবটি একটু উল্লেখিত থাকা প্রয়োজন। নাটিকাটি লেখবার পর তিনি অন্ততঃ দশ বছর বেঁচেছিলেন, তাই একটা জিজ্ঞাসা থেকে যায়, ঐ দশ বছরের ভেতরেও তিনি এটিকে ছেপে প্রকাশিত হবার সুযোগ দিলেন না কেন?—যে-নাট্যকার

নীলকরদের মত পশুশক্তিকে পরোয়া করেন নি, তিনি কী শেষ পর্যন্ত বন্ধু বিচ্ছেদের ভয়ে এটিকে ছাপ্‌তে দেন নি?—সমাজ-সমালোচক ও যুগ-প্রকাশক দীনবন্ধুর পক্ষে এ কৈফিয়ৎ যে খুব যথেষ্ট নয়, তা' যে-কোনো সরলমতি পাঠকই উপলব্ধি করবেন বলে আশা করা যায়।

হাস্যরসের ইন্দ্রজাল

বর্তমান প্রসঙ্গের সূচনায় আমরা যে হাস্যরসের কথা বলেছি, এবার শেষে তার সম্যক পরিচয় নেবার একটু চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। আমাদের প্রতিদিনকার পরিচিত জগৎকে নিয়ে দীনবন্ধু যে সাহিত্যের একটি আশ্চর্যজগৎ নির্মাণ করেছেন, তা' আমরা দেখেছি। সমকাল তাঁর কাছে কী ভাবে ধরা দিয়েছে, এবং কোন চেহারায় তারা পরিস্ফুট, 'নবজাগরণ ও মানবিকতা-বাদের' আলোচনায় তা' বিস্তৃতভাবে দেখানো হয়েছে। সমাজ-জিজ্ঞাসার খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলিও যে দীনবন্ধুর চোখ এড়িয়ে যায় নি, একথা নতুন করে বলবার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও একটি দিক অনুদ্‌ঘাটিত। হাস্যরসের ঐন্দ্রজালিক তাঁর রসিক মন নিয়ে এই পরিচিত বাস্তব জগৎকে কী ভাবে দেখেছেন, এবার সেদিকে একটু খোঁজ খবর নেওয়া যেতে পারে। এই প্রতিদিনকার পরিচিত মানুষরাই যখন কোনো রসিক শিল্পীর হাস্যরসের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হন, তখন তাদের আরেক মূর্তি ওখানে দেখা যায়। সূচনায় একজন সুধী সমালোচকের একটি বিখ্যাত উক্তিকে মনে রেখে আমরা এ ব্যাপারে তল্লাশি চালাতে পারি। সমালোচকের উক্তিটি হল, 'For humour, frown upon it as will, is nothing less than a fresh window of the soul. Through that window we see, not in deed a different world but the familiar world of our experience, distorted as if by the magic of trickey sprite '[৮২]—

এখানে, উদ্ধৃত 'ম্যাজিক কথাটি অবশ্য লক্ষনীয়। ঐন্দ্রজালিক তাঁর জাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় এই 'ফ্যামিলিয়ার ওয়ার্লড'কে কেমন করে বদলে দেন, তা' দীনবন্ধুর সাহিত্য-পাঠকদের কাছে কিন্তু অপরিচিত নয়। এখন এই জাদুর ছোঁয়া কী রকম, তার একটু পরিচয় নেওয়া যাক।

স্থূল অর্থে যাকে 'হাস্যরস বলা হয়ে থাকে, এই হাস্যরসকে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নানা ভাগে ভাগ করা যায়, একথা বোধকরি কারো অজানা নয়। এই হাস্যরস কখনো রঙ্গ-ব্যঙ্গের রূপ নিয়ে দেখা দেয় আমাদের কাছে, কখনো তা' আবার ধরা দেয় ঠাট্টা-তামাসার ভেতর দিয়ে। কখনো কখনো হাস্যরস উৎসারিত হয়

পরিহাস-বিদ্রূপের ভেতর দিয়েও। আর হাস্যরসের অবতারণায় ভাঁড়ামি করা, আবোল-তাবোল বকা ইত্যাদিতো আমরা দেখে থাকি প্রায়শই। সুতরাং স্থূল অর্থে হাস্যরস যাকে আমরা বলছি, তার প্রকাশ দেখি আমরা নানা ধারায়। ইংরেজিতেও ঠিক এই অবস্থা। ওখানেও 'হিউমার' কথাটি ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হলেও, নানা আকারে সে ধরা দিয়ে থাকে। কখনো সে 'উইট', কখনো সে 'কমিক'। এ ছাড়া 'ফান্', 'স্যাটায়ার', 'ল্যামপুন', 'ননসেন্সিক্যাল' ইত্যাদি শব্দগুলিকে আমরাতো হামেশাই ব্যবহার করে থাকি।—আমাদের আলোচ্য নাট্যকার দীনবন্ধু তাঁর হাস্যরস সৃষ্টিতে এই রীতিগুলিকে যে কাজে লাগাবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী?

জলধরের চলা-ফেরা, হাবভাব, সবকিছুর মধ্য দিয়ে যে কৌতুকরস উচ্ছলিত, তার মূলে অনেক খানি আছে এই 'ভাঁড়ামি'। এই 'ভাঁড়ামি' থেকে 'কমলে কামিনী' নাটকের বক্কেশ্বরও মুক্ত নয়। ওদিকে 'সধবার একদশী' নাটকে ভোলামাতাল ও রামমাণিক্যকে নিয়ে যে কৌতুকের হাট বসানো হয়েছে, এ হাটে প্রধান বিক্রয়যোগ্য পণ্য হল ভোলা ও রামমাণিক্যের 'গ্রাম্যতা'। 'কেনারাম' ডেপুটিকেও এদের সঙ্গে ভিড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু ভুললে চলবে না যে তার সমস্যা ভোলা-রামমাণিক্যের সমস্যা নয়। তার পদমর্যাদার অহঙ্কার এবং ঐ একই সঙ্গে তার নিজের সম্পর্কে 'সুপিরিয়রিটি কম্‌প্লেকস্' বিশেষভাবে কাজ করেছে। 'লীলাবতী' নাটকে 'উনপাজুরে বরা খুরে' হেমচাঁদ-নদেরচাঁদের যে কৌতুক চিত্র আঁকা হয়েছে, তার উৎসেও ঐ 'গ্রাম্যতা'।—মোটকথা, এইসব অসঙ্গতিগুলিকেই দীনবন্ধু কাজে লাগিয়েছেন।

অবশ্য দেহগত বিকৃতি, মুখোশ-পরিয়ে নাচানো, সঙ্ সাজানো ইত্যাদি আরো মোটা রসিকতার ছবি দীনবন্ধু যে আঁকেন নি, তা' নয়। বরং এদের নিয়ে মাঝে মাঝে তিনি বড়োই বাড়াবাড়ি করেছেন। 'কমলে কামিনী' নাটকে এক অদন্তী বৃদ্ধার চরিত্র আছে, সে বৃদ্ধা দন্তহীনতার জন্য 'ন' বলতে পারে না, বলে 'ল'। এবং সে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে কবিতাও আবৃত্তি করে। ফলে সে কবিতাও বিকৃত উচ্চারণে হাস্যরস সৃষ্টিতে সহযোগিতা করে। এই কবিতা যে কেমন, তার একটি নমুনা দেওয়া যাক। দন্ত্য 'ন' হীন একটি 'চৌপদী' এই রকম: 'বদল্‌ত অশাল্‌ত / বিলা প্লাল্ কাল্‌ত/একাল্‌ত প্লালাল্‌ত / লিতাল্‌ত মরি।'[৮২ক]—না, দন্ত্য-'ন' কোথাও নেই, কিন্তু 'ল'য়ের আগম কী ভয়ঙ্কর হতে পারে, এ তার নমুনা।—জলধরকে হোঁদল সাজিয়ে

নাচানোর ভেতর দিয়ে বা নদের চাঁদকে সিঁদুর মাখিয়ে সঙ্‌ সাজানোর মূলেও এই স্থূল দিকটি অধিকতর উন্মোচিত।

অবশ্য সূক্ষ্মরসিকতাও আছে। বাগ্‌-বৈভবের 'রথচাইলড্‌' নিমচাঁদের 'উইট' ইত্যাদির সূক্ষ্ম প্রয়োগের কথা না হয় বাদ দিচ্ছি। ঘটনাগত চমৎকারিত্ব বা নদেরচাঁদের বক্তৃতার কথা এখানে কী উল্লেখ করা যায় না? মালতী ভ্রমে জগদম্বার কাছে প্রণয় নিবেদন করতে গিয়ে বেচারি জলধর যে বিপদে পড়েছিল, সেই ঘটনা-চমৎকারিত্ব এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। জলধর যেমন এই ঘটনায় 'কেউটে সাপের ন্যাজ মারিয়ে ধরিচি'[৮৩] বলে চীৎকার করে উঠেছিল, 'কমলে কামিনী'র বকেশ্বরের অবস্থাও হয়েছিল প্রায় অনুরূপ। চোখ-বাঁধা অবস্থায় সে নিজের শিবিরকে মনে করেছিল শত্রুশিবির। ফলে, বেচারির পিঠে 'কাকুণ্ডি' নামক কিলবৃষ্টি যা হয়েছিল, তাতে বেচারি একবারে বিপন্ন। বাসর ঘরে বিবাহ-পাগল রাজীবও লাঞ্ছিত হয়েছিল ঐ ভ্রমবশত। এই ভ্রমজণিত মত্ততা 'সধবার একাদশী'তে প্রচুর আছে। সুতরাং পরিসর বাড়িয়ে লাভ কী?

এই ভাবে বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে এগোলে দীনবন্ধুর সাহিত্যে এ জাতীয় নানাধরণের হাস্যরসের আবিষ্কার খুব কঠিন নয়। কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য তা' নয়। আমাদের জিজ্ঞাসা হল, এই হাস্যরসের ভেতর দিয়ে জীবনের কোনো গভীরতর তাৎপর্য তিনি খুঁজে পেয়েছেন কীনা! একথা আমাদের অবিদিত নয় যে, 'Mark Twains Huckleberry Finn is a greater work than Kant's Critique of Pure reason, and Charles Dickens's creation of Mr. Pickwick did more for the elevation of human race—say it in all seriousness—than Cardinal'Newman's Lead, kindly Light etc. Newman only cried out for light in the gloom of sad world, Dickens gave it.'[৮৪]

বিষন্ন পৃথিবীর অন্ধকারে বসে 'নিউম্যান' আলোর জন্য কেঁদেছিলেন, চীৎকার করেছিলেন, তিনি তা' পান নি। কিন্তু 'পিক্‌উইকে'র রচয়িতা চার্ল্‌স্‌ ডিকেন্‌স, তা' দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। হাস্যরসিকের সঙ্গে দার্শনিকের হল এই তফাৎ। আলোচ্য নাট্যকার দীনবন্ধুর বেলাতেও যে তা' ঘটেছে, সেকথা বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ করা হয়েছে। 'সুরাপান নিবারণী সভার' প্রতিষ্ঠাতা প্যারীচরণ 'সধবার একাদশী' পড়ে কী বলেছিলেন তা' আমরা দেখেছি। আর দীনবন্ধুর এই ব্যঙ্গের লাঠির আঘাতে বহু জলধর ও

রাজীবকে যে তাঁদের জলধর ও রাজীব জীবন পরিত্যাগ করতে হয়েছে তার স্বীকারোক্তি অন্য কেউ নন, তা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং।

এসব দেখে শেষ পর্যন্ত আমাদের সেই তথ্যে গিয়ে পৌছতে হতে পারে যে তিনি কেবল বাহ্যিক অসঙ্গতি দেখেই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি এই অসঙ্গতি আবিষ্কার করেছিলেন আমাদের জীবনের গভীরে। তাঁর হাস্যরসের উপকরণ ছিল উনিশ শতকের সমকালীন সমাজ, কিন্তু তিনি শিল্পদৃষ্টিতে অতিক্রম করেছিলেন এই সমকালীন-সমাজকে। সমকালীন মানুষকেও। সর্বকালের মানুষের ভেতর যে গভীর অসঙ্গতি রয়েছে, তিনি তা' আবিষ্কারে সমর্থ হয়েছিলেন। সমালোচকের ভাষায় বলা যায়, তুচ্ছ ভাঁড়ামি-তোতলামি বা রঙ্গব্যঙ্গ নয়, এ অসঙ্গতি আরো গভীর সঞ্চারী—'It is no longer dependent upon the mere trick and quibble of words or the odd and meaningless incongruities in things that strike us as 'funny.' Its bases lie in the deeper contrasts offered by life it self : the strange incongruity between our aspiration and our achievement, the eager and fretful anxieties of to-day that fade into nothingness of to-morrow, the burning pain and sharp sorrow that are softened in the gentle retrospect of time[৮৫] ....ইত্যাদি।—এ উক্তির পাশাপাশি দীনবন্ধু সম্পর্কে মোহিতলালের বিশ্লেষণটি পড়ে দেখবার মত। মোহিতলাল তাঁর এই লেখায় ঠিক এই ভাবেই হাস্যরসের যথার্থ দার্শনিকতা ব্যাখ্যা করে লিখেছেন, 'ইহা সাধারণ ভাঁড়ামী বা রঙ্গরস নহে; ইহা বৃহত্তর অনুভূতি-কল্পনার হাস্যরস। এক হিসাবে যাবতীয় রসের মধ্যে এই রস শ্রেষ্ঠ। দীনবন্ধুর রচনায় যে অতিরিক্ত কৌতুক-হাস্যের প্রাচুর্য আমাদিগকে সহজেই আকৃষ্ট করে, তাহাই যদি তাঁহার কৃতিত্ব হইত, তাহা হইলে তাঁহার প্রহসনগুলির মধ্যে উৎকৃষ্ট নাটকীয় গুণের সমাবেশ আমরা দেখিতে পাইতাম না। সেই প্রবল কৌতুক-হাস্য-প্রিয়তার মধ্যেও দীনবন্ধুর নাটকীয় কল্পনা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই। উৎকৃষ্ট হাস্যরস উৎকৃষ্ট কাব্য-কল্পনার মতই দুর্লভ, কারণ উভয়ের মধ্যেই জগৎ ও জীবনকে গভীর ভাবে দেখিবার শক্তি আছে,·· এই ভাব-দৃষ্টির দ্বারা মানুষকে দেখিতে পারিলে তাহার সর্ব অভিমান নিরর্থক বলিয়াই যেমন হাস্যকর হইয়া ওঠে, তেমনই সেই হাসির অন্তরালে একটি সুগভীর সহানুভূতি প্রচ্ছন্ন থাকে—ঐ সহানুভূতি আছে বলিয়া পরিহাসও রস হইয়া ওঠে, হাস্যরস কবিকল্পনায় অভিষিক্ত হয়।'[৮৬]

বলার অপেক্ষা রাখে না, দীনবন্ধুর বেলায় তা' ঘটেছে। কেবল কবিকল্পনার অভিষেক নয়, একটি আশ্চর্য দার্শনিকতাকেও তিনি তাঁর এই সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। লিকক কথিত 'the mingled heritage of tears and laughter'[৮৭] যে আমাদের জীবনের চূড়ান্ত কথা, দীনবন্ধু তা' সমকালের উপকরণ দিয়ে আমাদের 'দয়েছেন দেখিয়ে। এর ফলে সমকালকে তিনি করেছেন অতিক্রম। তিনি চিরকালের রসলোকে স্থান করে নিয়েছেন। তাঁর চরিত্রগুলিও তাই হয়ে গেছে চিরায়ত। এ ব্যাপারে সমালোচকরাও একমত এবং তাঁরা লিখতে বাধ্য হয়েছেন, 'নিমচাঁদ শুধুমাত্র অধঃপতিত মাতাল নহে, গোপীনাথ শুধুমাত্র নীচ, পদলেহী দেওয়ান নহে, রাজীবলোচন অতিক্রান্ত সমাজের একজন বিয়েপাগল বুড়ো মাত্র নহে, তাহারা চিরন্তন মানব সমাজের নিত্যকার রূপ। তাহারা উনবিংশ শতাব্দীতে ছিল, আজ আছে, এবং চিরকাল থাকিবে।'[৮৮]

হাস্যরসের সমালোচকের এই বক্তব্যের ওপর আশাকরি, আমাদের যে কোনো মন্তব্যই বাহুল্য বলে মনে হবে। সুতরাং দীনবন্ধুর হাস্যরসের সমালোচনা এখানেই শেষ করা যেতে পারে।

॥ সূত্রনির্দেশ ॥

১। বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা (১৩৭৬ সং)—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, পৃ. ৩০০

২। এই উক্তিটি ইতিপূর্বেও উদ্ধৃত হয়েছে। একথাটির জন্য 'বঙ্কিমরচনা সংগ্রহ', প্রবন্ধখণ্ড, শেষ অংশ, (১৯৭৩) পৃ ১১২৭ দ্রষ্টব্য।

৩। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়' শীর্ষক প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল সম্পাদিত 'সমালোচনা সাহিত্য, (১৩৫৭) গ্রন্থের পৃ. ২৯০-৯১ দ্রষ্টব্য।

৪। বঙ্কিমরচনাসংগ্রহ, (১৯৭৩), প্রবন্ধখণ্ড, শেষ অংশ, পৃ. ১১৩০

৫। গ্রন্থখানি সেকালে একটি অত্যুত্তম গ্রন্থ বলে সমাদৃত হয়েছিল। সচেষ্ট হলে এ জাতীয় আরো স্বীকৃতি সংগ্রহ করে, ঐ গ্রন্থের উৎকৃষ্টতা প্রতিষ্টিত করা যায়। রাজেন্দ্রলালের এই বক্তব্যটি ধৃত রয়েছে 'রহস্যসন্দর্ভের' (৩৩ খণ্ড), ১৪১-৪২ পৃষ্ঠায়।

৬। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে Calcutta Review পত্রিকায় রেভাঃ লালবিহারী দের যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়, এটি তার অংশ বিশেষ।

৭। বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, ১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।

৯। Land Mark in French Literature, by Lyton Stratchy, P. 38

১০। পত্রিকাটির নাম 'সমাচারদর্পণ'। সেকালে বিরাম চিহ্নের ব্যবহার ছিল না। এখানে বিরামচিহ্ন দিয়ে নেওয়া হল।

১১। বিয়েপাগলা বুড়ো, প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

১২। ঐ, দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

১৩। ঐ, প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

১৪। 'সমাচারদর্পণ' পত্রিকা, বিরামচিহ্নের ব্যবহার আমাদের দেওয়া।

১৫। বৃদ্ধের বিবাহের ব্যাপার বই পড়ে নিশ্চয়ই জানতে হয় না। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁর 'বাংলা নাটক' বইটিতে যা লিখেছেন, প্রসঙ্গত উদ্ধৃত করা গেল। ঘোষ মশাই লিখেছেন, 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' সকল সমাজেই দেখা যায়—এ দেশে যেমন, বিদেশে তেমনই। লর্ড রেডিং এদেশে বড় লাটের কায শেষ করিয়া স্বদেশে যাইয়া পত্নী বিয়োগ হইলে, আপনার মহিলা সেক্রেটারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। বিশ্ববিশ্রুতকীর্তি লয়েড জর্জ বৃদ্ধ বয়সে বিপত্নীক হইয়া ঐরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। এদেশে শিক্ষিত সমাজেও এরূপ ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়। নামোল্লেখে বিরত রহিলাম। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া লিখিত, তাঁহাকে আমরা দেখিয়াছি।'

১৬-১৭। বিয়ে পাগলা বুড়ো, প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

১৮। ঐ, দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

১৯। দীনবন্ধু মিত্র, (১৩৫৮), ডঃ সুশীলকুমার দে. পৃ. ৬৫

২০। বিয়ে পাগলা বুড়ো, প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

২১। ঐ, দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

২২। ঐ, প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

২৩। প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্কে রসুই ঘরের রোয়াকে বসে দিদি রামমণির কাছে এই স্বীকারোক্তি করেছে গৌরমণি, এই দৃশ্যে এদের সংলাপ পড়লে বোঝা যায় যে দীনবন্ধু বিধবা বিবাহের পক্ষে ছিলেন।

২৪। বিয়েপাগলা বুড়ো, প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

২৫। আধুনিক বাংলা সাহিত্য, (১৩৬৫), মোহিতলাল মজুমদার, পৃ. ১২৩

২৬-২৭। ললিতচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'দীনবন্ধুমিত্রের গ্রন্থাবলী'র বসুমতী সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২৮। ঐ, ভূমিকা।

২৯। শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (এম. সি. সরকার সং), ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪২২

৩০। 'সধবার একাদশী', প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

৩১। ঐ, দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

৩২। এক অর্থে 'সধবার একাদশী'ও 'ভ্যানিটি ফেয়ার'। এখানকার সকলকেই দেখবার মতন।

৩৩। The Theory of Drama, by A. Nicoll, P. 224.

৩৪। ১২৭৯ সনে 'এডুকেশান গেজেট' ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য লিখিত 'নাটক ও নাটকের অভিনয়' শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

৩৫। বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ, (১৯৭৩), প্রবন্ধ খণ্ড, শেষ অংশ, পৃ. ১১২৬।

৩৬। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের 'পিতাপুত্র' শীর্ষক রচনা দ্রষ্টব্য, পৃ. ৫৩০।

৩৭-৩৮। বান্ধব, ১২৮৩।

৩৯। সধবার একাদশী, তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

৪০। ঐ, দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৪১। সধবার একাদশী, (সা.প.সং), ১৩৫৩, পৃ. ৪৭।

৪২। সধবার একাদশী, তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৪৩। ঐ, তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

৪৪। ললিতচন্দ্র মিত্র সম্পাদিত বসুমতী সংস্করণের 'দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৪৫। বাংলা সাহিত্যের নরনারী, (১৩৬০), প্রমথনাথ বিশী, পৃ. ৩৭

৪৬। সধবার একাদশী, দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৪৭-৪৮। ঐ, দ্বিতীয় অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

৪৯-৫১। ঐ, প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৫২। The Civilization of the Renaissance in Italy, P. 242.

৫৩-৫৪। সধবার একাদশী, তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৫৬। তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্কে রামবাবুর কাছে মার খেয়ে নিমচাঁদ বলেছে, 'ভাবুন, আপনার উপযুক্ত ভাইপো সভ্যতার অনুগামী হয়ে তাঁর হৃদয়প্রিয় বন্ধুর সহিত আলাপ করিয়ে দিচ্ছিলেন—Female emancipation is not a bad thing among gentlemen'—কথাটি যেভাবে বলা হয়েছে, এ অবস্থার কথাকে অবশ্য গম্ভীরভাবে নেওয়া যায় না। তবু এই উল্লেখটুকু লক্ষণীয়।

৫৭। সূত্রটি আগেই নির্দেশ করা হয়েছে।

৫৮। সধবার একাদশী, প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৫৯। ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত সম্পাদিত সধবার একাদশী' (সা. প. সং ১৩৫৩), ভূমিকা, পৃ. ।৶.

৬০-৬১। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্ররচনাবলী, (শতবার্ষিক সং), ১০ম খণ্ড, পৃ, ৫৪-৫৫।

৬২। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত প্রবন্ধ 'বঙ্কিমচন্দ্র' দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্ররচনাবলী, (শতবার্ষিক সং), ১৩ খণ্ড, পৃ. ৮৯৬। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য হল, 'নির্মল শুভ্রসংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথমে বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন। তৎপূর্বে বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসকে অন্যরসের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না।'

৬৩। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'কলিকাতা রিবিউতে সুরধুনী কাব্যের যে সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা অন্যায় বোধহয় না। দীনবন্ধু যে ইহাতে রাগ করিয়াছিলেন, ইহাই অন্যায়। 'ভোঁতারাম ভাট' দীনবন্ধুর চরিত্রের ক্ষুদ্র কলঙ্ক। বঙ্কিমরচনাসংগ্রহ, (১৯৭৩), প্রবন্ধখণ্ড শেষ অংশ, পৃ. ১১২৮। প্রসঙ্গত উল্লেখ থাকা ভালো এই 'ভোঁতারাম ভাট' হলেন Calcutta Review-এর সমালোচক রেভারেণ্ড লালবিহারী দে।

৬৪। জামাই বারিক, দ্বিতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

৬৫। ঐ, চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৬৬। ঐ, প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৬৭। তৃতীয় অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

৬৮-৬৯। ঐ, তৃতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

৭০। ঐ, চতুর্থ অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

৭১। দীনবন্ধু মিত্র, (১৩৫৮),—ডা: সুশীলকুমার দে, পৃ. ৬৩।

৭২। দীনবন্ধুর পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্রের বক্তব্য হল অন্য। এঁর ধারণা, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলকাতার বণিক সম্প্রদায়ভুক্ত কিছু লোক ওয়েল্‌স সাহেবকে এক সম্বর্ধনা দেন বর্তমান নাটিকাটি সেই পটভূমিতে লেখা।

৭৩। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা,' (সা. প. সং, ১৩৫৫), পৃ. ৬৩ ৬৪।

৭৪। The Bengalee, P, 227

৭৫। Ibid, P. 230

৭৬। এই বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'The Bengal Hurkaru and India Gazetteer,' Sept, 7, 1863, দ্রষ্টব্য।

৭৭। বিবিধ : গদ্য-পদ্য, ১৩৫৯, (স. প. সং) দীনবন্ধু মিত্র, পৃ. ৪২

৭৮। ঐ, পৃ. ৪২

৭৯। ঐ, পৃ. ৪৩-৪৪

৮০-৮১। ঐ, পৃ ৪৪

৮২। Know Ronald, 'On Humour and Satire', 'New And Old Essays. (1939), P. 206.

৮২ ক। 'কমলে কামিনী' (সা. প. সং,) পৃ. ১০৬-০৭।

৮৩। 'নবীন তপস্বিনী,' (সা. প. সং, ১৩৫৯), পৃ. ৫৩

৮৪। Humour as I See it : 'Laugh with Leacock', (June, 1964), P. 310 11.

৮৫। Ibid, P. 311.

৮৬। 'আধুনিক বাংলা সাহিত্য', (১৩৬৫), পৃ. ১২১-২২

৮৭। 'Humour as I See it', P. 311.

৮৮। বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা, (অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭), ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, পৃ. ১১০

ছয়

।। কখনো নিন্দিত, কখনো অভিনন্দিত ।।

'সত্য যে লজ্জার ঘাটে পা ধোয় না, একথা আমাদের ইংরেজ গুরুরা আমাদের শেখান নি। হয়ত একথা শেখাবার তাকতও তাঁদের ছিল না। কেননা ইংরেজের কাছে যখন আমরা তালিম নিতে শুরু করলাম, তখন আর ইংরেজ এলিজাবেথান-জেকোবিয়ান যুগের ইংরেজ নেই, তার মতি পরিবর্তন ঘটেছে। রেনেসাঁসের সত্যান্বেষণ ক্ষীণ হতে হতে রূপান্তরিত হয়েছে রোমান্টিক সত্য বিমুখতায়; তার বীর্যান্বিত ভোগবুদ্ধি শীর্ণ হয়ে শেষ পর্যন্ত ভিক্টোরিয় বিবেকের মেদাতিশয্যের নীচে চাপা পড়েছে। ফলতঃ ডানের কবিতা, হব্‌স-এর দর্শন, সুইফ্‌টের ব্যঙ্গ কিংবা স্টার্ণের উপন্যাস বাঙালী শিক্ষিত মনের উজ্জীবনে বিশেষ কোনো ছাপ ফেলেনি।...আমরা জীবনের চাইতে কল্পনাকে বড় বলে ভাবতে শিখেছি; ভিক্টোরিয় উচিত্যবোধে দীক্ষা নিয়ে আমাদের ধারণা হয়েছে সত্যের চাইতে শ্লীলতা বেশী মূল্যবান।'[১]

ও'দের এই কথাগুলি ক্ষোভের সঙ্গে নিবেদিত হলেও, এরা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, তা' বাঙ্‌লা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে বুঝিয়ে বলবার অপেক্ষা রাখে না। রেনেসাঁসের সত্যসন্ধানী মন যে শেষ পর্যন্ত রোমান্টিক সত্য বিমুখতায় গিয়ে পৌঁচেছে, জীবনের থেকে কল্পনা যে দেখা দিয়েছে প্রধান হয়ে এবং শ্লীলতা যে সত্যকে দাঁড়িয়েছে আড়াল করে, তা' প্রমাণ করবার জন্য কোনো পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না, অন্ততঃ উনিশশতকীয় বাঙ্‌লা সাহিত্যে। তবে এ ব্যাপারে ব্যতিক্রমও আছে। অবশ্য সামান্যই ব্যতিক্রম। আর সেই সামান্য ব্যতিক্রমের প্রধান হলেন, দীনবন্ধু মিত্র।

জীবন সম্পর্কে অসীম কৌতূহল এবং তাকে সম্ভোগের ভেতর দিয়ে সত্য করে তোলা যে রেনেসাঁসী শিল্পীদের অন্যতম লক্ষ্য, তা' ইতিপূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা গেছে। মানুষকে এঁরা 'বিকশিত করতে চেয়েছিলেন এই সম্ভোগের ভেতর দিয়ে। অনুভূতির পরিশীলন, মনের সুষমিত সমগ্রতা, বুদ্ধির সূক্ষ্মতা সাধন বা জ্ঞানের প্রসার—সবই যে সম্ভোগ-কেন্দ্রিক, ইউরোপীয় সাহিত্যের লেখকেরা তা' দেখিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছেন। সত্যকে তাঁরা প্রকাশ করেছেন অসঙ্কোচ নির্লজ্জতায়। শ্লীলতার দোহাই দিয়ে তাঁরা যে

জীবনকে ফাঁকি দেন নি, তার প্রমাণ রয়েছে র‍্যাবলে থেকে সেক্সপীয়ার প্রমুখ সকল রেনেসাঁসী লেখকের সাহিত্যকর্মে। ফরাসী গদ্য সাহিত্যের ভগীরথ র‍্যাবলের জন্ম হয়েছিল সেক্সপীয়ারের থেকে সত্তর বছর আগে। মধ্যযুগের অন্ধকার রাত তখন সবে ফিকে হতে আরম্ভ করেছে, জীবন-বিমুখ ধর্মতত্ত্বের আচরণে তখন ফরাসী চিন্তা আচ্ছন্ন। —সেই সময় র‍্যাবলে দেখা দিলেন তাঁর মুক্ত-বুদ্ধি আর শাণিত লেখনী নিয়ে। তাঁর যুগান্তকারী রচনা 'গার্গান্তুয়া-পাঁতাগ্রুয়েল' সুদীর্ঘ কুড়ি বছরের সৃষ্টি। ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রথম পর্বের প্রকাশ, আর ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ পর্ব যখন প্রকাশিত হয়, তখন তিনি জীবনের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন। এই বিখ্যাত গ্রন্থটি লিখে তিনি যে কী পরিমাণ নিন্দা কুড়িয়েছিলেন, তা আজকের দিনে ভাবাই যায় না। অবশ্য প্রশংসাও তিনি কম পাননি। অজস্র নিন্দা ও অকুণ্ঠ অভিনন্দনে তিনি হয়েছিলেন অভিষিক্ত। ফরাসী সাহিত্যে যে জীবনবোধ আমরা দেখতে পাই, তার সূচনা ও বিকাশ র‍্যাবলের মধ্যেই ঘটেছে। তাঁর পথ ধরেই পরে একে একে দেখা দিয়েছেন মলিয়ের, ভলতেয়ার, দিদেরো, স্তাঁদাল, বালজাক প্রমুখ শিল্পীরা। এঁদের সাহিত্য যে কতখানি সম্ভোগে সরস, কৌতুকে উচ্ছল, যুক্তিশীলতায় শাণিত এবং মুক্তির অভীপ্সায় বেগবান, তা এঁদের পাঠক মাত্রেই অবগত।

ইংরেজী সাহিত্যেও একদা যে এই জীবনবোধ প্রবল ছিল, তার অনেক প্রমাণ আছে। অন্য কেউ নন, যাঁকে অবলম্বন করে উনিশ-শতকের বাঙলা সাহিত্যের অগ্রপ্রবণতা, সেই সেক্সপীয়ার কী কারো থেকে কম ছিলেন? সম্ভোগের ভেতর দিয়ে জীবন ও সাহিত্য কী ভাবে সত্য হয়ে উঠে, তাঁর থেকে একথা আর কে বেশি জানত?—জীবনকে পরিস্ফুট করবার জন্য তিনি তথাকথিত শ্লীলতা ও অশ্লীলতার সীমানা মানেন নি। সেক্সপীয়ারের বহু নাটকে নরনারীর দেহমিলন, অঙ্গবিশেষের রসালো বর্ণনা, এবং এ জাতীয় নানা রকম ইংগিত যে উপস্থিত রয়েছে, তা' ব্যাখ্যা করে না বললেও চলে। 'ভেনাস অ্যাণ্ড অ্যাডোনিসে' ভেনাসের কামাতুরতার যে বর্ণনা আছে, তা' ঐ সব ব্যাপারের কাছে কিছু নয়। ঐ সব অশালীন ভাষণ যে ফলস্টাফ, ডম কুইক্‌লি বা নিচু শ্রেণীর চরিত্রের মুখে কেবল উচ্চারিত হয়েছে তা' নয়, অপেক্ষাকৃত ওপর মহলের চরিত্র, যথা জুলিয়েট, রোজালিন্ড্, বিয়াত্রিচে ও হ্যামলেটের মুখেও শোনা যায় নানারকম অশালীন উক্তি এবং ইংগিতে। কখনো স্পষ্ট ভাষায়, কখনো বা রূপক উপমাতে। এরিক প্যাট্রিজের লেখা

'সেকস্‌পীয়ার'স্‌ বডি'র সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, আশা করি তাঁদের কাছে এ সব তত্ত্ব বিস্তৃত করে বলবার অপেক্ষা রাখে না। নরনারীর দেহমিলন ও তৎ-সংক্রান্ত অনাবৃত আলোচনা, অপ্রীতিকর শারীর-ক্রিয়া বা সমকামিতা ইত্যাদি তথাকথিত নিষিদ্ধ বিষয়ের কোনোটাই সেক্সপীয়ার যে বাদ দেন নি, তা' চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন প্যাট্রিজ সাহেব। যাই হোক, এই সেক্সপীয়ার, যাঁর প্রতিভা বিশ্ববন্দিত, তিনিও কম নিন্দিত হন নি নীতিবাগীশদের পাল্লায় পড়ে। আঠারো শতকের শেষ থেকে ইংল্যাণ্ডে যে নীতি-বাগীশতার জোয়ার দেখা গেল, তখন থেকে সেক্সপীয়ারকে নিয়েও দেখা দিল বিতর্ক। এমন কী তথাকথিত অশ্লীল অংশগুলি বাদ দিয়ে তাঁর গ্রন্থগুলির একটি সুনীতি-সম্মত সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগও দেখা গিয়েছিল। টমাস্‌-বাউড্‌লার নামে এক সাহেব এই উদ্যোগে এসেছিলেন এগিয়ে, আর সেই থেকে কে না জানে, বিখ্যাত শব্দ 'বাউড্‌লারাইজ' কথাটির উৎপত্তি! এই সময় কোলরিজ- এর মতন কবিরাও অভিযোগে তোলেন যে সেক্সপীয়ারের ভাষা রীতিমত অশ্লীল, এবং এত অশ্লীল যে তা' ভাষান্তরিত করতেও বাধে। এইভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, কেবল সেক্সপীয়ার নন, এর সঙ্গে বোকাচ্চিও, ও সর্ভান্তেজদের মত বিশ্ববিশ্রুত প্রতিভাধরেরাও কখনো নিন্দিত, আবার কখনো বা অভিনন্দিত।

এরপর, আশা করি, বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমাদের আলোচ্য নাট্যকার কেন 'বিতর্কিত নাট্যকার' আখ্যা পেয়েছেন। স্কট-ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-টেনিসন-ডিকেন্সের ঐতিহ্যধারার ধার নাট্যকার দীনবন্ধু ধারেন না। তিনি হলেন মানবতন্ত্রীদের সঙ্গে সমগোত্রীয়। অর্থাৎ র‍্যাবলে-সেক্সপীয়ার-বোকাচ্চিও-সর্ভান্তেজদের সঙ্গে দীনবন্ধুর আত্মিক যোগ, যদিও ঐ সব বিশ্ববিশ্রুত প্রতিভা-ধরদের মত অত বড়ো তিনি হতে পারেন নি। তাই তাঁর সাহিত্যকে বিচার করতে হলে এই নিরিখেই দেখতে হবে। তাঁর কপালে যে নিন্দা ও প্রশংসা জুটেছে, তা' তাঁর এই প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং তা' অভাবিত হলেও, অনিবার্য।

এখন দীনবন্ধুর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, সেই অভিযোগ যথার্থ কী না, তা' শিল্প বিচারের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখা যেতে পারে। মানবিকতাবাদের দোহাই দিয়ে, না হয় তাঁর সব রকম অশ্লীলতাকে উড়িয়ে দেওয়া গেল, কিন্তু সাহিত্য-বিচারের তুলাদণ্ডে সবগুলি কী ক্ষমার্হ?—এই সঙ্গে আরো একটি বিষয় দেখা দরকার, যে বিষয়টি হল তাঁর নাটকীয় সংলাপের ভাষা।—এই

সংলাপ কী শুধুই 'মদের কথাতেই আরব্ধ ও মাতালের কথাতেই পর্য্যবসিত' ? —না কী বাঙলাদেশের নাড়ির সঙ্গে এর যোগ আছে বলেই এ ভাষা অসম্ভব জোরালো এবং এর কল্যাণেই তাঁর চরিত্রগুলি জীবন্ত ?—যাই হোক, কেবল রেনেসাঁসী দৃষ্টি নয়, শিল্পরসিকের চোখ দিয়েও ব্যাপারটি একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে।

অশ্লীলতা

'এ ছাইভস্ম কখনও যদি মঞ্চে অভিনয় করতে হয়, তবে সে অনুষ্ঠানের জন্য সোনাগাছির থেকে উৎকৃষ্ট স্থান ও সেখানকার আবাসিনীদের চেয়ে উত্তম শ্রোতা ও অনুরাগী দর্শক আমরা রেকমেণ্ড করতে পারি না।'[১ক]

আজ থেকে শতাধিক বছর আগে ওই নিষ্ঠুর উক্তিগুলি এক সমালোচকের কলম থেকে যে-নাটকটির ওপর বর্ষিত হয়েছিল, সেটি হল বাংলা দেশের একটি শ্রেষ্ঠ নাটক। নাম, 'সধবার একাদশী'। নাট্যকার যে-সে লোক নন, উনি স্বয়ং দীনবন্ধু মিত্র। একালে যদিও তিনি একজন শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হিসাবেই বন্দিত ও অভিনন্দিত, সেকালে কিন্তু তাঁর মত নিন্দিত নাট্যকার আর কেউ ছিলেন না। সমালোচক মহলে তাঁর যেটুকু খ্যাতি ছিল, তা' হল ওই অশ্লীলতার গুণে। অর্থাৎ তাকে খ্যতি না বলে অখ্যাতি বলাই ভালো।

'ক্রাই ডে রিভ্যু' সেকালের একটি বিখ্যাত পত্রিকা। সেই কুলীন পত্রিকায় ওই আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সমালোচকও হেঁজি-পেঁজি লোক নন, লালবিহারী দে। কিন্তু শুধু কি তিনি ? অনেক তা-বড় তা-বড় সমালোচকও এ নাটকটি সম্পর্কে অনুরূপ কুৎসিত ধারণা পোষণ করতেন। 'বাঙলা ভাষা ও বাঙলা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থের রচয়িতা প্রায় একই ভাষায় লিখেছিলেন: 'সধবার একাদশী' খালি মদের কথাতেই আরব্ধ ও মাতালের কথাতেই পর্যবসিত। ইহাতে হাস্যরসোদ্দীপক অনেক বিষয় বর্ণিত আছে সত্য, কিন্তু আদ্যোপান্ত অশ্লীল বখামি ও মাতলামির কথাতেই পরিপূর্ণ। সমাজ-প্রচলিত কোন দোষের সবিস্তার বর্ণন, সেই দোষ জন্য অনিষ্ট সংঘটন ও তৎপরে তদ্দোষাক্রান্ত ব্যক্তির অনুতাপ ও চরিত্র শোধন প্রভৃতি পরিহাসচ্ছলে বর্ণনা করিয়া সেই দোষের প্রতি সমাজের ঘৃণা উৎপাদন করাই বোধ হয় প্রহসনের মুখ্য উদ্দেশ্য। সে উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া শুদ্ধ কতকগুলো বখামির গল্প লিখিলেই যদি প্রহসন হইত, তাহা হইলে কলিকাতার মেছোবাজার ও সোনাগাছি প্রভৃতি স্থানে দৈনন্দিন যে সকল

ব্যাপার সংঘটিত হয়, সেইগুলি অবিকল লিখিয়া লইলেও অনেক প্রহসন হইতে পারিত।'[২]

এই কী সমালোচনা? সমালোচনার নামে এ-জাতীয় গালাগাল বাংলা দেশের কোন গ্রন্থের ভাগ্যে কখনও কী জুটেছে?

'ভিক্টোরিয় যুগে বাঙ্‌লা সাহিত্য' গ্রন্থে হারানচন্দ্র রক্ষিত অপেক্ষাকৃত সংযমের সঙ্গে যে মত ব্যক্ত করেছেন, তাকে ওই মতেরই প্রতিধ্বনি বলা চলে। তিনি লিখেছেন 'সধবার একাদশী'র লিপিকুশলতা ও চরিত্রচিত্রণ উৎকৃষ্ট হইলেও, সত্যের অনুরোধে বলিব, ইহার রুচি ও ভাব প্রশংসনীয় নহে —বরং নিন্দার বিষয়।'[৩]

একালের সমালোচক প্রভুচরণ গুহঠাকুরতাও নাট্যকার দীনবন্ধু সম্বন্ধে তাঁর বইয়েতে বড় একটা ভালকথা লিখে যান নি। সেকালের অখ্যাতির ঢেউ একালের উপকূলে পর্যন্ত এঁকে গেছে কলঙ্গের দাগ।

আর একটু এগোনো যাক। কেবল 'সধবার একাদশী'তেই নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র এ-হেন রুচিহীনতার দায়ে অভিযুক্ত হন নি; এ অভিযোগ উত্থত রয়েছে তার সকল নাট্যকর্মেই। সামগ্রিকভাবে না-হোক, অংশ-বিশেষে। যে নীলদর্পণকে নিয়ে তাঁর বিশ্ব-জোড়া খ্যাতি, সেখানে রায়তদের সংলাপে অথবা তোরাপ রাইচরণের কথোপকথনে যে ভাষা উচ্চারিত হয়েছে, সেগুলিকে তথাকথিত রুচিবানদের নিশ্চয়ই ভালো লাগবে না। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'র রাজীব ও ছেলের দল যে-কবিতা শুনিয়েছে তাকে অশ্লীল বলতে কারোর বাধবে কী? 'সধবার একাদশী'র মত এ বইখানিও ওই একই কারণে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করতে নিষেধ করেছিলেন। 'লীলাবতী' নাটকে নদেরচাঁদ-হেমচাঁদের রঙ্গরসিকতা রুচিবানদের কানে নিশ্চয় সুধাবর্ষণ করবে না। আর 'জামাই বারিকে'র রঙ্গ-রস সর্বত্র যে সুরুচির সীমার ভেতর আবদ্ধ আছে, এমন কথা হলফ করে কে বলবে? এইরকম পাঁচ-সাত ভেবে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কুরুচির দায় থেকে দীনবন্ধুকে মুক্তি দেন নি।

আমরা যারা সাধারণ পাঠক এ-অবস্থায় বড়ই বিপর্যস্ত। ভয়ে ভয়ে বিশ্বাস করে ফেলি, সত্যি সত্যিই তিনি হয়ত অশ্লীল নাট্যকার ছিলেন! আবার প্রশ্নও করি, তাই কী? সুরুচি বলতে কাকে বোঝানো হয়? —কী সে বস্তু? এমনও তো হতে পারে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে রুচি রক্ষার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রুচিহীনতাকে প্রশ্রয় দিতে হয়েছে তাঁকে!—তা' হলে?

গত শতকের এই বহুলালোচিত নাট্যকারকে তাই এক কথায় খারিজ

করার আগে তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ সেটি একবার যাচাই করে দেখা যেতে পারে। আর তা' বিচার করতে হলে যুগধর্ম ও শিল্পধর্মের পরিপ্রেক্ষিতেই করতে হয়। দীনবন্ধুর বিরুদ্ধে যে অশ্লীলতার অভিযোগ উত্থিত, তাকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম ও প্রধান অভিযোগ হল, শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনি একেবারে বেপোরোয়া। নিষিদ্ধ ও নীতিহীন ইঙ্গিতময়তা যা তাঁর সাহিত্যে এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আছে, তাকে দ্বিতীয় অভিযোগ হিসাবে খাড়া করা যেতে পারে। তৃতীয় ও শেষ অভিযোগ হল, শৃঙ্গারকামনার অনাবৃত অভিব্যক্তি। সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে এগুলি যে অশালীন কর্ম, তাতে বোধ হয় কারও সংশয় নেই।

যে অশালীন শব্দগুলি যথেচ্ছভাবে তাঁর সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়েছে তার কিছু কিছু নমুনা এখানে সংগ্রহ করা যেতে পারে[৪]: 'মাগ', 'শালা', 'মাগী', 'বাঞ্চত', 'গোরুখোর', 'ভাতার', 'বাউরা', 'আঁটকুড়ি', 'শালি', 'ছেনালি', 'কসবি', 'ভাই-ভাতারি', 'বাস্টার্ড অব হোর্স বিচ', 'খানকি বিবি', 'পেট খসা', 'বাঁড়ি', 'ভাতারখাগি', 'পেট করা', 'কাপড তোলা' প্রভৃতি অনেক শব্দই 'নীলদর্পণে' পাওযা যায়। 'ভাতার', 'মাগী', 'পেট হওয়া', 'মাগ', 'ছেনাল', 'নাম লেখান', 'রাঁড়', প্রমুখ নিষিদ্ধ শব্দ 'নবীন তপস্বিনী'তেও ব্যবহৃত হয়েছে। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ও 'সধবার একাদশী' অনুসন্ধান করলে এ জেন শব্দের তালিকাকে আরও দীর্ঘ করা যেতে পারে। ওই শব্দগুলির সঙ্গে আরও নতুন নতুন শব্দ যোগ করা যায়, যথা,—'গর্ভস্রাব', 'বাবাকেলে বাবা', 'ছোডা ফোটান', 'বিয়ান ভ্যাডা', 'বোনাই-ভাতারি', 'ব্যাই-ভাতারি', 'আক তা ভাতারের মাগ', 'বেশ্যা মাগী', 'শালা', বাঞ্চত' 'মেয়ে-মানুষ', 'ভাদ্রবউয়ের কাছে শোযা', 'মাগীবাড়ী', 'বাই বাতার', 'দেহ দেওয়া', 'এঁডে', 'বাইজির হাউস', 'পাবলিক হোর', 'মাগমুখো', 'বেরিয়ে আসা', 'মাগ কপালে', 'ভাতার কপালে' ইত্যাদি। 'লীলাবতী,' 'জামাই বারিক' এবং 'কমলে কামিনী'ও এ রীতির শব্দসম্পদ থেকে বঞ্চিত নয়। এখানে আরও নতুন নতুন ঐশ্বর্য: 'খেমটিব নাচ', 'পেচ্ছাব', 'চোনা', 'নিতম্ব', 'স্তন', 'পুতের মুতে কড়ি', 'বিয়েন,' 'খেমটাওযালী', 'বউ বার করা', 'ঢলাঢলি,' 'শালীর বেটি', শ্যালার ব্যাটা', 'মেয়েমুখো', 'নিতম্বে ত্বদ' 'আবাগের ব্যাটা', 'সোনাগাছি', 'ভাতারের স্যাংজটি', 'মড়িপোডানীর জামাই', 'পথে পড়া', 'আঁটকুড়ীর ছেলে', 'ভাইখাগীর ভাই', 'শতেক খোযারী', 'নয়ত্নয়ারি', 'পাঁটি বেচার মেয়ে', 'হিজড়ে', বিছানায় শোয়া', 'ড্যাকরা',

'পালঝাড়া', 'গর্ভসঞ্চার', 'গর্ভপাত', 'জারজ', 'শালার ব্যাটা শালা' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হামেশাই লক্ষণীয়। না, এটি নিঃশেষিত তালিকা নয়। অনেক নিরীহ শব্দের অন্তরালে আরো হয়ত কুৎসিত ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে। সেই আপাতনির্বিরোধ শব্দগুলিকে বর্তমান তালিকায় স্থান দেওয়া হয় নি। তবে এ কথা স্বীকার করতেই হয়, রুচিশীল পাঠকেরা যাকে অশ্লীল বলেন, সে জাতীয় শব্দে দীনবন্ধুর সাহিত্য আকীর্ণ।

এখন বিচার করা যাক, সত্য সত্যই শব্দগুলি বর্জনীয় কী না! সামাজিক সত্যের খাতিরে যাকে আমরা অনভিপ্রেত মনে করি, সাহিত্যের সত্য তাকে আবার অত্যন্ত অভিপ্রেত বলে মনে করতেও পারে। রসতত্ত্ব বা নন্দনতত্ত্বের যে বিচার, সামাজিক ন্যায়নীতির বিচার তার থেকে একেবারে আলাদা। বরং অনেক সময় বিপরীত। সমাজনীতির দিক থেকে অবৈধ প্রণয় রীতিমত ধিক্কৃত, আর নর্মচিত্র বা শৃঙ্গারদৃশ্যের কথা না তোলাই ভালো। সাহিত্যে কিন্তু পরকীয়াতত্ত্ব সানন্দে স্বীকৃত, নর্মচিত্র সদা অভিনন্দিত। আর শৃঙ্গার? —সে ত একটা রস। তাকে বাদ দিয়ে সাহিত্যই হয় না।

যে 'অশ্লীলতা' শব্দটিকে আমরা হামেশা যখন-তখন যেখানে-সেখানে ব্যবহার করে থাকি, সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রে তাকে কোন্ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে একটি পথ পাওয়া যেতে পারে। প্রাচ্যদেশীয় আলংকারিকেরা যা 'রসাশ্রিত' তাকে সাহিত্য বলে মেনে নিয়েছেন। যদি তা' ঘোরতর অসামাজিক হয়, তা' হলেও। তাঁদের মতে, একমাত্র সেই জিনিসই বর্জনীয়, যা রসহানি ঘটায়। রসোদ্বোধনে বিঘ্নকারী বস্তুকে তাঁরা পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা করেছেন। 'কাব্যদর্শে' দণ্ডীকে এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষাতেই লিখেছেন—

কামং সর্বোঽপালংকারো
রসমার্থে নিষিঞ্চতি
তথাপ্য গ্রাম্য তৈবৈনং
ভারং বহতি ভূয়সা।[৫]

কাব্যের রসকে ফুটিয়ে তোলাই হল অলংকারের সার্থকতা। আর সেই ঈপ্সিত সার্থকতা একমাত্র অগ্রাম্য মনোভাব ও অগ্রাম্য শব্দের সাহায্যেই লাভ করা যেতে পারে। 'গ্রাম্য' হলেই সব মাটি হয়ে গেল। রসহানি অনিবার্য।

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগবে, তা' হলে 'গ্রাম্যতাই' কি অশ্লীলতা?—'গ্রাম্যতা" বলতে কী বোঝায়? পরবর্তী কালের অলংকারিকেরা এ কথার জবাবও দিয়ে

.গছেন। তাঁরা গ্রাম্যতার ভেতরে সূক্ষ্মভাবে অশ্লীলতাকেও দেখতে পেয়েছেন। এবং পৃথক করে সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। গ্রাম্যতার কথা নির্দেশ করে লিখেছেন—

লোকমাত্র প্রযুক্তং গ্রাম্যম্।[৬]

যে কথা শুধু জনসাধারণের মুখে শোনা যায়, কিন্তু শাস্ত্রে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না, সে কথা 'গ্রাম্য'। সুতরাং সাহিত্যে এদের ব্যবহার খুবই সীমায়িত। সাহিত্যে প্রতিটি শব্দ অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যা মনকে জাগাতে পারল না, ভাবাতে পারল না, সে জাতীয় শব্দ ব্যবহারের সার্থকতা কী?—এ বোঝা মাত্র। বামন একেই বলেছেন, 'গ্রাম্য'।

আর অশ্লীলতা? —সেই বাক্যকেই আলংকারিকেরা অশ্লীল বলে অভিহিত করেছেন যা,—

ব্রীড়া জুগুপ্‌সা মঙ্গলাতঙ্কদায়ী।[৭]

যা শুনলে আমাদের মনে লজ্জা, ঘৃণা, অমঙ্গল ও আতঙ্কের উদয় হয়, তাকেই বলা হয় অশ্লীল। রসশাস্ত্রের বিচারে এখানে উল্লিখিত প্রত্যেকটি ভাবই হল লৌকিক। যে বই পড়তে পড়তে লজ্জায় দেহ কুঞ্চিত হয়, সে শিহরণ নিশ্চয় রসের আস্বাদে নয়। সেখানে দেখা যায় রসের অলৌকিকত্বের পরিবর্তে জেগে উঠেছে স্থূল লৌকিক বোধ। লজ্জা-ঘৃণা-অমঙ্গল ও আতঙ্ক এক্ষেত্রে রসের অপঘাতই ঘটায়।

দীনবন্ধুকে আমরা এই রসহানির অভিযোগে আদৌ কী অভিযুক্ত করতে পারি?—একবার যাচাই করে দেখা যাক। ইতিপূর্বে যে শব্দগুলি উদ্ধার করা হয়েছে, সেগুলি বিচ্ছিন্ন শব্দ। ঐ বিচ্ছিন্নতার ভেতর দিয়ে উদ্দেশ্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সমগ্রভাবে তাদের পর্যালোচনা করা দরকার।

বর্তমানে সেইরকম একটি উদাহরণ দেবার চেষ্টা করব। উদ্ধৃত উদাহরণটি 'নীলদর্পণ' থেকে নেওয়া। বেগুনবেড়ের কুটির গুদাম ঘরে উপস্থিত রায়তরা শাবদ্ধ। সুতরাং তাদের ক্রোধ যে সাহেবের কথায় ফেটে পড়বে, এটিই স্বাভাবিক। সেই স্বাভাবিক কথোপকথনটি এইরকম:

'প্রথম রাই। কুঁদির মুখি বাঁক থাকবে না, শ্যামচাঁদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা। মোদের চোকি কি আর চামড়া নেই, না মোরা বড়বাবুর নুন খাই নি—তা করবো কি, সাক্ষী না দিলি যে আস্ত রাখে না—উট সাহেব মোর বুকে দেঁড়য়ে উটেলো—দ্যাদিনি অ্যাকন তবাদি অক্ত ঝোজানি দিয়ে পড়চে—গোড়ার পা য্যান বল্‌দে গোরুর খুব।

দ্বিতীয়। প্যারেকের খোঁচা—সাহেবরা যে প্যারেক মারা জুতো পরে জানিস নে?

তোরাপ। (দন্ত কিড়মিড করিয়া) তুত্তোর প্যারেকের মার প্যাট করো, লৌ দেখে গাডা মোর ঝাঁকি মেরে উট্‌চে। উঃ কি বলবো, সমিন্‌দির অ্যাকবার ভাত্তারমারির মাটে পাই, এমনি থাপ্‌পোর ঝাঁকি সমিন্‌দির চাবালিডে আসমানে উড়্‌য়ে দেই, ওর গ্যাড্‌ম্যাড্‌ করা .হর ভেতর দে বার করি।'[৮]

তোরাপের এই সংলাপ শুনে রুচিশীল শ্রোতারা যে কানে আঙুল দেবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ভাষাই কী তোরাপের চরিত্র প্রকাশ করছে না? মাঠে-খাটা প্রভৃত শক্তির অধিকারী তোরাপ। এক থাপ্‌পড়ে সে শত্রুর চোয়াল উড়িয়ে দিতে পারে। সংলাপে সে যদি একটু বেপরোয়া হয়, তাতে নিশ্চয় মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। তার স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশ তো এভাবেই হওয়া উচিত। নয় কী?

অন্যত্রও এ জাতীয় উদাহরণ বিরল নয়। নিমচাঁদ ও রামমাণিক্যের কথোপকথনও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। অংশটি 'সধবার একাদশী' থেকে নেওয়া। একজন অসভ্য বাঙ্গাল, অপরজন সভ্যতার অনির্বাণ দাহে জর্জরিত। দৃশ্যটি এইরকম:

নিম। আমরা তোর বিক্রমপুর যাব—

রাম। নদী তো প্রবীন।

নিম। ষ্টীমারে যাবো, তোর ভাগ্যধরীকে আনবো—

রাম। হালা বাই হালা, ই কি তোর কলকত্তাই মাগ, উমি লোকের লগে খারাপ কাম করবে—বাগ্যদরী বাই বাতার কবরে, স্যাও বালো, পরের লগে দেহ দেবে না—কোন দিন না।

অটল। তোর বাগ্যদরী তো সতী বড়। আ বাঙ্গাল।

রাম। পুঙ্গিব বাই বাঙ্গাল বাঙ্গাল কব্যা মস্তক শুবাই দিচে—বাঙ্গাল কউস ক্যান্—এতো অকাণ্ড কাইচি তবু কলকত্তার মত হবার পারচি না?'[৯]—

এখানেও অনেক আপত্তিকর শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু ওই শব্দগুলির পরিবর্তে সাধু শব্দ ব্যবহার করলে রামমাণিক্যের চরিত্র কী ঠিকমত ফুটে উঠত?—চরিত্র-চিত্রনে প্রতিটি শব্দই এখানে প্রয়োজনীয়। ওই শব্দগুলির সাহায্যেই অমার্জিত বাঙাল রামমাণিক্যের নির্বোধ রসরূপটি এতো সহজে

উজ্জ্বল হয়ে হয়ে উঠেছে। তাই বামন-কথিত 'গ্রাম্য' বা 'অশ্লীলতা' কোনো শব্দটিই এখানে লাগানো যায় না।

অনুরূপভাবে আলোচনা করলে দেখা যায়, আপাতদৃষ্টিতে যে শব্দগুলি অভব্য ইঙ্গিতবহ, নিষিদ্ধ, রসের কারণে তাদের ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কতখানি আবশ্যিক হয়ে উঠেছে, তার প্রমাণ হিসাবে কয়েকটি উদাহরণ সংগ্রহ করা গেল :

(১) নদে। বড় চালাকি কচ্চো—আমি দম্ভ করে বলতে পারি শ্রীরামপুরে আমার কাছে এক ব্যাটাও বামন নয়। আমাদের বাঁদা ঘর, আমরা আসল কুলীনের ছেলে।

শ্রীনাথ। স্টড ব্রেড।

নদে। আজো পেচ্ছাপ কল্যে বামন বেরোয়।

শ্রীনাথ। গোদোলপাড়ার ওষুদ খেতে হয়—ঢেঁকিরাম, অমন কথা কি বলতে আছে? ব্রাহ্মণ, দেবশরীর, যজ্ঞোপবীত গলায় বিপ্রচরণেভ্যোঃ নমঃ, তাঁকে ওরূপে কি বার কত্তে আছে, পইতেয় যে চোনা লাগবে।[১০]

(২) অটল। আমার ইচ্ছে কচ্চে কাঞ্চনের সঙ্গে একবার নাচি।

নিম। পলকা।

কাঞ্চন। আমি একটু বাগানে বেড়াই গে—

(কাঞ্চনের প্রস্থান)

নকু। কাঞ্চনের গলাটি বেশ মিষ্টি।

অটল। গেল কোথায়?

নিম। To do a thing which no one can do for her —'

(৩) বলো হ্যাওরা রে এর ব্যাওরা কি?
নোন্‌দায়ের কোলে কেন শোয় না ঠাকুরঝি।[১১]

(৪) যাহা ইচ্ছা কর কান্ত বাধা নাহি তায়,
দেখ কিন্তু দাসী যেন লাজ নাহি পায়।[১৩]

(৫) ভাল ২ করে গেলাম কেলোর মার কাছে
কেলোর মা বলে আমার জামার সঙ্গে আছে।[১৪]

(৬) আমি কি ভেসে এসিচি
কাল সকালে কেলে সোনার কোলে বসিচি।[১৫]

উদাহরণ আর দীর্ঘতর করে লাভ নেই। উদ্ধৃত উদাহরণগুলি যে অভব্য ইঙ্গিতে ভরা, তা' কী দেখিয়ে দেবার অপেক্ষা রাখে? প্রথমটিতে 'বামন'

জনয়িতার ক্রোধকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত একটি শব্দও আপত্তি জনক নয়। অথচ ওই বাক্যের ভেতরে নিরীহ কথার অন্তরালে এমন একটি চিত্র রয়েছে প্রচ্ছন্ন হয়ে, যা এত সতর্কতার সঙ্গে রচিত যে একটু এদিক ওদিক হলেই শিল্প-মহিমাচ্যুত হতে পারত। দ্বিতীয় ইঙ্গিতটি কাঞ্চনের প্রকৃতির আহ্বানে সাড়া দেওয়া। এই নির্দোষ লাইনটি প্রায় অশ্লীলতার সীমারেখা স্পর্শ করে গেছে। চতুর্থ উদাহরণ বাদ দিলে বাকী যেগুলি পড়ে থাকে, সেগুলির সব ক'টিই প্রবাদ। এবং সব ক'টিতেই ঐ নিষিদ্ধ ইঙ্গিত উহ্যত।

এতদ্‌সত্ত্বেও এগুলিকে ঠিক অশ্লীল বলা যায় না। কেননা, রসসৃষ্টির দিক থেকে এদের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। হয়ত অন্যভাবেও লেখা চলত, কিন্তু তাতে সংশ্লিষ্ট চরিত্রগুলির স্বাভাবিকতা নিঃসন্দেহে যেত ক্ষুণ্ণ হয়ে। এদিকে এরা রসোত্তীর্ণ হতে পেরেছে বলে, এরা 'গ্রাম্য' বা 'অশ্লীল' কোনোটিই নয়।

কিন্তু এত আলোচনার পরেও একটি প্রশ্ন আমাদের মনে থেকে যায়। বাস্তব-চিত্রনে দীনবন্ধুর যোগ্যতা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। কিন্তু এ কাজ করতে গিয়ে তথাকথিত রুচিহীনতাকে প্রশ্রয় দিতে গেলেন কেন? —শিল্পী হিসাবে তিনি অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিলেও, সাহিত্যের উপকরণ সংগ্রহে তিনি যে তুচ্ছ ঘৃণ্য পাঁকের ভেতর নেমেছেন, এ কেমন করে সম্ভব হল?

এর উত্তর পেতে হলে 'যুগধর্ম'কে একবার যাচাই করে দেখা দরকার। আগে জানতে হবে সেকালের আবহাওয়াকে। বুঝতে হবে যুগের রুচিকে। আর এ ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রকেও একবার স্মরণ করা যেতে পারে। কেননা, ওই তথাকথিত 'অশ্লীল' শব্দটিকে ব্যবহার করেই বঙ্কিমচন্দ্র যুগ-পরিচয় লিপিবদ্ধ করে লিখেছেন: '... সেকালে অশ্লীলতা ভিন্ন কথার আমোদ ছিল না। যে ব্যঙ্গ অশ্লীল নহে, তাহা সরস বলিয়া গণ্য হইত না। যে গালি অশ্লীল নহে, তাহা কেহ গালি বলিয়া গণ্য করিত না। তখনকার সকল বাক্যই অশ্লীল। চোর কবি, চোর পঞ্চাশৎ দুই পক্ষে খাটাইয়া লিখিলেন—বিদ্যাপক্ষে এবং কালীপক্ষে, দুই পক্ষ সমান অশ্লীল। তখন পূজাপাঠন অশ্লীল, উৎসবগুলি অশ্লীল, দুর্গোৎসবের নবমীর রাত্রি বিখ্যাত ব্যাপার, যাত্রার সঙ্‌ অশ্লীল হইলেই লোকরঞ্জক হইত। পাঁচালি, হাফ আখড়াই অশ্লীলতার জন্যই রচিত।'[১৬]

এই অশ্লীলতার আবহাওয়া সেকালের নব্যশিক্ষিত তরুণদের মনে রীতিমত আলোড়ন এনেছিল। এবং খাস কলকাতা শহরের ওপর একটি 'অশ্লীলতা নিবারণী সভা' পর্যন্ত হয়েছিল স্থাপিত। বারো শ' আশি সালের পৌষ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় এ নিয়ে একটি আলোচনাও প্রকাশিত হয়।

শব্দ ব্যবহারের দিক থেকে বাঙ্‌লাদেশ সেদিন যে কত বেপরোয়া সে তত্ত্ব ঐখানে উদ্ঘাটন করা হয়। আর রুচির পরিচয়?

সমাজের সর্বস্তরে রুচিহীনতা ছিল প্রকটতর। যে ক্ষেতে চাষ করে, সেই কৃষকের মুখ দিয়ে যে রীতির শব্দ উচ্চারিত হত, ক্ষেতের মালিকের মুখেও ঐ একই রীতির শব্দ পাওয়া যেত। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রাম্য-নাগরিক, কেউই এ অভ্যাস থেকে ছিলেন না বঞ্চিত। এমন কী অন্তঃপুরচারিণীরাও এ ভাষা ব্যবহারে অদক্ষ ছিলেন না। রঙ্গ-রসিকতা এবং এবং গালাগালের ভাষা ছিল সেকালে একইরকম। এক কথায় বঙ্গ-সংস্কৃতির সঙ্গে এই তথাকথিত রুচিহীনতা যুক্ত ছিল অঙ্গাঙ্গিভাবে। আর এসব নিয়ে সেকালের সমাজ সুস্থও ছিল বিকারে অন্তত যে ভোগে নি, তা' প্রমাণিত। প্রাণ ছিল বলেই হাসতে পারত প্রাণ খুলে। সূক্ষ্ম কৃত্রিম রুচির তারা অপেক্ষা রাখত না।

রুচিহীন সুস্থ মানুষের এই ভাষা নিয়ে দীনবন্ধু তাঁর নাটকের অমর চরিত্রগুলি করলেন সৃষ্টি। কাল্পনিক রুচিশীলতার মোড়ক মুড়ে দিয়ে তাদের তিনি খর্ব করেন নি। আর এ বিষয়ে তাঁর ক্ষমতাও ছিল অপরিসীম। দুর্বল শিল্পীর হাতে পড়লে যা রুচি-বিকারে পরিণত হত, দীনবন্ধুর হাতে তা' লাভ-করল অসম্ভব শিল্প-মহিমা।

একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তে রাজীবের কাছে ঘটকের কন্যার রূপ বর্ণনাটি অনেকেরই হয়ত স্মরণে থাকতে পারে। কন্যার বয়ঃ-প্রাপ্তির প্রসঙ্গে এখানে 'স্ত্রী-সংস্কারে'র উল্লেখ পর্যন্ত নির্দ্বিধায় ব্যবহৃত হয়েছে। অথচ এখানে যে সংযম ও শিল্পবোধ রক্ষিত হয়েছে, সেকালের অনেক নামকরা নাটক তা' বজায় রাখতে পারে নি। – নাট্যকার দীনবন্ধু অত্যন্ত সহজেই এ অগ্নিপরীক্ষায় হয়ে গেছেন উত্তীর্ণ। আর অপর নাট্যকারদের পদস্খলন সেখানে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। --'সপত্নী নাটক' সেকালের একটি বিখ্যাত নাটক। সপত্নী সমস্যাই এখানে আলোচ্য। এ নাটকের একটি অংশে সূর্যকান্ত নামক একটি নির্বোধ গণৎকারকে নিয়ে হাস্যরস সৃষ্টির একটি প্রয়াস আছে। 'স্ত্রী-সংস্কারে'র একটি অনাবৃত আলোচনাও ঐ হাস্যরসের অঙ্গ। এ আলোচনায় স্ত্রী-সংস্কারের লোক-প্রচলিত অভিধানগুলিকে যে রকম বেপরোয়াভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে শ্লীলতার মাত্রা সর্বত্র রক্ষিত হয়েছে কী? নাটকীয় অংশটি এইরকম:

(শ্রীকণ্ঠ ঘোষালের প্রবেশ)

শ্রীকণ্ঠ।… গণক মহাশয়। আমি একটি বড় বিপদে পড়িয়াছি, আমার কন্যাটির ঋতু হইয়াছে, দেখুন ত দিনটা কেমন?

সূর্যকান্ত। (গম্ভীরভাবে পঞ্জিকা দেখিয়া) হুঁ্যা। তা বড় শক্ত কথা। …এই যে শক্রটা হইয়াছে বলিতেছ সেটা স্ত্রী কি পুরুষ বল দেখি।

শ্রীকণ্ঠ।…আমি রিপু বলি নাই, রিতু রিতু—

সূর্যকান্ত। হাঁ হাঁ বটে বটে। তা বাপু শুধু তোমার কন্যার বলিয়া কেন?…এ বছরে বারো মাসই শীত।

শ্রীকণ্ঠ।… সে আবার কি গণক মহাশয়। ও কি বলিতেছেন · ও সকল নয়, আমাদের মেয়েটির পুষ্পোৎসব উপস্থিত।

সূর্যকান্ত। (আহ্লাদিত হইয়া) হ্যা, ভাল ভাল।… দুর্গোচ্ছব পুষ্পোৎসব, লক্ষ্মীপূজা সরস্বতীপূজা, শ্যামাপুজা এ সকল কোন কর্মে তাঁহাদের কামাই নাই।…

শ্রীকণ্ঠ। দূর হউক, আজ্ঞে মহাশয় এসব কিসে কি বুঝিতেছেন। ও সকল নয়, আমার কন্যাটি ফুল দেখিয়াছে।

সূর্যকান্ত। (বিস্মিতভাবে) রাম। রাম। আজ কি কুযাত্রায় বাড়ি বাহির হইয়াছি। তাই এত বিভ্রম হইতেছে। ফুল দেখিয়াছেন?· তোমার মেয়ে ফুল দেখিয়াছে, এ বড় আহ্লাদের বিষয় শুনিয়া কানটা শীতল হইল, বস্তুকত্যা বলিয়া রাখি, যা বল যা কও সে সকল কিছুই শুনিব না, নাতিনীর ঋতু হইয়াছে, আমাদের অনেক দিনের আশা রুধিরে যেন পেট ভরে, এক খানি বনাত দিতে হইবে বাপু। আর নয়তো জামাই কর।

সপত্নী নাটক, পৃ ৪১-৪৩

দীনবন্ধুর রচনাটিকে যদি অশ্লীল বলতে হয়, এই লেখাটিকে তা' হলে কোন্ শ্রেণীতে ফেলব? এটি দেখার পর অনুমান করতে কষ্ট হয় না, কেন 'অশ্লীলতা নিবারণী সভা,' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দীনবন্ধুর ভেতর দিযে যা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে কোনো বিকৃতি নেই। তা' জীবনরসেরই অনিবার্য প্রকাশ। এ বিষয়টিই রাজীব ও ঘটক যেভাবে প্রকাশ করেছে তাতে কোনো মালিন্যের স্পর্শ নেই। কিন্তু উদ্ধৃত নাট্যাংশে দেখা যাচ্ছে আলোচ্য 'স্ত্রী সংস্কার'-কে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে যতখানি বিকৃত করতে হয়, তার চূড়ান্ত এখানে করা হয়েছে। একেই বলে রস-বিকার। অশ্লীলতা। একালে হয়ত অনেকেই অবাক হবেন, হাজার হাজার দর্শকসমাবেশে অভিনেতারা ঐ শব্দগুলি কেমন করে উচ্চারণ করত!—কেমন করে?—

অথচ দীনবন্ধুর নাটক অভিনয়ে কোনো দিন এতটুকু ও অসুবিধা হয়নি। বরং তাঁর নাটক দিয়ে বাঙ্‌লা দেশের আধুনিক রঙ্গমঞ্চের আরম্ভ। সেদিক থেকেও দীনবন্ধু অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

দীনবন্ধু সম্পর্কে আর একটি অভিযোগ এখনো বাকী। নারীদেহের সৌন্দর্য বর্ণনায় তিনি যে শৃঙ্গার কামনা ছড়িয়ে দিয়েছেন, এ সম্পর্কেও অনেকে তাঁর রুচির প্রতি কটাক্ষ করেছেন। এর জবাবে আগে যা বলা হয়েছে, সেই কথাই পুনরুক্ত করা দরকার। অর্থাৎ বলা দরকার, সংস্কৃত নন্দনতত্ত্বে শৃঙ্গার একটি রস। সংস্কৃত কাব্য ও নাটকে এ রস অত্যন্ত উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত। সে গাঢ় বর্ণচ্ছটায় অনেকের চোখ যায় ধাঁধিয়ে। লজ্জায় মুখ ফিরিয়ে নেন অনেকে। সুবন্ধুর 'বাসবদত্তা' সম্পাদনা করতে গিয়ে হল-সাহেব ঐ রকম আরক্তিম হয়ে উঠেছিলেন। ভিক্টোরীয় ঔচিত্যবোধে তাঁর মন ছিল পরিশীলিত। আমাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে ইনি ছিলেন অসচেতন। তাই ঐ বিড়ম্বনা। বাঙালী-ঐতিহ্য সম্পর্কে যদি আমরা সচেতন না হই, অনুরূপ বিড়ম্বনা আমাদের কপালেও লেখা আছে। জয়দেব থেকে ভারতচন্দ্র পর্যন্ত বাঙ্‌লা সাহিত্যে যে শৃঙ্গার রসের চর্চা দেখা যায়, দীনবন্ধুতে এসে সেটি হঠাৎ কী বিলীন হয়ে যাবে? এ কথা যদি আমরা স্মরণ রাখি, তবে দীনবন্ধুকে আলোচনা করা আমাদের পক্ষে সহজসাধ্য হয়। বোঝাটা হয় আরো সহজ।

এ ছাড়া আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার। সম্ভোগের জন্য আকাঙ্ক্ষা নব-জাগরণের হল একটি বিশেষ প্রবণতা। যা দুর্গম ও রহস্যময়, সেখানেই নবযুগের কৌতূহল। শুধু বাহ্যিক ঐশ্বর্য নয়, দেহ-সৌন্দর্যের গভীরেও সে ডুব দিতে চায়। না, এ সম্ভোগে কোন গ্লানি নেই। কোনো মালিন্যও নেই। সুস্থ জীবনের সহজ স্বাভাবিক স্ফূর্তি এই সম্ভোগের মধ্য দিয়ে হয় প্রকাশিত। প্রথম যৌবনের কাব্যরচনায় দীনবন্ধু এ সম্ভোগে সাড়া দিয়েছিলেন। আর পরবর্তী কালের নাট্যচর্চায় এ আহ্বান তিনি কী এড়িয়ে যেতে পারেন?

'লীলাবতী' নাটকটিতে নাট্যকার অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে সেকালের ব্রাহ্ম রুচিকে তুলে ধরেছেন। কিন্তু দেহবর্ণনার সুযোগ যখন এসেছে, তখন তিনি ভারতচন্দ্রের শিষ্য। ললিত-লীলাবতী দুটি চরিত্রই ব্রাহ্ম রুচিতে পরিশীলিত। শারদাসুন্দরীও তাই। নদেরচাঁদের সঙ্গে লীলাবতীর যখন বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেছে, তখন অন্য কোন চিন্তা নয়, যে-চিন্তা শারদার মনে সর্বাধিক আঘাত দিয়েছে তা' হল লীলাবতীর সুন্দর দেহটি কী শেষ পর্যন্ত নদেরচাঁদ

ভোগ করবে? শারদাসুন্দরী কর্ত্তৃক ব্রাহ্মিকা লীলাবতীর দেহসৌন্দর্য বর্ণনাটি লক্ষণীয়:

পঙ্কজকোরকনিভ নব পয়োধর—
চক্রে চক্রে অতিক্রম অতীব সুন্দর।
রাম্ হস্ত শোভা সীতা-পীনস্তনদ্বয়,
বিপিনে বায়স নখে বিদারিত হয়?[১৭]

এই নাটকের নায়ক ললিতমোহন। তার সঙ্গে লীলাবতীর যে প্রেম তা' কামগন্ধহীন নয়। এ প্রেমের আনন্দ শুধু মনেব মিলনে নয়। দেহমিলনেও। তাহ প্রতি অঙ্গের জন্য প্রতি অঙ্গের তীব্র আকাঙ্ক্ষা। হরিণসদৃশ নয়ন, দন্তরুচি কৌমুদী, 'অনঙ্গ আলয়' উরু বিপুল নিতম্ব, ক্ষীণ কটিদেশ, বিশাল স্তনভার, উদ্দাম কেশদাম—সব সৌন্দর্যই আকর্ষণ করে ললিতমোহনকে। বঙ্গ-উৎকল-তৈলঙ্গ-কেরল কর্ণাট-গুর্জর প্রভৃতি দেশের যা কিছু শ্রেষ্ঠ, সেই তিল তিল উত্তম সৌন্দর্য দিয়ে ঐ কমনীয় তিলোত্তমামূর্ত্তি গঠিত। মৈথিলী মোহিনীদের থেকেও উজ্জ্বল হরিণ চোখ, বঙ্গ বিলাসিনীদের থেকেও সুন্দর দাঁত, উৎকল অঙ্গনাদের মত 'অনঙ্গ আলয়' উরু, তৈলঙ্গী নিতম্ব, কেরলীয় সজল জলদরুচি কেশ, কর্ণাট কামিনীদের মতন কৃশ কটিদেশ, আর গুর্জর রঙ্গিণীদের মত স্তনভার—এই হল-লীলাবতীর দেহশ্রী। দীনবন্ধুর ভাষায় এ নায়িকার দেহ হল, 'মকর কেতন কেলি চারু নিকেতন'।[১৮]

'বিয়েপাগলা বুড়ো'তেও এ জাতীয় দেহ-বর্ণনা আছে। আছে শৃঙ্গারচিত্র। এর থেকে সেটি আরো চটকদার। যে রূপবর্ণনার দ্বারা ঘটক বৃদ্ধ রাজীবকে প্রলুব্ধ করেছে, তা' হল এইরকম:

গোলাপি বরণ পীন পয়োধরদ্বয়—
বিকচ কদম্ব শোভা যাতে পরাজয়।
বিরাজে বক্ষের মাঝে নিজ গরিমায়,
স্থানাভাবে ঠেকাঠেকি সদা গায় গায়,
তাতে কিন্তু উরজের অঙ্গ না বিদরে
কমলে কমলে লেগে কবে দাগ ধরে?
গঠিত বিমলকুচ কোমলতা সারে,
নরম নিরেট তাই দেখ একেবারে।
চিকণ বসনে কুচ রেখেচে ঢাকিয়ে
কাম যেন তাঁবু গেড়ে আছে বার দিয়ে।[১৯]

নায়ক যখন আঁ'চল টেনে ধরেছে, তখন নায়িকার সলজ্জ অপ্রস্তুত ভাষণও অনুরাগে মদির হয়ে উঠেছে,—

রসরাজ কি কাজ সলাজ মরি।
মম অঞ্চল ছাড় দু পায় ধরি।
ক্ষম জীবন যৌবন হীন বলে,
ভ্রমরা কি বসে কলিকা কমলে,
নব পীন পয়োধর পাব যবে,
রস সাগর নাগর শান্ত হবে।
রহ মানস রঞ্জন ধৈর্য ধরে
সুখ নূতন নূতন লাভ পরে।[২০]

তোটক-ছন্দে রচিত নায়িকার এ অনুনয় শুনতে শুনতে অবশ্যই ভারতচন্দ্রের কথা মনে পড়তে পারে। কবিতাটিতে ভারতচন্দ্রের প্রভাব সাংঘাতিক। উভয় লেখকই কিশোরী স্তনদ্বয়কে 'কলিকাকমলে'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। দু-জনের নায়িকাই কিশোরী। তাই প্রতীক্ষার জন্য সলজ্জ অনুরোধ। ভারতচন্দ্রের নায়িকা সম্ভোগের কথায় বলেছে,—

রসলাভ হবে রহিয়া ফুটিলে।
বল কি হবে কলিকা দলিলে ।।[২১]

দীনবন্ধু লিখেছেন :

নব পীনপয়োধর পাব যবে
রসসাগর নাগর শান্ত হবে ।।[২২]

নবযুগের দেহাসক্তির ভিত্তিতে নাট্যকার দীনবন্ধু যে নির্মল ও বিশুদ্ধ সৌন্দর্যচিত্র এঁকেছেন, শুধু বাঙলা সাহিত্যে কেন, তা' যে-কোন সাহিত্যে দুলর্ভ। তথাকথিত অশ্লীল শব্দ দিয়ে তিনি যে জীবন্ত সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, সম্ভবত তা' তুলনীয় একমাত্র সেক্সপীয়ারের সঙ্গেই। সেক্সপীয়ার বা বেন জনসনের মধ্য দিয়ে জীবনের যেসব সত্য আবিষ্কৃত হয়েছে, আজকের দিনে আমাদের কাছে তা" রীতিমত অভাবনীয়। প্রকাশের ভাষায় দীনবন্ধু সর্বত্র সাধুরীতি ও দেশীয় রীতিকে ঠিকভাবে অবশ্য মেলাতে পারেন নি। বা চান নি। দুটি রীতিতে তথাকথিত রুচি-হীনতার সাহায্যে তিনি যে সাহিত্যধারা অবারিত করেছেন, তার মধ্যে দেশীয় রীতির সম্ভাবনা ছিল প্রচুর। হয়ত তিনি আরো এগিয়ে যেতেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু হয়ে অতখানি যাবার শক্তি তাঁর ছিল না। সেক্সপীয়ারের 'হ্যামলেট' নায়িকা 'ওফেলিয়া'কে

অতি অকপটেই তরুণী প্রেমিকার দুটি উরুতে শোয়ার আনন্দের[২৭] কথা বলতে পারে। কিশোরী ওফেলিয়ার কণ্ঠে রতি-বিলাপও বেমানান ঠেকেনা। কেননা, শিল্পী হিসাবে সেক্সপীয়ার অতি নিপুণ। তার ওপর তাঁর সহায় ছিল যুগধর্ম ও সাহিত্যধর্ম, উভয়ই।

তাই ভাষা ও ভাবনায় সেক্সপীয়ার যে বিপুল সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, সে জাতীয় সাহস আমাদের বাঙলা সাহিত্যের সংকীর্ণ ধারায় আজো অকল্পনীয়। তবে ঐ অনাবৃত বলিষ্ঠ জীবনবোধের স্পর্শ যদি কোনো শিল্পীর কাছে গত যুগে আমরা পেয়ে থাকি, তিনি আর কেউ নন, দীনবন্ধু মিত্র। এ-জাতীয় সাহিত্যকর্মে তিনি একাই ব্রতী ছিলেন। মোট কথা, সেকালের শিল্পসাম্রাজ্যে তিনি এক নির্জন নিঃসঙ্গ সম্রাট। বাঙলা সাহিত্যে তাঁর পূর্বসূরীও যেমন কেউ ছিল না, তাঁর উত্তরাধিকারীও তেমনি বিরল। এ ব্যাপারে তিনি বোধ হয় নিঃসন্তান।

সংলাপ

ডেনমার্কের যুবরাজকে বাদ দিয়ে হ্যামলেট নাটকটিকে যেমন চিন্তা করা যায় না, যেমন ভাবা যায় না জল ছাড়া মাছের জীবন, ঠিক অনুরূপভাবেই সংলাপহীন নাটকের অস্তিত্ব অকল্পনীয়।

তবে সংলাপ কীভাবে রচিত হয় এবং তার আদর্শ কেমনতর হওয়া উচিত এ নিয়ে তর্কের অবকাশ আছে। গ্রীক নাটকে যেভাবে সংলাপ রচিত হত, সেক্সপীয়ারের নাটকে কী সেই ধারাই অনুসৃত হয়েছে? আর সেক্সপীয়ারের অনুকরণে শ', গলস্‌ওয়ার্দি বা ও'নীল কী তাঁদের সংলাপ নির্মাণ করেছেন! মলিয়্যের-ইবসেনে কী সাযুজ্য কল্পনা সম্ভব? ইয়েটস্‌ ও মেটারলিঙ্কের কাব্যময় সংলাপের সঙ্গে আমাদের গিরিশচন্দ্রের কী কোনো সাদৃশ্য আছে? —না। প্রত্যেক নাট্যকারই তাঁর নিজস্ব ভাষায় সংলাপ রচনা করে থাকেন। কেউ করেন গদ্যে। কেউ কবিতায়। কাব্যময় গদ্য কারো কারো পছন্দ। আবার কারো দুর্বলতা আছে গদ্যময় কাব্যের ওপর। —অমিত্রাক্ষর ছন্দেও আবার অনেকের অনুরাগ। প্রতিদিনের ব্যবহৃত মুখের ভাষা দিয়ে একেবারে খাঁটি বাস্তব নাটক রচনা করছেন, এমন শিল্পীর সংখ্যাও কম নয়। নাট্যকারের স্বাতন্ত্র্য ও নাটকের প্রকরণগত বৈচিত্র্যের জন্য সংলাপেরও প্রকৃতি বদলায়। অবশ্য, সকল নাট্যকারই একথা স্বীকার করবেন যে সংলাপ এমন হওয়া দরকার, যা বক্তার চরিত্ররূপকে মুহূর্তে তুলে ধরবে আমাদের চোখের সামনে।

সহায়তা করবে পরিস্থিতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও ঈপ্সিত রসকে পরিস্ফুট করতে। মোটকথা, সংলাপের উৎকর্ষেই নাটকের উৎকর্ষ। সংলাপ অবহেলিত হলে নাটকের ব্যর্থতাও সুনিশ্চিত। প্রতিটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে অনেক প্রচেষ্টা ও পরিশীলনে গড়ে ওঠে ঐ নাটকের ভাষা। শিল্পীদের অনেক শ্রম ও অনুশীলন এর পিছনে হয় ব্যয়িত। অতঃপর সেই সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর সাফল্যের সাত-মহল প্রাসাদ গড়ে ওঠে।

কিন্তু আমাদের বেলায় তা' হয় নি। বাংলা নাটকে সংলাপের আদর্শ আজো পাওয়া যায় নি।—এই একই খাতে দুর্বল সংলাপ ধারা গত শতকেও ছিল প্রবাহিত। একই তরঙ্গমালায় আমাদের সংলাপ ছিল উদ্বেল এবং অনুরূপ বন্যায় আপ্লুত। তবে একজন নাট্যকারকে অন্ততঃ স্মরণ করা যেতে পারে, যিনি চেয়েছিলেন ভিন্ন খাতে নাট্যধারাকে বাহিত করতে। খাঁটি ইউরোপীয় আদর্শে নাটক রচনার জন্য ছিল তাঁর সযত্ন প্রয়াস। সেই বিস্মৃত শিল্পী আর কেউ নন, স্বয়ং দীনবন্ধু মিত্র। বলার অপেক্ষা রাখে না, যুগসন্ধির লগ্নে সংলাপ রচনায় তিনি যে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন,—যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ছাপ রেখে গেছেন,—এখনো তা' নতুন আলোর ইশারা দিতে সমর্থ।

তবে সেদিনকার সমস্যা ছিল আরো অনেক বেশি। সেদিন সংলাপে সাদামাটা হিসাবে যা ব্যবহৃত হত, তা' হল গদ্য। আধুনিক বাংলা নাটকের যখন জন্ম হয়, বাংলা গদ্য তখনও ক্ষীণ ও দুর্বল। সেই শিথিল ভাষা দিয়ে উপযুক্ত সংলাপ নির্মাণ করা ছিল রীতিমত কঠিন। সেদিন ঐ শ্লথ গদ্য আবার বিভক্ত ছিল দুটি ধারায়। সংস্কৃত পাঠশালায় লালিত ধারা ছিল রীতিমত গুরু-গম্ভীর। অন্যটি কথ্য ভাষার ওপর নির্ভরশীল—আরবী-ফারসী শব্দে পরিপুষ্ট। প্রথমটি মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের। দ্বিতীয়টি 'আলাল-হুতোমে'র। দুটিই অপরিণত। সংলাপে অনুপযুক্ত। যে সবলতা থাকলে সার্থকতা অবশ্যম্ভাবী, বাংলা গদ্যে তা' তখনও ছিল অনুপস্থিত। আর কবিতা?—তার কথা না তোলাই ভালো। মাইকেল তখনো কবিতায় হাত দেন নি। সুতরাং মিত্রাক্ষরের শৃঙ্খলে বাংলা কবিতা সেদিন দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ—এ হেন দুর্লগ্নে আধুনিক বাংলা নাটকের জন্ম।

বাংলা নাটকে মধুসূদনই প্রথম শিল্পী, যিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় সাহিত্যধারার সঙ্গে সমানভাবে ছিলেন পরিচিত। ইতিহাসের দিকে চোখ রেখে বলা যায় তাঁর স্পর্শেই বাংলা নাটকের হল স্বপ্নভঙ্গ। অপরিণত বাঙলা

গন্ত দিয়ে নাটকীয় সংলাপ রচনা করতে গিয়ে তিনিও কম অস্বস্তিতে পড়লেন না। যদিও 'শর্মিষ্ঠা' রচনা করার সময় ভাষারীতিকে ঢেলে সাজাবার ইচ্ছা ছিল তাঁর, কিন্তু হিতার্থীরা তাঁর ওপর আস্থা রাখতে পারেন নি। তাঁরা চেয়েছিলেন, রামনারায়ণকে দিয়ে সমস্ত নাটকটি সংশোধিত করা হোক। এ হেন প্রস্তাবে মধুসূদন ক্ষুব্ধ না হয়ে পারেন কী? তাঁর রচনায় যে নতুন রীতির পরীক্ষা আছে, রামনারায়ণ তার কী বুঝবেন?—হয়ত দু-একটি ব্যাকরণগত ত্রুটি বা বানান ভুল রামনারায়ণ ধরে দিতে পারেন, কিন্তু তার বেশি কী সম্ভব?—আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে শিল্পী যে রসমূর্তি নির্মাণ করেন, একজন ভিন্ন রীতির মানুষ তার সবটা বুঝতে পারেন কী? একটি চিঠিতে মধুসূদন ঐ তত্ত্বই ব্যাখ্যা করে লিখলেন—'আমি চাই নি যে রামনারায়ণ আমার বাক্যগুলিকে ঢেলে সাজাক। নিশ্চয়ই নয়। যদি ব্যাকরণগত কোনো ত্রুটি থাকে, সেটুকু সংশোধনের জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছিলাম,—'ইউ নো দ্যাট এ ম্যানস্ স্টাইল ইজ দি রিফ্লেক্শন্ অব হিজ মাইন্ড—একজনের বাচন-রীতি তার নিজের মনের প্রতিফলন।'[২৩] সুতরাং—

'শর্মিষ্ঠা' নাটকে সংলাপ রচিত হয়েছিল সংস্কৃত-ঘেঁষা তৎসম শব্দযুক্ত ভাষায়। আর সে ভাষা সাধারণ দর্শকদের পক্ষে আদৌ বোধ্য ছিল না। শ্রোতৃমণ্ডলী[২৪] তা' নিতেও পারে নি। গ্রন্থটিকে ইংরেজীতে অনুবাদ করার সময় নাট্যকার এই ত্রুটির কথা বুঝতে পারলেন। কিন্তু মজা এই যে, তিনি এ দোষ নিজের ঘাড়ে না নিয়ে চাপিয়ে দিলেন শ্রোতৃমণ্ডলীর ওপরেই। অর্থাৎ সংস্কৃতঘেঁষা ভাষায় তাদের অধিকার না থাকাটাই যেন অপরাধ।

কিন্তু নাটকীয় সংলাপ বুঝতে না-পারার জন্য দায়ী যদি কারোকে করতেই হয়, তবে নাট্যকারকেই তা' করা উচিত, নয় কী?—উপযুক্ত সংলাপের মাধ্যমে নাটকের সঙ্গে শ্রোতাদের একাত্ম করাই হল নাট্যকারের কর্তব্য। তিনি কী তাঁর এ দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন?

উঁচু ভাবের গায়ে নাট্যকার যত খুশি পোশাক চাপান, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু বাঙলাদেশের স্বতন্ত্র বাচন-রীতিকে না জেনে কোনো বাঙালীর পক্ষে নাটক লিখতে যাওয়া একটি বিড়ম্বনা মাত্র। প্রবাদের ব্যবহার, শব্দের গ্রাম্যতা বিচার, অলংকারের প্রয়োগ, পোশাক-আশাক ও ঘর-গৃহস্থালির সামাজিক খুঁটিনাটি না জেনে সংলাপ রচনা করতে যাওয়া মূঢ়তার নামান্তর। মধুসূদন এ তথ্য জেনেছিলেন, তবে তা' অনেক দেরিতে; কিন্তু দীনবন্ধু সহজাত দক্ষতা নিয়ে বাংলা নাটকে হাত দিয়েছিলেন। আর

মধুসূদনের সফলতার আদর্শত চোখের ওপর ছিলই। সংলাপের ভাষা তখনো সমস্যাসংকুল, জটিল। মধুসূদনের অভিজ্ঞতা ও সহজাত প্রতিভা দুই-ই দীনবন্ধুকে করল সহায়তা। ফলে, তাঁর হাতেই বাংলা নাটকের যুগান্তরের ইঙ্গিত এলো।

দু'রীতির বাংলা গদ্যের ফাঁদ প্রথমেই জড়িয়ে ধরল দীনবন্ধুকে। আর মধুসূদনের মতই উঁচু ভাবের গায়ে কাব্যের পোশাক চড়াতে তিনিও যত্নবান না হয়ে পারলেন না। মাইকেলের মতন তিনিও ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষায় শিক্ষিত। ইংরেজী ও সংস্কৃত দুটিতেই তাঁর ছিল সমান অধিকার। কল্পনাপ্রবণ ও অভিজাত শ্রেণীর চরিত্রের মুখে সেক্সপীয়ার যে কাব্যময় ভাষা দিয়েছেন, তা' তিনি বহুবার পড়েছেন। বহুপঠনে কণ্ঠস্থ। কলিদাসের কাব্যময় সংলাপও তাঁর কাছে অপরিচিত নয়। সংসারের ধূলিধূসর রুক্ষতার উর্দ্ধে সে যে স্বপ্নবৈভব রচনা করে, সেই ঐশ্বর্যের আকর্ষণ কাটানো দীনবন্ধুর মত শিল্পীর পক্ষে ছিল দুঃসাধ্য। ফলত, তিনি যেখানে কল্পনাপ্রবণ উচ্চশ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টি করেছেন, তাদের মুখে কাব্যময় সাধুরীতির গদ্যই তুলে ধরেছেন। আর এ যে কী সাংঘাতিক চোরাবালি, না-ডোবা পর্যন্ত তা' বোঝাই যায় না। এর ওপর গদ্যচর্চার অনুরূপ ব্যাধি যদি একটু আগে থাকতে সংক্রামিত থাকে, তবেত কথাই নেই!—দীনবন্ধুর ঐ ব্যাধি ছিল। সুতরাং অঘটন ঘটল।

নাটক লেখার অনেক—অনেক আগে তরুণ দীনবন্ধু যখন 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন, সে সময় কবিতা ছাড়া তিনি অন্য বিষয়ে কলম ধরতেন না। তবু একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ রচনায় তিনি একদা আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। সেই গদ্যরচনার নাম 'জনক জননীর স্নেহ'। তার কিয়দংশ উদ্ধার করা যেতে পারে তাঁর গদ্য চর্চার নমুনা হিসাবে,—

'সর্বতেজঃপুঞ্জ-করুণা বরুণাগার-নির্ম্মল-নির্ব্বিকার-সর্ব্বসদগুণাধার-পরমপবিত্র-অনাদ্যনন্ত দেবমণ্ডিত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যাবতীয় সৃষ্টিবস্তু দৃষ্টিপথে পতিত হয় অথবা মেধা সহযোগে মনোভাণ্ডারে আনা যায়, তৎসমূহের প্রতিক্ষণকাল অনন্যমনে এবং সরলান্তঃকরণে জ্ঞানালোচনা করিয়া দেখিলে অচিরাৎ প্রতীতি হইবে তাহারা নিরন্তর নিয়ন্তার গুণরাশি প্রকাশ করিতেছে।'[২৫]

মৃত্যুর এক বছর আগে বারোশ উনআশি সালের কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে 'মধ্যস্থ' পত্রিকায় এই লেখক 'পোড়া মহেশ্বর' নামে একটি গল্প লেখেন, সে গদ্যের নমুনাও তুলনামূলক আলোচনার জন্য সংগ্রহ করা যেতে পারে,—

...পৃথিবী মৃত্যুঞ্জয়ের কুসুমোদ্যান, তরুগুলি সজল জলদরুচি লতাপল্লবে

অবিরত সুশোভিত থাকে, কুসুমকুল বিকশিত হইয়া সুশীতল-সমীরণ-সহকারে সৌরভ বিতরণ দ্বারা সকলের চিত্তবিনোদন করে, এই তাঁহার ইচ্ছা, পরশ্রী-কাতর, পাষণ্ড নির্দয় নীচাত্মারা কাননের কোমলপত্র ছিন্ন করে বসন্তানিলান্দোলিত মুকুল ভারাবনত লতিকার উচ্ছেদ করে, পরিমল-পরিপূর্ণ বিকাশোন্মুখ অথবা বিকশিত কুসুম সমূহ অবচয়ন করে, তাঁহার অভিপ্রায় নহে।'[২৬]

উদাহৃত দুটি ভাষাই বিবৃতিমূলক। তৎসম শব্দ ও সমাসভারে ভারাক্রান্ত। কোনো কোনো জায়গায় শব্দ ও সমাসের আবরণ ছিন্ন করে বাচ্যার্থ খুঁজে পাওয়া কঠিন। এ ভাষায় নাটকত দূরের কথা, গল্পও লেখা যায় না। সেই প্রথম জীবনে কাব্য রচনার আরম্ভ থেকে—শেষদিনে যখন তিনি সাহিত্যলক্ষ্মীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলেছেন, দীনবন্ধু ঐ ভারী গদ্যের সাধনাই গেছেন করে। আর যেখানে তিনি গভীর-গম্ভীর, অভিজাত ও কল্পনাপ্রবণ চরিত্রচিত্রনে যত্নবান, সেখানে সংলাপ রচনায় ঐ ভাষার ফাঁদে পা না-দিয়ে তিনি পারেন নি। সুতরাং ব্যর্থতাও হয়েছে অনিবার্য। 'নীলদর্পণ' নাটকে সর্বাপেক্ষা করুণ পরিবেশে তিনি গম্ভীর হতে গিয়ে ঐ ভুলই করে ফেললেন। গোলোক বসু ও নবীনমাধব তখন মৃত—শোকাঘাতে জননী পাগল হয়ে কনিষ্ঠা পুত্রবধূকে হত্যা করেছেন। সেই বিষাদবিধুর পরিবেশে ঐ দৃশ্য দেখে বিন্দুমাধব যে স্বগতোক্তি উচ্চারণ করেছে, তা' ঐ ভাষার জন্যই ব্যর্থ,—

'হে মাতঃ, জননী যেমন যামিনীযোগে অঙ্গ চালনাদ্বারা স্তনপানাসক্ত বক্ষঃস্থলস্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বধ করিয়া নিদ্রাভঙ্গে বিলাপে অধীর হইয়া আত্মঘাত বিধান করে, আপনার যদি একণে শোকদুঃখ বিস্মরিয়া ক্ষিপ্ততার অপগম হয়, তবে আপনিও আপনার জীবনাধিক সরলতা বধ জনিত মনস্তাপে প্রাণত্যাগ করেন।'[২৭]

না, এ শোকের ভাষা নয়। চারিদিকে যখন মৃত্যুর কালোছায়া দোদুল্যমান, মর্মান্তিক যন্ত্রণায় চিত্ত যখন বিকল, তখন কী কারো মুখ দিয়ে এ ভাষা বেরোয়?

মোটকথা, যে চরিত্রগুলিকে দীনবন্ধু যত্নের সঙ্গে কবিত্বের ভাব দিয়ে মুড়ে সাজিয়ে গুছিয়ে তুলেছেন, সে সব চরিত্র কেবল ঐ যত্নের জন্যই ব্যর্থ হয়ে গেল। 'নীলদর্পণ' নাটকে গোলোক বসু, নবীনমাধব, বিন্দুমাধব এবং অপরাপর উচ্চ শ্রেণীর চরিত্রগুলির প্রধানতঃ এ কারণে বিফল। আর যে-চরিত্রগুলি উপেক্ষিত,—তাঁর কবিত্বের স্পর্শ পায় নি, ঐশ্বর্যশালী ভাষা থেকে বঞ্চিত,

তারা ঐ অযত্নের জন্যই সফলতা লাভে সমর্থ হয়েছে।—'নীলদর্পণে'র সাধুচরণ ও রাইচরণ ঐ বৈপরীত্যের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। সাধুচরণ ভদ্রঘেঁষা, তাই দীনবন্ধু তার মুখে সযত্নে কিছু সাধু ও মার্জিত ভাষা তুলে দিয়েছেন। আর ঐ সাধুভাষা শুধু দেওয়ানের গায়ে নয়, শ্রোতৃবর্গের পিঠেও 'ঝাঁটার বাড়ি'[২৮] মারে। অথচ কেবল চাষাদের ভাষার জন্যই রাইচরণ অতি সহজেই হয়ে ওঠে দীপ্ত।

উচ্চ শ্রেণীর চরিত্রের বিফলতার কারণ হিসাবে নাট্যকারের 'অভিজ্ঞতার অভাব'কে দায়ী করেছেন অনেকে।[২৯]—কিন্তু তা' কী বিশ্বাসযোগ্য?—উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত, উচ্চ-রাজকর্মে নিযুক্ত, রাজকীয় খেতাবে ভূষিত এবং সেকালে অভিজাত সমাজের সঙ্গে যাঁর অবাধ মেলামেশা, সেই মানুষটি এঁদের সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, তাও কী কখনও হয়?[৩০]—আসল কথা তা' নয়। ওরা কাল্পনিক। আধা-বাস্তব আধা-কল্পনায় ভরা সংস্কৃত বা ইংরেজী নাটকের আদর্শে তিনি কিছু চরিত্র-সৃষ্টিতে উদ্যোগী ছিলেন। এরা সিরিয়াস। তাই গম্ভীর গন্ধ এদের মুখে তুলে দিয়েছেন নাট্যকার। দিয়েছেন দুর্বোধ্য ও কাল্পনিক ভাষা। আর ঐ ভাষার টানে চরিত্রগুলি হয়ে গেছে আড়ষ্ট। একজন মনস্বী সমালোচকও সমর্থন করেছেন এই অনুমানকে,—'তাহাদের মুখে কাব্যোৎকর্ষের জন্য যে ভাব ও ভাষা দেওয়া হইয়াছে তাহা সঙ্গত বা স্বাভাবিক হয় নাই। এই কৃত্রিম ভাব ও ভাষার আধিক্য যদি বাদ দেওয়া যায় তবে আপত্তির রেশ কিছু থাকে না।'[৩১]

দীনবন্ধু যেখানে অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল, ভাষা সম্পর্কে যেখানে তাঁর সযত্ন প্রয়াস নেই, সেখানে ভাষার বিড়ম্বনাও নেই। ওখানে তাঁর সৃষ্টিশীল লেখনী যেন আপন দীপ্তিতে ঝিলিক দিয়ে উঠছে। যার মুখে যে ভাষা মানায়, নিঃসংকোচে তার মুখে সে ভাষা তুলে দিয়েছেন তিনি। ফলতঃ অশ্লীল গালাগাল, অশালীন ইঙ্গিত—বাদ যায় নি কিছুই। তোরাপ-রাইচরণ, ক্ষেত্রমণি-পদীময়রাণী, নদেরচাঁদ-হেমচাঁদ, কাঞ্চন-নিমচাঁদেরা কেবল ঐ জীবন্ত ভাষার জন্যই বাংলা সাহিত্যে অমরতা লাভ করেছে। যাতে রক্ত টগবগ করে ফোটে, বা একটি রক্তমাংসের মানুষ অতিসহজে ওঠে জীবন্ত হয়ে, বা যে ছোঁয়ায় হাসি-কান্নার মণিমুক্তো ঝরে,—সেই সোনার কাঠির নামই কী ভাষা?—এক সমালোচক এর জবাব দিয়ে লিখেছেন—'ইহার নাম ভাষা।.........এ ভাষার শব্দ গ্রন্থনে মনুষ্যহৃদয়ের আদিম ভাষাকে বাংলারীতির মধ্যে বাঁধিয়া দিতে হইয়াছে—এ ভাষার উপাদানে, মৃত্তিকার

প্রতিমার মত, একটা নাটকীয় অবস্থার চরিত্র গড়িতে হইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের দুর্ভাগ্য যে এ ভাষার এ প্রয়োজন এখন আর নাই, নাই বলিয়াই বাংলাভাষা এখন কুলত্যাগিনী হইয়া 'রোগ'-এর ভাষায় পরিণত হইয়াছে।'[৩২]

যে-সংলাপ রচনায় নাট্যকার দীনবন্ধু অভাবিত সফলতা দেখালেন, তার চাবিকাঠিটি কী, একবার খোঁজ করে দেখা যেতে পারে। তাঁর সংলাপে কী এমন উপাদান আছে, যা ঐ মনীষী সমালোচককে অতখানি অভিভূত করল! এর কারণ হিসাবে কয়েকটি তথ্য অবশ্যই দাখিল করা যায়। এ দেশের চিরন্তন কথ্য রীতির ওপর নির্ভর করে দীনবন্ধু যে তাঁর ভাষাকে তৈরী করেছিলেন, সেটিই হল তাঁর অসাধারণ সাফল্যের কারণ। কথায় কথায় তাঁর চরিত্রসমূহের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে ছড়া, এসেছে ডাকপুরুষের বচন। আর প্রবাদ মাত্রাত ঝাল-মসলার মত আছেই। এ ভাষায় আমাদের চিরকালের অভ্যাস। অসাধারণ চাতুর্যে নাট্যকার সেই চিরকালীন পথই নিয়েছেন। গ্রাম্য উপমা, পীরের গান, সেকালের রসিকতা—ঐতিহ্যগত কোনো উপাদানই অব্যবহৃত থাকেনি তাঁর হাতে। খাঁটি বাংলা দেশের কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠেছে তাঁর নাটকে।

প্রথমে, প্রবাদের কথাই ধরা যাক। এমন প্রচুর ও বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রবাদের ব্যবহার খুব কম নাট্যকারের শিল্পেই দেখা যায়। আর বাক্য-গ্রন্থনে প্রবাদের যে শক্তি, তা' অপরিসীম। 'উইট' ও 'উইজডমে'র অপূর্ব সমন্বয় হল এই প্রবাদ। সমালোচকের ভাষায় বলা যায়—'দি উইট অব ওয়ান ম্যান অ্যাণ্ড উইজডম অব মেনি'।[৩৩] আর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বলা যায়,—এরা নিজেরাই এক একটা ছোট্ট বাঙলা।—'…ইহাতে বাংলাদেশের প্রাত্যহিক গৃহস্থালির দ্বন্দ্ব কলহ, দ্বেষ হিংসা, উত্তেজনা অবসাদ, দৈন্য সঙ্কীর্ণতা, অক্ষম অসহিষ্ণুতা, পানাপুকুরের ঘাট হইতে পিছনের আঁস্তাকুড় পর্যন্ত, কোন কিছুই বাদ পড়ে নাই। এখানে মানুষ দেবতা নয়, ভাল মন্দ লইয়া রক্তমাংসে গড়া নিতান্ত ক্ষুদ্র দুর্বল মানুষ, তাই বাঙালীর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের এমন নিখুঁত ঘরোয়া-চিত্র অন্যত্র পাওয়া যায় না।'[৩৪]

সেকালের বাংলাদেশের এই প্রবাদ প্রবচনের চর্চা ছিল ব্যাপকতর। ইংরেজী শিক্ষার কল্যাণে আমাদের সংলাপ থেকে এরা খসে পড়েছে ধীরে ধীরে। তবু গত শতকে এরা আমাদের সাহিত্যে কম ছিল না। ভবানীচরণের রচনায়, টেকচাঁদের ও হুতোমের নকশায়, এমন কী মধুসূদনের 'মেঘনাদবধে'ও

এদের নিঃশব্দ অনুপ্রবেশ লক্ষণীয়। গত শতকের কতকগুলি গ্রন্থের নাম পর্যন্ত প্রবাদমূলক। যথা,—'আলালের ঘরের দুলাল', 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'যেমন কর্ম তেমনি ফল', 'হিতে বিপরীত', 'ভাগের মা গঙ্গা পায় না', 'ঘর থাকতে বাবুই ভেজে', 'চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা', 'একেই বলে ঘোর কলি', 'লোভে পাপ পাপে মৃত্যু', 'চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী', 'কলির বউ ঘর ভাঙ্গানী' প্রভৃতি অনেক নামই উল্লেখ করা যায়।

প্রবাদের হাত ধরেই এগিয়ে আসে ছড়া। প্রবাদ যদি পুরুষ হয়, ছড়া হল তা'হলে নারী। এমন মেয়েলি রীতি কচিৎ দৃষ্ট হয়। হঠাৎ শুনলে কবিতার চরণ বলে ভ্রম হবে। ঐ ছন্দবহুল মেয়েলি ছড়ার ভিতর দিয়ে গৃহিনী ও গৃহকন্যাদের চরিত্র যে ভাবে ফুটে ওঠে, যে সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব আভাসিত হয়, তা' অতুলনীয়। সমালোচকের উক্তি উদ্ধার করে বলা যায়—'···মেয়েদের ছড়ার মধ্য দিয়ে আমরা বাংলার মেয়েদের মনস্তত্ত্বের এমন একটা আভাস পাই, যা অন্যত্র সুদুর্লভ। বাঙলার মেয়েদের সঙ্কীর্ণতা—যেমন প্রতিবেশিনীর উপর হিংসা আর বিদ্রূপ, বাপের ঘর থেকে সদ্যোবিচ্ছিন্ন নববধূর প্রতি উপেক্ষা ও স্নেহ-হীনতা, সতীনের প্রতি হিংস্রভাব, ঘর-জামাইয়ের উপর অশ্রদ্ধা, নব-বিবাহিত পুত্রের উপর মায়ের সতর্কদৃষ্টি—এইসব ঐ ছড়াগুলির মধ্যে থেকে ফুটে বেরোয়।'[৩৫]

যিনি এগুলিকে কাজে লাগাতে পেরেছেন, বিনা আয়াসেই খাঁটি বাঙ্গালী চরিত্র আঁকার ছাড়পত্র তিনি আয়ত্ত করেছেন। প্রবাদ ও ছড়ার আলোকে স্ত্রী-চরিত্রগুলিত বটেই, নবযুগের শিক্ষিত পুরুষেরা পর্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ইংরেজি বাক্যরাজির সঙ্গে বাঙলা প্রবাদের ব্যবহার নিমচাঁদকে কী অবিস্মরণীয় করেনি?

দীনবন্ধুর সাহিত্যের আয়োজন অবশ্য খুবই সামান্য। তবু ঐ স্বল্প পরিবেশে নাটকে ও কাব্যে তিনি যে প্রবাদ ব্যবহার করেছেন, তা' চারশোরও বেশি।—[৩৬] সংলাপসৃষ্টিতে তাঁর অসাধারণ সফলতার পিছনে এদের অবদান সর্বাধিক।

কেবল প্রবাদ প্রবচনে নয়, তিনি আমাদের দেশীয় প্রবণতাগুলিকে যে ভাবে কাজে লাগিয়েছেন, তাও রীতিমত চমকপ্রদ। বিশেষতঃ মেয়েদের সংলাপে। রোমান-বাগ্মী সিসেরোর সেই বিখ্যাত গল্পটি এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যেতে পারে। শাশুড়ির কথা শুনতে শুনতে তাঁর নাকি মনে হত তিনি যেন ল্যাটিন কবি 'প্লাউতুস' বা 'নায়ভিউস'-এর কথা শুনছেন।—কারণ?

সেই প্রাচীন কবিদের ভাষা সিসেরোর কালে ছিল অচলিত। কিন্তু মেয়েদের ভাষা সেই অচলিত ভাষাগুলিকে যত্নের সঙ্গে ধরে রাখে।—এ প্রবণতা শুধু রোমান রমণীদের বৈশিষ্ট্য নয়, বাঙ্গালী মেয়েদেরও এটি একটি বিশেষ গুণ। যে সব সাহিত্যিক এসব তত্ত্ব সম্পর্কে সচেতন, তাঁরা খুব সহজেই মেয়েদের চরিত্র আঁকতে সক্ষম। যাঁরা তা' নন, তাঁরা ব্যর্থ।—দীনবন্ধু এ বিষয়ে সক্ষম শুধু নন, দক্ষও। তিনি বাঙালী মেয়েদের আরো অনেক প্রবণতাকে কাজে লাগিয়েছেন। যথা, 'ল' স্থানে 'ন'-এর ব্যবহার মেয়েদের একটি উচ্চারণগত বৈশিষ্ট্য। উপসর্গের ব্যবহার, উত্তেজক বিশেষ্য ও ঝাঁঝালো বিশেষণ—আঁটকুড়ো, আকখুটে থেকে পোড়া, রাজ্যি প্রভৃতিতে, কিছু সমাসে, যথা,—হাবাতকুড়ে, হতচ্ছাড়া, শতেকখোয়ারি, নয়তুয়ারি প্রমুখ ভাষণে, কস্‌টি-নাস্‌টি, নাদুস-নুদুস, ডামা-ডোল প্রভৃতি শব্দে এবং যমের অরুচি জাতীয় 'নমিন্যাল ফ্রেজে' ও পিণ্ডি-চটকানো, অমুকের মাথা খাওয়া ইত্যাদি 'ভার্বাল ফ্রেজ'-ব্যবহারে বাঙালী মেয়েদের যে দক্ষতা, এ সবের একটাকেও দীনবন্ধু বাদ দেন নি সংলাপ রচনায়। বরং একটু বেশি মাত্রায় করেছেন ব্যবহার।

আরো প্রগতিশীলতার পরিচয় অবশ্য দীনবন্ধুর সাহিত্যে আছে। লোকগাথা থেকে তিনি যেমন 'পিরের গান' জামাইদের মুখে তুলে ধরেছেন, 'রামায়ণের' কথকতায় যেমন নতুন ভাষ্যের আরোপ করেছেন, রামমাণিক্যের মুখে অনুরূপ ভাবে 'বাঙাল' ভাষার ব্যবহার পরিবেশকে মুহূর্তে চিত্তাকর্ষক করে তুলতে সমর্থ হয়েছে। দীনবন্ধুর জন্ম হয়েছিল নদীয়া জেলায়। শৈশব কেটেছিল চৌবেড়িয়া নামক ছোট্ট একটি গ্রামে। উত্তর-কৈশোরে এসেছিলেন কলকাতায়। সুতরাং নদীয়া ও কলকাতার ভাষা তাঁর নাটকে যে ব্যবহৃত হবে এটিই স্বাভাবিক। তবে দীনবন্ধুর আগেই মধুসূদনের নাটকগুলি আসর অধিকার করেছিল, তাই যে ভাষাদর্শে সেগুলি দীক্ষিত, সেই কলকাতা-যশোহরের ভাষার প্রভাবও দীনবন্ধুকে অনিবার্যভাবে স্পর্শ করল। বিশেষতঃ 'নীলদর্পণে'। এখানে তিনি মধুসূদনকে এড়িয়ে যেতে পারেন নি।

এদিকে ওড়িয়া-হিন্দীতে দীনবন্ধুর অধিকার ছিল সুবিদিত। তাঁর চাকরিই তাঁকে এ যোগ্যতা এনে দিয়েছিল। তাই 'লীলাবতী' নাটকে রঘুয়ার মুখে দীনবন্ধু যে সংলাপ তুলে দিয়েছেন তা' একবারে খাঁটি ওড়িয়া। একবারে দেহাতি। এমন কী একটি প্রবাদও ব্যবহার করেছেন,—

অল্‌পিকে সল্‌পিকে লোকে
মনে বহন্তি গর্বিতা

সারু গাছ মুলে ভেকো
ছত্র দণ্ড ধরইতা।[৩৭]

ক্ষুদ্র চিত্ত যাদের, তাঁদের মনে থাকে গর্ব। মান কচুর গাছ ভেতরে ভেকো, ফাঁপা। কেবল ছাতার মতন আছে বড়ো বড়ো পাতা।—এই হল প্রবাদটির অর্থ। প্রবাদকথক রঘুয়া এই ভাষার দৌলতেই সবিশেষ উপভোগ্য। 'সধবার একাদশী'তে গোকুলবাবুর বাড়ির সমুখে দণ্ডায়মান অযোধ্যা সিং এবং রঘুবীর সিংহের কথাও এ প্রসঙ্গে মনে আসতে পারে। উভয়েই হিন্দীভাষী। তুলসীদাস আবৃত্তিতে উভয়েই সমান দক্ষ। পরে এ জাতীয় চরিত্র বাঙলা সাহিত্যে অনেক দেখা গেছে। তবে জেনে রাখা ভালো, বাংলা নাটকে এ জাতীয় চরিত্র সৃষ্টির পথিকৃৎ দীনবন্ধু স্বয়ং।

এহ বাহ্য। সংলাপের ভাষা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কাব্যকেও দীনবন্ধু কী কম ব্যবহার করেছেন? কাব্যিক সংলাপে মধুসূদনের দুর্বলতার কথা আগেই বিবৃত করা হয়েছে। আর অমিত্রাক্ষরই যে সে-বিপ্লব আনতে পারে এ স্বপ্ন নিয়ে তিনি হয়ত আজো সমাধিক্ষেত্রে আছেন ঘুমিয়ে।[৩৮] যাই হোক, দীনবন্ধুরও প্রায় অনুরূপ বিশ্বাস ছিল যে উৎকৃষ্ট কাব্যের দ্বারাই সংলাপকে সুন্দর করে গড়ে তোলা যেতে পারে। কেবল অমিত্রাক্ষর নয়, এ প্রয়োজনে তিনি আরো অনেক ছন্দকে ব্যবহার করেছেন। অনেক।

প্রথমে পয়ারের কথাই ধরা যাক। 'পয়ার-গয়ার[৩৯] বলে রসিকতা করলেও চৌদ্দ মাত্রার প্রাচীন ছন্দের উপর দীনবন্ধুর দুর্বলতা ছিল সর্বাধিক। হয়ত তাঁর ধারণা ছিল পয়ারের সঙ্গেই বাংলা দেশের নাড়ীর যোগ। তাই উৎকৃষ্ট বাংলা সংলাপ, পয়ার ছাড়া কী সম্ভব? এ চিন্তার দ্বারা তাড়িত হয়ে 'নীলদর্পণে'র উপসংহারে বিন্দুমাধবের মুখে চৌদ্দ মাত্রার পয়ারই ব্যবহার করলেন তিনি। অবশ্য এর জন্য তাঁকে ব্যর্থতাও নিতে হল বরণ করে।

নানা ছন্দ নিয়ে 'নবীন তপস্বিনী'তে এ পরীক্ষা আরও ব্যাপক। শুধু পয়ার-ত্রিপদী নয়, অমিত্রাক্ষরের বৈচিত্র্যও লক্ষণীয়। চৌদ্দ মাত্রার ছন্দকে নাট্যকার আরো শাণিত করেছেন মেজে ঘষে। অশিষ্ট কিশোরের মতন চটুল চৌপদী জলধরের মুখে উঠেছে শিস্ দিয়ে। অভিপ্রেত কৌতুকরস মুহূর্তে উঠেছে জমে। এইভাবে কোথাও কোথাও এসেছে অভাবিত সাফল্য। আবার পরীক্ষা যেখানে বিফল হয়েছে, সেখানে ব্যর্থতার বিরক্তিও কম নয়। 'নবীন তপস্বিনী' নাটকে দুটি ধারা। একটি গম্ভীর। অপরটি লঘু। একটিতে কান্না, অন্যটিতে হাসির ঝিলিক। গম্ভীর অংশের রোমান্টিক

নায়ক হল বিজয়। তার প্রথম প্রেমের আকুলতা প্রকাশের জন্য দীনবন্ধু যে ভাষা খুঁজেছেন, তা' কাব্যিক। এবং ছন্দে তা, অমিত্রাক্ষর,—

এ কি তাপসের মন অচল অটল
হরিণনয়না মুখ পুণ্ডরীক হেরে
এমন ব্যাকুল যেন মণিহারা ফণী,—
কিম্বা সরোবর নীরে মোহ মুকুর
বিচঞ্চল শশধর কলেবর, যবে
পূর্ণিমার সন্ধ্যাকালে, তাপসের কুল,
কূল হতে লয় বারি কমণ্ডলু ভরি।[৪০]......

এ স্বগতোক্তি তিন পৃষ্ঠার। অলঙ্কারে কণ্টকিত, শ্লথগতি। মাতা তপস্বিনীর বেদনাও এই অমিত্রাক্ষরেই হয়েছে প্রকাশিত। তার ভাষাও অনুরূপ। একই ত্রুটিপূর্ণ। অতিকথনে একঘেয়ে। চৌদ্দ মাত্রার গম্ভীর কবিতাও এ কারণে একই দশাই ভুগেছে।

অথচ লঘু কবিতায় দীনবন্ধু সংলাপকে যেন মাতিয়ে তুলেছেন। লোকায়ত 'আলাল-হুতোমী' গদ্যের মতন এ কবিতাতে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ঐ নাটক থেকেই আলোচনার সুবিধার্থে নমুনা সংগ্রহ করা যেতে পারে, যেমন:

(জলধরের সংলাপ :)
মন উচাটন, মালতী কারণ, কই দরশন
পাই গো তার।
(নেপথ্যে মলের শব্দ)
মলেতে মল্লার, বেহাগ বাহার, বাজে চমৎকার
বাঁচিনে আর।[৪১]

বেশি উদ্ধৃতি অকারণ মনে করেই আর নমুনা এখানে দেওয়া গেল না। প্রথম জীবনে কবিতাচর্চাতেই দীনবন্ধুর নামডাক ছিল। তখন তিনি ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। 'সংবাদ প্রভাকরে' গুরুর অনুকরণে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের কবিতা রচনায় খ্যাতি পেয়েছিলেন তিনি তাড়াতাড়ি। পরবর্তী জীবনে নাট্যকার হিসাবে দেখা দিলেন, আর কবি দীনবন্ধু গেলেন হারিয়ে। কিন্তু তাঁর ব্যঙ্গকাব্যের ধারা সংলাপে যে আরেক মূর্তিতে দেখা দিতে পারে, তা' কী আমরা কখনো ভেবেছি? গদ্য সংলাপের মত কবিতাতেও তাঁর সফলতা ও ব্যর্থতার একই কারণ। যেখানে তিনি গম্ভীর, সেখানে তাঁর কবিতাও কৃত্রিম। ফলত, চরিত্র ব্যর্থ। যেখানে তিনি লঘু, হাস্যরসে সমুজ্জ্বল, সেখানে তাঁর কাব্যও

নেচে উঠেছে। চরিত্রও উঠেছে জীবন্ত হয়ে। বাঁকা কথা, ক্ষুরধার ব্যঙ্গের ভাষা, উইট ও হিউমারের সার্থক প্রয়োগ, কাব্যসংলাপের ক্ষেত্রে তাঁকে এনে দিয়েছে অভাবিত সাফল্য। আবার কোন কোন জায়গায় বাঙ্‌লা-দেশের ছড়াপ্রবাদের সঙ্গে এর গভীর মিলও দেখা যায়। মোট কথা, এখানেও তিনি আনতে পেরেছেন বাঙ্‌লাদেশের সেই চিরন্তন রস-প্রবণতার স্পর্শ। তাই বাংলা নাটকের সংলাপ রচনায় দীনবন্ধুর ভূমিকা যে অসাধারণ, তা' স্বীকার করতেই হয়।—সংলাপই যে চরিত্রকে প্রকাশ করে, নাটকের ভাববস্তু ও বক্তব্যকে প্রাণ দেয়, তা' দীনবন্ধু যেভাবে প্রমাণ করেছেন, বাংলা সাহিত্যে আর কেউ বোধহয় তা' করতে পারেন নি। যতই বাস্তবঘেঁষা নাটক হোক-না-কেন, প্রতিদিনকার কথোপকথন,—প্রতিদিনের ভাষায় সংলাপ নির্মাণ করা যায় না। আবার ভাষা যদি কৃত্রিম হয়, তাহলে ব্যর্থতাও অনিবার্য। সুতরাং প্রকৃত সংলাপের ভাষা আছে এর মাছামাঝি। সে প্রতিদিনের ব্যবহারে একঘেয়ে নয়, আবার অব্যবহারে কৃত্রিম পোশাকী নয়। অতিকথন বা অতিসংক্ষেপ কোনোটিই তার গুণ নয়। তবু সে সংহত ও দীপ্ত। মঞ্চে পাদপ্রদীপের আলোয় তাঁর কল্পিত চরিত্রগুলিকে দাঁড় করিয়ে শিল্পী তাকে জীবন্ত করার জন্য যে কয়টি মুহূর্ত পান, তাকে খুব হিসাব করে খরচ করা দরকার। শব্দের ব্যবহারেও বটেই। কুশলী শিল্পী এ বিষয়ে সচেতন। আর যে শিল্পী অসচেতন, তাঁর হাতে নাটকের মৃত্যু অনিবার্য।

সংলাপের ভাষা, দেখা গেল, দীনবন্ধুকে খুঁজে খুঁজে আবিষ্কার করতে হয়েছিল। তাই সব জায়গায় তিনি সমান দক্ষতা দেখাতে পারেন নি। অনেক পথ তিনি নির্মাণ করেছেন, কিন্তু সব পথই সাফল্যের দরজা পর্যন্ত পৌঁছায় নি। তবু যে আদর্শ তিনি রেখে গিয়েছিলেন, তাকে সামনে রেখে এগিয়ে যেতে পারলে আমাদের নাটকে যুগান্তর যে ঘটতে পারত, তা' নিশ্চিত করে বলা যায়। কিন্তু আমরা সে আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে চেয়েছি কী?—না। ফলে, আমাদের সংলাপের ভাষাকে আমরা হারিয়েছি। কবি মোহিতলাল যা ক্ষোভের সঙ্গে আবিষ্কার করেছিলেন সেটিই হল আমাদের জীবনের চরম দুঃখ-জনক ঘটনা। ক্ষেত্রমণির ভাষা,—যা বাংলাদেশের চিরন্তন অন্তরের ভাষা,—সে আজ কুলত্যাগিনী। আর সেই রোগ সাহেবের ভাষা যাকে আমরা কোনোদিন জানতাম না, সে আজ কুলীন হয়ে আমাদের সংলাপে সমাসীন। কুলকন্যার বহিষ্কার ও রোগের সামাজিক সম্মান সত্যিই এক বিচিত্র নাটক। অথচ এই বিসদৃশ ও বিষাদান্ত নাটক আমরাই তৈরি করেছি—।

দীনবন্ধুর আদর্শের উত্তরাধিকার থাকলে এরকম ঘটনা যে ঘটত না, আশা করি, একথা আর নতুন করে বলতে হবে না। আর বাঙ্‌লা সাহিত্যও যে নতুন সম্পদে সমৃদ্ধ হত, একথা পুনরুক্তি করা বাহুল্য মাত্র।

॥ সূত্রনির্দেশ ॥

১। 'কবির নির্বাসন ও অন্যান্য ভাবনা', (এপ্রিল, ১৯৭৩), শিবনারায়ণ রায়, পৃ. ১৬৮

১ ক। 'বঙ্গভাষার লেখক' গ্রন্থের ৫৩২ পৃষ্ঠায় এই আলোচনাটি আছে। এই গ্রন্থের 'পিতা-পুত্র' শীর্ষক আলোচনায় 'ফ্রাইডে রিভিউ'-এর থেকে যে ইংরেজি লেখাটি উদ্ধার করা হয়েছিল, তার বাঙ্‌লা অনুবাদ এখানে দেওয়া হয়েছে। মূল ইংরেজি লেখাটি এইরকম: 'If this trash ever be put on the stage, we cannot recommend a better place for its performance than Sonagachi and a fitter audience than its inmates and their patrons.'

২। এই কথাগুলির লেখক হলেন, রামগতি ন্যায়রত্ন। এঁর লেখা 'বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', পৃ. ৩০৪ দ্রষ্টব্য।

৩। 'ভিক্টোরিয় যুগে বাঙ্গালা সাহিত্য', পৃ. ৩২৩-২৪।

৪। এই সংগ্রহে বিভিন্ন গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হল, পৃষ্ঠা সংখ্যা দেওয়া সম্ভব নয় বলেই এ ব্যাপারে চেষ্টা করা গেল না।

৫। 'কাব্যাদর্শ' : দণ্ডী, প্রথম পরিচ্ছেদ, শ্লোক সংখ্যা, ৩২।

৬। কাব্যালংকার সূত্রম্ : বামন, দ্বিতীয় অধিকরণ, প্রথম অধ্যায়, বৃত্তি-৭।

৭। ঐ, দ্বিতীয় অধিকরণ, প্রথম অধ্যায়, বৃত্তি ১৯।

৮। 'নীলদর্পণ', (সা. প. সং), ১৩৬৬, পৃ. ২৬।

৯। 'সধবার একাদশী', (সা. প. সং) ১৩৫৬, পৃ. ৩১।

১০। 'লীলাবতী', (সা. প. সং) ১৩৫৯, পৃ. ১৩।

১১। 'সধবার একাদশী', (সা. প. সং) ১৩৫৩, পৃ. ১০।

১২। ঐ, পৃ ২০।

১৩। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', (সা. প. সং), ১৩৫৭, পৃ ৫৫।

১৪। 'নীলদর্পণ', (সা. প. সং), ১৩৬৬, পৃ. ২৭।

১৫। 'জামাই বারিক', (সা. প. সং), ১৩৫৭, পৃ. ১৭।

১৬। এই অশ্লীলতার প্রসঙ্গে আলোচনাটি আমরা পাই 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' প্রবন্ধে। এ প্রসঙ্গে 'বঙ্কিমরচনাসংগ্রহ' (১৯৭৩) প্রবন্ধখণ্ড শেষ অংশের, ১১৬১ পৃ. দ্রষ্টব্য।

১৬ ক। এই আলোচনা সুবিস্তৃত। তাই প্রয়াংশে একটুও উদ্ধার করা গেল না। তবে এই আলোচনার সার কথা হল,... 'অশ্লীলতাপ্রিয় পাঠকদিগের সংখ্যা যে দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে তাহাতে সংশয় নাই। এখনকার কতকগুলি পুস্তক ও পত্রের যে ভয়ানক অবস্থা তাহাতে আমরা তাহাদিগের রুচির সঙ্গে পূর্বকালের কবিওয়ালা ও পাঁচালি ওয়ালাদিগের কোন প্রভেদ দেখিতে

পাই না। প্রভেদের মধ্যে এই যে এখন দণ্ডবিধির আইনে অশ্লীলতাদণ্ডের জন্য একটি ধারা আছে, পূর্বে সেইরূপ বিধান ছিল না। সুতরাং এখনকার অশ্লীলতা কিছু অস্পষ্ট, পূর্বকার অশ্লীলতা স্পষ্ট। তাদের কদর্যতা একই প্রকার।'—'বঙ্গদর্শন', পৌষ, ১২৮০।

১৭। 'লীলাবতী', (সা. প. সং), ১৩৫৯, পৃ. ৪৩।

১৮। ঐ, পৃ. ৯৫।

১৯। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', (সা. প. সং), ১৩৫৭, পৃ. ২১।

২০। ঐ, পৃ. ৫৭।

২১। 'বিদ্যাসুন্দর' দ্রষ্টব্য। রায় গুণাকর ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, (বসুমতী সং), পৃ. ২

২২। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', পৃ. ৫৭।

২২ ক। হ্যামলেট বলেছে ওফেলিয়াকে, 'That's a fair thought to lie between maid's legs',—Hamlet : Act III, Sc. II.

২৩। 'I did not wish Ramnarayan to recast my sentences—most assuredly not. I only requested him to correct grammatical blunders, if any. You know that a man's style is the reflection of his mind.'—রামনারায়ণের হস্তক্ষেপ সম্পর্কে এই হল মধুসূদনের বক্তব্য। ডাঃ ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত 'কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী', (১৩৭০) পৃ. ১২৩ দ্রষ্টব্য।

২৪। এ ব্যাপারে মধুসূদন নিজেই কবুল করেছেন,…'as for the Bengali original, the only fault found with it, is that the language is a little too high for such audiences, as we may expect to patronize it.'—'কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী', (১৩৭০) পৃ. ১২৬।

২৫। বিবিধ : গদ্য পদ্য (সা. প. সং, ভাদ্র, ১৩৫৯) দীনবন্ধু মিত্র, পৃ. ৬৪।

২৬। ঐ, পৃ ৩২।

২৭। 'নীলদর্পণ', (সা. প. সং), পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

২৮। 'নীলদর্পণে' সাধুচরণের ভাষার ওপর দেওয়ানের ঐ বিখ্যাত মন্তব্যটি এখানে আবার মনে করিয়ে দেওয়া হল।

২৯-৩০। 'অভিজ্ঞতার অভাবে'র কথা তুলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। বঙ্কিমের বক্তব্য হল, 'লীলাবতী' বা কামিনী শ্রেণীর নায়িকা সম্বন্ধে তাঁহার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। ছিল না, কেন না, কোন লীলাবতী বা কামিনী বাঙ্গলা সমাজে ছিল না বা নাই'।—বঙ্কিমরচনা সংগ্রহ, (১৯৭৩), প্রবন্ধখণ্ড শেষ অংশ, পৃ. ১১৩৪—এখানে মনে রাখতে হবে লীলাবতী বা কামিনী কাল্পনিক বলেই এ অঘটন সম্ভব হয়েছে। এই ব্যাখ্যা কিন্তু নবীনমাধব-বিন্দুমাধবের বেলায় দেওয়া যাবে না, কারণ ঐ জাতীয় চরিত্রের অভাব কিন্তু আমাদের সমাজে ছিল না।

৩১। দীনবন্ধু মিত্র, (মাঘ, ১৩৫৮), ডাঃ সুশীলকুমার দে, পৃ. ৫৩।

৩২। আধুনিক বাংলা সাহিত্য, (১৩৬৫), মোহিতলাল মজুমদার, পৃ. ১১৯, প্রবন্ধের নাম, 'দীনবন্ধু'।

৩৩। প্রবাদ সম্পর্কে এটি আবার একটি আপ্ত বাক্য। অর্থাৎ প্রবাদ সম্পর্কে এটিকে একটি প্রবাদ বলা চলে।

৩৪। 'বাংলা প্রবাদ', (আশ্বিন, ১৩৫২), ডাঃ সুশীলকুমার দে সম্পাদিত, পৃ. ২৭।

৩৫। 'বাংলায় নারীর ভাষা', ডঃ সুকুমার সেন। এই প্রবন্ধটির জন্য দ্রষ্টব্য হল, 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা', ৩৩শ ভাগ, ১৩৩৩, পৃ. ২৩৯।

৩৬। বর্তমান লেখক দীনবন্ধুর সমগ্র রচনাবলীর ওপর একটি প্রবাদের তালিকা তৈরী করেছে, যাতে প্রবাদ ও প্রবাদ তুল্য আপ্তবাক্যের সংখ্যা চারশোরও বেশি। 'সাহিত্য সংসদ' প্রকাশিত ডাঃ ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত গ্রন্থে এরকম একটি তালিকা আছে, তাতে এ সংখ্যা দেখানো হয়েছে ২৫৫টি। অবশ্য এর ভেতর দীনবন্ধুর কাব্য এবং 'কুঁড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ' নাটিকা এবং অপরাপর গ্রন্থ ধরা হয় নি।

৩৭। 'লীলাবতী', দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক, 'সংলাপ'টি রঘুয়ার।

৩৮। মধুসূদনের মূল বক্তব্যটি ছিল, 'I am of opinion that our dramas should be in Blank-Verse, and not in prose, but the innovation must be brought about' by drgress.'—ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত 'মধুসূদনের চিঠিপত্র,' পৃ. ১৭১ দ্রষ্টব্য।

৩৯। 'লীলাবতী' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে হেমচাঁদ যে বক্তৃতা দিয়েছে, তাতে এ জাতীয় মন্তব্য আছে। তার বক্তৃতার একাংশের বক্তব্য হল, 'কতকগুলো পয়ারে বয়ার জুটে মাতৃভাষাকে দগ্ধে মারছেন। পয়ারে বয়ারদের পয়ার গয়ারের মত—কিন্তু সরল গয়ার নয়, গলা আঁচড়ে তোলা—তাঁদের দ্বারায় বন্দা হবে। তাঁদের পদ্যে এত রস, তাঁদের পদ্য, পদ্য কি গদ্য, কেবল চোদ্দয় জানা যায়।'

৪০-৪১। 'নবীন তপস্বিনী', প্রথম অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সাত

'অস্তে গেলা দিনমণি.; আইলা গোধূলি'—

আমাদের পার্থিব জগতে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত যে একটি নিখুঁত সময়ের ব্যবধানে নিয়মিত ঘটে থাকে, তাতে যে একচুল হেরফেরও সম্ভব নয়, আশাকরি, তা' কাউকে ব্যাখ্যা করে বলবার প্রয়োজন নেই। পৃথিবীর নাট্যমঞ্চতে যত অঘটনই ঘটুক না কেন, তার জন্ত এসব নিয়মকানুন কখনো লঙ্ঘিত হয় না। সূর্যাস্ত যেমন আসে, গোধূলির আগমনও তেমনি সুনিশ্চিত। অমোঘ নিয়মে সব নিয়ন্ত্রিত হয়।

এই সুরে সুর মিলিয়ে আমরা একটি জিজ্ঞাসা তুলে ধরতে পারি, আমাদের ভাবের জগতের পরিবর্তনও কী এমনি সূক্ষ্ম সময়ের তারে বাঁধা? উনিশ শতকের তৃতীয় দশকের সূচনাতে এই শহর কলকাতাকে কেন্দ্র করে আমাদের বাঙলা-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে যে নতুন ভাবের উদয় দেখা গেল, তা' কী সাতের দশকের ভেতরেই অমোঘ নিয়মে অস্তাচলবর্তী হল? —১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা নভেম্বর তারিখে দীনবন্ধুর মৃত্যু আমাদের নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি বিষণ্ণ দিন। কিন্তু কী আশ্চর্য, এ তিরোধানত কেবল একজনের নয়, একটু চোখ মেলে তাকালেই দেখা যায়, এই একই বছরে আরো তিনজন বিখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যু ঘটল। ঐ তিনজন হলেন, বিখ্যাত কবি কাশীপ্রসাদ ঘোষ, মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত, এবং নবযুগের নায়ক কিশোরীচাঁদ মিত্র।—ছয়ের দশকের শেষ ভাগ থেকে আরম্ভ করে ঐ সাতের দশকের শেষ পর্যন্ত হিসাব করলে দেখা যায়, গত শতকের যাঁরা বিশাল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ, তাঁরা সকলেই বিদায় নিলেন একে একে। এ বিদায়ের অনেকগুলিই অবশ্য অকাল-বিদায়। তা' কালেই হোক, অকালেই হোক, এঁদের বিদায় একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, রামগোপাল ঘোষ ও প্রখ্যাত পত্রিকা সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ বিদায় নিলেন একেবারে ছয়েক দশকের শেষের দিকে। সাতের দশক পড়তে-না-পড়তেই চলে গেলেন কালীপ্রসন্ন সিংহ ও রাধানাথ সিকদার। পরে একে একে গেলেন দীনবন্ধু-মধুসূদন-কাশীপ্রসাদ-কিশোরীচাঁদ থেকে রাজা কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ও দ্বারকানাথ মিত্র প্রমুখ

মনীষীরা। এঁদের লোকান্তর, অস্বীকার করবার উপায় নেই, আমাদের জাতীয় জীবনে নিঃসন্দেহে একটি শূন্যতার সৃষ্টি করল। আর এমন ইংগিতও পাওয়া গেল যে একটি ভাবধারার অবসান ও অন্য একটি ভাবধারার অভ্যুদয়ের এক আশ্চর্য লগ্ন বুঝি উপস্থিত!

বর্তমান গ্রন্থের প্রথমেই আমরা দেখেছি 'রেনেসাঁসের' নতুন সত্য কী ভাবে আমাদের তরুণ বাঙ্‌লাকে তুলেছিল মাতিয়ে। দিব্য চেতনার পরিবর্তে কী ভাবে আমরা মানবিক চেতনায় হয়েছিলাম উদ্বুদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞান নয়, বস্তুজ্ঞান কী ভাবে আমাদের করেছিল আকর্ষণ, পারলৌকিক ও অলৌকিক কার্যকারণের বদলে ঐহিক বা প্রাকৃতিক কার্যকারণ কী ভাবে আমাদের মনের গভীরে হয়েছিল সঞ্চারিত, একথা আলোচনা করা গেছে বিস্তৃতভাবে। হিন্দু-কলেজের প্রতিষ্ঠা, ডিরোজিয়ানদের বিদ্রোহ, তারো আগে 'ধর্মতলা অ্যাকাডেমির' ডেভিড ড্রামণ্ডের নতুনরীতির শিক্ষাদান, টমপেনের 'এজ অব রিজ্‌নে'র আবির্ভাব, রামমোহন-দ্বারকানাথ-প্রসন্নকুমারের সমাজ ও ধর্মসংস্কারে আত্মনিবেশ, জর্জ টমসনের কলকাতা আগমন, রামগোপাল-তারাচাঁদের জ্বালাময়ী ভাষণ ইত্যাদির ভেতর দিয়ে নতুন যুগ কী ভাবে নিজেকে বিকশিত করল, সেকথা সূচনাতেই বিবৃত করা হয়েছে। বাহ্যত অনেক ভাঙ্গাভাঙ্গি হয়েছে সত্যকথা, কিন্তু একথাও অস্বীকার করা যায় না, এর মধ্যে দিয়ে সত্যিকারের মানবিক সত্যেরও জন্ম হয়েছে। যেখানে মানুষের অধিকার সঙ্কুচিত হয়েছে, সেখানেই দেখা গেছে প্রতিরোধ, উচ্চারিত হয়েছে প্রতিবাদ। ইউরোপের তুলনায় আমাদের 'রেনেসাঁসে'র গভীরতা ও স্থায়িত্ব যে স্বল্পকালীন, হিসাবের কষ্টি পাথরে তা' সহজেই ধরা পড়ে। কিন্তু তাই বলে কোনো রকমেই উপেক্ষনীয় নয় আমাদের এই 'নবজাগরণ'। চোদ্দশ তিপ্পান্ন খ্রীষ্টাব্দে অটোমান তুর্করা যেদিন 'কন্‌সটান্‌টিনেপল' দখল করে বসল, ঠিক সেইদিন থেকে যদি ইউরোপীয় রেনেসাঁসের কালগণনা করতে হয়, তা'হলে সাড়ে তিনশ বছর কাল অর্থাৎ 'ফরাসীবিপ্লবে'র অব্যবহিত কয়েক বছর পর পর্যন্ত এই স্থায়ীত্বকে স্বীকার করে নিতেই হয়। ঐ সাড়ে তিনশ বা কারো কারো মতে চারশো বছরের সময়কালে বহুবিচিত্র মানুষ দেখা দিয়েছেন, যাঁরা নানা ধারায় ও নানা ভাবে বহন করে নিয়ে গেছেন 'রেনেসাঁসে'র সত্যকে।—আমাদের দেশে 'রেনেসাঁসে'র বিকাশ ধারা কিন্তু ঠিক এইখাতে বাহিত হয় নি। যদিও বন্যার মত দুর্বার বেগে এই নতুন ভাবধারা আমাদের সংস্কৃতির নীচু জমিগুলিকে ভাসিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু

মাত্র সাড়ে চারদশকের ব্যবধানে দেখা গেল, সে বন্যা আর নেই। বন্যা নেমে গেছে। পরিবর্তে ঐ ঢালুজমিতে দেখা দিয়েছে ভালো ও কোমল 'পলি'। পুরান ফসলের চিহ্নমাত্র নেই, কিন্তু নতুন ফসলের জন্য ভূমি প্রস্তুত। জানিনা, সমালোচকরা এই পর্যায়টিকে কী ভাবে ব্যাখ্যা করবেন। কিন্তু পুরান সঞ্চয় নিয়ে বেচা-কেনা যে চলবে না, তা' সুনিশ্চিতভাবেই বলা যায়।—আমাদের ইতিহাসে উনিশ-শতকের সাতের দশক সেই রকম একটা তাৎপর্যের ইংগিতবাহী।

শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই এই সময়কার বঙ্গসমাজের যে ছবি এঁকেছেন, তাতে এ পরিবর্তনের ব্যাখ্যা আছে। ১৮২৫ থেকে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে চিহ্নিত করে এই কালের ওপর শাস্ত্রী মশাই সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এ সময়টিকে তিনি 'নবযুগের জন্মকাল' বলে গণনা করেছেন এবং সামাজিক পরিবর্তনের ব্যাপারে যা লিখেছেন, তা' হল, 'প্রাচীন ও নবীনের সংঘর্ষণ ও ঘোর সামাজিক বিপ্লবের সূচনা'।

প্রাচীনে ও নবীনে সেদিন কেমন সংঘর্ষ হয়েছিল, কে সেই সংঘর্ষে জিতেছিল, এসব প্রশ্ন অবশ্যই করা যায়। এমন কী 'প্রাচীন' ও 'নবীনে'র সংজ্ঞাটিও এই সূত্রে ঝালিয়ে নেওয়াও যেতে পারে। আর ঘোর সামাজিক বিপ্লব কতখানি ঘোরতর হয়ে দেখা দিয়েছিল, এ প্রশ্নও আশাকরি অবান্তর নয়।—কিন্তু এ সব প্রশ্নের জবাব সুদীর্ঘ ভূমিকায় দেওয়া হয়েছে বলে তা' আর তোলা গেল না।

তবে একটি কথা আগেভাগেই বলে রাখা দরকার। সে কথাটি হল এই যে, ঐ সংঘর্ষে শেষ পর্যন্ত যদি 'প্রাচীন' জয়ী হয়ে ফিরে আসে, তাকে কী আমরা স্বাগত জানাব?

তিনের দশকের আগে-পরে যাঁদের জন্ম, এবং একদা যাঁরা নবযুগকে ধরে রেখে দিয়েছিলেন নানা সংগ্রামের ভিতর দিয়ে, তাঁরা যে সূর্যাস্তের মতনই কালের অমোঘ নিয়মে একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন সাতের দশকে, তা' আমরা আগেই চাক্ষুষ করেছি। এখন আমরা যদি দেখি, সাড়ে চার দশকের ব্যবধানে 'প্রাচীনে'রই আবার তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়, তখন একটু খট্‌কা লাগে না কী?—যে 'ব্রাহ্মধর্ম' একদা নব্যসংস্কৃতির অনিবার্য প্রভাবের ফলে সৃষ্ট হয়েছিল, তার অপসরণ কী অনেকটা সেই সংকেতই দেয় না?—শিবনাথ শাস্ত্রী মশাই তাঁর বঙ্গসমাজের ইতিহাসে এই দশকের নাম দিয়েছেন, 'ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবের হ্রাস ও হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সূচনা',

—যদিও ধর্মের নাম দিয়ে এই পরিবর্তনকে চিহ্নিত করা হয়েছে, কিন্তু ভেতর পর্যন্ত অনুসরণ করলে দেখা যাবে, এই পরিবর্তন শুধু মাত্র ধর্মীয় নয়, এ পরিবর্তন সমাজের সর্বস্তরে ছিল ব্যাপ্ত।

ভুললে চলবে না, ঠিক এই সময়েই শশধর তর্কচূড়ামণিরও আবির্ভাব ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে সকলের কাছে পরিচিত করে দেন। আর বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও ধর্মব্যাখ্যায় নেমে পড়েন।

বন্যা নেমে গেছে। পলিমাটিতে আচ্ছন্ন ভূমিতে আসন্ন শস্যের এই কী সংকেত? পালাবদলের এই কী ইংগিত?—রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জীবনস্মৃতি'তে লিখেছেন, 'এই সময়ে কলিকাতায় শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের অভ্যুদয় ঘটে। বঙ্কিমবাবুর মুখেই তাঁহার কথা প্রথম শুনিলাম। আমার মনে হইতেছে, প্রথমটা বঙ্কিমবাবুই সাধারণের কাছে তাঁহার পরিচয়ের সূত্রপাত করিয়া দেন। সেইসময় হঠাৎ হিন্দুধর্ম পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সাক্ষ্য দিয়া আপনার কৌলীন্ত প্রমাণ করিবার যে অদ্ভুত চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা দেখিতে দেখিত চারিদিকে ছড়াইয়া পাড়ল।'[১]

হিন্দুধর্মের এই নতুনতর বিকাশকে অনেকেই সেদিন যে স্বাগত জানিয়েছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে বিরোধীরাও যে চুপ করে বসেছিলেন, এ অনুমান ঠিক নয়। বরং তাঁরাও পড়েছিলেন আসরে নেমে। তবে প্রকৃত লড়াইয়ের আগেই কিন্তু বিরোধীরা নিজেদের অজান্তেই গেলেন পরাজিত হয়ে। কেননা, 'রেনেসাঁসী' সত্যের ভেতর যে বেপরোয়া মনোভাব ছিল, তা' রুচির সূক্ষ্মতা বা শুচিতার দোহাই দিয়ে মানুষকে কখনো দূরে সরিয়ে রাখত না। অন্ততঃ দীনবন্ধু প্রমুখ শিল্পীরা যে তা' করেননি, সেতো চোখের ওপরেই দেখা গেল। তরুণ রবীন্দ্রনাথ, যিনি একদা 'কৃষ্ণচরিত্রের' ব্যাখ্যায় বঙ্কিমের সঙ্গে একহাত লড়ে গিয়েছিলেন, তিনি নিজের অজ্ঞাতে আগে থেকে বঙ্কিমের এইরুচি ও শুচিতার কাছে যে আত্মসমর্পণ করে বসেছিলেন, এ সত্য তিনি বোধহয় কোনোদিন আবিষ্কারও করতে পারেন নি।—এইভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলে অনুভব করা যায় প্রকৃত পরিবর্তনটা ঠিক কোথায় ঘটেছে। —তাই সাতের দশকে দীনবন্ধুর মৃত্যু শুধু তাঁর কায়িক মৃত্যুই নয়, তিনি যে ভাবধারাকে বহন করে নিয়ে আসছিলেন, তারও অবসান হ'য়ে গেল।— যে দীনবন্ধুকে দিয়ে নতুন এক সাহিত্য-ধারা উন্মোচিত হতে পারত, তা' আর সম্ভব হ'ল না।

তবু দীনবন্ধুর সাহিত্যের অনুকরণ হয় যে নি, তা' নয়। আর একথা কেনা

জানে, দীনবন্ধু না-থাকলে জাতীয় রঙ্গমঞ্চ আদৌ কী সেদিন সৃষ্টি হতে পারত ?—তাই দীনবন্ধুর সাহিত্য-আলোচনার উপসংহার টানার আগে এই দিকটা একবার তাকিয়ে দেখা দরকার। এবং তাঁর অনুসৃত সাহিত্য থেকে রঙ্গমঞ্চের দিকে আমাদের আলোচনা বিস্তৃত করা যেতে পারে। আর এর পরেই আমরা তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে প্রকৃত সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছুতে পারব, নচেৎ নয়। সুতরাং এ দিকটা একবার পরিক্রমা করে আসা যাক।

দীনবন্ধু প্রভাবিত নাটক

'নীলদর্পণ' নাটকটির সম্পাদনা করতে গিয়ে অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী উক্ত গ্রন্থের ভূমিকার উপসংহারে লিখেছেন, 'দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ' নামটি পেয়েছিলেন বোধকরি বিশ্বনাথ কবিরাজের 'সাহিত্যদর্পণ' থেকে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে পেলাম 'সমাচার দর্পণ'। দীনবন্ধুর কৃতিত্ব এই যে পরবর্তীকালে 'জমিদার দর্পণ', 'চা-কর দর্পণ' ইত্যাদি কয়েকটি দর্পণ-শ্রেণীর নাটকের পথ প্রদর্শক তিনি।'[২]

অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী এখানে যে সামান্য ক'টি শব্দ ব্যয় করেছেন, তা' খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। হয়ত তাঁর মনটা 'দর্পণে'র দিকেই পড়েছিল, তাই 'দর্পণ' নামাঙ্কিত দুটি নাটকের কথা তাঁর মনে এসেছে। তাঁর লক্ষ্য যদি গোটা সাহিত্যের ওপর থাকত, তবে হলফ করে বলা যায় যে, আরো কয়েকটি নাম তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যেত, যা আরও ব্যাপক অর্থে দীনবন্ধুকে 'পথ-প্রদর্শকে'র ভূমিকায় দেখাতে সমর্থ হত।

এহ বাহ্য। 'নীলদর্পণে'র আলোকেই যখন আমরা দীনবন্ধু প্রভাবিত পথে হাঁটতে আরম্ভ করেছি, তখন সেই পথ ধরে হাঁটাই শ্রেয়। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশীর কাছে আমরা দুটি মাত্র 'দর্পণ' নাটকের নাম পেয়েছি, কিন্তু বিস্মৃত নাটকের কবরখানায় গেলে আমরা অনায়াসে আরো কয়েকটি 'দর্পণ' শ্রেণীর নাটককে খুজে বের করে আনতে পারি। 'সাক্ষাৎদর্পণ', 'ভারত-দর্পণ', 'জেলদর্পণ', 'কেরাণীদর্পণ', 'বঙ্গদর্পণ', 'মিউনিসিপ্যাল-দর্পণ' ও 'টাইটেলদর্পণ'কে প্রাগুক্ত 'জমিদারদর্পণ' ও 'চা-কর দর্পণে'র' সঙ্গে আমরা যোগ করে দিতে পারি অনায়াসে।—নামের শেষে 'দর্পণ' আছে বলে এরা যে সকলেই 'নীলদর্পণে'র আদলে লেখা, এমন অনুমান যদি আমরা করে বসি,

তা'হলে কিন্তু ভুল হবে। এরা আপন আপন মহিমায় স্বতন্ত্র তবে, 'দর্পণে' মুখ রাখলে বোঝা যায় যে দীনবন্ধু অন্ততঃ এখানে অনুপস্থিত নন।

প্রথমে 'সাক্ষাৎ দর্পণে'র কথাই ধরা যাক। একশো ষোলো পৃষ্ঠার এই নাটকটির প্রকাশ কাল, সন ১২৭৮ সাল। ২২১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের দ্বৈপায়ণ যন্ত্র থেকে যদুনাথ রায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত। এই গ্রন্থটির প্রকাশিত হবার প্রধান শর্তই হল, 'যে সকল ভয়ানক দোষ ও বিগর্হিত আচার ব্যবহার বর্ত্তমান বঙ্গসমাজে প্রচলিত আছে, 'এই সাক্ষাৎ দর্পণ' নাটকে তাহাই সাধ্যানুসারে বর্ণনা করিলাম।' ৩

পঞ্চাঙ্কে বিভক্ত এই নাটকটিকে লেখক 'দৃশ্যকাব্যকুসুম' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কাহিনীটি একটু শিথিল এবং নাটকের বিষয়বস্তুর দিক থেকে এর সঙ্গে যদি কারো সাদৃশ্য থাকে, তবে তা' হল 'সধবার একাদশী'র, 'নীলদর্পণে'র নয়। পানাসক্তি ও গণিকাচর্চার সঙ্গে নানারকম ব্যধির কথা ও ছবি সমকালের পটভূমিতে এ নাটকে চিত্রিত ও বিবৃত হয়েছে।

হরিশবাবু এবং তাঁর তিন প্রতিবেশী হরিহর-হলধর-রামনারায়ণের পারিবারের ঘটনা নিয়ে এই নাটকের কাহিনী। কালিকুমার আর সুবোধ হল হরিশবাবুর দুই ছেলে। কালিকুমার তার চরিত্র দোষের জন্য ত্যাজ্যপুত্র। কনিষ্ঠপুত্র সুবোধের বিবাহের জন্য হরিশবাবু প্রস্তুত হচ্ছেন। হরিহরের কন্যা 'নলিনীর' সঙ্গে এ বিয়ে প্রায় পাকাপাকি।—নলিনীর দিদি কামিনীর বিয়ে হয়েছিল প্রতিবেশী রামনারায়ণের পুত্র দোয়ারির সঙ্গে। এই দোয়ারি আবার কালিকুমারের মতই চরিত্র দোষে দুষ্ট। অবশ্য প্রতিবেশী হলধরবাবুর পুত্র কেদারের নামও এই একই সঙ্গে উচ্চারিত হওয়া দরকার।

কেদার-কালিকুমার-দোয়ারি এই তিনজনের চরিত্র একই রকম। কেদারের বৈঠকখানায় যখন বৈঠক বসে, তখন এদের আলোচনায় সে কালের বহু খবর পাওয়া যায়। সাহেবদের সঙ্গে এক কামরায় 'ট্রাভেলে'র বিপত্তি, পরাধীনতার যন্ত্রণা, সদ্য-বিলেতফেরৎ কেশব সেনকে ঘিরে কী রকম ভিড় হয়েছিল, তার বর্ণনা, বা 'রেভারেন্ট কালাচাঁদে'র কাহিনী—না, কিছুই বাদ নেই। এ ছাড়া বাসরে অশ্লীলতা, গুলি ও মদ খাওয়ার গুণাগুণ বর্ণনা, গণিকাচর্চা ইত্যাদি বিষয়ও উক্ত বৈঠকের ছিল আলোচ্য। এমন কী প্রেমে রাগিনী 'সুরটমল্লার, তাল খেমটায়' সেকালের থিয়েটার ও নাটকাভিনয়কেও করা হয়েছে ব্যঙ্গবিদ্রূপ।—এই নাটকে গণিকা হরকালি এবং তার পাতানো মায়ের চিত্রও অনুপস্থিত নয়।

'সধবার একাদশী'র অনুকরণে উপেক্ষিতা স্ত্রীদের পরিচয়ও এখানে অনুপস্থিত থাকে নি। কালিকুমারেরর ভার্যা কুসুম ও দোয়ারির স্ত্রী কামিনীর মর্মযন্ত্রণা 'সধবার একাদশী'র কুমুদিনীরই অনুরূপ। তবে কুমুদিনী বিদ্রোহ করে নি, এখানে কিন্তু দোয়ারির স্ত্রী কামিনী বিদ্রোহ করেছে।—সুবোধের সঙ্গে গোপন প্রেমে সে হয়েছে লিপ্ত। নাটকের চতুর্থ ও পঞ্চম অঙ্কে এই প্রেম তীব্র আকার ধারণ করেছে। চতুর্থ অঙ্কে সুবোধের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। কামিনীর শয়ন কক্ষে রাত্রে দেখা করবার জন্ত চিঠি লিখল সুবোধ। ঐ চিঠির খবর কী ভাবে যেন কালিকুমার জানতে পারল। পরে কালিকুমারের কাছ থেকে ঐ খবর জানল দোয়ারি। আর দোয়ারি নিজের স্ত্রীর এই গোপন প্রেমকে শাস্তি দেবার জন্ত তৈরী হয়ে গেল।

পঞ্চম অঙ্কে সুবোধ-কামিনীর নিভৃত মিলন, কিন্তু হঠাৎ দরজায় টোকা। সুবোধ লুকোল খাটের তলায়। দরজা খুলল কামিনী। দোয়ারি কামিনীকে চুলে ধরে টেনে এনে আঘাত করল তরোয়াল দিয়ে। এদিকে সুবোধও খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এসে ঐ তরোয়াল দিয়ে দোয়ারিকেও খুন করে বসল।—এই হল কাহিনী।

আগেই বলেছি নাটকটি 'দর্পণ' নামাঙ্কিত হলেও এর প্রকৃত সাদৃশ্য রয়েছে 'সধবার একাদশী'র সঙ্গে। অনেক চরিত্র ও অনেক সংলাপ রয়েছে যা আমাদের বার বার 'সধবার একাদশী'র কথা মনে করিয়ে দেয়। 'সধবার একাদশী'র অটলের চাকর 'দামা'র অনুকরণে এখানে একটি চাকরের আমরা সাক্ষাৎ পাই, এর নাম, নিমচাঁদ। এই নিমচাঁদের সংলাপ যেন দামার অনুকরণে লেখা। যথা,—'বড়মানুষের আঁস্তাকুড়ও ভাল। এই বাবু উঠে গেলেন, আমি দিব্যি কোরে ফুলেল্ তেল মাখছি। বাবু এই সিদিনে আট টাকা দিয়ে কাপড় কিনেছেন, দু'মাস বাদে নিমচাঁদের। খোচাতে নেগিয়ে একটু ফাঁসিয়ে রাখবো, পরে জিজ্ঞাসিলে বলব পুরনো কাপড় ছিঁড়বে না! ছেলে বাবুরা সুখে থাক, জুতোর ভাবনা নেই, আর বাড়ীতে খাওয়ান দাওয়ান যাগ-যজ্ঞী হোলেত কথাই নেই। দশটি জোড়া জুতোর কাজ করবো। আজকাল কিছু খদ্দেরের অভাব নেই। মাজারি গোচ্ অনেক বাবু আছেন, পুরনো জুতো অথচ গোরার বাড়ীর হওয়া চাই, খুঁজে বেড়ান।' [8]

দামার উক্তির সঙ্গে এই সংলাপের কতখানি সাদৃশ্য, আশাকরি, তা বিস্তৃত করে বলার অপেক্ষা রাখে না। এহ বাহ্য। 'নীলদর্পণে'র সঙ্গে যার মিল, সে রকম একটি নাটক নিয়ে আলোচনা করা যাক।

এ নাটকের নাম 'জমীদার দর্পণ'। শ্রী মীর মশাম্‌রাক হোসেন হলেন এই নাটকের রচয়িতা। ১২৭৯ সনে এটি প্রকাশিত হয়। জমিদারদের মুখের সমানে এই নাটকটি তুলে ধরে নাট্যকার নিবেদন করেছেন, 'জমীদার-দর্পণ' সম্মুখে ধারণ করিতেছি, যদি ইচ্ছা হয় মুখ দেখিয়া ভালমন্দ বিচার করিবেন।'[৫] —এই নাটকে মো-সাহেব পরিবৃত জমিদার হায় ওয়ান আলীকে অত্যাচারী রোগ সাহেবের মতন করেই আঁকা হয়েছে। আবুমোল্লার স্ত্রী নুরের সঙ্গে ক্ষেত্রমণির সাদৃশ্য চোখে পড়ে। বৈষ্ণবী কৃষ্ণমণি অনেকটা পদীর সঙ্গে তুলনীয়। কুট্টিনী হিসাবে একই ছাঁচে ঢালা চরিত্র। অন্তর্বত্নী নুরের ওপর নির্যাতনের ফলে ক্ষেত্রমণির মতই তার মৃত্যু ঘটেছে। উভয়ের নির্যাতন দৃশ্য একই ছাঁচে ঢালা। অসহায় নুরের অভিযোগ এই রকম:

'নুর। (মৃদুস্বরে) হা খোদা! আমার কপালে এই ছিল? নারীকুলে জন্ম নিয়ে সতীত্ব রক্ষা কর্ত্তে পাল্লেম না! হায়, এই জন্যে কি আমার জন্ম হয়েছিল? জন্মেই কেন মরে গেলুম না? তা'হলে এত গঞ্জনা সইতে হতো না।...কি করি উপায় নাই, এ দুঃখ কাকে জানাব? এ সময়ে প্রাণধন স্বামীর সঙ্গে দেখা হলো না।

[জমীদার দর্পণ, (চৈত্র, ১২৭৯), পৃ, ৪২]

কুষ্টিয়ার লোক ছিলেন এই মীর মশাররাফ হোসেন। 'জমীদার বংশে আমার জন্ম', এই বলে তিনি নিজের পরিচয় নিবেদন করেছেন। সুতরাং দীনবন্ধুর মত সত্যমূলক ঘটনাই যে তাঁর নাটকের উপজীব্য, একথা বলা বাহুল্যমাত্র। 'বঙ্গদর্শনে' এই লেখাটি বঙ্কিমচন্দ্রেরও অনেক প্রশংসা পেয়েছিল। এবং সেই প্রশংসা এই রকম: 'জনৈক কৃতবিদ্য মুসলমান কর্তৃক এই নাটকখানি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানি বাঙ্গলার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। বরং অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গালার অপেক্ষা এই মুসলমান লেখকের বাঙ্গালা পরিশুদ্ধ। জমীদারদিগের অত্যাচার উদাহরণের দ্বারা বর্ণিত করা ইহার উদ্দেশ্য। নীলকরদিগের সম্বন্ধে বিখ্যাত নীলদর্পণের যে উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ জমীদার সম্বন্ধে ইহারও সেই উদ্দেশ্য।'[৬]

বঙ্গীয় ১২৮১ সনের পৌষমাসে প্রকাশিত দক্ষিণারঞ্জন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ৬৪ পৃষ্ঠার যে 'চা-কর দর্পণ' নাটকটি পাওয়া যায়, তার সঙ্গে 'নীলদর্পণের' সাদৃশ্য আরো গভীর। দীনবন্ধু যেমন নীলকরদের হাতে তাঁর নাটকটি তুলে দিয়েছিলেন, নাট্যকার দক্ষিণারঞ্জন তেমনি এটিকে তুলে দিয়েছেন 'চা-কর'দের হাতে, ভূমিকায় লিখেছেন, 'চা-কর দর্পণ' পাঠকগণের হস্তে অর্পণ করিলাম।'—গ্রন্থটির প্রথমে যেমন একটি ভূমিকা আছে, তেমনি

ভূমিকার বাঁ পাশে একটি ছবিও আছে। ঐ ছবিতে এক উদ্ধত ইউরোপীয় যুবক স্খলিত বসনা এদেশীয় এক যুবতীকে পীড়নে উদ্যত। এ নাটকে সরমার সঙ্গে ক্ষেত্রমণির সাদৃশ্য লক্ষণীয় ভাবে চোখে পড়ে। ম্যাকলীন সাহেব রোগ-সাহেবেরই অনুরূপ। ম্যাকমিলান সাহেব নিজেই স্বীকার করেছে, এবং নিধুকে নীলকরদের ভাষাতেই শাসিয়েছে, 'নীলকর সাহেবদের শামচাঁদ আছে, মোর চাবুক আছে, সেই চাবুক তোমাকে না দিলে, তুমি সিধা হবে না।'[৭]—নাটকটি 'নীলদর্পণে'র মতই মেলোড্রামাটিক।

এই নাট্যকারের আরেকটি নাটকের নাম, 'জেলদর্পণ'। যদিও 'দর্পণ' নামাঙ্কিত, নাট্যকার কিন্তু এখানে 'নীলদর্পণে'র অনুসরণ করেন নি। অনুসরণ করেছেন তিনি 'সধবার একাদশী'র দীনবন্ধুকে। নগরবিহারী রাক্ষসী কাঞ্চনের সঙ্গে সাদৃশ্য পাওয়া যায় 'বিরাজমনী'র। শিবনাথ বাবুর স্ত্রী সুরবালা সধবা হয়েও ভোগ করেছে বৈধব্যের যন্ত্রণা। ছিয়াত্তর পৃষ্ঠার এই নাটকটিতে সিমুলিয়ার মুক্তিমণ্ডপের কথাও আছে। আর আছে কয়েকটি জেলের পরিচয়। কেননা, জমিদার শিবনাথ তাঁর কুকর্মের জন্য সুদীর্ঘকাল জেল খেটেছিলেন।

প্রিয়লালদত্তের লেখা 'ভারতদর্পণ' নাটকটি যে দীনবন্ধুর অনুপ্রেরণায় লেখা, তা' এর পাতাগুলি উল্টে গেলেই বোঝা যায়। তবে বিষয়ের দিক থেকে লেখক দীনবন্ধুর ওপর খুব যে আনুগত্য দেখিয়েছেন, তেমন বলা যায় না। দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী'র যে উদ্দেশ্য, এই ক্ষুদ্র নাটকটিরও সেই উদ্দেশ্য। অর্থাৎ গণিকাচর্চা ও পানাসক্তির বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন লেখক। নাটকের প্রাথমিক সমস্যা হল, 'চৌদ্দ আইন'। এই 'চৌদ্দ আইন পাশ' সেকালের বাবুদের কাছে না কী এক ভীষণ ঘটনা!—ঐ আইন কী ভাবে পতিতাদের ভেতর আলোড়ন এনেছিল, তা' দিয়ে নাটকের সূচনা। এ আইনে নির্দিষ্ট ছিল, সকল গণিকাকেই 'রেজিস্টার্ড' হতে হবে। তবে তার আগে ডাক্তার দিয়ে শরীর ব্যাধিমুক্ত কী না, তা' যাচাই করা হবে। তখনকার দিনে বেশির ভাগ রূপোপজীবিনীই ছিল অসুস্থ, সুতরাং পরীক্ষা দিতে ছিলেন তাঁরা নারাজ। তাই গণিকাদের কণ্ঠে শোনা গেল সুগভীর খেদোক্তি,—

> কি কাল হইল মম এ চোদ্দ আইন।
> দিন ২ ভেবে মম তনু হল ক্ষীণ॥
> পড়িয়ে অকূলে আমি ভা.বি যে আকুল।
> কে আর লইবে কুলে হয়ে অনুকুল॥[৮]

এ নাটকেও কাঞ্চনের অনুরূপ চরিত্র পাওয়া যায় নিস্তারিনীর ভেতর দিয়ে। নায়ক পূর্ণচন্দ্র অটলেরই মতন। পূর্ণচন্দ্রের স্ত্রী উমাবতীর সঙ্গে অটলের স্ত্রী কুমুর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তবে এই উমাবতী তার স্বামীর উপেক্ষাকে নীরবে মেনে নেয় নি। সে হয়ে উঠল বিদ্রোহী। সে বলল: 'এখন যৌবনকালে আমিও আর চুপ করে থাকতে পারি না, অবশ্য কোন একটা উপায় দেখতে হবে।'[৯]—উপায় দেখল সে। তবে উমাবতীর এই উপায়টি কিন্তু ভালো নয়। কুট্টিনী রেবতীর কল্যাণে সে লিপ্ত হল গোপন প্রণয়ে। ফলে, হল সে অন্তর্বত্নী। নাটকের শেষে একটি চরিত্র এই সব দেখে মন্তব্য করেছে সখেদে, 'রাঁড় ভাঁড় এই দুটিতেই আমাদের এই সোনার ভারতকে ছারখার কল্লে।'[১০]—বলাবাহুল্য, এই হল নাটকের শেষ কথা!

প্রসন্নচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের লেখা 'পল্লীগ্রামদর্পণ', যদিও এই দর্পণ-শ্রেণীর নাটক, কিন্তু প্রকারে এটি একবারে আলাদা জাতের। ১৪২ পৃষ্ঠার এই নাটকটিতে গ্রামের সমস্তাই বিস্তারিত ভাবে আলোচিত। পল্লীগ্রামের রাস্তার কাদা, ডাকাতি, গ্রাম্য দলাদলি ইত্যাদি কী রকম হতে পারে, নাট্যকার তাই দেখিয়েছেন এ নাটকে। ১২৮১ সালের জ্যৈষ্ঠসংখ্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় এই গ্রন্থটির সম্পর্কে লেখা হয়েছিল, 'গ্রন্থের প্রশংসাবাদ কল্লে আমরা এই বলতে পারি যে গ্রন্থকার পল্লীগ্রামের দুরবস্থা বর্ণনার জন্য গ্রন্থ লিখিতে প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য অতি বৃহৎ।' —এ ব্যাপারে আমাদের একালের সমালোচকদের মতও প্রায় অনুরূপ,—'নাটকে নাটকত্ব বড় কিছু নাই। তবে কলিকাতার নিকটে গঙ্গাতীরবর্তী গ্রামের দুর্দশার স্বাভাবিক চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।'[১১]

'কেরানী দর্পণ' এই শ্রেণীর আর একটি নাটক। নাটকটি জনপ্রিয় হয়েছিল। 'ন্যাশানাল থিয়েটার' ও 'বেঙ্গল থিয়েটারে' অভিনয়ের গৌরবও অর্জন করেছিল এই নাটকটি।—এ ব্যাপারে গবেষক-সমালোচকদের যা মতামত, তা' হল এই রকম, 'মহন্তের এই কি কাজ' প্রণেতা 'কেরানীদর্পণ' (১৮৭৪) নামে একটি ষড়ঙ্ক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে কলিকাতার কেরানী-জীবনের পরম বাস্তব চিত্র ধরা পড়িয়াছে। কেরানীর গৃহজীবন, তাহার আপিসের পরিবেশ, খাস বিলাতি বড়-সাহেব এবং ফিরিঙ্গী ছোট সাহেব, ছোট বড় কেরানী বাবু—সবই যেন মূর্তিমান হইয়াছে লেখার গুণে। নীলদর্পণ নাটকের সঙ্গে কেরানীদর্পণের তুলনা করা চলে, এবং ইহা দীনবন্ধুর নাটকের মত গ্রাম্যরসাশ্রিতও নয় এবং দুঃসহ ট্রাজেডি-ভারাক্রান্ত নয়।

বাস্তব জীবনের অতিরঞ্জন বিহীন নাটক সেকালে দুর্লভ ছিল। সেইজন্য কেরানী-দর্পণ মূল্যবান নাটক। কেরানীদর্পণের প্রকাশক চণ্ডীচরণ ঘোষ। লেখক কি যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ?'[১২]

'বঙ্গদর্পণ', মিউনিসিপ্যাল দর্পণ' এবং সরকারী খেতাব লোভী জমিদারদের ব্যঙ্গ করে লেখা 'টাইটেল দর্পণ' নাটকটি এই 'দর্পণে'র সূত্রেই দীনবন্ধুর অনুকৃতি।[১৩] ভেতরে দীনবন্ধুর তেমন কোনো প্রভাব নেই। সুতরাং বর্তমান আলোচনায় এদের বাইরে রাখাই শ্রেয়।

তবে দীনবন্ধুর প্রভাব যে সেদিন অনতিক্রম্য ছিল, একটু সচেষ্ট হলেই তা' উপলব্ধি করা যায়। রামনারায়ণ তর্করত্ন পর্যন্ত দীনবন্ধুর প্রভাবে হয়েছিলেন প্রভাবিত, এবং এ ব্যাপারে সমালোচকদের স্বীকৃতি হল,—'রামনারায়ণ কয়েকখানি ক্ষুদ্রাকৃতি প্রহসন রচনা করিয়াছিলেন, যথা, 'যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল', 'উভয়সঙ্কট', ও 'চক্ষুদান'। ইহাদের মধ্যে সমসাময়িক সামাজিক জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতি যে ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে, দীনবন্ধু মিত্র তাঁহার নাটকের মধ্য দিয়া ইতিপূর্বেই তাহার পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। রামনারায়ণের ক্ষুদ্র প্রহসন কয়খানি যে দীনবন্ধুর প্রভাব হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত তাহা বলিতে পারা যায় না।'[১৪]

এদিকে 'নীলদর্পণের' প্রভাব সেদিন যেমন ছিল দুর্বার, 'সধবার একাদশী'ও অনুরূপভাবে অনেক নাট্যকারকে উৎসাহিত করেছিল ঐ জাতীয় নাটক লেখায়। যদিও সেসব নাটক আজ বিস্মৃত, কিন্তু ভুললে চলবে না যে এদের ভেতর দিয়ে সে যুগের এক যন্ত্রণাকে আমরা দেখেছিলাম প্রকাশিত হতে। সুতরাং সমকালের বিচারে তাদের এক আলাদা গৌরব অন্ততঃ রয়ে গেছে।

জ্ঞানধন বিদ্যালঙ্কারের লেখা 'সুধা না গরল' নাটকে যে 'সধবার একাদশী'র প্রভাব অল্পস্বল্প আছে',[১৫] একথা সমালোচকরাই দিয়েছেন জানিয়ে।—'কলিকাতাস্থ সুরাপান-নিবারনী সভার বিজ্ঞাপনানুসারে পাটনা সুরাপান-নিবারনী সভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতী চরণ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আদেশে পাটনা কলেজের পণ্ডিত শ্রীনবীনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,[১৬] যে নাটকটি লিখেছিলেন, তার নাম হল, 'বারুনী বিলাস'। পানাসক্তির পরিণাম যে কী ভয়ঙ্কর হতে পারে, নাট্যকার তাকেই করেছেন চিত্রিত। নাটকটির শেষে আছে,

'দেখবে এ ভবে, সুরা উপদ্রবে, কিরূপ ঘটনা ঘটিল।
সুশীলা ভগিনী, হায় সৌদামিনী, আত্মঘাতে প্রাণ ত্যজিল।।

বিদ্যাবিশারদ, হায় রে নীরদ, মরি মরি প্রাণে মরিল।
দেশ আভরণ, অনঙ্গমোহন, কলেবর পরিহরিল ॥"[১৭]

এ নাটকে গণিক চারুনেত্রা কাঞ্চনেরই প্রতিরূপ। কুমারী সৌদামিনী যেখানে অনঙ্গমোহনের শিকারে পরিণত হয়েছে, সেই দৃশ্যটি দেখলে সৌদামিনীকে ক্ষেত্রমণি বলে ভ্রম হতে পারে এবং অনঙ্গকে মনে হতে পারে রোগ সাহেব।

না, আর আলোচনা বাড়িয়ে আর লাভ নেই। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে গেলে দেখা যাবে এই সময়কার প্রায় প্রতিটি নাটকেই দীনবন্ধুর প্রভাব। কোথাও দেখা যায়, নিমচাঁদ সুধাচাঁদ[১৮] হয়েছে। কোথাও বা হয়েছে গাঁজাখোর সাতুলাল।[১৯] 'প্রজাহিতাকাঙ্ক্ষীণা' নামে যিনি 'সভ্যতা সোপান' নাটকটি লিখেছিলেন, তিনি তো এর সোপানে সোপানে দীনবন্ধুর প্রভাবকে রেখেছেন চিরমুদ্রিত করে। এখানে কখনো অটলের খুড়শ্বশুর গোকুলের কণ্ঠস্বর শোনা যাবে, যথা—'তোমাদের কাছ থেকে অনেকে অনেক আশা করে',[২০] কখনো বাঙ্গাল রামমাণিক্যের মত লোকেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে,—'আরে বাঙ্গাল বাঙ্গাল কইচো ক্যান? বাঙ্গাল এহ (হেয়) নাহি? আংরেজের পোলা সাত্রব আইচেন'[২১]—ইত্যাদি। কাঞ্চনের মত রূপোপজীবিনীর কণ্ঠস্বরও অনুপস্থিত নয়, 'আমার নাম হীরে মালিনী। আমি থাকি রাধার কুঞ্জে, কৃষ্ণা আমার ননদিনী।'২২ —নদেরচাঁদের বক্তৃতা, সধবা থেকেও বৈধব্যের যন্ত্রণা, এমন কী 'লঙ্‌' সাহেবের স্মৃতি, কিছুই বাদ রাখেন নি নাট্যকার।

এইভাবে অন্বেষণ করলে আরো অনেক নাটকে দীনবন্ধুর প্রভাব আবিষ্কার করা যে কঠিন নয়, একথা একাধিকবার বলা হয়েছে। সুতরাং নাটক ধরে ধরে বিশ্লেষণ করাটাও একান্ত বাহুল্য মাত্র। তবু জেনে রাখা ভালো, আরো কয়েকজন নাট্যকার ও নাটকের নাম উল্লেখ না করলে আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যায়। যেমন, বিপিনমোহন সেনগুপ্তের 'হিন্দু মহিলা নাটক' (১৮৬৮), বটুবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হিন্দু মহিলা নাটক' (১৮৬৯), ক্ষেত্রমোহন ঘটকের 'কামিনী নাটক' (১২৭৫) অবশ্য স্মরণীয়। শ্রীনাথ চৌধুরীর 'আমিতো উন্মাদিনী' ও হারানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গ কামিনী নাটক' (১৮৬৮) এই প্রসঙ্গে উপেক্ষণীয় নয়। আরো কয়েকটি নাটক রূপোপজীবিনীদের জীবনচিত্র তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছিল, সেই নাটকগুলিতেও দীনবন্ধুর প্রভাব সবিশেষ লক্ষণীয়। যেমন, 'কুল প্রদীপ', 'বাহবা চৌদ্দ আইন' ও 'বেশ্যাবিবরণ'।

দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'ও যে অন্য নাটককে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিল, তারও প্রমাণ আছে। এবং এ ব্যাপারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'হিতে বিপরীত' ও অতুলকৃষ্ণের 'The old Fool বা বুড়ো বাঁদরে'র উল্লেখ অবশ্যই করতে হয়।

না, কেবল গৌণ নাট্যকাররাই নয়, সেকালের যাঁরা প্রধান প্রধান নাট্যকার, রামনারায়ণ থেকে মনোমোহন, কেউই যে দীনবন্ধুর প্রভাবকে এড়িয়ে যেতে পারেন নি, তা' তাঁদের নাটক থেকে অনায়াসেই দেখিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তবে সেটা একান্ত বাড়াবাড়ি হবে মনে করে, উপস্থিত ক্ষান্ত হওয়া গেল। কিন্তু এই প্রসঙ্গে দুটি জিনিষ লক্ষণীয়। প্রথম লক্ষণীয় বিষয়টি হল, নাটকের ফর্ম। এঁরা সকলে দীনবন্ধুর ফর্মেই নাটক লিখেছেন। এমন কী যাঁরা 'ট্রাজেডি' লিখেছেন, তাঁরা দীনবন্ধুর 'সেনেকান' আদর্শকে[২৩] পর্যন্ত কেউই পারেন নি অতিক্রম করতে। দ্বিতীয় বিষয়টি হল, এঁরা অনেকেই সধবার পক্ষে বৈধব্যের যন্ত্রণাটিকে ঠিকমত মেনে নিতে পারেন নি। তাই গোপন প্রণয়কে এঁরা উৎসাহিত করেছেন। বা বিপরীত দিক থেকে বলা যেতে পারে যে সমাজের বাঁকা পথটিকে এঁরা দেখিয়ে দিয়েছেন চোখে আঙুল দিয়ে। তাই গৌণ হলেও এই নাটকগুলি সামাজিক ইতিহাসে বিশেষ এক মর্যাদার দাবি রাখে।

জাতীয় রঙ্গমঞ্চ

'বঙ্গে রঙ্গালয় স্থাপনের জন্য মহাশয় কর্মক্ষেত্রে আসিয়াছিলেন, মহাশয়ের নাটক যদি না থাকিত, এই সকল যুবক মিলিয়া 'ন্যাশানাল থিয়েটার' স্থাপন করিতে সাহস করিত না। সেই নিমিত্ত আপনাকে রঙ্গালয় স্রষ্টা বলিয়া নমস্কার করি।'[২৪]

এই নমস্কার যাঁর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হল, বলার অপেক্ষা রাখে না, তিনি হলেন আমাদের আলোচ্য নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র। দেশে-বিদেশে অনেক বড়ো বড়ো নাট্যকার আছেন, আছেন অনেক প্রতিভাশালী যুগন্ধর সাহিত্যিক, কিন্তু এই দুর্লভ গৌরবের অধিকার ক'জনের ভাগ্যে জোটে? ক'জন নাট্যকার জাতিকে উপহার দেন রঙ্গমঞ্চ? নবজাগরণের প্রভাবে আমাদের দেশে যেমন স্থাপিত হয়েছিল স্কুল-কলেজ, লাইব্রেরী-হাসপাতাল, ঠিক সেই পথেই এলো আমাদের পাবলিক থিয়েটার। দীনবন্ধুর মত প্রতিভাবান নাট্যকাররা না-এলে আমাদের এই প্রাপ্তি যে বিলম্বিত হতো,

তাতে আর সন্দেহ কী! ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়ে দেওয়া যেমন সম্ভব নয়, তেমনি নাটক ছাড়া থিয়েটার কী কখনো চালু হতে পারত? তাই গিরিশচন্দ্রের এই প্রশস্তিতে আর যাই থাক, অন্ততঃ অতিশয়োক্তি যে নেই, তা' নিশ্চিন্ত ভাবে বলা যায়।

ইংরেজরা যেদিন এদেশে এসে 'থিয়েটার' নির্মাণ করেছিল, তখন সময়ের হিসাবে সেটা হল অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। আমাদের তখন যাত্রার যুগ। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি, ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে, নেটিভদের নিয়ে একবার মঞ্চাভিনয়ের চেষ্টা যে হয়েছিল, একথা সর্বজনজ্ঞাত। আজ যেখানে এজরা-ষ্ট্রীট, সেখানে পঁচিশ নম্বর 'ডুমতলা'তে, হেরাসিম লেবেডেফ নামে এক রুশ যুবকের উৎসাহে সেদিন যে বাঙলা নাটক অভিনীত হয়, সেই আমাদের প্রথম মঞ্চাভিনয়। কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এই যে, ঐ অভিনয়ের পরে আরো পঁচাত্তর বছর গড়িয়ে গেলেও আমরা নিজেদের উদ্যোগে একটি সাদামাটা রঙ্গমঞ্চ পর্যন্ত গড়ে তুলতে সমর্থ হই নি। অবশ্য সেকালের বড়ো বড়ো ধনী পরিবারে শৌখীন মঞ্চাভিনয়ের কোনো ত্রুটি ছিল না। —প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'হিন্দু থিয়েটার'ও 'ওরিয়েণ্টাল থিয়েটার', প্যারীমোহন বসুর 'জোড়াসাঁকোর নাট্যশালা', সাতুবাবুর বাড়ির থিয়েটার, 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ', 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা', থেকে 'পাথুরেঘাটা রঙ্গ নাট্যালয়' প্রমুখ বহু মঞ্চেই সেদিন শৌখীন অভিনয় চলছিল। কিন্তু জনসাধারণের সঙ্গে তার কোনো যোগ ছিল না। ফলে, সাধারণ লোকে যাত্রার আমোদ নিয়েই সুখে ছিল। এমন কী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেরাও ঐ অভিনয় দেখবার সুযোগ পেত না। আর শখ করে বিনা নিমন্ত্রণে ঐ অভিনয়ে দেখতে গেলে দারোয়ানদের হাতে কী রকম লাঞ্ছনা জুটত, সে সব কথা না তোলাই ভালো। —যাই হোক, এ ব্যবস্থার পরিবর্তনের জন্য দাবি উঠল। আর গিরিশচন্দ্রই প্রথম ব্যক্তি, যিনি পরিবর্তনকে করলেন ত্বরান্বিত।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের একটি ঘটনা উপলক্ষে বাইশ-তেইশ বছরের তরুণ যুবক গিরিশচন্দ্র তাঁর বন্ধুদের কথা দিয়েছিলেন যে 'he would entertain the common people by opening a theatre within a year.'[২৫] না, এ বছরে পারেন নি তিনি, তবে সত্তরের দশকের প্রথমেই তাঁর আনুকূল্যে 'জাতীয় রঙ্গমঞ্চ' প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল।

সাহিত্য সম্পদে সমৃদ্ধ ও একই সঙ্গে অভিনয়োপযোগী, এ জাতীয় নাটক যে কদাচিৎ সৃষ্ট হয়ে থাকে, একথা সমালোচককুলের কখনো অজ্ঞাত নয়।

আমাদের দুর্লভ সৌভাগ্য এই যে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' সেই জাতীয় একটি নাটক। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের থেকে এলো এর নিমন্ত্রণ। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে যখন এর অনূদিত সংস্করণ নিয়ে হাইকোর্টে মোকদ্দমা চলছে, সেই তখন থেকে দেখা যাচ্ছে এর অভিনয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন তারিখে 'হরকরা'র সংবাদদাতা 'ঢাকা' থেকে জানাচ্ছেন, 'Our native friends entertain themselves with occasional theatrical performances, and the 'Nil Darpan' was acted on one of these occasions,'—শুধু কী ঢাকায়? 'টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া'র খবর থেকে এর কিছুদিন পরেই জানা গিয়েছিল যে 'বোম্বে সমাচারদর্পণে'র সম্পাদকের উদ্যোগে 'গ্রান্ট রোড থিয়েটারে' নীলদর্পণের অভিনয় ব্যবস্থা সেদিন ছিল পাকাপাকি।[২৬] পরে বঙ্কিমানুজ পূর্ণচন্দ্রের মুখেও এ খবরের সমর্থন পাওয়া গেছে, 'এই নাটকখানি ইউরোপে অনেক ভাষায় অনূদিত এবং সুদূর বোম্বাই সহরে পর্যন্ত অভিনীত হইয়াছিল।'[২৭]

এই 'নীলদর্পণ' নাটকটি কলকাতায় শেষপর্যন্ত কী অভিনীত না হয়ে থাকতে পারে? বলতে দ্বিধা নেই, এই নাটকটি দিয়েই কলকাতায় প্রতিষ্ঠা হল, 'সাধারণ রঙ্গমঞ্চের'। অভিনয়ের তারিখ, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ, ৭ই ডিসেম্বর।

জোড়াসাঁকো। মাসিক তিরিশ টাকায় এখানে ভাড়া নেওয়া হয়েছিল একটি বাড়ি। মধুসূদন সান্যালের বাড়ি। এখানেই তৈরী হয়েছিল মঞ্চ। না, দর্শকদের বসবার ব্যবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। মাথায় ছিল 'ক্যানভাসে'র চন্দ্রাতপ। তবু কী আশ্চর্য, ভিড় কিছু কম হয় নি। ঐ কনকনে শীতের সন্ধ্যায় লোক এসেছিল অনেক। সে রাতের অভিনয়ে সাতশ টাকার টিকিট বিক্রি হয়ে গেল অক্লেশে।—আর এত উদ্যোগ আয়োজন যে-নাটকটির জন্য, সে নাটকটি অন্যকিছু নয়, সেটি হল, 'নীলদর্পণ'।

তবে এর পিছনে যে উদ্যোগ ছিল, সেখানেও ছিল দীনবন্ধু মিত্রের বই। গিরিশচন্দ্র প্রথমে যখন উৎসাহী হন, তখন তিনি মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা'-কে নিয়ে করেছিলেন যাত্রাভিনয়। এই যাত্রার সফলতায় গিরিশচন্দ্র এতই অনুপ্রেরণা পেলেন যে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইনি প্রতিষ্ঠা করলেন, 'বাগবাজার এ্যামেচার থিয়েটারে'র। অভিনয়ের জন্য তখন তুলে নেওয়া হল, 'সধবার একাদশী'। এ বছর শারদীয় দুর্গাপুজোর সময় বাবু প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে হল প্রথম মঞ্চাভিনয়। নিমচাঁদের ভূমিকায় এ অভিনয়ে দেখা দিলেন

গিরিশচন্দ্র। পরে এই অভিনয় হল শ্যামপুকুরে নবীনচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে এবং পড়পারে জগন্নাথ বসুর নাটমঞ্চে। চতুর্থ অভিনয় ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত হল —। স্থান, শ্যামপুকুরের রায় বাহাদুর রামপ্রসাদ মিত্রের বাড়ি। সরস্বতী পুজোর সন্ধ্যা। জাস্টিস্ সারদাচরণ মিত্র তখন ছাত্র, এম. এ পরীক্ষার্থী, সেদিনকার দর্শনার্থীদলের ভেতর তিনি ছিলেন একজন। ঐ অভিনয় দেখে তিনি অভিভূত হয়ে স্মৃতি-কথায় লিখেছিলেন,—'সধবার একাদশী' পূর্বে পড়িয়াছিলাম; কিন্তু সেদিনের অভিনয় দেখিয়া, বিশেষতঃ 'নিমচাঁদে'র অভিনয় দেখিয়া আমি আনন্দে আপ্লুত হইলাম। বয়োবৃদ্ধ বশতঃ ক্রমশ অনেক জিনিষ ভুলিয়াছি, আরও কত ভুলিব, ইংরাজী, বাঙ্লা সংস্কৃত, অনেক নাটক পড়িয়াছি, অধিকাংশের নামমাত্র স্মরণ আছে। কিন্তু সে রাত্রের নিমচাঁদের অভিনয় বোধ হয় কখনও ভুলিব না।'[২৮] —কেবল সারদা-চরণের কথা নয়, সংবাদে প্রকাশ, দীনবন্ধু মিত্র নিজে অভিনয়ের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি অভিনয়ে অভিভূত হয়ে গিরিশকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, আমি নিশ্চিত, নিমচাঁদ তোমার জন্যেই লিখিত হয়েছে, কেবল তোমার জন্য। তুমি ছাড়া কী এর অভিনয় সম্ভব হত?—কেবল গিরিশচন্দ্রকে নয়, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর 'জীবনচন্দ্রে'র ভূমিকায় অভিনয়ও তারিফ করেছিলেন তিনি। অভিনয়ের এক জায়গায় অর্দ্ধেন্দু যে অটলকে লাথি মেরে চলে গিয়েছিল, তার প্রসঙ্গ তুলে বলেছিলেন, 'উহা improvement on the auther. আমি এবার 'সধবার একাদশী'র নূতন সংস্করণে অটলকে লাথি মারিয়া গমন লিখিয়া দিব'।[২৯]

শুধু 'সধবার একাদশী' নয়, দীনবন্ধুর অপরাপর নাটকও এবার একে একে আরম্ভ হল অভিনীত হতে। অভিনীত হল 'বিয়েপাগলা বুড়ো', এবং 'লীলাবতী'। এদিকে অভিনেতারা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের নাম বদল করতে আরম্ভ করলেন। 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার' নাম বদলে হল, 'দি ক্যালকাটা ন্যাশানাল থিয়েটার'। আরো পরে 'ক্যালকাটা' বাদ পড়ল। তখন এই দলের নাম হল, 'দি ন্যাশানাল থিয়েটার'। মোটকথা এই অভিনেতাদের দল নিজেদের বিকশিত করতে পারল একমাত্র দীনবন্ধুর জন্যই। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বরের যে টিকিট কেটে অভিনয় দেখানো হল, মোটকথা, সেটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর পিছনে যে তাড়া রয়েছে, তা হল, নিজেদের উন্মোচিত ও বিকশিত করার তাড়া। বলাবাহুল্য, এর সবটাই এক 'রেনেসাঁসী' মনোভাব। রেনেসাঁসী সাধনার সুফল নাটকের বিভিন্ন

চরিত্র-পরিকল্পনায় ও নানারকম সংলাপে ছিল ছড়িয়ে, তা' জনসাধারণের কাছে প্রকাশিত হবার অবারিত সুযোগ পেয়ে গেল।

আর সব থেকে মজার ব্যাপার এই যে, সাধারণ মানুষ এই ব্যাপারে সুন্দর ভাবে সাড়াও দিল। দীনবন্ধুর নাটকে যেখানে যেখানে মানবতন্ত্রের জয়-জয়কার, ঠিক সেখানে সেখানেই দেখা গেল এঁদের উচ্ছ্বাস।—বাইরে যে-সব অভিনয় হয়েছিল, যেগুলি বাদ দিয়ে, এবং কেবল টিকিট কেটে যে অভিনয় হয়েছিল, শুধু সেইগুলি ধরে পরিসংখ্যান করলে দেখা যায়, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত যে অভিনয় হয়, তাতে 'নীলদর্পণে'র অভিনয় হয়েছিল কম করে অন্ততঃ ষোলো বার; আর 'লীলাবতী,' 'জামাই বারিক,' 'সধবার একাদশী,' 'নবীন তপস্বিনী,' 'কমলে কামিনী,' ও 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' সব মিলিয়ে আরো অন্ততঃ চোদ্দবার। এবং যখনই অভিনয় হয়েছে, তখনই দর্শকদের কাছে সাড়া পাওয়া গেছে অভূতপূর্ব। এই কথাগুলি যে এতটুকুও অতিশয়োক্তি নয়, তা' 'ইংলিশ ম্যান' পত্রিকার একটি ছোট্ট খবর উদ্ধৃত করে প্রমাণ করে দেওয়া যায়। 'ইংলিশম্যান' কোনদিন 'নীলদর্পণে'র অভিনয়কে খুব একটা সুনজরে দেখে নি। অথচ সেই সংবাদপত্রই দেড় বছরের টানা অভিনয়ের পর এই 'নীলদর্পণের' কথায় লিখল, 'The Pavilion in Beadon Street was crowded last saturday evening to witness the play of 'Nil Darpan'. The acting was successful, and elicited great applause from the audience.'[৩০]

শ্রোতৃমণ্ডলীর সঙ্গে অভিনয়ের এমন পারস্পরিক একাত্মতা যে কদাচিৎ ঘটে থাকে, একথা বিবৃত করা বাহুল্যমাত্র। তবু এ অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল, এবং তা' একটি মাত্র কারণে। আর সে কারণটি হল, দীনবন্ধু এই যুগের মনটিকে স্পর্শ করতে পেরেছিলেন। বলতে পেরেছিলেন মানুষের কথা। তাই মানুষও অবাক হয়ে তাঁর কথা শুনেছে। এখন এ নাট্যকার যদি সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা না হয়, তবে কে হবে? তাই গিরিশচন্দ্রের প্রশস্তি অতিশয়োক্তি নয়, বরং যথার্থ উক্তি বলাই শ্রেয়।

আইলা গোধূলি?

তবু গোধূলি এলো। কালের অমোঘ বিধানেই সম্ভবতঃ এ গোধূলি এলো।

পরিবর্তনের হাওয়াটা যে আগে থাকতেই এলোমেলো বইতে আরম্ভ করেছে, তা' আমরা আগেই দেখেছি। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের সূচনা যে

ঘটেছে, তা' কেবল শশধর তর্কচূড়ামণিকে দিয়ে নয়, বঙ্কিমের ধর্ম ব্যাখ্যা দিয়েও তা' দেখিয়ে দেওয়া যায়। এদিকে রেনেসাঁসের নায়কদের মৃত্যুও বহন করে নিয়ে এলো যুগান্তরের ইংগিত। ঠিক এই সময়টিতে 'ন্যাশানালিজ্‌মে'র যে বন্যা এলো, সেটাও চোখ বুজে পরিবর্তনকে মেনে নেবার পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং এই সময়ে, এই এলোমেলো ঝড়ের সময়, মানবিকতাবাদের ঐ কঠিন আদর্শটিকে ঠিকমত দীপ্ত করে রাখা ছিল কঠিন।

নাটকের পক্ষে এ ধারাকে রক্ষা করা যে আরো কঠিন ছিল, তা' অতীত ইতিহাস একটু নাড়া ঘাঁটা করলেই বোঝা যাবে। আর দীনবন্ধুর ধারাটি কী ভাবে যে ধীরে ধীরে হারিয়ে গেল, তা' এই সমকালীন ইতিহাস ঘাঁটলেই বেরিয়ে আসবে। —এখন সেই ইতিহাসটুকু তুলে ধরেই আমাদের বর্তমান আলোচনার উপসংহার টানা যেতে পারে।

আমরা যাকে আধুনিক কালে 'নাটক' বলছি, এই নাটক যে ইউরোপের কাছ থেকে আমাদের পাওয়া, একথা আশাকরি, বিস্তৃত করে না বললেও চলে। আমাদের দেশে যা ছিল, তা' হল 'যাত্রা', এবং সংস্কৃত নাটকের অনুসরণে বড়োজোর 'দৃশ্যকাব্য' বলা যেতে পারে। আমাদের দেশে ঐ যাত্রার ধারাটি যে কোনো দিনই লুপ্ত হয় নি, এমন কী রঙ্গমঞ্চের গৌরবের দিনেও না, তা' আমরা চোখের ওপরেই দেখেছি। দীনবন্ধু যখন মানবিকতাবাদী নাটক লেখায় ব্যাপৃত, তখন পুরাণ থেকে একেকটি কাহিনী সংগ্রহ করে নাট্যকার মনোমোহন লিখে চলেছেন গীতাভিনয়। প্রায় একই সঙ্গে এবং পাশাপাশি চলছে এই দুটি ধারা। সেকালের একজন সমালোচকও এই কথারই প্রতিধ্বনি তুলে লিখেছেন, 'এদেশের নাটককারগণ দুই শ্রেণীতে বিভাজিত। এক শ্রেণীর নাম ইংরাজীনবিশ। আর এক শ্রেণীর নাম বাংলানবিশ। বাংলানবিশ দিগের মধ্যে মনোমোহন বাবুই সর্ব শ্রেষ্ঠ, এবং আমরা এই জন্য বহুদিন হইতেই ইঁহার পক্ষপাতী।'[৩১]

এই উক্তি কটিই আমাদের দেখিয়ে দিচ্ছে যে দীনবন্ধুর সাহিত্যাদর্শের বিপদ ঠিক তাঁর পাশেই ছিল লুকিয়ে।—ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে তুলনা করলে এই অসঙ্গতিটাকে আরো সুন্দর ভাবে আবিষ্কার করা যেতে পারে।

ইংরেজি নাটকের একদা জন্ম হয়েছিল 'মিস্ট্রি' ও 'মিরাক্‌ল' থেকে। আমাদের দেশে যেমন পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে যাত্রা হত, ওদেশে খ্রীষ্টীয় শাস্ত্রের কাহিনী নিয়ে নির্মিত হত 'মিস্ট্রি নাটক'।—আর আমাদের যেমন কৃষ্ণ, রাম বা অপরাপর সাধুসন্ত ও অবতারদের নিয়ে যাত্রাভিনয়ের সুযোগ ছিল,

ওদেশে ঠিক ঐ ভাবেই 'মিরাকল' তৈরী হত খ্রীষ্টীয় মহাপুরুষদের জীবনী নিয়ে। পরের যুগে এই সূত্রেই দেখা দিয়েছিল 'মর‍্যালিটি' ও 'ইন্‌টারলিউড'। আরো পরে এই পথ ধরেই এলো আধুনিক যুগের 'ট্রাজেডি', ও 'কমেডি'। অর্থাৎ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই ওদেশের নাট্যধারা রূপ পেয়েছিল আধুনিকতায়। এই আধুনিকতা কেবল প্রকরণগত নয়, মানবিকতাবাদের মুক্ত-চিন্তা ও মুক্ত-বুদ্ধি যথাকালে ঐ নাটকের প্রকারগত পরিবর্তনেও করেছিল সহায়তা। মোটকথা, চেষ্টা করেও এ নাট্যধারাকে পরে উজানে বাহিত করা ওঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আমাদের বেলায় ব্যাপারটি কিন্তু তা' ছিল না। মধুসূদন-দীনবন্ধু যে নাট্যধারাকে মুক্ত করেন, তা' ছিল আরোপিত, দেশীয় ধারার সঙ্গে তার কোনো প্রকৃত যোগ ছিল না। ইউরোপীয় ভাবধারার মতই এই নতুন ধারাটি এসেছিল পশ্চিমের থেকে। দীনবন্ধু যখন এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন, তখনো এর শিকড় ভালো করে মাটির ভেতরে ঢুকতে পারে নি। যদি দেশীয় নাট্যধারার পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে এই নতুন রীতির নাটক আসত, তা' হলে তাকে কখনও হটানো যেত না। চিরকালের মত সে আমাদের সঙ্গী হয়েই থাকত।—কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এই যে তা' হয় নি। 'যাত্রা' ও 'গীতাভিনয়' মধুসূদন-দীনবন্ধুর সঙ্গে সমান তালেই সজীব হয়ে রয়ে গেল।

মধুসূদন-দীনবন্ধুর পরে আমাদের সাহিত্যে সব থেকে বড়ো নাট্যকার হলেন, গিরিশচন্দ্র। গিরিশচন্দ্র শুধু নাট্যকার নন, তিনি ছিলেন মঞ্চ পরিচালক। ভালো অভিনেতাও। কেবল একদিকে নয়, তাঁর নায়কতা ছিল তিন দিকে। তবে মঞ্চ পরিচালনার জন্যই তাঁর নাটক লেখা। নতুবা তিনি নাট্যকার হতেন কী না সন্দেহ। যাই হোক, এই কারণেই, এই বৈভ ব্যক্তিত্বের জন্যই সবটা গোল পাকিয়ে গেল। মধুসূদন-দীনবন্ধুর মধ্যে যে 'রেনেসাঁসী' বিদ্রোহ ছিল, সেই বিদ্রোহকে তিনি ধরে রাখতে পারলেন না। 'নাটক'কে ঠিক এঁদের আদর্শের নাটকে না রেখে 'গীতাভিনয়ের' দিকে ঠেলে নিয়ে গেলেন। এবং তাঁর এই নিয়ে যাওয়াটাও ভারি মজার। এখানে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপ লক্ষ্য করবার মতন।

প্রথমে গিরিশচন্দ্র ঐতিহাসিক নাটক লিখতে গেলেন। কিন্তু এই নাটকের ঠিক মত যখন সমাদর হল না, তখন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে লিখলেন, 'সার্বজনীন না হইলে নাটক এখানে সমাদৃত হইবে না, দেশ হিতৈষিতা প্রভৃতি

যত প্রকার কথা আছে তাহাতে কেহ ভারতের মর্মস্পর্শ করিতে পারিবেন না। ঐতিহাসিক নাটক সমস্তই স্থানীয়; স্থানীয় প্রসঙ্গ স্থানেই চলিয়াছে। Wars of the Roses ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে জানে বলিয়াই সেখানে ঐ সময়কার ঐতিহাসিক নাটক চলিয়াছে। নতুবা কেবল ঐ সকল ঐতিহাসিক নাটক লিখিয়া সেক্সপীয়ার সেক্সপীয়ার হইতেন না।৩২

এই যুক্তিতে ঐতিহাসিক নাটক গেল খারিজ হয়ে। এবার ধরা হল, সামাজিক নাটক। যে সামাজিক নাটকের ওপর দীনবন্ধুর প্রতিষ্ঠা, এবং যে সামাজিক ক্ষেত্রে 'রেনেসাঁসে'র সংগ্রাম, সেই সামাজিক উপকরণও নস্যাৎ হয়ে গেল এক মুহূর্তে, এবং এ ব্যাপারে গিরিশচন্দ্রের যুক্তি হল, 'দোষ গুণ লইয়া নাটক রচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় বাঙ্গালার গুণ দূরে থাকুক, বড় রকমের একটা দোষও নাই। দোষের ভিতর বড় জোর নাবালককে ঠকাইয়াছে, কেহ মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে' ৩৩ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন দেখা দেবে, তা' হলে কোন্ জাতীয় নাটক আমাদের কাছে সর্বাধিক প্রিয়?—কোন্ নাটকের জন্য আমদের আকাঙ্ক্ষা প্রবলতর?—গিরিশচন্দ্র এর জবাব দিয়েছেন, আর জবাবে যার কথা জো'রের সঙ্গে বলেছেন, তা' হল, 'পৌরানিক' নাটকের তত্ত্ব।—এই নাটক ভালো কেন? এ বিষয়ে গিরিশচন্দ্রের যুক্তি হল, 'পৌরানিক নাটক জাতীয় নাটক, আর জাতীয়তা প্রণোদিত নাটক ছাড়া জাতীয় হিসাবে হিতকর হয় না। ভারতবর্ষের জাতীয়তার মূলে ধর্ম। ভারত ধর্মপ্রাণ। যাহারা লাঙ্গল ধরিয়া চৈত্রের রৌদ্রে ক্ষেতে পরিশ্রম করিতেছে তাহারাও কৃষ্ণ নাম জানে। তাহাদের মন কৃষ্ণ নামে আকৃষ্ট। যদি নাটকের সর্বজনিকতার প্রয়োজন থাকে, তবে কৃষ্ণ নামেই হইবে। যাঁহারা বিদেশীয় ভাবে চিত্ত গঠন করিয়াছে—তাঁহারা ভারতের বৈশিষ্ট্য ভারতের মর্ম বুঝেন না।'৩৪

ওপরের ঐ কথাগুলি শুনলে হঠাৎ মনে হতে পারে এ বুঝি কোনো ধর্ম প্রচারকের কণ্ঠস্বর।—বিদেশ থেকে আগত 'মানবিকতাবাদে'র যে ভাবধারা আমাদের মধ্যে নানা সংঘাত ও সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে বেঁচেছিল, তার অস্তিত্ব এবার উঠল টলমল করে। ড্রামণ্ড-ডিরোজিও থেকে রামমোহন-বিদ্যাসাগর সকলের সাধনাই যেন চলল এবার অবলুপ্ত হতে। অন্ততঃ নাট্যসাহিত্যে এ ভাবধারার বিদায় যে আসন্ন হয়েছে, তা' খুব স্পষ্টভাবেই বোঝা গেল।—হলও তাই।

এ বিষয়ে সমালোচকরাও আমাদের এই কথারই প্রতিধ্বনি তুলে লিখলেন, 'সমাজ সব সময়েই গতিশীল, সেই গতি কখনো 'প্রগতি' আবার কখনো বা

'পরাগতি'। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমাজে এই প্রগতি দেখা গিয়াছিল, কিন্তু ঐ শতাব্দীর শেষ ভাগেই প্রগতি পরাগতিতে রূপান্তরিত হইয়া গেল। যে বিধবা বিবাহের সমর্থনেএক কালে বহু গ্রন্থাদিরচিত হইতে দেখিয়াছি, সেই বিধবার প্রণয় ও পরিণয় কঠোরভাবে নিন্দিত হইল গিরিশচন্দ্রের নাটকে। যে নারীকে আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে সমুজ্জল করিয়া মাইকেল ও দীনবন্ধু সূর্য্যালোকিত মুক্ত জগতে লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাকেই আবার শাস্ত্রের অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া অসূর্যস্পশ্যা গৃহলক্ষ্মীর আসনে বসাইয়া গিরিশচন্দ্র ও অমৃতলাল নিশ্চিন্ত হইলেন। শুধু তাহাই নহে, পৌরানিক আদর্শ প্রাপ্ত সতীত্ব ও স্বামীভক্তির এক ধম্বন্তরী সুধা খাওয়াইয়া তাহাকে নিস্তেজ ও সম্মোহিত করিয়া রাখিলেন। গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল, অন্নপূর্ণা, কিরণময়ী, জোবি, জহরা ও অমৃতলালের প্রকৃতি চরিত্র দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য ভাবের সংঘাতে আমাদের মুক্তি পাগল চিত্তের যে শৃঙ্খল ঝঙ্কার শুনা গিয়াছিল, তাহাতে দৈব-বিধানের বিরুদ্ধে পরুষ প্রতিবাদের সহিত মিশিয়াছিল, মানবতার জয়দৃপ্ত উল্লাস। দৈবকে ছাড়িয়া মানবতার প্রতিষ্ঠা করা সহজ নহে। ইহাতে দৃঢ়তা ও কাঠিন্স প্রয়োজন। অথচ ইহার মধ্যে আছে অশান্তি ও অনিশ্চয়তা। এই দৃঢ় কঠিন, অশান্ত ও অনিশ্চিত মানবাত্মার যে-বেদনা আমরা দেখিলাম মধুসূদনের রাবণ চরিত্রে, সেইরকম চরিত্রের সন্ধান উংনবিশ শতাব্দীর শেষভাগে দেখি না। · তখন মানুষের মন মানুষকে ছাড়িয়া পুনরায় দেবতার দিকে ঝুঁকিয়াছে। সেজন্ত তৎকালীন নাটকে দৈব-শক্তির অলজ্ব্য অনিবার্যতা ও মানুষী-শক্তির ব্যর্থ পরাজয়ের কাহিনী বর্ণনা করিয়া দেবতার প্রতি একটা নিশ্চিন্ত নির্ভরতার ভাব জাগ্রত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল।[৩৫]

না, উদ্ধৃতি বাড়িয়ে আর লাভ নেই। দৈব-শক্তির কাছে মানবিক শক্তির পরাজয় যদি এ যুগের কথা হয়, তবে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে দীনবন্ধুর পথের সঙ্গে এ পথের কোনো মিল নেই। গিরিশচন্দ্র-অমৃতলাল-ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ নাট্যকারেরা এই নতুন পথেই এগিয়ে চললেন, দীনবন্ধুর আদর্শ পড়ে রইল উপেক্ষিত হয়েই। যাঁরা 'দৈবশক্তি'র কথা সোজাসুজি বললেন না, তাঁরা রুচির দোহাই দিয়ে ও নীতির নজির তুলে দূরে সরিয়ে রাখলেন আমাদের আলোচ্য নাট্যকারের আদর্শ।—এ ধারায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল এবং বঙ্কিম থেকে রবীন্দ্রনাথ কেউই বাকি থাকলেন না। সুতরাং যুগান্তরের কালো পর্দার অন্তরালে হারিয়ে গেলেন আমাদের নাট্যকার।

তবু এই উপসংহারে একটি কথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হয়। মনে রাখতে হয় যা ঘটেছিল, সেই ইতিহাসকে।

'সুরধুনী' কাব্যের কবি একদা শহর কলকাতার সুরধুনী তীরে দাঁড়িয়ে নব উপচারে নবযুগের নবোদিত সূর্যকে করেছিলেন বন্দনা। সেদিন যে জ্যোতির কনকপদ্মখানি নবজাগ্রত চেতনায় করেছিল ঝলমল, তা' নবজাগ্রত মানুষের আকাঙ্ক্ষার আলোয় ছিল উদ্ভাসিত। অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে ছিল দীনবন্ধুর নিয়ত সংগ্রাম। কুটিল, কুৎসিত, ক্রুর পাপের উপর তাঁর ঘৃণা ছিল নিত্য-বর্ষিত। পল্লব-কুসুম নিয়ে সাহিত্য রচনা করবার অবকাশ তিনি পান নি এবং ইচ্ছাও বোধহয় ছিল না।—মেঘের বর্ণচ্ছটা বা বসন্তের মাধবীমঞ্জরী তাঁকে বিমোহিত করলেও, সাহিত্যের উপকরণ হিসাবে তিনি এদের পারলেন না গ্রহণ করতে। তাই তাঁর যাত্রা দুঃখের রাত্রে, তাঁর অভিযান নব নব সংকটের পথে। নিন্দার জয় শঙ্খনাদে রচিত ছিল তাঁর স্বাগত-ভাষণ, আর বহ্নি তেজে বিরচিত ছিল তাঁর জয়মূল্য।

যে-কোনো দেশের সাহিত্যে এ জাতীয় শিল্পী কদাচিৎ দেখা যায়। কদাচিৎ। আমরা দুর্লভ গৌরবের অধিকারী যে তাঁকে পেয়েছিলাম।—তাই যুগান্তরের কালো মেঘও এঁকে ঢাকা দিতে অক্ষম। —দীনবন্ধু চির অম্লান। তিনি অমর। 'নবজাগরণ ও মানবিকতাবাদের' ইতিহাসে তাঁর নাম লেখা আছে সোনার অক্ষরে। —এখান থেকে তাঁকে হটাবে কে?

তবে এঁর সাহিত্যকে উপলব্ধি করতে হলে, এঁর সমকালকে ও এঁর অনুসৃত আদর্শকে জানতে হবে। নইলে এঁকে ভুল বোঝবার আশঙ্কা যে খুব বেশি আশা করি এই গ্রন্থের উপসংহারে তা' নতুন করে বলবার অপেক্ষা রাখে না।

॥ সূত্র নির্দেশ ॥

১। রবীন্দ্র রচনাবলী (শতবার্ষিক সং) ১০ম খণ্ড, পৃ. ১১৫
২। 'নীলদর্পণ', (১৯৬১), প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, সম্পাদকের ভূমিকা, পৃ. ১৮
৩। সাক্ষাৎ দর্পণ, (১২৭৮), গ্রন্থের বিজ্ঞাপন অংশ দ্রষ্টব্য।
৪। ঐ, পৃ. ৯
৫। 'জমীদার দর্পণ', (চৈত্র, ১২৭৯), গ্রন্থের ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য।
৬। 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা, ভাদ্র, ১২৮০।
৭। 'চা-কর দর্পণ', পৃ. ৩৫-৩৬।

৮। ভারতদর্পণ, পৃ. ৯

৯। ঐ, পৃ. ৪২

১০। ঐ, পৃ. ৭৫

১১। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', (২য় খণ্ড), সুকুমার সেন, পৃ ৩৩১

১২। ঐ, ২য় খণ্ড (১৩৫০), পৃ. ৩৩৩

১৩। 'বঙ্গদর্পণ' নাটকটির প্রকাশকাল ১২৯১ সাল, নাট্যকারের নাম গোপালকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'মিউনিসিপ্যাল দর্পণে'র রচয়িতা হলেন সুন্দরীমোহন দাস, প্রকাশকাল ১৮৯২। আর 'টাইটেল দর্পণ' নাটকখানির প্রকাশ, ১২৯১ সাল, রচয়িতা হলেন প্রিয়লাল পালিত। তৃতীয় নাটকটি সম্পর্কে সুকুমার সেন লিখেছেন, 'সরকার-খেতাব লোভী জমিদারদের চিত্র ইহার বিষয়।' [বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, (১৩৫০), পৃ. ৩৩৭ দ্রষ্টব্য।]

১৪। 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস,' (১৩৬২), ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ. ১০২

১৫। 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (১৩৫০), ২য় খণ্ড, পৃ. ১২৭

১৬। বারুণী বিলাস (১২৭৪) ভূমিকা অংশ দ্রষ্টব্য।

১৭। ঐ, পৃ. ১০৬

১৮। বিপিনবিহারী দে ১২৭৭ সালে 'একাদশীর পারণ' নামে একটি নাটক প্রণয়ন করেন। এই নাটকের প্রধান চরিত্র হল, 'সুধাচাঁদ।' এই 'সুধাচাঁদে'র প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের বক্তব্য হল, 'প্রহসন খানি 'সধবার একাদশী'র পরিশিষ্টের মতন। দীনবন্ধুর নিমচাঁদ দত্ত এখানে সুধাচাঁদ দত্ত হইয়াছে।'

১৯। সাতুলাল হল শিশিরকুমার ঘোষ প্রণীত 'নয়শো রূপেয়া' নাটকের প্রধান চরিত্র। এই নাটকটি প্রকাশিত হয় ১২৭৯ বঙ্গাব্দে। ১২৮০ সালের বৈশাখ সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শনে' এই গ্রন্থের সমালোচনায় মন্তব্য করা হয়, 'সাতুলাল গাঁজার নিমচাঁদ, সুতরাং নিমচাঁদের ছোট ভাই ;...সাতুলালের এতগুণ আছে যে, সে নিমচাঁদের কাঁধে হাত দিয়া দাঁড়াইবে বড় আশ্চর্য নয়।'

২০। 'সভ্যতা সোপান' (১৮৭৮), পৃ. ১

২১। ঐ, পৃ. ৫৭

২২। ঐ, পৃ. ১৪। 'সধবার একাদশীর' অটল কাঞ্চনকে অনুনয় করে বলেছিল, 'তুমি যে মালিনী মাসী, হিরে মালিনী ফিরে চাও'—, এ কী তারই প্রতিধ্বনি ?

২৩। 'সেনেকান' আদর্শের কথায় 'নীলদর্পণ' আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা টমাস স্যাকভিলের 'Gorboduc-এর নাম লিখেছি। আদর্শটি যে আরোপিত নয়, তার প্রমাণ হলেন মধুসূদন স্বয়ং। ইনি একটি চিঠিতে একদা লিখেছিলেন, 'Have you ever heard of Sackville—Lord Buckhurst, born in 1527 ? This noble man's play called 'Gorboduc' first introduced to Englishmen the form of verse'... ['কবি মধুসূদন ও তাঁর পত্রাবলী', ক্ষেত্রগুপ্ত সম্পাদিত, পৃ. ১৬২-৬৩]-স্বয়ং মধুসূদন যে এঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, এমন মনে করবারও কারণ রয়েছে।

২৪। গিরিশচন্দ্র প্রণীত 'শাস্তি কি শান্তি'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য। ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র নাট্যকার দীনবন্ধুকে 'নাট্যগুরু' হিসাবে বন্দনা করেছেন।

২৫। The Indian Stage (1938), Vol II, H. N. Dasgupta. P. 149.

২৬। এই প্রসঙ্গে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের Hindu Patriot দ্রষ্টব্য।

২৭। বঙ্কিম প্রসঙ্গ, পৃ. ৬৯

২৮। সারদাচরণ মিত্রের এই স্মৃতিচারণটি দীর্ঘ। এখানে অংশতঃ উদ্ধার করা হল। ১৩১২ সালের 'বঙ্গদর্শনে'র অগ্রহায়ণ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

২৯। নটচূড়ামণি অর্দ্ধেন্দু শেখর মুস্তফী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, পৃ. ৫

৩০। The Englishman, April 17, Friday. 1874.

৩১। 'বান্ধব' বৈশাখ, ১২৮৮ সাল।

৩২। 'গিরিশ প্রতিভা' (১৩৩৫), হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃ ৪৮০

৩৩-৩৪। ঐ, পৃ. ৪৮১

৩৫। 'বাংলা নাটকের ইতিহাস', (১৩৬২)—অজিতকুমার ঘোষ, পৃ. ১২৭

সমাপ্ত